অন্দরমহলের গল্প

সমরেশ মজুমদার

আরুণি পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

।। ভূমিকা ।।

বাঙালির অন্দরমহল এক বিচিত্র জগৎ। জগৎ পরিবর্তনশীল। অন্দরমহলও তাই বদলাচ্ছে, কিন্তু এর মধ্যে যে একটা জাড্যতা আছে তার বুঝি তেমন বদল হয়নি। খুব পুরনো অন্দরমহলের ছবি একটা না পেলেও গত দেড়শো বছর বা দুশো বছরের অন্দরমহলের ছবিটা ধরা পড়ে আছে মেয়েদের লেখা নানান আত্মকথায় এমনকি সংবাদ-সাময়িক পত্রের নানান টুকরো সংবাদে। ইংরেজের সঙ্গে বাঙালির অন্দরমহলের এতোই তফাৎ যে বিলেতের যুবরাজ এসে বাঙালির অন্দরমহল দেখবার জন্যে একদা আঁকুপাঁকু করে উঠেছিলেন। উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁকে সে সুযোগ করে দিয়ে একটা ইতিহাস রচনা করেছিলেন।

কি ছিল সে অন্দরমহলে? যা ছিল তা কিন্তু শুধু অন্দরবাসিনীরাই পরিচালনা করতেন না — পুরুষসমাজের তর্জনীসঙ্কেতে তা পরিচালিত হত। ফলে মেয়েরা কারাবাসেই থাকতেন বলা যেতে পারে। এতোটা কড়াকড়ির কারণ বহিরাগত মুসলমানদের উপস্থিতি কিনা বলতে পারি না। তবে ঘোমটার আড়ালে এতোখানি থাকার মধ্যে হয়তো এই বহিরাক্রমণের প্রভাব থাকতেও পারে।

আসলে বালবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ — নানান সামাজিক প্রথা ও আচরণ; মেয়েদের বাইরে যেতে মানা, অপরিচিত পুরুষদের সঙ্গে কথা বলায় মানা — এই সব মানার পাহাড়ে তাঁদের জীবন অনেকটা 'খাওয়ার পরে রাঁধা আর রাঁধার পরে খাওয়াতেই' অতিবাহিত হয়ে যেত।

এরই মধ্যে ইংরেজরা আসাব পর মেয়েদের জীবনেও একটা পরিবর্তন আনার সুযোগ এসে গেছিল। লেখা-পড়া শেখানোর আয়োজন হতে শুরু হয়েছিল। সেটা মোটামুটি কলকাতাতেই। গ্রামে তখনও এই ঢেউ এসে পড়েনি। নবমীতে লাউ শাক আর দ্বাদশীতে পুঁই শাক খাওয়ার বাছবিচারেই মেয়েদের জীবন কাটছিল। (এখনও কি এর খুব পরিবর্তন হয়েছে? এখনও বাংলা ভাষার বেস্টসেলার বইটির নাম পঞ্জিকা !!)। মেয়েদের লেখাপড়া? সেকালে বলা হত মেয়েরা পড়াশুনো করলে — বিধবা হবে, সন্তান ম'রে যাবে এমনকি স্তনের দুধ পর্যন্ত শুকিয়ে যাবে।

এমন সব নিষেধ-মানার মধ্যেও রাসসুন্দরীরা লেখাপড়া শিখেছিলেন লুকিয়ে-চুরিয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে জানলা-দরজার ফাঁক কাপড় দিয়ে আড়াল

করে রাতের গভীরে আলো জ্বালিয়ে সংসারের সব কাজ সেরে। স্বামীরাও অবশ্য তাই চেয়েছিলেন। কোন্ রাসসুন্দরীরা? যাঁরা শ্বশুরের ঘোড়াটিকেও দেখে সসম্মানে ঘোমটা টেনে নিতেন সম্ভ্রমে এবং লজ্জাশীলতায়। যাদের মনের ইচ্ছে মনেই মিলিয়ে যেত — স্বাতন্ত্রের কথা যাঁরা মনেও আনতে পারতেন না। কারণ তাঁদের আচরণে পান থেকে চুন খসে পড়লেই ধুন্ধুমার কান্ড বেধে যেত। সমাজ যাই যাই করে উঠত। অথচ বোবা কান্নায় অন্দরমহলের বাতাস ভারী হয়ে উঠত। যুবতী বিধবারা আপনার বয়স্ক পুত্রের সঙ্গেও কথা বলতে পারতেন না নির্জনে — অপর অত্যাচারের আর কি উদাহারণ দেবো এই ধোয়া তুলসিপাতার পুরুষ সমাজে? গোটা অন্দরমহল জুড়ে সন্দেহ আর অপমানের অন্ধকার, বিধিনিষেধের সীমাহীন বর্বরতা।

সেই কোন এক বালিকা বয়সে — যখন সে কাপড় পড়তে পারত না — স্বামীর অন্দরে এসে ঢুকত। আর যদি কুলিন ঘরের বউ হত — তাহলে তো কথাই ছিল না। খেলার বয়সেই তারা নিজেরাই খেলনা হয়ে যেত। মেয়েছেলে, বিটিছেলে — সে তো জুতোর শুকতলা। তাদের নিয়ে ছড়া কাটা হত —

মেয়ের নাম ফেলি
পরে নিলেও গেলি
যমে নিলেও গেলি।

অথবা

মেয়েছেলে মাটির ডেলা
টপ্ করে নে জলে ফেলা।

শাশুড়ি ননদের অত্যাচার শোনা যেত বধুর পিঠের খুন্তি পোড়ানো ছ্যাঁকা চিহ্নে। ছড়ায় শুনতাম —

বড় সরাখানা ভেঙে গেছে
ছোট সরাখানা আছে —
নাঁচন কোঁদন কর কি বউমা
হাতের আটকান আছে।

— বউরা পেট ভরে খাবে? সংসার রসাতলে যাবে না।

কিন্তু একদিন এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবার বাসনা জাগল। মেয়েরা স্কুলে যেতে শুরু করলেন — ঈশ্বর গুপ্ত ছড়া কাটলেন —

আগে মেয়ে গুলো ছিল ভাল ব্রতধর্ম করতো সবে
একা বেথুন এসে শেষ করেছে, আর কি
তাদের তেমন পাবে

এবং 'তারা বিবি সেজে এ-বি পড়ে বিলিতে বোল কবেই কবে'। আটকে রাখতে পারেনি পুরুষ সমাজ মেয়েদের অন্দরমহলের চৌহদ্দির মধ্যে। অচলায়তন একটু একটু করে ভেঙেছে বই কি!

কিন্তু সত্যিই কি ভেঙেছে। বাঙালি মেয়েরা কি প্রত্যাশিত স্বাধীনতা পেয়েছেন! আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী। মেয়েরা এখনও লোলুপতার শিকার। তবুও বদল যে হয়নি এমন কথা বলি কি করে?

সাহিত্যকে বলা হয়ে থাকে সমাজের প্রতিচ্ছবি। বাংলার ছোটগল্পে এই পরিবর্তনশীল বাঙালির অন্দরমহলের ছবি অবশ্যই ধরা পড়ে আছে। ফলে বাংলার সমাজের একটা বড় অংশের সামাজিকতার ইতিহাস এই গল্পগুলিতে ধরা পড়ে আছে। মেয়েরা আজ ঘরের বাইরে এসেছেন। পুরুষ সমাজ বলছে তাঁরা সমানাধিকার প্রাপ্ত। একদা কেশব সেন গান গেয়েছিলেন — নরনারী সকলের সমান অধিকার। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন — না জাগিলে আজি ভারত-ললনা ভারত যে আজ জাগে না জাগে না। কিন্তু এখানেই তো আবার মেয়েদের জন্যে তেত্রিশ শতাংশের সংরক্ষণের আপাতবিরোধী আন্দোলন করেন মেয়েরাই (নাকি এ-ও পুরুষের কারসাজি)!!

এই যে মেয়েদের ভাগ্য, এই যে মেয়েদের বেরিয়ে আসা (তসলিমাদের মত অবশ্যই নয়) — এই চলচ্ছবিটা ধরে রাখার জন্যেই এই গল্পের সংকলন। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার তাঁর ঔদার্যে আমাকে এই সংকলনটি করে দিতে বলেন। এই পরিকল্পনাটি তাঁর মস্তিষ্কের ফসল। তবে এই ফসলটিকে মড়াইজাত করার দায় দিয়েছিলেন আমাকে। যে-দায় আমি পালন করার চেষ্টা করেছি। এই আয়োজনের সঙ্গে সংযুক্ত সকলের কাছেই আমার ঋণ।

গল্পগুলিতে যৌথ পরিবার, ভেঙ্গে যাওয়া যৌথ পরিবার থেকে আপনি আর কপ্‌নির ছোট পরিবার সুখী পরিবারের পরিবর্তনশীল ছবি পাঠক পেতে পারেন। এরই মধ্যে অনঙ্গদেবের আশ্চর্য গমনাগমন জীবনের মধ্যে অন্যবিধ মাত্রা এনে দিয়েছে। জীবনে জটিলতাও এসে গেছে আধুনিকতার সঙ্গে সন্দেহ নেই। ছোট বয়সের মাটির তালকে বড়ো করে সংসারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে

নেওয়ার সঙ্গে বড় হয়ে আসা বুলি শেখা পাখিকে নতুন বুলিতে অভ্যস্থ করতে গিয়ে মতবিরোধ বাড়ছে বই কমছে না। বিচ্ছেদ-বিরোধ বাধছে। এরই মধ্যে বাঙালি অন্দরমহল বাঁচার চেষ্টা করছে। এ লড়াই বাঁচার লড়াই কিনা তা যেন সাহস করে বলতে পারছিনা।

গল্পগুলিতে মেয়েদের লেখাপড়া-শেখা, শাশুড়ি স্বামীদের সহযোগিতা-বিরোধিতা, বৈধব্য এলে তার অবস্থান অথচ জীবনগঠনের প্রবল আর্তি, স্বামীর অমিতাচার পবিত্রতা স্ত্রীর অন্দরমহলকে যেভাবে বিপর্যস্ত করে এবং যার কারণ হয় অকালমৃত্যু; যৌথ পরিবার কেমন করে ভ্রাতৃবিরোধে ভেঙ্গে যায় এবং জা-দের এতে ভূমিকা — মেয়েরাই মেয়েদের কতখানি শত্রু হয়ে ওঠেন; অন্দরমহলেই লক্ষ্য করা গেছে দেবর ও শ্যালিকাদের অন্যতর প্রেমের, গোপন প্রেমের চিরকালীনতা; স্বামী-শাশুড়ি-বধূ নিয়ে মনোরম সংসার — চলে যাওয়া মেয়ের বেদনা — আদুরে আদুরে ছোটদের নিয়ে স্নেহোষ্ণ অন্দরমহল — সংসারের নানা খুঁটিনাটি এমনকি দেশপ্রেমের উৎসার; কালো মেয়ের পরিণাম ও পাওনা-গন্ডার বিরোধে বিপর্যস্ত অন্দরমহল; বাঙালির অন্দরমহলে বৃদ্ধ মাতা পিতার অবাঞ্ছিত উপস্থিতি; অন্দরমহলের আলোড়নে বর্হিমহলের টালমাটাল ভাব; পারত্রিক আর ঐহিক সংস্কারের টানাপোড়েনে এলোমেলো অন্দরমহল; অসম-বয়সের বিবাহে যে মৃত্যু তাও যেন এখানে বড়ো কথা নয়; অন্দরমহল কখনও বা বিস্তৃত হয়ে অন্যের অন্দরমহলকে পরিব্যাপ্ত করে; কখনও বা এই মহলে রচিত হয় সাহিত্যের পরিবেশ — জীবন হয় মনোরম; আবার সামান্য সরষের তেল বাজারে অমিল হলেও এই অন্দরমহলে আলোড়ন ওঠে; আবার এগিয়ে আসা আধুনিক অন্দরমহলও বাঙালি লেখকের গল্পে অনিবার্যভাবে ঠাঁই করে নেয়।

এই যে ওঠা পড়া — এরই একটি ক্রম পরিবর্তনশীল ছবি এই গল্পগুলিতে ধরা পড়ে গেছে। সামাজিক ইতিহাসের এই সাহিত্যিক দলিলটি একালের পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারার একটা দায়বদ্ধতা আমরা স্বীকার করেই নিয়েছি।

যাঁদের গল্প নিয়েছি, তাঁদের সকলের প্রতি আমাদের বিনম্র কৃতজ্ঞতা।

অন্দরমহলের সত্যি ছবি
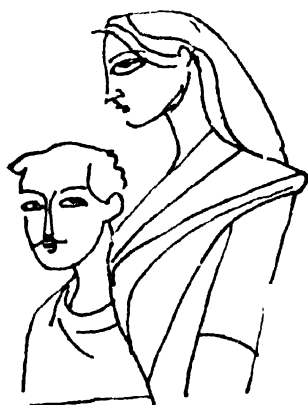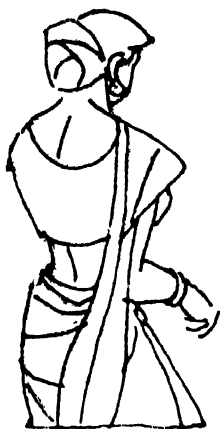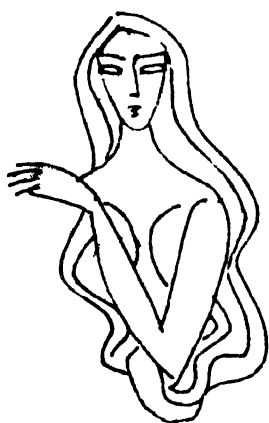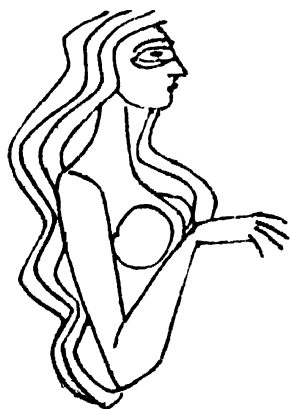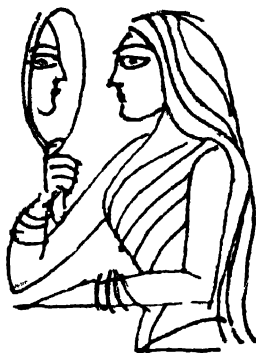
অন্দরমহলের গল্প

বিপত্নীকের পত্নী

নৃত্যকালী দেবী

।। ১ ।।

পিতা মাতা তাহাদের একমাত্র কন্যা সত্যশীলাকে সৎপাত্রে দিবার জন্যে যথোচিত চেষ্টা করিয়া ছিলেন। সেই চেষ্টার ফলে নারায়ণদহের জমিদার কৃষ্ণরাম বসুর জ্যেষ্ঠপুত্র সুধীরচন্দ্র বসুকে জামাতারূপে পাইলেন, এইরূপ সামাজিক সর্বগুণে গুণান্বিত চির-প্রার্থনীয় জামাতা পাইবেন, তাহা সত্যশীলের পিতা দেবেন্দ্রবাবু আশাও করেন নাই। বিশেষত সুধীর বিবাহিত, ভগবানের কাম্য মানবের আশা ও কল্পনার অতীত, হঠাৎ সুধীরের পত্নীবিয়োগ হইল, শোকের ঝড় না থামিতেই পুনঃ পরিণয়ের মলয় বহিতে লাগিল, দেবেনবাবুও সুযোগ ছাড়িলেন না। মলয়ানিল পূর্ণ বসন্তকাল, হৃদয়-উদ্যান হইতে সযতনে পালিতা দশমবর্ষীয়া কুমারী কুসুমকলিকা তুলিয়া সাদরে জামাতৃরূপী দেবতা বিংশ বর্ষীয় যুবক সুধীরচন্দ্রের পদসরোজে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। পত্নীবিয়োগে শোকজর্জরিত যুবক নিজ হৃদয়ের স্নেহ ও দুর্বলতা প্রকাশ জন্যই যে অশ্রুজলে ভাসাইয়া সেই অস্ফুট কলিকুসুম সাদরে কণ্ঠে ধারণের জন্য অগ্রসর হইলেন। উভয় পক্ষই ধনকুবের, খুব সমারোহ সহকারে বালিকা যুবক পরিণয় শেষ হইল।

।। ২ ।।

বিবাহের এক বৎসর পর সত্যশীলা "শ্বশুর-ঘর" করিতে যাইতেছে। বিদায়ের দৃশ্য কি শোকদ্দীপক, লক্ষ্মীগাঁও হইতে নারায়ণদহ একদিবসের রাস্তা, নৌকায় সব বন্দোবস্ত করিয়া দরজায় পাল্কি, দেবেন্দ্র বাবু ঠিক করিয়া দিয়া অন্দরে আসিয়া মাতাকে বলিলেন, "আর বিলম্ব কেন?"

সত্যের স্নেহময়ী পিতামহী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দেবু সতির কান্না তো দেখতে পারি না, মেয়ের বড় যন্ত্রণা, দেবু বড় যন্ত্রণা।" স্নেহময় পিতার নয়নদ্বয় জলে সপূর্ণ হইল। করুণ কণ্ঠে কহিলেন, "মা এর তো উপায় নাই,

সতি কোথায়?" পিতামহী রোরুদ্যমান পৌত্রীকে কোলে করিয়া লইয়া আসিলেন। বালিকা পিতামহীর গলা জড়াইয়া ধরিল, "আমি যাব না, আমি যাব না। তোমাদের ছেড়ে আমি যাব না।" বলিয়া উচ্চস্বরে গগন বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অন্য দিকে সত্যশীলার জননী, "আমার সোনার প্রতিমা আজ কাকে দিচ্ছি, কে আমার বাছার মুখ চেয়ে খেতে বলবে" ইত্যাদি বলিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশিনীরা পর্যন্ত কাঁদিতে লাগিল, উঃ সে কি দৃশ্য?

বহুক্ষণ পর পিতামহী ঈষৎ শান্ত ভাবে গত রাতের উপদেশাবলী আবার একটু স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন, "মা সতি, সে পরের বাড়ি সারা দিন মনে রাখিস সুধীর খুব ভাল ছেলে যা বলে তাই শুনিস, তাকে যেন রাগাস নে সেখানে তোর রাগ কেউ সহ্য করবে না", বলিতে বলিতে বৃদ্ধা উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, সত্যশীলার আর কাঁদিবার শক্তি ছিল না। একটা থাম ধরিয়া কেবল ওঃ ওঃ করিয়া যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে লাগিল।

দেবেনবাবু অশ্রু নয়নে জননীকে বলিলেন, "মা কর কি তোমরা সবাই এমন ক'রে কাঁদ কেন," তৎপরে কন্যার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "মা আমার লক্ষ্মী, তুমি তো সব বুঝ, মা সেই তো তোমার বাড়ি, তোমার মার, ঠাকুমার যেমন এই বাড়ি, তোমার তেমনি সেই বাড়ি," ইত্যাদি বলিয়া সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শান্ত হইবে কে?

সমস্ত রাস্তা কাঁদতে কাঁদিতে সত্যশীলা শ্বশুর বাড়ি চলিল, সঙ্গে পিত্রালয়ের একমাত্র দাসী "ক্ষেমা"। এখন ক্ষেমাই সত্যশীলার আনন্দ ও শান্তির স্থল।

।।৩।।

সত্যশীলার আসার পর নারায়ণদহের কামিনীগণ একবার মনের সাধে নব বধূর সর্বাঙ্গীন সমালোচনা করিয়া লইল। সত্যশীলার দেবরবধু বলিলেন, "একে তো দিদি বলতেই আমার লজ্জা বোধ হয়, আহা! আমার পোড়া কপাল, নইলে অমন বোনের মত জা হয়।" শাশুড়ি সান্ত্বনাচ্ছলে বলিলেন, "এও অমনি হবে, সুধীরের আমার স্ত্রী ভাগ্য ভাল।" একজন কুটুম্বিনী বলিলেন, "সে কি

আর হয় মাসি, যেমন যায় তেমন আর হয় না।'' শাশুড়ির চক্ষে জল আসিল, বলিলেন, ''তা কি আর হয়, আহা সে আমার লক্ষ্মী বৌ তেমন কি আর হবে?''

গৃহিণীর কনিষ্ঠ পুত্র সুকুমারচন্দ্র সেইখানে ছিলেন, তিনি বলিলেন, ''মা বৌ মলেই তোমাদের কাছে সতী লক্ষ্মী আর ঘর করা যায়, আজ যদি এ বৌ-দিদি মরে যান, তবে কাল তুমি একেও সতী লক্ষ্মী ঘর আলো করা বৌ বলবে।'' গৃহিণী চমকিয়া বলিলেন, ''ওকি কথা, শুভ দিনে অমন কথা বলে না, চুপ কর।'

নূতন বৌ এসেছে, খাওয়া দাওয়া মিটিতে রাত্র ১১টা হইতে চলিল। বিধবা শাশুড়ির জলযোগের পর সত্যশীলা পিতামহীর শিক্ষা মত এক খুরি তেল লইয়া শ্বশ্রূর পদ সেবার জন্য আসিলেন। ছোট বৌ সুহাসিনী খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, ''বৌ, ওকি করছ, ওসব চাল আমাদের বাড়ি নাই।।'' নববধূ বালিকা সত্যশীলা আশ্চর্য হইয়া গেল, এখনও তো সে তাঁহার মাকে রোজ ঠাকুমার পায়ে তেল দিয়া দিতে দেখে। শ্বশ্রূ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, ''বৌ আমার লক্ষ্মী এখন যাও মা, শোও গে।'' তৎপর সুহাসিনীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, ''যাও মা, বড় বৌকে ঘরে দিয়ে এস।'' সুহাসিনী মুখে কাপড় দিয়া বলিলেন, ''আমি পারব না মা, ভাসুরের ঘরে জা কে দিয়ে আসতে পারবো না।'' তৎপর গৃহিণীর বিধবা বোনঝি সরলা সত্যশীলার হাত ধরিয়া লইয়া শয়ন কক্ষাভিমুখে চলিল। সরলা এক সম্পর্কে সত্যশীলার কাকিমা হইত।

যাইবার সময় ঘোমটাবৃত সত্যশীলার পুনঃ পুনঃ পদ স্খলন হইতে ছিল। সত্যশীলাকে এইরূপ ভীতা দেখিয়া সরলা সস্নেহে বলিল, ''সত্য, কাঁপছ কেন?''

সত্য কম্পিত কণ্ঠে বলিল, ''কাকিমা আমি তোমার কাছে শোব।''

কাকিমা হাসিয়া বলিলেন, ''পাগলী মেয়ে তা কি হয়।'' পরের বাড়ি সত্যশীলা আর কিছু বলিতে সাহস পাইল না। কম্পিত হৃদয়ে বালিকা আপাদ-মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া শয়ন করিল। সুধীরচন্দ্র প্রবেশ করিলে সরলা প্রস্থান করিল। সুধীর ধীরে ধীরে গিয়া নব পরিণীতা বালিকার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

স্বর্গীয়া পত্নীর জন্য হৃদয় হইতে একটি নিশ্বাস পড়িল। নব পরিণীতা বালিকা পত্নী পার্শ্বে শায়িতা, যুবক সুধীর ধীরে ধীরে পত্নীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "তুমি এত লজ্জা কেন করছ, তোমার আমার লজ্জার সম্বন্ধ নয়, কথা বল।"

বালিকা কথা বলিতে পারিলেন না, "তোমার আমার লজ্জার সম্বন্ধ নয়" ইহাও বালিকার বিশ্বাস হইল না, কেননা তাহার মা এখনও তাহার পিতাকে খুব বেশী লজ্জা করিয়া থাকেন।

সুধীর একটু থামিয়া আবার বলিলেন, কথার স্বর অভিমানে ও বিষাদে পূর্ণ। "সত্য; আমার সঙ্গে তুমি কথা বলছ না, আমার হৃদয়ে কি যন্ত্রণা, তা কি তুমি জান না, ভেবেছিলাম তোমার দ্বারা আমার এ যন্ত্রনা শীতল হবে।" বালিকা, একাদশ বর্ষীয়া বালিকা উত্তর কি দিতে পারে? যন্ত্রণা ও শীতল এই দুটি শব্দ বালিকার কর্ণে প্রবেশ করিল, কিন্তু সে যন্ত্রণা কি এবং তাহা শীতল করিবার প্রক্রিয়া কি, তাহা বালিকা কি করিয়া জানিবে? এইখানেই বলিতে বাসনা হয়, বিপত্নীক যুবকদিগের বিবাহার্থে বিধবা যুবতী স্থির করা কর্তব্য, সম-অবস্থাতেই বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি আসিয়া থাকে, বালিকা যুবক মিলনে সমাজের অমঙ্গল ও ব্যক্তি বিশেষের অশান্তি সৃষ্টি ভিন্ন আর কিছুই হয় না। যুবক স্বামীর হৃদয় তাপদগ্ধ, প্রেম, মিলন, বিরহ সবই তাহার পুরাতন, অপর পক্ষে কুসুম সুকোমল হৃদয় বালিকার সবই নূতন। তাহার মন স্বামীকেও নূতনত্বে ভরা খেলার সাথীর মত দেখিতে চায়। অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতীর নিকট অষ্টবিংশ বর্ষীয় যুবক বড় নহে, কিন্তু একাদশ বর্ষীয়া বালিকার পার্শ্বে একবিংশ বর্ষীয় যুবক মানাইবে কেন?

পুনরায় যুবক সুধীর অতৃপ্ত আবেগ স্বরে বলিলেন, "সত্য একটি কথা বলো আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি, একটি কথা বল।"

নিদ্রায় বালিকার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিতেছিল, ভয়ে জিহ্বা জড়িত হইতেছিল, সেই অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রে জড়িত ও কম্পিত কণ্ঠে বালিকা সত্যশীলা বলিল, "বলুন, কি বলব।"

।। ৪ ।।

গত ঘটনার ছয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল জগতেও বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এইরূপ স্থলে আমাদের ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাটিতেও যে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, তাহা লেখাই বাহুল্য। সত্যশীলা এখন আর কম্পিত-হৃদয়া লজ্জা ও ভয়ময়ী বালিকা নয়, সপ্তদশ বর্ষীয়া সহৃদয়া, গাম্ভীর্যময়ী, যুবতী, সন্তানের জননী ও গৃহের গৃহিণী সত্যশীলাকে "দিদি" বলিয়া ডাকিতে এখন আর সুহাসিনীর লজ্জা হয় না, এখন আর পিত্রালয় হইতে আসিবার সময় সত্যশীলার আকুল ক্রন্দনে বাড়ি আন্দোলিত হয় না। সত্যশীলার স্থির নয়নে এখন নীরব ক্রন্দনেরই পূর্ণ অধিকার। বয়োবৃদ্ধির সহিত সত্যশীলার বাল্যস্বভাবের বহু পরিবর্তন হইয়াছে। ইহা সকলেরই হয়, বেশীর মধ্যে সেই পরিবর্তনে যেন বিষাদের একটি সুগভীর রেখা পড়িয়াছে। সে রেখা এত সূক্ষ্ম, যে সাধারণ চক্ষে বড় পড়িত না। সাধারণে জানিত সত্যশীলা রমণীরত্ন, ধীরা, স্থিরা, শান্ত ও মৃদু-মধুর-ভাষিণী। যাহাদের হৃদয় সঙ্কীর্ণ ও কুটিলতায় পূর্ণ তাহারা বলিত, "দেমাকী ও অহঙ্কারী"। ইহাতে সত্যশীলার বড় কিছু আসিত না। "তুমি কেন এত গম্ভীর" এ প্রশ্ন সাধারণে করিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু সত্যশীলা স্বামী সুধীরচন্দ্রের চক্ষু এড়াইতে পারিলেন না। সত্যশীলার গাঢ় চিন্তাপূর্ণ গম্ভীরবদন, মৃদুবাক্য, উদাস স্থির নয়ন ও হৃদয়াস্থিত অতি যত্নে লুক্কায়িত বিষাদরাশি সুধীরচন্দ্রের চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল। সুধীর যাহা চাহিতেন, স্ত্রী ঠিক তাহা পাইতেন না, অথচ কি পাইতেন না, তাহাও বুঝিতে পারিতেন না। সুধীর হৃদয়ের পূর্ণ আবেগে প্রেমময়ী পত্নীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিতেন, তখন তিনি বুঝিতেন, অপর পক্ষে সেরূপ প্রাণ মন উন্মাদকারী আবেগ উচ্ছ্বাস নাই। তিনি সবিস্ময়ে মুখপানে চাহিতেন, পত্নী পতির সেই দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে পারিতেন না, সলজ্জে শান্ত কোমল নয়ন দুটি ভূতলে স্থাপন করিতেন।

সুধীরের হৃদয়ের বাসনা স্বামী স্ত্রী পরস্পরের নিকট কিছু গোপন না রাখেন, এরূপ বাসনা দম্পতিদিগের স্বাভাবিক। সুধীর নিজ হৃদয় দ্বার উদঘাটন

করিয়া সত্যশীলার নিকট সবই খুলিয়া বলিতেন, আর নীরব ও প্রেমিকা সত্যশীলা সেই উচ্ছ্বাসময়ী কাহিনীর উত্তরে "হ্যাঁ, না" ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারিতেন না! ইহাও সুধীরের অশান্তির কারণ, মধ্যে মধ্যে সুধীরচন্দ্র আকুলভাবে সত্যশীলাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "সকলের নিকটই তুমি কি শ্রোতা থাক, কখনওই কি বক্তা হও না?" এ কথার কি উত্তর দিলে ঠিক হয়, সত্যশীলা তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেন না। কিয়ৎক্ষণ নীরবে থকিয়া হস্তের উপর ললাট ন্যস্ত করিয়া বলিতেন, "সে আমি বুঝতে পারি না।" স্বামীর ক্ষোভের সীমা থাকিত না। বলিতেন, "এই কি এক উত্তর মুখস্ত করে রেখেছ।"

সত্যশীলার মুখে ঈষৎ হাসির রেখা পড়িত, বলিতেন। "বোধ হয় তোমার স্বর্গীয়া পত্নী এমন ছিলেন না।"

"তাঁর কথা আর কেন পুনঃ পুনঃ বল" বলিয়া সুধীরচন্দ্র সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন, সত্যশীলার গম্ভীরমুখ আরও গম্ভীর ভাব ধারণ করিত। দিন এইরূপ ভাবেই কাটিয়া যাইতেছে, বাহিরে কোন গোলযোগ নাই।

।। ৫ ।।

সন্ধ্যা লাগিতেছে, শান্তময়ী সন্ধ্যাসতীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্যেই যেন পাখিকুল নানা রবে বৈতালিক কার্যে ব্রতী হইয়াছে, প্রকৃতি রাণী নবীনা অতিথি সমাগমে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, তারাদীপ গুলি জ্বালিতে জ্বালিতে মলয়ানিলে সন্ধ্যাসুন্দরীকে ব্যজন করিতেছে। সায়াহ্নবালাও যেন তাহার ধূসর উড়ানিখানি রাখিয়া ধীরে ধীরে তিমিরাসনে উপবেশন করিতেছেন, সত্যশীলা রকের উপর দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন, মার হাঁটু ধরিয়া দুই বৎসরের খুকী মাধুর্য খেলিতেছে, এমন সময় প্রফুল্ল মুখে তাম্বুল চর্বণ করিতে করিতে সুকুমার, সুন্দর দুটি বেল ফুলের মালা হস্তে লইয়া বৌদিদির নিকট আসিলেন, সত্যশীলা তাড়াতাড়ি অবগুণ্ঠন ললাট পর্যন্ত নামাইয়া দিলেন, কাকাকে দেখিবামাত্র বালিকা মাধুর্য মাকে ছাড়িয়া কাকার নিকট আসিয়া মালা দুটি লইবার জন্য হাত বাড়াইল। সুকুমার শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, "বৌদিদি তোমার জন্যে মালা এনেছি।"

সত্যশীলা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ফুল আমি বড় ভালবাসি।" সুকুমার কহিলেন, "আমি দাদার কাছে শুনেছি, সেই জন্য ফুল পেলেই তোমার জন্য আনি।"

"আমার জন্যে বুঝি আনা হয় না" বলিতে বলিতে স্বভাব সরলা সুহাসিনী সেই খানে আসিয়া সত্যশীলার গলা জড়াইয়া ধরিলেন. সুহাস সত্যশীলার অতি স্নেহের, বয়ঃকনিষ্ঠা হলেও সত্যশীলা বড় দিদির মত সুহাসের সকল আবদার সহ্য করিতেন। সুকুমার স্নিগ্ধ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তোমার জন্যেও এনেছি - কিন্তু স্থান ভেবে পরতে হবে, বৌদিদির পায় আর তোমার গলায়, তৎপর মালা দুটি সত্যশীলার চরণ তলে রাখিলেন। সত্যশীলা, "কী কর ঠাকুর পো" বলিয়া মালা দুটি লইয়া একটি সুহাসের অপরটি মাধুর্যের গলায় পরাইয়া দিলেন। সুকুমার প্রস্থান করিলে সত্যশীলা একখানি মাদুর পাতিয়া সুহাসকে লইয়া বসিলেন, অল্পক্ষণ মধ্যেই 'খুকি' ঘুমাইয়া পড়িল। খুকির পার্শ্বে খুকির মা ও কাকীমা শয়ন করিয়া নানা বিষয় আলাপ করিতে লাগিলেন। তাহাদের কথার স্রোত কোথা হইতে কোথা চলিতেছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। গৃহ হইতে সমাজরীতি, সমাজ হইতে সংসার, রাজনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি নানাবিধ লহরী লইয়া সে বাক্যে স্রোতস্বিনীর বেগ বৃদ্ধি করিতেছিল। বিবাহ বিষয় আলোচনা করিতে সুহাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা দিদি বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তোমার মত কি?" একটু ভাবিয়া সত্যশীলা বলিলেন, "আমার মত বিপত্নীক বিবাহ সম্বন্ধে যেরূপ বিধবা বিবাহ সম্বন্ধেও সেরূপ।"

সুহাস আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "বিপত্নীক বিবাহে আবার মত কি?" সত্যশীলার অধরে ঈষৎ হাস্য রেখা পড়িল। বলিলেন, "বাঃ, যত অপরাধ করেছে বুঝি বিধবা? আমার মতে বিধবা বিবাহ যেরূপ গর্হিত বিপত্নীকের বিবাহ সেইরূপ গর্হিত। তবে পতি-পত্নীর অনভিজ্ঞের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু বাল্য বিবাহ যে আমার মত নয় তা তুমি জান।"

সুহাস। "তুমি আজ আমায় নূতন কথা শুনালে, দিদি তাহলে বিপত্নীক বিবাহও প্রণয়ের অবমাননা, ঘোর নিষ্ঠুরতা!" সত্যশীলা গম্ভীর মুখে বলিলেন, "অবশ্য তুমি জান না আমাদের শাস্ত্রে আছে প্রথম পত্নীই পত্নী, আর সব

রিপুচরিতার্থের জন্য।" সুহাস, "তা তো ঠিকই, এখন আমি দেখছি এ খুব অধর্মের কাজ।" সত্যশীলা অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "হ্যাঁ"।

তাহার পর দুই জনে আরও অনেক কথা হইল। অবশেষে আহারান্তে যে যাঁহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সত্যশীলা ধীরে পদক্ষেপে শয়নাগারে আসিলেন তখনও স্বামী আসে নাই. গৃহ নীরব, সেই নীরবতার মধ্যে শিশু মাধুর্যের মৃদু নিশ্বাস ও ঘড়ি টুক্ টুক্ শব্দ সুস্পষ্টরূপে শুনা যাইতেছিল, জানালা দিয়া সুধাকরের সুধা আসিয়া ঘরের মধ্যে পড়িতেছে, সত্যশীলা মুক্ত বাতায়নে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্নাসুন্দরীর এই অনধিকার প্রবেশ ভাবিতে লাগিলেন, তৎপরে একখানা আরাম চেয়ার সেইখানে আনিয়া তদুপরি শয়ন করিলেন। যেন জ্যোৎস্নার মধ্যে জ্যোৎস্না ভাসিতে লাগিল। সত্যশীলার নয়ন দুটি ধীরে ধীরে মুদিত হইয়া আসিল, কিছুক্ষণ পরে সুধীরচন্দ্র শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। জ্যোৎস্নালোকে শায়িতা পত্নীকে আজ তাঁহার চক্ষে অতি সুন্দর দেখাইল, দুরে দাঁড়াইয়া তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া স্বর্গের এই সুষমারাশি সন্দর্শন করিলেন। তৎপরে অতি ধীরে সত্যশীলার নিকটস্থ হইয়া অতি সন্তর্পনে পত্নীর মুখ চুম্বন করিলেন। পতিপত্নীর আঁখি মিলিত হইল।

চক্ষু চতুষ্টয় মিলিত হইবা মাত্র লাজময়ী সত্যশীলার নেত্রদ্বয় নত হইয়া আসিল। সুধীরচন্দ্র পার্শ্বস্থ একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। সত্যশীলাও উঠিয়া বসিলেন. একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কখন এসেছ?"

সুধীর, অনেকক্ষণ।

সত্য, আমাকে ডাকনি কেন?

সুধীর ঈষৎ হাসিমুখে কৌতুহলপূর্ণ কোমল স্বরে বলিলেন, "ভেবেছিলুম চুপে চুপে একটি চুম্বন করে শোব।" সত্যের অধরদ্বয় হাস্যে রঞ্জিত হইল। বলিলেন, "চুপে চুপে কেন?" সুধীর সেইরূপ সুমধুর স্বরে বলিলেন, "বিরক্ত হবে বলে।" সত্যশীলার মুখে বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ পাইল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিরক্ত হই?"

সুধীর, "মুখে হও না সত্য কিন্তু মনে তো হতে পার।" সত্যশীলা গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এ কথা কোথায় পেলে?"

সুধীর, "অনুমান কর।"

সত্যশীলা গম্ভীর মুখে একবার গগনমণ্ডলস্থ দ্বাদশীর চন্দ্রের প্রতি চাহিলেন, তৎপর মুহূর্তের জন্য স্বামীর মুখোপরি নয়ন দুটি স্থাপিত করিয়া আবার চক্ষু দুটি নত করিয়া ধীর স্বরে বলিলেন, "কই তুমি ডাকলে কখন বিরক্ত হয়েছি বলে তো মনে পড়ে না।" সুধীর সত্যশীলার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "বিরক্ত হও না, কিন্তু আনন্দও প্রকাশ কর না। কই কর? এই আজকেই আমার চুম্বনের পর কই তুমি তো আনন্দ করে গলা ধরে প্রতি চুম্বন দিলে না"। সত্যশীলার মস্তকটি নত হইয়া পড়িল কহিলেন, "তা আমি পারি না।"

সুধীর, "কেন পার না।"

সত্যশীলা অপরাধিনীর ন্যায় ধীরে ধীরে বলিলেন, "বুঝতে পারি না।"

"বুঝতে পার না, সত্যই বুঝতে পার না, আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি তা তুমি বুঝতে পার না, বুঝ না যে তুমি আমার জীবনের অপেক্ষাও প্রিয়।' বলিতে বলিতে সুধীরচন্দ্র আবেগ ভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুধীরের আবেগ অভিমান সত্যশীলা না বুঝতে পারেন এমন নয়, তথাপি বলিলেন, "বোধহয় তোমার পূর্ব পত্নীকেও এ পদটি অনেকবার বলিয়াছ।" পত্নীর এই কথা পতি কর্ণে দারুণ শ্লেষ মিশ্রিত বোধ হইল, অভিমানে বলিলেন, "ওকথাই বলেছি, এ আর আশ্চর্য কি?" সত্যশীলা কহিলেন আশ্চর্য আর কি মান কুমারী বলেছেন, "অনন্ত অনন্ত প্রণয় ভাই জোয়ারের জল" তাঁর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। সুধীর বিরক্তির সহিত বলিলেন, "এরূপ ভাবে প্রণয়ের অবমাননা কর না।" সত্যশীলা স্বাভাবিক সহজ ভাবে বলিলেন, "আমি প্রণয়ের অবমাননা করি নাই, করে থাক তুমিই করেছ।"

সুধীর বুদ্ধিমানের মত আর কথা কাটাকাটি না করিয়া কহিলেন, "থাক এ আর শুনতে চাই না, নিদ্রার সময় অতীত প্রায় চল ঘুমাবে।" বলিয়া পত্নীর

হস্ত দুখানি ধরিলেন।

"তুমি যাও খুকিকে দুধ খাইয়ে নিয়ে আমি যাচ্ছি। সুধীর পুনরায় পত্নীর হাত ধরিয়া সাগ্রহ সহকারে কহিলেন, "ঝি খাওয়াবে, এখন ওঠ।"

সত্যশীলা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "এ ঝির কর্তব্য নয়, মার কর্তব্য। রাত্রি এগারোটা বেজে গেছে, যাও শোও গে।" সুধীরচন্দ্র ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন।

।।৬।।

বেলা প্রায় ছটা সত্যশীলা স্নান ও জলযোগের পর কেবল সেলাইয়ের কল লইয়া বসিতেছেন, সুহাসিনীরও স্নানাদি শেষ হইয়াছে তিনি মাধুর্য্যকে লইয়া ব্যস্ত, এমন সময় সুকুমার চন্দ্র আসিয়া বলিলেন, "বৌদি আর একটা বড় মাছ এসেছে।" বৌদিদি কথা কহিবার পূর্বেই সুহাস সুকুমারের মুখের উপর চঞ্চল চক্ষু দুটি স্থির করিয়া কহিলেন, "এসেছে তো কি হয়েছে?"

সুকুমার হাসিয়া ফেলিলেন, হাসিয়াই কহিলেন, "সুহাস তুমি ভাবি দুষ্ট হয়েচো।"

সুহাসের চক্ষু দুটি হাসিতেছিল দর্শনে ঈষৎ অধর চাপিয়া কহিলেন, "তুমি ভারি লক্ষ্মী হয়েছো।"

সুকুমার হাসি কৌতুক মিশ্রিত মুখে সুহাসকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিলেন, "রোস তোমার সব দুষ্টমির কথা বৌদিদির কাছে বলে দিচ্ছি।"

"আমিও বলে দিচ্ছি" বলিয়া সুহাসিনী সত্যশীলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার কানে ফিস্‌ফিস্ করিতে লাগিলেন। সুকুমার ছাড়িবার পাত্র নহেন, কহিলেন "দেখ দেখি তুমি বিচার কর।"

বৌদিদি তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ দেওরকে বিশেষ সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন, দেবরের এ কথায় কিছু উত্তর না দিয়া স্বভাব-সুধীরা সত্যশীলা মৃদুস্বরে কহিলেন, "মাছের কথা কি বলছিলে ঠাকুর পো?" আশ্চর্য! গাম্ভীর্যের কাছে সকলেই নম্র, এতক্ষণ সুকুমারের চক্ষে মুখে হাস্য ও কৌতুক নৃত্য করিতেছিল,

সত্যশীলার সহিত কথা কহিবার সময় তাঁহার সে ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইল। ধীরে প্রশান্ত মুখে বৌদিদির চরণ যুগলে দৃষ্টি রাখিয়া কহিলেন, "আমার দুজন বন্ধু এসেছেন, একটা বড় মাছও পাওয়া গেছে, বৌদিদি দুটি পোলাও পাক করে দেবে?" "আচ্ছা আমি পাকের উদ্যোগ করে দিচ্ছিগে, সুহাস খুকিকে দেখ।" বলিয়া সত্যশীলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুকুমার কহিলেন, "বৌদিদি শুনেছ? দাদা ঢাকা যাচ্ছেন।"

বৌদিদি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কই, না! কেন যাচ্ছেন জান?"

সুকুমার, "তাঁর এক প্রিয় বন্ধু কি একটা মোকদ্দমায় বড় বিপদে পড়েছেন তিনিই দাদার কাছে টেলিগ্রাফ করেছেন।" "ও" বলিয়া সত্যশীলা রন্ধনার্থে প্রস্থান করিলেন। সুকুমার ও সুহাসিনী বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন।

আহারাদির পর যাত্রার সময় সুধীর চন্দ্র সত্যশীলার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। সত্যশীলা মৃদুস্বরে কহিলেন, "কবে আসবে।" সুধীর, "শিগগির আসব।"

সত্যশীলার স্বর অতি কোমল, করুণ স্বরে কহিলেন, "খুব সাবধানে থেক!"

সুধীর হাসিয়া কহিলেন, "অবশ্যই, তবে এখন আসি?" সত্যশীলা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে গ্রীবাটি ঈষৎ হেলাইয়া সম্মতি দিলেন। সুধীরচন্দ্র যাইবার সময় সাদরে সত্যশীলার অধর চুম্বন করিলেন। অদ্য সত্যশীলাও পতি কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া প্রিয় মুখ চুম্বন করিলেন।

।।৭।।

এক সপ্তাহ পর সুধীরচন্দ্র বাড়ি আসিলেন। যে জন্য গিয়া ছিলেন, তাহাতে সফল হওয়াতে মন খুব প্রফুল্ল হইয়াছে, সন্ধ্যার পরই সত্যশীলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, সত্যশীলা তাঁহার উদ্যানে একটি মর্মর বেদিকার উপর শয়ন করিয়া ছিলেন, সুধীর আসিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন, "বসো বসো" বলিতে বলিতে বলিতে সুধীর হাসিয়া বসিলেন, সত্যশীলা পুনরায় শয়ন করিলেন। এবার তাঁহার উপাধান হইল "স্বামীর উপদেশ"।

সুধীর ঢাকার কত গল্প করিলেন, তথাকার রীতি-নীতি, কথাবার্তার এরূপ নকল করিয়া বলিতে লাগিলেন যে সত্যশীলা হাসিতে হাসিতে কর দ্বারা মুখাবৃত করিতে লাগিলেন। সুধীর মুগ্ধ নয়নে এই হাসিরাশি দর্শন করিতে ছিলেন, বহুদিন তিনি এরূপ ভাবে স্ত্রীকে হাসিতে দেখেন নাই।

ক্রমে রাত্রি বেশী হইয়া আসিল চতুর্থীর ম্লান চন্দ্র ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। সেই ম্লান, মধুর, স্নিগ্ধ, শান্ত আলো রাশি আম গাছের ভিতর দিয়া স্বামীর অঙ্কশায়িনী সত্যশীলার মুখের উপর আসিয়া পড়িল।

উদ্যান নীরব, স্থির, চারিদিকে বেল, চামেলী ফুটিয়া সৌরভ বিকীর্ণ করিতে লাগিল, সত্য ও সুধীর নীরব। বহুক্ষণ পর এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুধীরচন্দ্র কহিলেন, "কি ভাবছো সত্য?"

সত্যশীলা সচকিতে কহিলেন, "কই কিছুই না।"

সুধীর। "তবে যে চুপ করে আছো"।

সত্য। "সে তো তুমি জান"।

সুধীর। 'কই আমি জানি? তুমি কেন চুপ করে থাক। তাতো খুলে বল না।"

আবার বহুক্ষণ উভয়ে নীরব। অদ্য এই নীরবতা সুধীরচন্দ্রের অতি অসহনীয় হইয়া উঠিল, তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সবিষাদে পত্নীর ললাটে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন "সত্যশীলা আমি তোমার মনোমত নই ? তুমি কি আমায় ভাল বাসিতে পার না ?"

একি কথা, স্বামীর এরূপ কথা শুনিয়া কোন সাধ্বী স্ত্রী নীরবে থাকিতে পারে। সত্যশীলা সবেগে উঠিয়া বসিয়া উত্তেজনা সহকারে কহিলেন, "এ কথা বলে যে তুমি আমায় কেবল মর্মাহত করলে তা নয়, অপমানিতও করলে, ও কথা তুমি কি করে বল্লে? তুমি যদি আমার মনোমত না হতে, আমি যদি তোমায় ভালবাসতে না পারতেম, তা হলে যে শিশু তাকে কখনই দেখতে পেতে না।" খুব তাড়াতাড়ি এই কথাগুলি বলিতে বলিতে সরলা সত্যশীলার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল।

সুধীর চন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত ব্যথিত ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে পুনরায় পত্নীকে অঙ্কোপরি শয়ন করাইয়া ভাঙা ভাঙা স্বরে কহিলেন, "আমি অন্যায় করেছি সত্যশীলা, আমাকে ক্ষমা কর, তোমার এই অস্বাভাবিক নীরবতায় আমার মনে এ প্রশ্ন উঠিয়াছে।" সত্যশীলা অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাবে কহিলেন, -- "আমার এ গম্ভীর ভাবটা যে একটু অস্বাভাবিক তা আমি বুঝি, আর এর কারণ --" সত্যশীলা চুপ করিলেন।

সুধীর অতি আগ্রহের সহিত বলিলেন, "এর কারণ কি বল, বল, জানবার জন্য আমার ভারি আগ্রহ হচ্ছে।

সত্যশীলা ধীরে কম্পিত গলায় কহিলেন, 'যখনি আমার মনে হয় স্বামী অতি হৃদয়বিহীনের ন্যায কেবল রিপু চরিতার্থের জন্যই আমাকে বিবাহ করেছেন তখনি আমার মন খারাপ হয়।

সুধীর সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি এই ভাবো? এতো আমি কখনই ভাবি নাই, আমি তো কখনই তোমাকে বিলাসের বস্তু বলে ভাবি না জীবন সঙ্গিনীই মনে করি।"

সত্যশীলা ছিন্নতার বীণার মতো কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, 'জীবন সঙ্গিনী তুমি কাহাকে বল? স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধও কি শুধু জীবন পর্যন্ত? মরে গেলে কি সে স্মৃতি থাকে না? যখন তুমি আমায় আদর করতে এস, ভালবাসি বলে প্রণয় প্রকাশ কর, তখনি আমার মনে হয় এসব ভন্ডামি। অবশ্য তুমি তোমার স্বর্গীয়া পত্নীকে এমনি সরল ভাবে বলিতে "আমি তোমার"। এখন আমার হয়েছ আবার আমি যদি আজ মরে যাই কাল কোন এক দশম বর্ষীয়া বলিকাকে আদর করে ভুলাবার জন্য বলতে "আমি তোমার" - এমন অস্থায়ী প্রেমে কে তৃপ্ত হতে পারে? বিপত্নীকের পত্নী হয়ে পতির বিশুদ্ধ পবিত্র প্রেম পেলাম কিন্তু সে প্রেমে, পবিত্র গন্ধ ও আনন্দ কখনই পাওয়া যায় না।"

সত্যশীলার কথা অবসানের পর সুধীর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন সত্যশীলার মুখে একসঙ্গে এতগুলি কথা, বিশেষত তাহার দুঃখের কারণ জানিয়া বিষাদে কিছুক্ষণ বাকস্ফূর্তি হইল না, তৎপর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ধীরে ধীরে

কহিলেন, এ আমি ভাবি নাই, তাকে ভালবাসি নাই বলে, সত্যের অপলাপ করিতে আমার বাসনা নাই। তাঁর মৃত্যুর পর একবার আমার মনে উঠেছিল আর বিয়ে করবো না, কিন্তু সে কথা মুখ থেকে না বের করতেই মা, ঠাকুরমা সেটা এত অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিলেন যে আমি মুখ থেকে বের করতেই পারলাম না, কিন্তু তখন আমার মনে হয় নাই, যাঁকে বিবাহ করবো এই জন্যে তিনি চিরদিনের জন্য অসুখী থাকবেন। সত্যই আমি বড় হতভাগ্য।

সত্য। "তুমি ভুল বল্লে। তুমি হয়তো সব ভুলে গেছো, কিন্তু আমি ভুলি নাই। সেই যে দিন সাত বৎসর পূর্বে যখন তুমি কথা বলবার জন্যে বল্লে "সত্য তুমি জান না আমার হৃদয়ে কি যন্ত্রণা ভেবেছিলাম এ যন্ত্রণা তুমি শীতল করবে।" বহুদিন হয়েছে তবু আমি তোমার সেই কথাটি ভুলি নাই. সেই কথাটি স্মরণ রেখে সর্বদা তুমি যাতে শান্তি পাও, আমাব সেই বাসনা। আমি ভাগ্যহীনা, নইলে তুমি নিজেকে কেন হতভাগ্য বলবে।" বলিতে বলিতে সত্যশীলা উঠিয়া বসিলেন। অশ্রু কপোল বহিয়া বস্ত্র সিক্ত করিতে লাগিল। সুধীরচন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া স্ত্রীব নয়ন মার্জনা করিয়া মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন 'চুপ কর, চুপ কর. আমি সব সইতে পারি, কিন্তু তোমার এরূপ কান্না আমার বড় অসহনীয়, সত্যশীলা এখন আমি বুঝতে পারছি, এক পত্নীকে ভালবাসিয়া আর একজনকে পত্নীকে বরণ করা অতি নির্মম কাজ। যদি দ্বিতীয় পত্নীকে হৃদয়ের সব ভালাবাসা দেওয়া যায় তবু তিনি ভাবিতে পারেন, "স্বামী কি নিষ্ঠুর" সুধীর বসিলেন।

সত্যশীলা বহুক্ষণ নীরব রহিলেন তাঁহার হৃদয় প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় অতি ধীরে নীরব ভাব ধারণ করিল।

হঠাৎ খুকির ক্রন্দনধ্বনি, মার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে রোদনের শব্দে সত্যশীলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন, "মাধুর্যের দুধ খাবার সময় হয়েছে, সে কাঁদচে, আমি আসি," সুধীরচন্দ্রও উঠিলেন।

১৩০৯

অনাদৃত

অমিয়া চৌধুরী

মালতীর পাল্কি যখন প্রকান্ড লাল বাড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল তখন হেমন্তের বেলা অবসান প্রায়।

"পাল্কি করে এলে না কি?" বলিতে বলিতে গৃহিণী উমা প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন। মালতী পাল্কি হইতে বাহিরে হইয়া বড় জাকে প্রণাম করিল। পাল্কির খোলা দরজায় একখানি বালক মুখ দেখা গেল। মালতী সেদিকে হাত বাড়াইয়া, "আয় নেমে আয়।"

উমা অপ্রসন্ন স্বরে কহিলেন, "কে গা?"

"আমার ভাই, বড়দি।"

"ভাইটিকে সঙ্গে করে এনেছ বুঝি? বাপ রে -- সৎভাই এর অত দরদ?" অতি ক্রোধে উমা আর বেশী কথা কহিতে পারিলেন না, দ্রুতপদে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে মেজবধূ আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছিল, বড় জা চলিয়া যাইতেই সে ছেলেটিকে কাছে টানিয়া লইল, কহিল, "মুখখানি তোর মতই ছোট বৌ, তবে কালো দেখছি, তোর সৎমা কালো ছিলেন বুঝি?"

"হ্যাঁ, আচ্ছা কি করি বলত মেজদি।"

"কিসের কি? ও বড়দির এক কথা। চল, ঘরে চল।"

মালতী বিষণ্ণচিত্তে দ্বিতলে নিজের শয়ন কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল, মেজবৌ তাহাকে বসিতে দিল না; কহিল "সন্ধ্যে হয়ে গেছে, শিগগির মুখ হাত পা ধুয়ে আয়। তুই আসতে অত দেরি করলি কেন? শ্যামবাজার তো দশদিনের পথ নয়; উনি মারা যেতেই এলে পারতিস।"

"রইলাম এই দুটো দিন, বাপের বাড়ি যাওয়া তো এই শেষ হল। এতদিন বাপ ছিলেন না, -- তাও ছোটমা মার মতোই ভালবাসতেন, জুড়োবার স্থান একটা ছিল।"

"সে তো সত্যি কথাই; এদিকে ঠাকুর পো তো রেগে বসে আছে।"

"কেন, রাগ কিসের?"

"এতদিন গিয়ে বসে রইলি; যাকগে তোর ভাইটির নাম কি?"

"বিজয় কুমার।"

"এসো বিজয়, আমার সঙ্গে এসো।" বলিয়া মেজবধূ বালককে টানিয়া লইল। মালতীর দুই ভাসুর; দুই জনেই উকিল। মালতীর স্বামী সত্যেন্দ্র মেডিকেল কলেজে পড়িতেছে। তাহারা ধনী বটে কিন্তু বাড়িতে লোকের সংখ্যা অল্প। কারণ গৃহিণী উমা নিরাশ্রয় আত্মীয়বর্গ দ্বারা গৃহ পূর্ণ করার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ছিলেন। সুতরাং অনাথ বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে সঙ্গে আনিয়া মালতী যে অপরাধ করিল তাহা উমার কাছে একান্ত অমার্জনীয় বলিয়া বোধ হইল। সেদিন রাত্রে সত্যেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়াই কহিল, "আবার এ আপদ জুটিয়ে আনলে কেন?" প্রায় পনেরো দিন পরে স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ! এমন নীরস সম্ভাষণের জন্য মালতী একেবারে প্রস্তুত ছিল না। সে নীরবে নত মুখে বসিয়া রহিল। সত্যেন্দ্র টেবিলের উপর ছড়ানো জিনিস পত্র গুলি নাড়িয়া চাড়িয়া কহিতে লাগিল, "নিজে তো এক পয়সা আজও উপার্জন করতে পারিনি; এর মধ্যে তোমাকে বিবাহ করেছি এই তো বিষম সমস্যা, তার উপরে শালার অন্নবস্ত্রের ভারটাও যদি দাদার উপরে চাপাতে হয় তবে আর লজ্জার সীমা থাকে না। ওকে এনে কিন্তু ভাল করলে না।

"কোথায় রেখে আসতাম?"

"কেন, তোমার কাকারা আছেন ত।"

"তাঁরা রাখতে চাইলেন না যে।"

"আমরাই বুঝি রাখতে বাধ্য? কোন আইনে শুনি?"

মালতী চুপ করিয়া রহিল।

সত্যেন্দ্র কহিল "কি?"

"কি আর? নিরাশ্রয়কে একটু আশ্রয় দিতে আমরা পারব না? আমরা তো অক্ষম নই।"

"ভয়ানক দয়াবতী হয়ে উঠেছ যে! পরের ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে সবাই দয়ার প্রচার করতে পারে, কিন্তু এ যে কত বড় অন্যায়; - থাক গে। কোথায় সে বিজয়কুমার?"

"সে পিসিমার ঘরে কম্বলে শুয়েছে।"

সত্যেন্দ্র শয্যায় শুইয়া পড়িয়া গায়ের কাপড়টা টানিয়া লইতে লইতে অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "দরিদ্রের ঘরে বিয়ে করা মহা পাপ।"

অন্ধকারে মালতী হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিল, কোন কথা কহিল না।

পরদিন সকালে মালতী ভাঁড়ার ঘরে তরকারী কুটিতে ছিল। সদ্যস্নাতা বড়বধূ পিঠের উপর দীর্ঘ সিক্ত কেশগুলি ছড়াইয়া দ্বারের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, মালতী চোখ তুলিতেই তিনি কহিলেন, "কি গো ভাইকে তো আদর করে নিয়ে এলে; মায়ের শ্রাদ্ধ পিণ্ডির খরচটা কে দেবে শুনি?" মালতী নিরুত্তর, উমা তীব্র হাস্যপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন "ঠাকুরপো চার বছর ধরেই ফেল হচ্চে; তা না হলে হয়তো সৎ শাশুড়ির শ্রাদ্ধের খরচটা দিত। কিন্তু টাকাটা দিতে যে কাকে হবে, সে আমি জানি; রোজগার করা এমনি পাপ বটে!"

মালতী নতমস্তকে আপনার কাজ করিয়া যাইতে লাগিল, মেজ বধূ চায়ের পেয়ালা ও জলখাবারের থালা আনিয়া বড়জার সম্মুখে নামাইয়া রাখিল। উমা সেদিকে চাহিয়া কহিলেন, "আধঘন্টা হোল প্রায় স্নান করেছি, এত তাড়াতাড়ি চাটা করে নিয়ে এলে মেজবৌ?" মেজবধূর নাম লক্ষ্মী। সে স্বভাবেও লক্ষ্মী বটে; তবু উমার কাছে তাহাকে কম লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত না। কিন্তু লক্ষ্মী বড় লোকের কন্যা। মা বাপের বড় আদরের। সে অনেক সময় বাপের বাড়ীতে থাকিত বলিয়া, উমা তাহার উপরে ইচ্ছামত অধিকার খাটাইতে পারিতেন না। অধিকন্তু তাঁহার মেজ দেবর শচীন্দ্রের সহিত তাঁহার একেবারে বনিবনাও হইত না। সে ভয়ে তিনি লক্ষ্মীকে একটু এড়াইয়া চলিতেন। দরিদ্র-কন্যা মৌন-স্বভাবা মালতী তাঁহার ক্রোধের উপলক্ষ হইয়া বিরাজ করিত। সত্যেন্দ্র মালতীর লাঞ্ছনা চোখে দেখিয়াও কোন প্রতিকার করিবার চেষ্টা মাত্র করিত না এইজন্য সত্যেন্দ্রর

উপরে উমার এক ধরনের স্নেহ ছিল, সে অবশ্য স্বার্থপরের স্নেহ।

চা আনিতে দেরী হওয়াতে উমা যখন বিদ্রূপ করিলেন, লক্ষ্মী কোনও উত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়া চুপ করিয়া রহিল। উমা তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "শ্রাদ্ধের খরচটা কে দেবে, তাই জানতে এসেছিলুম।"

লক্ষ্মী কহিল, "সংসার থেকে --"

"সংসারের টাকাটা আসে কোত্থেকে শুনি।" এমন সময় শচীন্দ্রের পদশব্দ শোনা গেল, লক্ষ্মী ঘোমটা টানিয়া দিল। এবং মালতী মোটা থামের আড়ালে সরিয়া পড়িল। শচীন্দ্র আসিয়া কহিলেন, "সংসারের টাকাটা আসে ব্যাঙ্ক থেকে। টাকা তুলে আনতে হয় তো বলো, এনে দেব। কার শ্রাদ্ধ?"

উমা মুখ কালো করিয়া কহিলেন, "তোমার দাদার টাকাটা আর সংসার খরচে দেওয়া হয় না বুঝি।"

"হ্যাঁ, ডাক্তারের লম্বা-লম্বা বিল, সাহেব বাড়ির কাপড়ের ফর্দ আর রতন স্যাকরার খাঁই মিটিয়ে যা বাকি থেকে যায় তার থেকে কিছু কেড়ে কুড়ে দাদা সংসারে দেন তা জানি। কিন্তু বাজে খরচ দিতে তাঁকে তো কেউ বলছে না। শ্রাদ্ধে যা খরচ হবে তা আমি ব্যাঙ্ক থেকে এনে দেব এখন," বলিয়া শচীন্দ্র বাহিরে চলিয়া গেলেন। উমা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। উমার বাক্য স্রোতের জ্বালায় সেদিন সকলের মন তিক্ত হইয়া উঠিল। যদিও সেদিন রবিবার ছিল গৃহকর্তা উপেন্দ্র অন্তঃপুরে বড় দর্শন দিলেন না। বড় বধূর রুগ্ন ছেলে মেয়েগুলোই মায়ের হাতে কয়েকবার প্রহার লাভ করিল।

শ্রাদ্ধ শেষ হইতে অনেক দেরি হইয়া গিয়াছিল। উমা মালতীকে ডাকিয়া কহিলেন, "বাড়িশুদ্ধ লোকের খাওয়া শেষ হলো; বামুনদিদি এখন তোমার জন্য হাঁড়ি কোলে করে বসে থাকবে না কি? এক বাড়িতে অমন রকম রকম মেজাজ নিয়ে চলবে না।

মালতী তাড়াতাড়ি কহিল, "কাজ তো হয়ে গেছে বড়দি। বিজুকে খাইয়ে আসছি। বামুনদিদি, আমার ভাত একপাশে ঢাকা দিয়ে হেঁসেল তুলুক না।"

বলিয়াই সে বিজয়ের আহারের আয়োজন করিতে চলিয়া গেল। উমা আপন মনে বকিয়া যাইতে লাগিলেন।

মালতী বিজয়কে খাওয়াইয়া নীচের কলঘরে হাতপা পরিষ্কার করিতেছিল, এমন সময় উপর হইতে বড় বধূর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ডাকিয়া উঠিল "ছোট বৌ!" মালতী প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিয়া উপরের দিকে চাহিল। উমা রেলিংএর কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন; কহিলেন, "ছোট ঠাকুরপোর জলখাবারটা পিসিমার ঘরে আছে, বোন উপরে নিয়ে এসো শিগগির।" মালতী তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া ফেলিল। পরনের কাপড় খানা প্রায় ভিজিয়া গিয়াছে। নীচেই তাহার একখানা শাড়ি রৌদ্রে শুকাইতেছিল; সে কাপড়খানা ছাড়িয়া ফেলিয়া পিসিমার ঘরে আসিয়া জলখাবার গোছাইতে বসিল। এই সমস্ত কার্য শেষ করিতে মিনিট পনেরো সময় লাগিয়াছিল। খাবারের থালা খানা হাতে লইয়া উপরের সিঁড়িতে অর্ধেক উঠিয়াই সে স্বামীর উগ্রকণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। মালতী থামিয়া পড়িল; শুনিল, সত্যেন্দ্র কহিল, "কেন কিসের কাজ?"

উমা উত্তর দিলেন, "কাজত কত সেই থেকে ভাইকে খাওয়া নিয়ে সাধ্য সাধনা চলছে।"

"তবে থাক, আমার দরকার নাই।" বলিয়া সত্যেন্দ্র বাহিরে আসিল এবং সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল। মালতী দুই চক্ষুর ব্যাকুল অনুনয় পূর্ণ দৃষ্টি দিয়া স্বামীর চোখের দিকে চাহিল; সত্যেন্দ্র তাহার কোন মর্যাদা রক্ষা করিল না। বড় বধূ কক্ষ মধ্য হইতেই ডাকিতে লাগিলেন, "ঠাকুরপো অ ঠাকুরপো, খেয়ে গেলে না? আহা খেয়েই যাও রাগ করে একদিন না খেয়ে কি হবে বল তো?"

সেদিন আর মালতীর খাওয়া হইল না। তাহার ত্রুটিবশত স্বামীর আহার হয় নাই, এই আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হইয়া সে আর আহারে বসিতে পারিল না। লক্ষ্মী একবার অনুরোধ করিতে আসিয়াছিল, মালতী কহিল, "না মেজদি আমার পেট ব্যথা করছে," "ওগো সব বুঝি। গেরস্তের ঘরে অত রাজকন্যার মত অভিমানী হলে চলে না।"

এই ঘটনার তিনচার দিন পরে একদিন সকাল বেলা মালতী বিষণ্ণমুখে উমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। উমা তাহাকে দেখিয়া কোন কথা কহিলেন না। অগত্যা মালতী মৃদুস্বরে ডাকিল, "বড়দি।"

উমা কহিলেন, "কেন?"

"কাল রাত্রে বিজুর বড় জ্বর হয়েছে। সারারাত ঘুমোতে পারেনি, পিসিমা বলছিলেন -"

"তা আমি কি করব?"

"একজন ডাক্তার ডাকলে হয় না?"

"ভাল জ্বালা হল দেখছি। বাড়ির সবাই মিলে যত হাড়-হাবাতে জুটিয়ে আনুক, আর আমি মরি জ্বালাতন হয়ে।"

"আমি এমন হলে পারব না বলছি।" মালতী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। উমা অসহিষ্ণু ভাবে কহিলেন, "যাও না একটা বন্দোবস্ত যা হয় করগে; সবাই আমার ঘাড়ে চাপালে তো ভারী বিপদ দেখছি। কেন ছোটঠাকুরপো কৈ? সে পারবে না কুটুম্বকে একটু ওষুধ দিতে? তবে ডাক্তারী বিদ্যে শেখা কি করতে।"

মালতী স্বামীর কক্ষে আসিয়া দেখিল, সত্যেন্দ্র স্নানান্তে পরিপাটি বেশ পরিয়া আয়নার সম্মুখে চুল আঁচড়াইতেছে। স্ত্রীকে দেখিয়া সে ফিরিয়া চাহিল। মালতী আস্তে আস্তে কহিল, "একটা কথা শোন।" সত্যেন্দ্র চিরুনি খানা রাখিয়া ভিজা তোয়ালে লইয়া হাত দুখানি মুছিতে মুছিতে কহিল, "কি কথা।"

"বিজুর বড় জ্বর হয়েছে, কাল রাত্রে।"

"তারপর?"

"তুমি একবার দেখবে চল।"

সত্যেন্দ্র বিব্রত হইয়া পড়িল। চোখে চশমা পরিতে পরিতে কহিল "আমি? আমি তো এখন কলেজ যাচ্ছি। দশটা বাজে প্রায় আমার সময় নেই। হারানবাবুকে ডাকাও না।"

হারানবাবু ইহাদের পারিবারিক চিকিৎসক। মালতী কহিল "ডাকান তো আমার ইচ্ছায় হবে না।"

"তা হলে আমি আর কি করব?"

"তুমি কাউকে বল না ডেকে আনতে।"

"তা কি করে হয়? বাড়ির সবাই ভাববে বিজয়ের জন্য আমার ভাবনার অন্ত নেই, আমি অত আহ্লাদেপনা দেখাতে পারব না। বড় বৌই বা কি ভাববেন?"

"বড়বৌকে বলগে।" বলিয়া সত্যেন্দ্র দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

লক্ষ্মী আসিয়া কহিল "ছোট বৌ, আজ আর স্নান করবি না নাকি। কত বেলা হয়েছে দেখ দোখি।" মালতী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল "এই যাই: বিজুকে নিয়ে যে বড় ভাবনায় পড়্লাম মেজদি।" লক্ষ্মী কহিল, "ভাবনা কিসের? তোর ভাসুরকে বলেছি: হারান বাবুকে ডাকতে লোক পাঠিয়েছেন।

মালতী ছলছল কৃতজ্ঞতা ভরা দুই নেত্রে লক্ষ্মীর মুখ পানে চাহিয়া কহিল, "আমি তো মেজদি, তোমাকে কোন কথা বলিনি।" লক্ষ্মীর সুন্দর মুখখানি স্নিগ্ধ হাস্যে ভরিয়া গেল, সে কহিল "ভগবান দুটো চোখ দিয়েছেন যে ভাই না বল্লে ও সব আপনি দেখতে পাই।"

একদাগ ঔষধ পেটে পড়তেই বিজয়েব জ্বর সারিয়া গেল। দ্বিপ্রহরে সে শান্ত হইয়া ঘুমাতে লাগিল। মালতী লক্ষ্মীর কাছে গিয়া কহিল, "ভাগ্যে মেজদি এখানে ছিলে।" লক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, "থাকছিনা আর বেশী দিন" মালতী শঙ্কিত হইয়া বলল "কেন ভাই?"

"মা পত্র দিয়েচেন, দাদা নিতে আসবেন আমাকে।"

"মাগো, আমি একা কি করে থাকব মেজদি।" মালতীর ব্যাকুলতাকে লক্ষ্মী হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না। এই বাড়িতে সে ছাড়া মালতী যে কত অসহায় কত বিপন্ন সে তাহা জানিত। যদিও সে বড় বধূর বাক্যবাণ হইতে মালতীকে বাঁচাইতে পারিত না। তথাপি সে-ই মালতীর একমাত্র সান্ত্বনা স্থল। স্বামীর কাছে তো সে বালিকা বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা লাভ করিত না। তাই লক্ষ্মী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, "অঘ্রানের তো শেষ এসে পড়ল। এই পৌষ মাসটা শুধু থাকব। বেশী দিন নয়।" মালতী ব্যগ্র হইয়া কহিল "দেরি

কোর না ভাই, মাঘ মাস পড়তেই চলে এসো নিশ্চয়। আমি থাকতে পারব না।"

"শিগগিরই আসব। এই কয়টা দিন থাকিস সয়ে রয়ে। তবু তো বিজু এবার একটি সঙ্গী আছে!"

মালতী ম্লানমুখে কহিল, "ওকে এনে তো আমি বড়দির চক্ষুশূল হয়েছি।" লক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, "কবেই বা বড়দির চোখের মণি ছিলে।"

"না ভাই, তামাসা নয়; সত্যি বল না, বিজুকে নিয়ে কি করব? এমন জানলে --" অর্ধসমাপ্ত কথা মুখে লইয়া মালতী থামিয়া গেল। বড় বধূ ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়া কহিলেন, "হ্যাঁগা ভিজিটের টাকাটা কে দিলে শুনি?" মালতী বা লক্ষ্মী কেহই উত্তর দিলে না। গৃহিণী সকল সন্ধান না লইয়া আসেন নাই। দুজনেই চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তাঁহার কাংস্য কণ্ঠ সজোরে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, "তাহলে মেজঠাকুরপো আজকাল টাকা পয়সা ঘরে আনছে বুঝি? আমি সে খবর পাব কি করে? তাকে বলো মেজবৌ দুটো একটা টাকা পায়তো যেন ভূতের কাজে না দিয়ে সংসারেই দেয়। এতবড় সংসারটা অমনি চলে না। বাপের বাড়ি যাচ্ছো পরামর্শটা দিয়ে যেয়ো। আজকাল ছেলেরা বাপের কথা না শুনুক, বৌ এর কথা শোনে।"

উমার উচ্চ কণ্ঠের কথা পার্শ্বস্থ কক্ষে উপবিষ্ট শচীন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "ভিজিটের টাকা নিয়ে যা বলবার তা আমাকেই বল না, ওদের কেন বৃথা কথা শোনাচ্চ।"

উমা অপ্রসন্ন মুখে কহিলেন, "তোমাকে ত আমি কিছু বলছি না।"

"এই যে একরাশ কথা বল্লে, সে -- কাকে? বাবা ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমিয়ে রেখেছেন বলেই তো আর ভিজিটের টাকা দুটো ও সেখান থেকে তুলে আনতে পারি না। আর তোমার কাছে চাইতে যাওয়া মানে আবার একরাশ কথা শোনা তার চেয়ে নিজেই দিলাম, আপদ চুকে গেল।" "তা দাও গে না; তোমার টাকা যেমন ইচ্ছে খরচ করবে আমার তাতে কি? কিন্তু বলি ঠাকুরপো তুমি সর্বক্ষণই আমার সঙ্গে ঝগড়া করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাক

না কি?"

"যদি থাকি ত তোমার স্বভাবের গুণেই," বলিয়া শচীন্দ্র আপনার কক্ষে ফিরিয়া গেলেন।

ইহার কয়েক দিন পরে লক্ষ্মী বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। উমার সকল বিরক্তি ও ক্রোধের বর্ষণস্থল হইয়া, মালতী ভয়ে ভয়ে দিন কাটাইতে লাগিল। সমস্ত দিন সে কাজ কর্ম লইয়া ব্যস্ত থাকিত। নিজেকে কোন কথা ভাবিবার অবসর দিত না। তবুও কোন কোন দিন তাহার মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিত। সংসারে তুচ্ছ খুঁটি-নাটি ব্যাপারে মন কিছুতেই বাঁধা পড়িতে চাহিত না। তাহার বাল্যের সুখ কল্পনাগুলি পুরাতন সঙ্গীর মত যেন প্রাণের ভিতর ফিরিয়া আসিত। তাহাদের ব্যাকুল বাসনাকে মালতী কোন মতেই থামাইয়া দিতে পারিত না। একদিন বিকাল বেলা, সমস্ত কাজের শেষে কাপড়খানি কাচিয়া চুল বাঁধিয়া মালতী দ্বিতলের শয়ন কক্ষের বাতায়নে দাঁড়াইয়া ছিল। পৌষের অপরাহ্ন তখন জ্যোতিঃহারা সূর্যের রক্ত আভায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। সম্মুখে একটুখানি খোলা জমি; সেই স্থানে কয়েকটা নারিকেল ও খেদুর বৃক্ষ গুলির সুচিক্কণ পত্ররাশি কম্পিত হইতেছিল। সেইখানে দাঁড়াইয়া মালতী আপনার জীবনের ব্যর্থতার বিষয় ভাবিতে ছিল। তাহার জীবনের সার্থকতা কোথায়? বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ চারি বৎসর কেবল বড়বধূর বাক্য-জ্বালা সহিয়াই কাটিল। সংসারে কোন বিষয় তাহার তিলমাত্র অধিকার জন্মে নাই। কিন্তু গৃহের দাসীত্ব করিতে তাহাকে প্রয়োজন।

স্বামী প্রেম বলিয়া সে যাহাকে জানে, তাহাও আজ পর্যন্ত একদিনের জন্য তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। কখনও ঘটিবার সম্ভাবনাও নাই। সেই তো তাহার সকল ব্যথার মূল। সেই একটি স্থানে যদি স্নেহ ও সান্ত্বনার প্রাচুর্য থাকিত, তবে বড়বধূর সমস্ত অত্যাচার মালতী সহাস্য মুখে সহিতে পারিত। কিন্তু তাহারই বিশেষ অভাব ছিল। মালতী আপন চিন্তায় ডুবিয়া আছে, এমন সময়ে তাহার কর্ণে তীক্ষ্ণ আহ্বান আসিয়া বাজিল, "ছোট বৌ।" "যাচ্ছি বড়দি"। বলিয়া মালতী ত্রস্ত ভাবে বাহির হইয়া আসিল। দেখিল বড় জা দাঁড়াইয়া আছেন, - তাঁহার

হাতে একটা শালপাতার ঠোঙ্গা; আর সম্মুখে অপরাধীর মত নত মস্তকে দন্ডায়মান, বিজয় কুমার। মালতীকে দেখিয়া বড়বধূ কহিলেন, "হ্যাঁ গো, একি ছোটালোকের কান্ড বল দেখি? চারটে পয়সা চুরি করে খেলে?"

"কি হয়েছে বড়দি?"

"কখনো কিছু করতে বলি না। চারবেলা তো গোগ্রাসে ভাতের পিন্ডি গিলচে। আজ কি কুবুদ্ধি হোল আমার, তোমার গুণধর ভাইকে চার আনার রসগোল্লা আনতে দিয়েছিলাম; তার থেকে ছোঁড়া চার পয়সা চুরি করেছে।"

"কে বিজু?"

"সে নয়তো আর কে? যেমন শিক্ষে। দুলি আর মানি বড় কাঁদছিল; তাই ভাবলাম এখুনি আনিয়ে দিই; তা খুব শাস্তি হল আমার।"

"হয় তো ঠকে এসেছে বড়দি।"

"মিছে কথা বাড়িয়ো না ছোট বৌ, – ঠকবার ছেলে তোমার ভাইটি নয়। বাজার করবার অভ্যাসটা তো আর নূতন নয়। নবাবের ছেলে তো নয়, যে জন্মে দোকান বাজার চোখে দেখেনি।" উমা নীচে গিয়া, একজন ভৃত্যকে দোকানে পাঠাইয়া দিলেন, সে জানিয়া আসিল কহিল, দোকানী চার আনার খাবার দিয়াছে। বিজয় কুমার যে চুরি করিয়া খাইয়াছে আজ তাহা প্রমাণ হইয়া গেল। মালতী বিজয়কে আপনার ঘরে টানিয়া লইয়া তাহার গালে একটা চড় বসাইয়া দিয়া কহিল। "কেন চুরি করে খেলি হতভাগা?"

বিজয় চোখ মুছিতে লাগিল।

মালতী কাঁদিয়া ফেলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া চাপা কণ্ঠে কহিল "আমার ভাই হয়ে চুরি করে খেলি? রসগোল্লা খাবার জন্য প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল, —আমাকে বলিসনি কেন? আজ রাত্রে আর খেতে পাবি না, যা আমার কাছ থেকে সরে যা।" বলিয়া তাহাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া দিল।

বিজয় বাহির হইয়া গেল। মালতী দুঃখে কাঁদিতেই লাগিল।

পিতৃমাতৃহীন অনাথ ভাইটিকে সে বড় ভালবাসিত; তাই তাহাকে প্রহার করিয়া, সে নিজেই অশান্তি ভোগ করিতে লাগিল। সত্যেন্দ্র আসিয়া কক্ষে প্রবেশ

করিল, মালতী মুখ ফিরাইয়া লইল বটে, কিন্তু সত্যেন্দ্র তাহার অশ্রু চিহ্নিত মুখ দেখিতে পাইল। সে বুঝিল, একটা কান্ড হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পাছে স্ত্রীর বেদনায় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, বড়বধূ বা বাড়ীর অন্য লোকের কাছে উপহাসাস্পদ হইতে হয়, সেই ভয়ে সে মালতীকে কোন প্রশ্নই করিতে পারিল না। নীরবে জামা কাপড় ছাড়িয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সে দিন রাত্রে বিজয় কুমার না খাইয়াই শুইয়া রহিল। গৃহিণী দেখিয়াও কথা কহিলেন না। কিন্তু মালতী যখন খাইবে না বলিল, তখন তিনি রাগিয়া উঠিলেন কহিলেন, "ভাই বোনে যুক্তি করে উপোসী রইলে না কি? এ সেই চুরির শোধ হচ্ছে বুঝি? তা মন্দ নয়। কিন্তু বলি ছোট বৌ, অত রাগই বা কিসের? রাত পোহালেই যখন পিণ্ডি গিলতে হবে, তখন আবার অভিমান কেন?" মালতী কোন উত্তর না দিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। সত্যেন্দ্র টেবিলের নিকটে বসিয়া সিগারেট টানিতেছিল। স্ত্রীকে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া কহিল, "খেয়েছ?"

"না"

"যাওনা, খেয়ে এসো; রাত হয়েছে ত।"

"আজ খাব না।"

সত্যেন্দ্র অনুমান করিল, সেই বিকালে অশ্রুবর্ষণের সহিত এই উপবাসের কোন সম্বন্ধ আছে। সে নিরুত্তরে ধূমপান করিতে লাগিল, মালতী টেবিলের অপব প্রান্তে একখানা চেয়ারে গিয়া বসিল। তাহার অভুক্ত ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া, সত্যেন্দ্রর মায়া হইতে লাগিল, মৃদু স্বরে কহিল, "খাবে না কেন?"

"ক্ষিদে নেই" — বলিয়া মালতী মুখ ফিরাইয়া।

আবার অশ্রুবর্ষণের উপক্রম দেখিয়া সত্যেন্দ্র আসন্ন আরাম ভঙ্গের আশঙ্কায় বিব্রত হইয়া পড়িল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া কহিল, "আজ সারাদিন খেটেছি বড় ঘুম পেয়েছে শুইগে। তুমি শোবে না?"

"যাচ্ছি।"

সত্যেন্দ্র শয্যায় প্রবেশ করিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে সুখ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া গেল। মালতী আলো নিবাইয়া অন্ধকারে বসিয়া রহিল। মনের বেদনা

স্বামীর কাছে প্রকাশ করিতে পারিল না।

দিন পাঁচ ছয় পরে উমার লক্ষ্মীপূজা ছিল। পূজার আয়োজন করিতে করিতে করিতে তিনি একবার ঘর ছাড়িয়া গিয়াছিলেন। সহসা ফিরিয়া আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষুস্থির হইয়া গেল, দেখিলেন বিজয়কুমার ঠাকুর ঘর হইতে পশ্চাতের দ্বারপথে পলায়ন করিতেছে। উমা করস্থিত ফুলের সাজি সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া ভীষণ কণ্ঠে ডাকিলেন, "বিজয়"। কেহই উত্তর দিল না। আজ দুই দিন হল মালতীর জ্বর হইয়াছে, সে ঘরে শুইয়াছিল। উমা দ্রুত চরণে মালতীর কক্ষ দ্বাবে আসিয়া কহিলেন, "ওগো শুনচো?"

মালতী ক্লান্ত স্বরে কহিল, "কি হয়েছে?"

"হয়েছে আমার মাথা, পূজার সাজানো নৈবেদ্য হতে কি যেন চুরি করে নিয়ে পালাল।"

মালতী ভীত হইয়া কহিল, "কে?"

"তোমার বাপের গুণবান বংশধর, আবার কে? মুখ পোড়া বাঁদরের ঠাকুরের ভোগে দৃষ্টি পড়েছে, এবার আর রক্ষে নেই কেমন মা বাপের ছেলে গা এই বয়সে চুরিবিদ্যায় পাকা হয়ে উঠেছে।"

"মা বাপের কথা কি বলচ বড়দি।"

"বলছি ভাল বাপ মায়ের ছেলে চোর হয় না।"

মালতী বিবর্ণ মুখে উমার দিকে চাহিয়া রহিল।

"তোমার বাপ তো মিছে কথা বলতে আর ঠকাতে কম করেন নি, -- তাঁর ছেলেই তো বিজয় কুমার, সে আর ভাল হবে কি করে?" "ছেলে মানুষ জন্মে শিক্ষা পায়নি, তাই একটা অন্যায় করে ফেলেছে। তাই বলে একশোবার আমার বাপকে গাল দিচ্ছ কেন বড়দি?"

"ওমা গো, মুখ তো খুব বেড়েছে ছোট বৌ। চোরের হয়ে আবার আমার সঙ্গে ঝগড়া কর্ত্তে এলে? একই শিক্ষে কিনা, আচ্ছা আজ আমিও দেখছি।"

অল্পক্ষণ পরেই গৃহিণীর আশ্রিত সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র হরিদাস বেত্র হস্তে বিজয়কে শাসন করিতে আসিল, বিজয় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, এবং মালতী

আপন কক্ষে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। সেই ক্ষণেই গৃহ-প্রত্যাগত সত্যেন্দ্র অসুস্থ পত্নীকে এমন ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "অমন করে বসে আছ যে?"

মালতী ব্যগ্রস্বরে কহিল, "তুমি একবার বাইরে গিয়ে দেখ। বড় দিদি তার ভাইপোকে দিয়ে বিজুকে মার খাওয়াচ্ছেন। তুমি বাধা দাও গে তোমার পায়ে পড়ি।"

"আমি —?"

"পারবে না? এতটা অন্যায় সহ্য হবে তোমার? হরিকে দিয়ে বিজুকে মার খাওয়ানো -- সে তো শুধু আমাকে নয় আমার মা বাপকে শুদ্ধ অপমান করা হবে, এ অপমান থেকে তুমি আমাদের বাঁচাও।"

সতেন্দ্রে তাহার চিরমৌনী পত্নীকে এত কথা কহিতে শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। কহিল, "বিজু কি অন্যায় করেছে, সে অনুসন্ধান না নিয়ে--"

মালতী ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। হরিদাস বেত উঠাইয়া মারিবার উপক্রম করিয়াছে, এমন সময়ে মালতী আসিয়া দুই হাতে ভ্রাতাকে সরাইয়া দিল। ক্রোধে বিস্ময়ে আত্মহারা উমা কঠোর কণ্ঠে কহিলেন, "ছোট বৌ ওকি হচ্ছে?" "নিয়ে যাচ্ছি একে। যথেষ্ঠ কথা শুনিয়েও তৃপ্তি হোল না বড়দি। তাই যাকে তাকে নিয়ে এলে মার খাওয়াতে?"

মালতীর মুখে এই কথা? উমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না তীক্ষ্ম, কটু কণ্ঠে সমস্ত গায়ের জ্বালা ঢালিয়া দিয়া কহিল, "আমার ভাইপো বুঝি মানুষ নয় ছোটবৌ?"

"মানুষ হলেও বিজুকে মারবার তার কি অধিকার?" বলিয়া মালতী ভাইকে লইয়া চলিয়া গেল। উমা সমস্ত মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিলেন। সেদিন আহার কালে উপেন্দ্র অন্তঃপর আসিলে উমা সকালের ঘটনা তাহার নিকট বিবৃত করিয়া কহিলেন, "এত অপমান আমি সইব না, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।"

উপেন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, "তা দুই জা-এ যখন একসঙ্গে ঘর করতে

পার না তখন কাজে কাজেই তোমাকে বাপের বাড়ী যেতে হয়। বৌমার তো একটা বাপের বাড়িও নেই যে, সেখানে ছুটে গিয়ে রাগ দেখাবেন।"

আবার দিন কাটিতে লাগিল, মালতী এখনও অসুস্থ একদিন সে লক্ষ্মীর একখানি বিস্তারিত পত্র পাইল, পত্রে প্রথমঅংশ এই রূপ --

"স্নেহের মালতী তোমার ভাসুরের পত্রে তোমার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া বড় চিন্তিত হইলাম। তিনি আমাকে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিতে লিখিয়াছেন। অথচ কেন খুলিয়া লিখেন নাই। তোমার জ্বর ছাড়াও আর কিছু কান্ড ঘটেছে নিশ্চয়। কি হইয়াছে? দুটো দিন সহিয়া থাক বোন, পৌষ মাসটা শেষ হইলেই আমি আসিব। আমাদের দেশের বৌগুলির কি দশা ভাবিয়া আকুল হইতে হয়। আমার মাসতুতো ভাই অমলকে জানত? অমল গতবার বি-এ ফেল করিয়াছিল; এবার তো পরীক্ষাই দিল না। নন-কো অপারেশন করিতেছে। কিন্তু তাহার চোটটা ইংরাজকে বিন্দু মাত্র স্পর্শ করিতে পারে নাই; অন্য দিকে সর্বতো-ভাবে নিরপরাধ বধূও তাহার পিতৃ পরিবারের যন্ত্রণার বিষয় হইয়াছে। অমল পরীক্ষা দেয় নাই; রোজগার করে না, এ সকলই বধূর দোষ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। আমার মাসিমারা ছেলের রূপগুণ ও বংশ মর্যাদার জোরে শিক্ষিতা মেয়ে ঘরে আনিয়াছিলেন। সে শিক্ষার মর্যাদাটা তাঁহারা খুব দিতেন, উপযুক্ত শিক্ষা যে মানুষের মনে অধিকতর আত্মবোধ ও সম্মান জ্ঞান জাগাইয়া দেয় এই সহজ কথাটি যাহারা না বুঝে, তাহাদের লইয়া বড় বিপদ। মাসিমার বাড়ী আমাদের বাড়ীর পাশেই। দিবারাত্র তাহাদের বাড়ি অশান্তি কলহ লাগিয়াই আছে। সমস্ত বিষয়ে বাক্যহীন বউটাকে উপলক্ষ দাঁড় করানো হয়। অমল 'নন্-কো অপারেশন' করিতেছে। কিন্তু সে খুব সুবোধ ছেলে, পিতৃ-মাতৃভক্ত; বিবাহিত ধর্মপত্নীকে অন্যায় অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার মত পৌরুষ তাহার একবিন্দু নাই। দেখিয়া শুনিয়া দুঃখও হয় আবার হাসিও পায়। যে ছেলে আপনার সহধর্মিণীকে অযথা অপমানের হাত হইতে বাঁচাইতে পারে না। সে আবার একটা বিশাল দেশকে উদ্ধার করিবার কল্পনা স্বপ্নেও করিয়া থাকে। আমাদের দেশের ছেলেরা বিবাহ করে কেন বল দেখি? ঝি বা রাঁধুনী তো টাকা দিলেই পাওয়া যায়, তাহাই

সংগ্রহ করিবার জন্য আমাদের দেশের কলেজে পাশকরা ছেলেগুলো পবিত্র বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করে কেন, তাহা আমি বুঝতে পারি না।"

এই রকম তীব্র বিদ্বেষে চিঠিখানি আগাগোড়া পূর্ণ। মালতী মনে মনে কহিল, "দেবতার মত স্বামী পেয়েছ -- মেজদি তাই অত কথা বলতে পেরেছ; আমি আজ কালের ছেলেদের দোষ দিই কি করে? আমার স্বামীও তো এ সম্প্রদায়ের বাহিরে নন।" মালতীর জ্বর সারিয়া সারিতেছিল না। কিন্তু মাঘ মাসটা পড়িতেই লক্ষ্মীর আসা সম্বন্ধে তাহার মনে যে একটু আশা জাগিল, সেই আশার জোরে সে একটু সুস্থ সবল হইয়া উঠিল। সেদিন সকাল বেলা মালতী রোগশয্যা ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছিল। তাহার শরীর মন এখন বড় দুর্বল। থামের গায়ে অলস দেহভার স্থাপন করিয়া সে শীত প্রভাতের উষ্ণ মধুর রৌদ্রটুকু উপভোগ করিতেছিল। এমন সময় নীচে প্রাঙ্গণে বিজয় কুমারের কণ্ঠস্বর শুনিয়া, সে রেলিং এর ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, বিজয় উমার কনিষ্ঠ পুত্র রণুকে ক্রোড়ে লইয়া বাজার করিয়া ফিরিতেছে। তাহার দুই হাত নানা আকারের কাগজের ও শালপাতার মোড়কে পরিপূর্ণ। মালতীর অজ্ঞাতে বিজয়কে আজকাল এই সব কার্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে, বুঝিয়া নির্বাক বিস্ময়ে মালতী বিচলিতা হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে সে দেখিল, বিজয় প্রাঙ্গণের কলতলায় বাসন পরিষ্কার করিতে করিতে বামুনদিদির সঙ্গে কথাবার্তায় মগ্ন হইয়া গিয়াছে। মালতীর মাথাটা ঘুরিতে লাগিল। সে উঠিয়া গিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল, সেদিন দুপুরবেলা সে দাসীকে দিয়া বিজয়কে আপনার কক্ষে ডাকাইয়া পাঠাইল। দাসী আসিয়া কহিল, "বিজয়ের ভারী জ্বর হয়েছে যে! সে মাথা তুলিতেই পারচে না।" মালতী কহিল, "কোথায় সে?" দাসী কক্ষ নির্দেশ করিয়া চলিয়া গেল। মালতী ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল; কম্পিত পদে বারান্দা অতিক্রম করিয়া একপ্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র অন্ধকার, অপরিষ্কৃত কক্ষ দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই সময়েই পাশের ঘর হইতে বড়জার কর্কশ কণ্ঠস্বর তাহার কানে ভাসিয়া আসিল। উমা নবাগতা ভ্রাতৃজায়াকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিতেছিলেন, "জ্বালিয়ে খাচ্ছে আমাকে। আবার না কি জ্বর হয়েছে শুনছি।"

"কে ছেলেটা?"

"কে জানে কোথাকার কে? পথ থেকে ধরে এনে ঘরে ঢুকানো - তোমার নন্দাই খুব পারেন। কিন্তু তার যত ভাল তো সামলাইতে হয় এই আমাকে, কি বল ভাই?"

"সত্যি, তো! মা বাপ ছেলেটার নেই?"

"হরি বোল! মা বাপের যদি ঠিক থাকবে, তবে পরের ঘরে পড়ে আছে? ওদের আবার ঘর 'পর' আছে?"

মালতীর দুই কর্ণে যেন আগুন ঢালিয়া দিল। সে আর ভ্রাতার কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার ঘরে গিয়া শুইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সত্যেন্দ্র আসিয়া পত্নীকে এই অবস্থায় দেখিল। বিস্মিত হইয়া কহিল, "কাঁদচ যে অত?"

মালতী শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। দুই হাত জোড় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "কখনো কিছু চাইনি - আজ জোড় হাত করে বলছি তোমায়, এর একটা প্রতিবাদ কর তুমি। আমি আমার পিতৃ অপমান আর সইতে পারি না যে। আমি তোমাদের বৌ, এই অধিকারে আমার বাপকে শুদ্ধ গিন্নির গাল খেতে হচ্ছে। কিন্তু বৌএর কোন অধিকার আমায় দিয়েছ বল দেখি? তিলে তিলে শুধু আমার বুক ভেঙ্গে দিচ্ছ না?"

সত্যেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কি করচ? কেউ শোনে যদি" "এখনো সেই ভয় তোমার? কেউ শোনে যদি, তোমার একটু নিন্দে হবে -- এই ত? সেইটুকু সইবার মত তেজ তোমার নেই? তোমার সম্ভ্রম বজায় রাখতে আমার সকল দুঃখে পাথর চাপা দিয়ে রাখব, আর তুমি আমার দিকে ফিরেও চাইবে না, এমন পাষাণ তুমি – মাগো।"

"কেন ঠাকুরপোকে অত কথা শোনাচ্চ ছোটবৌ? তোমার মরা বাপের বড় ভাগ্যি যে আমার বাড়িতে তোমায় ঠাঁই দিয়েছি। কিসের জোরে অত কথা শোনাও, আজ বাড়ি ছেড়ে যাও না, আজই নতুন বৌ বরণ করে আনি।" উমা যেন দ্বারের সন্নিকট হইতে অশনি সম্পাত করিয়া চলিয়া গেলেন। মালতী

দুই চক্ষুর জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল, "আরো সহ্য করতে বল আমায়? আমাকে কি তোমরা মানুষ মনে করনা। আমি --" বলিতে বলিতে তাহার রোগশীর্ণ পাণ্ডুর কপোল বাহিয়া তরল অগ্নিস্রোতের মত অজস্র অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

সত্যেন্দ্র বিব্রত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, এমন কান্ড সে কল্পনাও করে নাই, মালতী অসহিষ্ণু কণ্ঠে কহিল, "তুমি যাও, তুমি আমার সামনে থেকে যাও। দেবতার আসনে যাকে বসিয়েছিলুম, তাকে এত ভীরু, কাপুরুষ দেখলে সহ্য হয় না – তুমি যাও।" সত্যেন্দ্র বিনা প্রতিবাদে নত মস্তকে বাহির হইয়া গেল। মালতী উপাধানে মুখ চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল।

গভীর রাতে অবসন্ন নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া মালতী দেখিল, লক্ষ্মী শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতেছে। মালতী সেই হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল, "ফিরে এলে ভাই। আর যেওনা মেজদি।" লক্ষ্মী স্নিগ্ধ স্বরে প্রাণের মায়া ঢালিয়া দিয়া কহিল, "না ভাই আমি আর তোমাকে ফেলে যাব না।" মালতী একটু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "বিজু কেমন আছে মেজদি জান?"

"তার জ্বর কমেছে?" তার জন্য এখন ভেবো না, তুমি ঘুমাও। মালতী চোখ বুঝিয়া আবার ঘুমাইতে চাহিল কিন্তু একটু পরেই চমকিয়া চোখ খুলিল। লক্ষ্মী তাহাকে চাহিতে দেখিয়া কহিল, "কি ছোট বৌ কষ্ট হচ্চে?" "না" বলিয়া মালতী আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল, মিনিট দশ পরে সে সহসা ভয়ানক চমকাইয়া শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। লক্ষ্মী বাহু দ্বারা তাহার কম্পিত দেহ বেষ্টন করিয়া কহিল, "ওকি, কোথায় যাও বোন? ঠাকুরপোকে ডাকব কি?" "না--না" বলিতে বলিতে মালতী সবেগে বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

"ছোট বৌ।"

"মেজদি।"

"কেন অমন করচিস ভাই?"

"আমি এখানে থাকতে পারচি না; চারিদিকে যেন আগুন লেগে গেছে।"

বলিয়া মালতী নিঝুম হইয়া পড়িল। লক্ষ্মী পাখার বাতাস করিতে করিতে তাহাকে ধরিয়া রাখিল।

সাতদিন পরে মালতীর জ্বর ছাড়িয়া গেল। লক্ষ্মীর একান্ত স্নেহ যত্নে একটু একটু করিয়া সে সুস্থতা লাভ করিতে লাগিল। একদিন বিকালবেলা বারান্দায় বসিয়া কোলের উপর কাগজ রাখিয়া সে কি লিখিতেছিল; এমন সময় লক্ষ্মী ওদিকে তাহার ঘর হইতে ডাকিল

"ছোট বৌ।"

"কেন মেজদি?"

"আর হিমে বাইরে বসে থেকো না, -- ঘরে যাও।"

"এটুকু লিখে যাচ্চি--"

"অত আজ আর নাই লিখলে বোন মাথা ধরবে যে।"

" না কিছু হবে না।" বলিয়া মালতী দিনান্তের শেষ আভার ন্যায় একটু ম্লান হাসি হাসিল।

সেদিন রাত্রে সত্যেন্দ্র যখন শয়নগৃহে আসিল, মালতী উঠিয়া গিয়া তাহার পায়ের উপর মাথা নত করিয়া পড়িল, তাহার রুক্ষ কেশভার স্বামীর পদতল প্লাবিত করিয়া ছড়াইয়া রহিল। সত্যেন্দ্র তীব্র জ্বালা মিশ্রিত সুরে কহিল, "আজ আবার ভক্তি উছলে উঠল যে?" মালতী কোন উত্তর দিল না। সত্যেন্দ্র কহিল, "সেদিন তো ভীরু কাপুরুষ বলে খুব একচোট বকে নিয়েছে, -- আজ আবার কাপুরুষের পায়ের উপর এসে পড়লে? দরকার নেই, -- দরকার নেই, আমাকে আবার অত ভক্তি দেখানো কেন?"

মালতী উত্তর না দিয়া পা ছাড়িয়া দিল, সত্যেন্দ্র শয্যায় দেহ প্রসারিত করিয়া লেপটা টানিয়া লইল। এবং তাহার ঘুম আসিতেও দেরি হইল না। মালতী ঠাণ্ডা মেঝের উপরে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। ঘর অন্ধকার -- সেই অন্ধকারে বসিয়া সে চোখের জল ফেলিতে লাগিল। তারপর সে উঠিল। আস্তে আস্তে পালঙ্কের কাছে গিয়ে দাঁড়াইল; মুক্ত বাতায়ন পথে শীত রজনীর কুয়াশাচ্ছন্ন জ্যোৎস্না সত্যেন্দ্রে মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। মালতী দৃষ্টি নত করিয়া সেই তৃপ্ত

মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কত রাত্রি সে বিনিদ্র অবস্থায় এই মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তৃপ্তি পায় নাই। কতদিন এই সুপ্ত সৌন্দর্য্য তাহার তরুণ মনে আশার প্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়াছে। বিবাহিত জীবনে যখন দুঃখ প্রবেশ করে নাই। তখন তাহার সমস্ত কল্পনা, সমস্ত আনন্দ, সমস্ত আশা, এই একটি ব্যক্তিকে ঘিরিয়া অবিরাম উচ্ছ্বসিত হইত। আজ সেদিন কোথায় গেল? মালতীর মনে হইল তাহার দুর্বল বক্ষ যেন কেহ কঠিন লৌহযন্ত্রে দলিত, পেষিত করিয়া দিতেছে। সে আর চাহিয়া থাকিতে পারিল না। একবার হাত দিয়া নিদ্রিত স্বামীকে স্পর্শ করিল, তারপর ছুটিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল।

তখন প্রভাতের রৌদ্র উজ্জ্বল হয় নাই, সত্যেন্দ্র লক্ষ্মীর শয়ন কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া ব্যাকুল স্বরে ডাকিল। "মেজ বৌ," "ঠাকুরপো নাকি?" মেজ বৌ ব্যস্ত হইয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল।

"দরজাটা খোল শীগ্গীর --।"

লক্ষ্মীর দ্বার মোচন করিয়া বাহিরে আসিতেই সত্যেন্দ্র ভীতি বিবর্ণ মুখে কহিল, "সর্বনাশ হয়েছে মেজ বৌ -- তোমাদের ছোট বৌকে ঘরে খুঁজে পাচ্ছি না। বাড়ীর কোথাও সে নেই।"

লক্ষ্মী রেলিংটা চাপিয়া ধরিয়া পাংশুমুখে চাহিয়া রহিল। শচীন্দ্র বাহিরে আসিয়া কহিলেন, তোমরা সব পাগল হয়েছ নাকি? স্নানের ঘরে টরে --"

সত্যেন্দ্র মাথা নাড়িয়া কহিল, "না কোথাও নেই; সব জায়গা খোঁজ করেছি। দেউড়ীর দরজা খোলা ছিল, ভগবান সিং নিজে বল্লে -"

লক্ষ্মী কোন মতেই কহিল, "শ্যামবাজারে চলে যায়নি ত?" শচীন্দ্র কহিলেন, "এরকম ভাবে চলে যাওয়ার অর্থ কি? আচ্ছা দেখছি" বলিয়া তিনি ত্বরিত পদে নীচে নামিয়া গেলেন। যদি মালতী ঘরেই বসিয়া থাকে এই আশায় মুগ্ধ হইয়া সত্যেন্দ্র আবার তাহার শূন্য কক্ষের দিকে ফিরিয়া গেল। প্রবেশ করিয়া দেখিল, বিছানায় পায়ের দিকে একখানা পত্র পড়িয়া রহিয়াছে, সত্যেন্দ্র তাড়াতাড়ি পত্রখানা তুলিয়া লইল। খামের উপর মালতীর সুন্দর হস্তাক্ষরে সত্যেন্দ্রনাথের নাম লেখা আছে সুতরাং কম্পিত হস্তে খাম ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিয়া বসিয়া

পড়িতে আরম্ভ করিল।

"শ্রীচরণেষু - আমি তোমাদের কাহাকেও না জানাইয়া আজ রাত্রিতে গৃহত্যাগ করিয়া চলিলাম। তোমারা আমার সন্ধান করিলেও আমাকে পাইবে না। যদি পার তবে বিজুকে একটু আশ্রয় দিও। অথবা তাহাকে পথের কুকুরের মত রাস্তায় তাড়াইয়া দিলেও কোন ক্ষতি নাই। কারণ আমি যে দেশে চলিলাম সেখানে কোন দুঃখই আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। সে দেশ বহু দূরে।"

"ভাবিয়াছিলাম, চুপ করিয়া সহিয়া থাকিব। কিন্তু কিছুতেই সহিতে পারিলাম না। তাই অনেক ভাবিয়া দেখিলাম। কেরাসিন-নায়িকার দলবৃদ্ধি করা অপেক্ষা আমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, তাহাই আমার কাছে ভাল মনে হইল। আমি সেই পথেই যাত্রা করিলাম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাকে ঠিক স্থানে পৌঁছে দেন। তুমি ভ্রমেও ভাবিও না যে, বড়দিদির লাঞ্ছনা অসহ্য হওয়াতে আমি এমন কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, বড়দিদির অপরিসীম অত্যাচার আমি সহাস্যমুখে সহ্য করিতে পারিতাম যদি তুমি আমার মান অপমান, সুখ-দুঃখের সাথী হইতে। তুমি তো এক দিনের জন্য তাহা হও নাই। তুমি সর্বদাই সকলের কাছে আপনার মান বজায় রাখিতে ব্যস্ত থাকিতে। কিন্তু একথা কখনও ভাবিয়াছ কি যে আমারও আত্মমর্যাদার জ্ঞান আছে; এবং আমি আকাশ হইতে মাটিতে খসিয়া পড়ি নাই। মা বাপের কোলেই আমি জন্মিয়াছিলাম। এবং তাহাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি তোমার পিতৃ-মাতৃ ভক্তি অপেক্ষা এক তিল কম নহে? যাঁহাদের কন্যাকে পত্নী পদ দিয়াছ, সেই আমার স্বর্গস্থ পিতা মাতার অপমান যখন তোমার পুরুষের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারিল না, তখন আমিই বা তোমার পরিবারের কথা ভাবিব কেন? আমার গৃহত্যাগে তোমাদের পারিবারিক সম্মানে আঘাত লাগিবে, এই কথা ভাবিতে আজ আমার ক্রূর আনন্দ হইতেছে। নিজের জীবন বলি দিয়া আমি সকল অপমান অবহেলার চূড়ান্ত করিয়া যাইব। আমার দিক হইতে তোমাদের সমস্ত সুখ, সম্মান, সুবিধা অক্ষুন্ন রাখা চাই অথচ আমার দিকটা তোমরা একেবারেই ভাবিবে না, - এ কথাটা আমি সহ্য করিতে পারি না। মানুষ মাটি বা পাথর নয় যে প্রয়োজন মত তোমরা তাহা হইতে কিছু কাটিয়া লইবে কিন্তু তাহকে

কিছুই ফিরাইয়া দিবে না। নারী দেহেও যে প্রাণ আছে তাহা তোমরা ভুলিয়াছ, নিজে নারী হইয়া আমি তো তাহা ভুলিতে পারি না।"

"হিন্দু রমণী মুখ ফুটিয়া কখন স্বামীকে ভালবাসা জানায় না। স্বামী যদি নিজের সহৃদয়তা দ্বারা স্ত্রীর ভালবাসা না বুঝেন তবে স্ত্রীর সাধ্য নাই সে অনির্বাচনীয় ভাব তাঁহাকে জোর করিয়া বুঝাইয়া দিবে। আমি তোমাকে ভালবাসি তা এখনও যে সে ভালবাসার একবিন্দু হ্রাস হইয়াছে এমন নহে তবু আজ শেষ বিদায় ক্ষণে "বাসি" বলিয়া কোন লাভ নাই। তাই বলিতেছি "বাসিতাম"। প্রতিদানহীন প্রচণ্ড প্রেম দিবারাত্রি আগুনের মত আমার মনের মধ্যে জ্বলিত, সে অসহ্য দহনে আমার ধৈর্য, স্থৈর্য, কর্তব্য, বুদ্ধি সব জ্বলিয়া গিয়াছে। আজ আমি আপনার বশে নাই। একদিন ছিল, যখন দেবতার আসনে তোমাকে বসাইয়া আমার তৃপ্তি হইত না। আজ দেখিলাম তুমি সংসারের অপর সাধারণ দশজনের মতই; সমস্ত মলিনতা পঙ্কিলতার বীজ তোমার মধ্যে সুপ্ত আছে তাহা আমি বুঝিয়াছি। আমার দেবতার এই মলিন মূর্তি দেখিয়া, আমার আর সংসার বাসের প্রবৃত্তি নাই। তোমাকে শ্রদ্ধা করিতে পারিব না -- তোমার সঙ্গে মিলিয়া তোমার সংসার করিব কি করিয়া? তোমার সহিত পাছে কপটতা করিতে হয় সেই ভয়ে তোমার জীবনের পথ হইতেই সরিয়া যাইতেছি। তুমি আবার বিবাহ করিবে নিশ্চয়। কিন্তু চিরবিদায়ের দিনে তোমাকে অনুরোধ করিতেছি আর কাহাকেও এমন দুঃখ দিও না। আর উপার্জনক্ষম হইয়া বিবাহ করিও তাহা হইলে বড়দিদির বাক্যবাণ সহিতে হইবে না। আমাকে বিবাহ করিয়া অনেক সময়ে বড়দিদির নিকটে অন্যায় কথা শুনিয়াছ -- সে সকল হইতে তোমাকে মুক্তি দিয়ে গেলাম। তুমি নাকি দেশোদ্ধারের কথা সংকল্প করিয়া কলেজ ত্যাগ করিয়াছ, এখন তুমি কি করিবে সে কথায় আমার আর প্রয়োজন নাই। তবে সংসারে আমার ন্যায় হতভাগিনীর সংখ্যা বিরল নহে। তাহাদের জন্য বলিতেছি -- অত বড় দেশোদ্ধারের কথা না ভাবিয়া, সেই অভাগিনীদের তাহাদের অন্ধকার জীবন হইতে উদ্ধার করিতে পারিলে দেশের মঙ্গল হয়। যদি নিজের হৃদয় দিয়া কখনও নারীর হৃদয় বুঝিবার চেষ্টা কর তবে দেখিবে, এই চিরলাঞ্ছিত নারী জাতি মনের

মধ্যে কত গভীর গোপন দুঃখ বহন করিয়া হাসিমুখে সুব্যবস্থায় তোমাদের সংসার পরিচালনা করে, ঈশ্বর চরণে আমার প্রার্থনা তিনি যেন একদিন তোমার অন্ধ চোখ খুলিয়া দেন।"

"এখন তবে বিদায়। বৃথা আমার অনুসন্ধান করিও না। আমি বহু বহু দূর তীর্থে যাত্রা করিলাম।

ইতি মালতী।"

বিস্ময় বিমূঢ় সত্যেন্দ্রের হাত হইতে পত্রখানা কাড়িয়া লইয়া মেজবৌ এক নিঃশ্বাসে তাহা পাঠ করিয়া ফেলিয়া মেঝেতে লুটাইয়া পড়িল। তাহার বক্ষস্থল মথিত করিয়া একটি ক্ষুব্ধ আহ্বান অধরে ফুটিয়া বাহির হইল।

শচীন্দ্র বিজয়কুমারকে একটা অনাথ আশ্রমে ভর্তি কবিয়া দিলেন।

গৃহত্যাগিনী মালতীর নাম সে গৃহে আর উচ্চারিত হইল না। উমা তাঁহার অবিবাহিতা, বয়স্থা পিতৃব্য কন্যার সহিত সত্যেন্দ্রের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন।

পর বৎসর লক্ষ্মী শচীন্দ্রের সহিত নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ব্যর্থ হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিল। সে এক বিপুল আশা বক্ষে লইয়া অসংখ্য তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়াছিল। কিন্তু কাহারও সন্ধান মিলে নাই। অগত্যা কল্পনাতীত, মর্মান্তিক কথাই তাহাকে বিশ্বাস করিয়া লইতে হইল। মালতীর নাম সে মুখে লইল না, — শুধু একখানি পবিত্র সুন্দর মুখ চিরদিনের মত তাহার হৃদয়ে আঁকা হইয়া রহিল।।

১৩২৮

কল্যাণী

উর্মিলা দেবী

।। ১।।

পৌষের প্রভাত। বেলা প্রায় ৭টা বাজিতে চলিয়াছে, কিন্তু সূর্যদেব এখনও আকাশ-প্রান্তে উঁকি দেন নাই। উঠানে দাঁড়াইয়া ঠিকা ঝি বলিল, উনোন ধ'রে গেছে গো, বউদি - আজ কি আর নীচে নামবে না?

একটি একুশ বাইশ বছরের সুশ্রী মেয়ে দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিতে আসিতে বলিল, -- আজ বড্ড দেরি হয়ে গেছে । ছেলেটা রাত্রে একটুও ঘুমতো দেয়নি। বামুনদি এখনও আসেন নি ঝি?

ঝঙ্কার দিয়া ঝি বলিয়া উঠিল, -- সে আবার এত সকালে কবে এসে থাকে গো ? বাজারের পয়সা-টয়সা দেবে ত দাও আমার ত আবার আরো দু'ঘর যেতে হবে, দেরি করলে চলবে কেন?

ঝিকে বাজারের পয়সা গণিয়া দিয়া বউটি বলিল, -- আজ আর বেশী কিছু আনতে হবে না,ঝি, তরকারী পাতি ত অনেক আছে। তুমি শুধু আধসের রুইমাছ আর একসের আলু নিয়ে এস।

ঝি চলিয়া গেলে, সে উনানে চায়ের জন্য জলের কেটলি চড়াইয়া দিয়া, গামছা ও তেলের বাটি লইয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল। স্নান সারিয়া আসিয়া সে দেখিল বামুনদি আসিয়া জলের কেটলি নামাইয়া রাখিয়া হালুয়া চড়াইয়াছে। মেয়েটি ক্ষিপ্রহস্তে চা প্রস্তুত করিয়া, একখানা থালার উপর চায়ের কাপ ও হালুয়ার রেকাবি বসাইয়া লইয়া উপরে চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে সিঁড়ি হইতে ডাক দিয়া বলিয়া গেল - তুমি ততক্ষণ দুধটা জাল দাও বামুনদি। আমি এসে তোমায় ভাঁড়ার বের করে দিচ্ছি।

কিছুক্ষণ পর স্বামীর উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি লইয়া সে যখন নীচে নামিল, তখন ক্ষুদ্র উঠানটুকু রোদে ভরিয়া উঠিয়াছে। নিকটের বাজার হইতে ঝি-ও ফিরিয়াছে। বাজার বুঝিয়া ও পয়সা হিসাব করিয়া লইয়া ঝিকে বিদায় দিয়া,

সে তখন বামুনদিকে ভাঁড়ার বাহির করিয়া দিল, তাহার তরকারির ডালা ও বঁটি, আনিয়া রান্নাঘরের রকে সে কুটনা কুটিতে বসিবে, এমন সময় বামুনদি'র চীৎকার তাহার কানে গেল, ও বৌদি, গেল, গেল, ধর-ধর। সে ফিরিয়া দেখিল, তাহার দুই বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্রটি টলিতে টলিতে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে। -- ও দুষ্টু। তুমি এরই মধ্যে উঠে এলে? বলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকে তুলিয়া লইল। মার কোলে চড়িয়াই ছেলে মা, দুদু কাব -- মা, দুদু কাব - বলিয়া কান্না জুড়িল।

মা ধমকাইয়া বলল, মা, দুদু খাব না ! বুড় ছেলে হয়েছেন, এখনও মা, দুদু খাব। এই খানে ব'সে এই সন্দেশটা ততক্ষণ খা -- আমি দুধ জুড়িয়ে আনছি। ছেলে কিন্তু সন্দেশের লোভে ভুলিল না। সন্দেশ ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, সে মায়ের কাপড় টানিয়া, হাত-পা ছুড়িয়া চীৎকার আরম্ভ করিল -- তন্দে কাব না, মা, দুদু কাব। পূজার ঘর হইতে গৃহিণীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর আসিল ও রাধে, ছেলে কাঁদাচ্ছিস কেন? তখন মা উপায়ান্তর না দেখিয়া ছেলে শান্ত করিবার জন্য রকের উপর বসিল। বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল, এমন ছেলেও দেখিনি বাপু, যা ধরবে, তাই করবে। তাহার পর স্বামীর উপরও রাগ হইল। খবরের কাগজে এতই কি মধু আছে যে, ছেলেটা উঠিয়া একা একা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল, তা ভ্রূক্ষেপ নাই; যদি পড়িয়া গুড়া হইয়া যাইত। তাহার মনে হইতে লাগিল, এমন মানুষও সে দেখে না, এমন ছেলেও সে আর দেখে নাই।

হঠাৎ তাহার দৃষ্টি উপরের বারান্দায় পড়িল। দেখিল, স্বামী সেখানে দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে। রাগে রাধার ব্রহ্মান্ড জ্বলিয়া গেল। ঝঙ্কার দিয়া সে বলিয়া উঠিল, কি হাসিই শিখেছিলে, রাগে পিত্তি জ্বলে যায়।

হাসিতে হাসিতে স্বামী বলিলেন কেমন জব্দ। আর ছেলে শাসন করতে যাবে? নিজেকে কে শাসন করে, তার ঠিক নেই, উনি যান ছেলে শাসন করতে।

স্ত্রীও হটিবার পাত্রী নয়। সে প্রত্যুত্তরে বলিল, তোমার ছেলে আর কত ভাল হবে।

বটে-বটে, একেবারে বাপ তুলি গাল। আচ্ছা এর শোধ পাবে। মেয়েটি এদিক ওদিক চাহিয়া স্বামীকে একটি ছোট্ট কিল দেখাইল।

বামুনদি ঘরে বসিয়া, শ্বশ্রূমাতাও অনতিদূরে। একজন উপরের বারান্দায়, একজন নীচের বারান্দায় - কাজেই উপযুক্ত উত্তর দিতে না পারিয়া স্বামী আপাতত বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন।।

ছেলে শান্ত হইল। ছোট পিঁড়ির উপর তাহকে বসাইয়া, তাহার হাতে সন্দেশটি তুলিয়া দিয়া, মা কুটন কুটিতে বসিল।

যে সন্দেশটি অনতিকাল পূর্বেই খোকা ঘোর বিতৃষ্ণভরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, এখন আবার সেই সন্দেশটিই সে পরম আদরে খাইতে লাগিল।

এমন সময়ে বৌদি বলিয়া ডাক দিয়া একটি আঠার উনিশ বছরের সুদর্শন যুবক উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাড়াতাড়ি একখানা আসন পাতিয়া দিয়া বৌদি বলল, এই যে, এস ভাই। তোমার গাঁয়ের কাজ শেষ হল? কবে এলে?

খোকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সে বলিল, কাল এসেছি। আজ একটা সুখবর আছে বৌদি। আলু কুটিতে কুটিতে নতমুখী বৌদি বলল, কি সুখবর ঠাকুরপো?

গান্ধীজী যে কলকাতায় এসেছেন।

সোৎসাহে মাথা তুলিয়া বৌদি বলল, এ্যাঁ সত্যি বলছ?

সত্যি নয় কি বৌদি ? এ সব কথা নিয়ে কি তোমার সঙ্গে আমি ঠাট্টা করতে পারি? তা আমায় একবাব দেব-দর্শন করাবে না ভাই?

সে কথাই ত তোমায় বলতে এসেছি। আজ বিকালে একটা মেয়েদের সভা আছে, মহাত্মাজী বক্তৃতা দেবেন। তুমি কি যাবে?

যা না আবার - নিশ্চয় যাব !

দাদা অনুমতি দেবেন ত?

সে ভার আমার! তুমি কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

আচ্ছা ঠিক দু'টোর সময়ে প্রস্তুত থেক। আমি একেবারে গাড়ি নিয়ে

এসে তোমায় নিয়ে যাব, দেরী করো না কিন্তু।

হাসিতে হাসিতে বৌদি বলিল, তোমার কোন ভাবনা নেই। দেব-দর্শনের আগ্রহ তোমার চেয়ে আমার কিছু কম নেই!

।। ২।।

গৃহকর্তা রাজশেখর বসু হাইকোর্টের উকিল। দীর্ঘ প্রশান্ত চেহারা, বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। সর্বদাই হাসি-খুশী এবং শান্তিপ্রিয় মানুষ। বন্ধু মহলে কৌতুকপ্রিয়তার জন্য সুপ্রসিদ্ধ। ওকালতি ব্যবসায়ে খুব পসার করিতে না পারিলেও, ক্ষুদ্র সংসারটি এক রকম চলিয়া যাইত। শ্বশুরের বসত-বাটিখানি উত্তরাধিকার সূত্রে শ্বশুরের কন্যা লাভ করিয়াছিল, তাই বাড়িভাড়াও লাগিত না। শ্বশুরের অনেকগুল সন্তান মরিয়া হাজিয়া শেষ বয়সের সন্তান রাধারানী কোন রকমে টিকিয়া গেল। বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সম্বল বলিয়া, বিবাহ দিয়া তাহাকে শ্বশুর-গৃহে পাঠাইতে তাঁহার মন উঠিল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পিতৃ-মাতৃহীন দরিদ্র যুবক রাজশেখরের সন্ধান মিলিল। রাজশেখর তখন এম.এ পাশ করিয়া 'ল' কলেজে ভর্তি হইয়াছেন। সহায়-সম্বল না থাকায় 'টিউসনি' করিয়া নিজের পড়ার খরচ চালাইতেছিলেন। রাধারাণীর পিতা তাঁহাকেই জামাতা মনোনীত করিলেন।

রাধারাণী শিশুকালে কিছু কৃশ ও দুর্বল ছিল, — কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বাস্থ্য ফিরিয়া গেল। সে সুন্দরী না হইলেও দেখিতে বেশ সুশ্রী ছিল। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, বুদ্ধিতে সমুজ্জ্বল মুখশ্রী, এবং সর্বোপরি তাহার নিটোল গড়নটুকু তাহাকে এক অপূর্ব শ্রী দান করিয়াছিল। তাহাকে রাজশেখরের খুবই পছন্দ হইল।

শ্বশুরের কাল হইয়াছে - শাশুড়ি এখনও বর্তমান। তিনি জামাতার সংসার ভুক্তা। প্রাচীনা হইয়াছেন, সন্ধ্যাপূজা এবং শিশু দৌহিত্রটিকে লইয়াই সময় কাটাইয়া দেন। সংসারের গৃহিণী এখন রাধারানী। রাজশেখর যে বৎসর বি এল পাশ করিয়া হাইকোর্টে ভর্তি হইলেন, সে বৎসরেই প্রাচীনা গৃহিণীর ভার কন্যা-জামাতার

হস্তে তুলিয়া দিয়া, বৃদ্ধ কালিদাস ঘোষ জীবলীলা সংবরণ করিলেন। এই কয় বৎসরেই জামাতার স্বভাবের পরিচয় পাইয়া, তিনি কন্যা ও পত্নী উভয়ের জন্যই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে চক্ষু মুদিয়াছিলেন।

বস্তুতই রাজশেখরের সংসারটি সুখে শান্তিতে পূর্ণ ছিল। স্বামী-স্ত্রীর পরিপূর্ণ প্রেম সংসারটিকে নন্দনকাননে পরিণত করিয়াছিল। তাহার উপর আজ দুই বৎসর হইল, শিশুপুত্রটি আসিয়া তাঁহাদের দাম্পত্য জীবন-টি কানায় কানায় পূর্ণ করিয়াছিল। শ্বশ্রূমাতার স্নেহে রাজশেখরের মাতার অভাব পূর্ণ হইয়াছিল -- আর ভ্রাতৃস্নেহের সাধ মিটাইয়াছিলেন, এই দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়-পুত্র বিশ্বেশ্বরকে দিয়া। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তাহাকে আপন ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিতেন। সেও দাদা ও বৌদি উভয়ের সঙ্গে ছোট ভাইয়ের মত আব্দার করিত। সম্প্রতি নন্-কো-অপারেশনের হিড়িকে বিশ্বেশ্বর কলেজ ছাড়িয়া কংগ্রেসের কাজে লাগিয়াছিল। রাজশেখর এ জন্য একটু ক্ষুব্ধ হইয়া ছিলেন। তাহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হয়েন নাই। রাজশেখরের মতে এটা একটা নতুন পাগলামি মাত্র। তিনি বলিলেন, দুদিনেই সব ঠান্ডা হইয়া যাইবে।

রাত্রিতে স্বামী-স্ত্রীতে কথা হইতেছিল। স্বামী বলিলেন, কি গো ! সভা কেমন হ'ল ?

ওঃ সে ভারী চমৎকার হ'ল - অনেক মেয়ে এসেছিল। গান্ধীজী কি সুন্দর বক্তৃতা করলেন।

তুমি তাঁর কথা কি ক'রে বুঝলে? তিনিত বাঙ্গালা জানেন না। হিন্দীতে বললেন, সে বেশ সোজা হিন্দী - খুব বোঝা যায়। উঃ তার কথা শুনে চোখের জল রাখা যায় না। বাস্তবিক আমরা যে কত বড় পরাধীন জাত, তা এমন ভাবে আগে কখনও বুঝিনি।

এখন বুঝেই বা কি করছ?

তাত ঠিকই - মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি, কি-ই বা আর করতে পারি। তবে গান্ধীজী কিন্তু বলেছেন, আমরাও ইচ্ছে করলে অনেক কাজ করতে পারি।

কি কাজ শুনি?

এই অসহযোগ আন্দোলনের একটা বড় অঙ্গ ত চরকাকাটা আর বিলাতী বস্ত্র ত্যাগ করে খদ্দর পরা। তা' আমরাও সে কাজ খুব করতে পারি। নিজেও করতে পারি, আর যাতে সব মেয়েরাই এ কাজ করে, তার চেষ্টা করতে পারি।

ওরে বাপরে! গান্ধীজী আমার সেরেছেন দেখছি। তোমার মাথাটি একেবারেই বিগড়েছে। ওগো, অত কিন্তু আমার সইবে না। বাড়ীর গিন্নিরা যদি এখন ঘরকন্না ছেড়ে বাইরে নাচতে যান তবেই আমাদের সংসারগুলি গেছে আর কি !

কেন ? ঘরকন্নাই বা ছাড়তে যাবে কেন, আর বাইরেই বা নাচতে যাব কেন? ঘরে বসেই ত এ সব কাজ করা যায়। আর দেখ, আর একটা কথা, বিলাতী কাপড় ত আর পরা চলে না !

কেন চলে না ? এত কাল চলল আর আজই একেবারে অচল হয়ে গেল?

এত কাল অন্যায় করেছি বলে কি চিরকালই অন্যায় করতে হবে?

এত কাল অন্যায় করেছি কে বল্লে?

গান্ধীজী বলেছেন, দেশের নেতারাও বলছেন।

শুধু বললেই ত আর হয় না -- একটা কাজ কেন করব, সেটা ত বুঝতে হবে ভাল করে? না বুঝে হুজুগের উপর কোন কাজ করার পক্ষপাতী আমি নই।

রাধারানী নিরুপায় হইয়া বলিল, -- তবে তুমি যাও না, তার সঙ্গে একবার দেখা করে এস না। তিনি তোমায় সবই বুঝিয়ে দিতে পারবেন। রাধারাণী নিজে কথাটা যেমন ভাবে বুঝিয়াছিল, তেমন ভাবে সে বুঝাইতে পারিতেছিল না -- কি করিবে সে ?

স্বামী কিন্তু তাহার প্রস্তাবে মোটেই রাজি হইলেন না। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন -- ও বাবা, তবেই গেছি। তাঁর কাজে গেলেই নাকি লোকে পাগল ব'নে যায়। তা'র পর শেষে খদ্দর'ত ধরাবেনই, ওকালতিটুকুও না ছাড়ালে বাঁচি। না বাপু, অমন কথা আমায় ব'ল না। তুমি যেরকম ক্ষেপেছ, এখন

আমি এদিকে একটু রাশ টেনে না রাখলে পথে বসতে হবে।

রাধারানী ক্ষুব্ধ হইয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজশেখর আদর করিয়া তাহাকে পাশে বসাইয়া বলিলেন, – রানি। মনে দুঃখ করছ কেন? তুমি ছেলেমানুষ, তাই সামান্যতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠ। আমার ত সব দিক ভাবতে হয়। এই অসহযোগ আন্দোলনটি একটি নুতন হুজুগমাত্র, এর কথাগুলি শুনে বেশ, কিন্তু কাজে লাগানো একেবারেই অসম্ভব। গান্ধীজীকে মানুষ হিসাবে আমি কিছু কম ভক্তি করি, তা মনে করো না। কিন্তু তবু, আপাতত তাঁর কথাগুলি পাগলামি ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারিনে। ও খদ্দর-টদ্দর কিছুই চলবে না, দু'দিন সবাই একটু নাচবে, তার পর দেখবে, সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। আমি হুজুগের স্রোতে ভেসে যেতে চাই না। কারণ, এর পর বন্ধুবান্ধবদের কাছে হাস্যাস্পদ আমাকেই হতে হবে। তুমি মনটাকে শান্ত করতে চেষ্টা কর।

রাধারানী আর কিছু বলিল না। জীবনে এই প্রথম স্বামীর কথায় তাহার মন শান্ত হইল না। কোথায় যেন একটা কি কাঁটার মত খচখচ করিতে লাগিল।

।।৩।।

রাধে!

যাই মা।

আজ বামুনদি' অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত, রাধারানীই আজ রাঁধিতেছিল। গ্রীষ্মকাল, আগুনের তাতে তাহার মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিয়াছিল। সে আঁচলে মুখ মুছিতে মুছিতে নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া বলল – আমায় ডাকছিলে, মা ?

হ্যাঁ মা, এই দেখচো, ঝোলের ত এই আলু কুটেছি পটলও কি দেব?

না মা, ঝোলে ত পটল তিনি ভালবাসেন না – পটল ভাজতে দাও।

আচ্ছা – বলিয়া তিনি কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, – ও কিরে, তোর মুখ অমন শুকনো কেন? চোখ ফুলেছে, কেঁদেছিস না কি? কি হয়েছে? জামাই কিছু বলেছেন নাকি?

লজ্জায় নতমুখী হইয়া কন্যা বলিল — কি যে তুমি বল, মা, কখনও কি আমাকে কিছু বলতে শুনেছ?

আমি ত সেই কথাই ভাবছিলুম, এ-ও কি সম্ভব হল? আজ ৭/৮ বছর বিয়ে হয়েছে কখনও ত একটা উঁচু কথা কইতে শুনি নি। বাবা আমার আশুতোষের মত সদাই ভোলানাথ। তাই তো সকলকে বলি, রাধে আমার অনেক তপস্যা ক'রেই এমন স্বামী পেয়েছিল। তা' তোর কি হয়েছে; শরীর ভাল নেই নাকি?

কিছুই তো হয়নি মা, অমনি ক'দিন থেকে মনটা ভাল নেই।

কেন, মনের আবার তোর কি হল? তুই-ই ঝগড়া-টগড়া করিস নিত? দেখিস বাছা, আদর পেয়ে যেন মাথায় চড়ে বসিসনে। ভুলে যাসনে, স্বামীই মেয়েমানুষের দেবতা, তার মনে কষ্ট দিতে নেই।

একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলিয়া রাধারাণী সরিয়া আসিল। উনানে ভাত টগবগ করিয়া ফুটিতেছিল, সে উনান গোড়ায় চুপটি করিয়া বসিল। মায়ের কথাগুলি তাহার মনে তোলাপাড় করিতে লাগিল। বাস্তবিকই অনেক তপস্যা করিয়া সে অমন স্বামী পাইয়াছিল। স্বামী যে তাহাকে কতখানি ভালবাসেন, তাহার প্রমাণ সে জীবনে অনেক পাইয়াছে। সে ত তাহার স্নেহে এক মুহূর্তের জন্যও কোন দিন সন্দেহ করে নাই। স্বামীও ত তাহার সমস্ত বুকখানা জুড়িয়াই বসিয়াছিলেন। প্রাণের ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি ত স্বামীকে সে নিঃশেষেই ঢালিয়া দিয়াছিল। তবু কিছু দিন হইতে তাহার মনে একটা অশান্তির কাঁটা দিন-রাতেরই বিঁধিতেছিল কেন? সেই যে প্রায় ৪ মাস হইল, সভায় বক্তৃতা শুনিয়া আসিয়া তাহার প্রাণের মধ্যে একটা নূতন ভাব জাগিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল, সে ত আজ তেমনই জাগ্রত আছে। স্বামীর নিকট সে সে বিষয়ে কোন সহানুভূতি পায় নাই বটে, কিন্তু তবুও ত সে মন হইতে তাহা দূর করিতে পারে নাই। এমনটা যে তাহার জীবনে কখনও সম্ভব হইবে, তাহা সে কোনও দিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। স্বামীকে বেষ্টন না করিয়া যে কোনও ভাব পৃথকভাবে তাহার প্রাণে আসিতে পারে, ইহা সে কখনও ভাবিতে পারে নাই। সেই দিন হইতে তাহার প্রাণের মধ্যে যে একটা গোটা মানুষ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে

ত সে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে পারিতেছে না। স্বামী ত তাহাকে আমলেই আনিতেছেন না। সে দু'এক দিন কথা পাড়িতে গিয়া দেখিয়াছে, হয় তিনি হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দেন, নয়ত আদর করিয়া চুমা দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দেন। সেই জন্য দারুণ অভিমানে সে ত চুপ করিয়াই গিয়াছিল। কেন? চিরদিনই কি তিনি তাহার সঙ্গে শিশুর মত ব্যবহার করিবেন? তাহার কি বয়স হয় না? সে কি শুধু স্বামীর খেলার পুতুল হইয়াই থাকিবে? তাহাই কি নারীজীবনের সার্থকতা? আদর্শ দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে আজকাল তাহার মনে নানারূপ প্রশ্ন উঠিতেছে। পূর্বের মত তাহার অনেকটাই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামীকে কোলে করিয়া গণিকালয়ে পৌঁছাইয়া দেওয়ার যে গল্প চলিত আছে, তাহা লইয়া তাহাদের স্বামী-স্ত্রীতে এক দিন তর্ক হইয়াছিল, স্বামী বলিয়াছিলেন, — এমন স্ত্রীকে আমি ত্যাগী বলে ভক্তি করতে পারি কিন্তু সাধ্বী স্ত্রী বলে তাকে পূজা করতে পারি না। স্বামীকে পাপের পথ থেকে বক্ষা করাই স্ত্রী ধর্ম, তাকে সে পথে অগ্রসর করে দেওয়া তার ধর্ম নয়। সে স্ত্রী কল্যাণী নয় - তাকে সহধর্মিণী বলতে আমি নারাজ।

রাধারাণী কিন্তু তাহার তীব্র প্রতিবাদ তখন করিয়াছিল। সে বলিযাছিল, স্ত্রীর আবার পৃথক সত্তা কি? তার নিজের আবার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুখ-দুঃখ শান্তি অশান্তি কি? যে স্ত্রী পতিব্রতা, তারার স্বামীকে বিচার করিবার অধিকারই বা কোথায়? স্বামীর সুখ-দুঃখ শান্তি অশান্তি তাহার নিজের ভাল হৌক, মন্দ হৌক, স্বামীর ইচ্ছা পালন করাই স্ত্রীর ধর্ম। অবশ্য সেই কুষ্ঠ রোগগ্রস্তের মত তাহার স্বামী যদি আজ অন্যে আসক্ত হন, তবে সে যে প্রাণে অশেষ ক্লেশ অনুভব করিবে না, এ কথা সে এক মুহূর্তের জন্যও মনে করিত পারে না। কিন্তু আদর্শ যাহা তাহা আদর্শই থাকিবে। উচ্চ আদর্শ ধরিবার শক্তি যদি তাহার না থাকে, তাহা হইলেই যে সে আদর্শ খর্ব হইয়া যাইবে, তাহা নহে, আজ কয়দিন হইতেই তাহার মনে হইতেছিল, তাহার স্বামীই ঠিক বলিয়াছিলেন। স্বামীর মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দেওয়া পরম সুখ, কিন্তু তাহাই জীবনের চরম সার্থকতা নহে। মানুষের কোন অবস্থাতেই ভাল-মন্দ জ্ঞান হারান ঠিক নয় স্বামী স্ত্রীলোকের ইহপরকালের

দেবতা তাহার সর্বস্ব সেই জন্যই স্বামীকে জগতের সম্মুখে আদর্শ মানবরূপে দাঁড় করাইবার পথে সহায়তা করাই স্ত্রীর ধর্ম্ম্য। স্বামী-স্ত্রী পরস্পকে ফুটাইইয়া তুলিবে, ইহাই দাম্পত্য জীবেনর আদর্শ। স্বামী ত আজ তাহার অন্তরের কথা বুঝিতেছেন না, কিন্তু তাহার অন্তরের মানুষটা যে বাহিরে আসিবার জন্য মাথা কুটিয়া মরিতেছে, তাহাকেই বা সে ঠেকাইবে কি করিয়া? একটা পথ ত তাহাকে করিতেই হইবে। সে মনে মনে একটা মতলব আঁটছিল, সে জন্য বিশ্বেশ্বরকে তাহার প্রয়োজন, কিন্তু মাস খানেক হইল সেও আবার গ্রামে চলিয়া গিযাছে। কবে যে আসিবে, কে জানে, সেই যে গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, — আমাদের পরপদানতা, শৃঙ্খলিতা দেশমাতা তাঁর ত্রিশ কোটি সন্তানের কাছে মুক্তি ভিক্ষা চাহিতেছেন, তোমারা কি এখনও চুপ করিয়া বাসিয়া থাকিবে? এস, আমরা সকলে মিলিয়া মায়ের পায়েব শিকল খুলিয়া দেই। এ কার্য আমি যেমন আমার ভাইদের ডাকিয়াছি, আমার বোনদেরও তেমনি ডাকিতেছি এস, সকলে আমার সাহায্য করিবে এস - সেই কথাগুলি তাহার হৃদয়ের পরতে পরতে কাটিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু তবু সে কোন উপায় করিতে পারে নাই। এ মনস্তাপ সে আর কিছুতেই সহিতে পারিতেছিল না।

সহসা তাহার চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া, পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে পৌঁছিল — বৌদি! সে এক রকম ছুটিয়াই বাহিরে আসিল। স্মিতহাস্যে মুখখানা উজ্জ্বল করিয়া বলিল, — ঠাকুরপো, এলে ভাই? আঃ বাঁচালে। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

৪

মাস চারেক পরের কাথা, বেলা প্রায় ৯টা বাজিয়োছে। রাধারানীই সব কাজ-কর্ম সারিয়া, আঁশ-রান্নার সব যোগাড় করিয়া দিয়া, ভাড়ার-ঘরের ছোট উনানটিতে মা'র জন্য রান্না চড়াইয়াছিল। মা বিধবা মানুষ, তাহার খাওয়ার কোন ঝঞ্ঝাট নাই, একটু ভাতে-পোড়া, একটা তরকারি ও একটু দুধ হইলেই চলিয়া যায়, কিন্তু এই নিরামিষ রান্নাও রাধারানীর প্রত্যহই অত্যন্ত পরিপাটি

করিয়া রাঁধিতে হয়। রাজশেখর বাবু অমিষাশী হইলেও, দু'একখানা নিরামিষ বান্না না হইলে তাঁহার খাওয়াই হয় না। সকালে অবশ্য তাড়াতাড়ি ঝোলভাত খাইয়া কাছারি যান, — কিন্তু রাত্রের খাওয়াটি তাঁহার একটু বিশেষ রকম হওয়াই চাই। নিরামিষ ঘরের ডাল, তরকারি ও আমিষ ঘরের নানা রকম ব্যঞ্জনাদি দিয়ে তিনি রাত্রিতে বেশ আড়ম্বর করিয়া, দীর্ঘকাল বসিয়া গল্প করিতে করিতে আহার করেন। তাই দুপুরে মার উনানে রাধারানী ভাল করিয়া রান্না করিয়া স্বামীর জন্য সব পৃথক করিয়া তুলিয়া রাখে। মা পূজা সারিয়া জপে বসিয়াছিলেন, খোকা তাঁহার কাছে বসিয়া কাঠের খেলনা লইয়া খেলিতেছিল। তিনি জপ করিতে করিতে নাতির তদারক করিতেছিলেন।

রাধারানী ডালের জল চড়াইয়া দিয়া, হেঁট হইয়া ডাল ধুইতেছিল, বিশ্বেশ্বর আসিয়া দোরগোড়ায় দাঁড়াইল, -- তাহার বগলচাপা একটা কাগজের মোড়ক। রাধারানী মুখ তুলিয়া দেখিল, তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া বলিল, -- কবে এলে, ঠাকুরপো, এর মধ্যে হয়ে গেল?

বিশ্বেশ্বর মোড়কটি তাহার হাতে দিয়া বলিল, -- এই ত ট্রেন থেকে নামছি, বৌদি, এখন বাড়িও যাইনি।

রাধারানী মোড়কটি তাকের উপর রাখিতেছে দেখিয়া, বিশ্বেশ্বর অবাক হইয়া বলিল, -- ও কি? ওখানে রাখছ যে খুলে দেখবে না?

একটু হাসিয়া রাধারানী বলিল, -- এখানে ত খোলা হবে না -- কে কোথা দিয়ে এসে দেখে ফেলবে। তোমায় আগে একটু চা খাইয়ে নিয়ে, তবে উপরে গিয়ে খুলব। আমি ত চা আর খাইনে বৌদি। অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়ো রাধারানী বলিল, — চা খাও না? সে কি ঠাকুরপো, তুমি যে সেই যা'কে 'চাখোর' বলে তাই ছিলে।

সেই জন্যইত ছেড়েছি, বৌদি! তা' ছাড়া যে সব অজ পাড়াগাঁয়ে আমাদের কাজ করতে যেতে হয়, সে সব যায়গায় চা কেন, দু'বেলা পেট ভরে ভাতও জোটে না। তাই ত বদ-অভ্যাসটা ত্যাগ করেছি।

একেবারে ব্রত নাকি? স্পর্শ কর না?

না-না - আমি আবার একটা কি মানুষ যে ব্রত-ট্রত করব। তবে না পেলে কষ্ট না হয়, আর কাজের ক্ষতি না হয়, সে জন্য নিয়মিত খাইনে।

তবে আজ একটু খাও, রেলে রাত জেগে এসেছ, শরীরটা একটু ভাল হবে। তুমি হাত পা ধুয়ে নাও গে, আমি এক্ষুনি তোমার খাবার ঠিক করে দিচ্ছি।

বিশ্বেশ্বর কলতলায় হাত-পা ধুইতে গেলে রাধারানী রান্নাঘরে আসিয়া বামুনদিকে জিজ্ঞাসা করিল - তোমার এখন কি হচ্ছে, বামুনদি, ঠাকুরপোর জন্য একটু চা'র জল করে দিতে পারবে কি?

আমি ভাত চড়িয়েছি, বৌদি, এই ভাত আর ভাজা ক'খানা হলেই আমার হয়ে যায়।

ওঃ, তুমি ভাত চড়িয়েছ? তবে ত আর হাঁড়ি নামানো চলবে না। আচ্ছা আমি মা'র উনানেই ক'রে দিচ্ছি।

হাঁড়িতে জল টগবগ করিয়া ফুটিতেছিল, তাহা নামাইয়া রাখিয়া রাধারানী জলের কেটলিটা বসাইয়া দিয়া, ময়দা পাড়িয়া মাখিতে বসিল।

বিশ্বেশ্বর আসিয়া দেখিয়া বলিল, - ও কি করছ বৌদি, এই সাত-সকালে এত কেন।

কিছুই না ভাই, এই তোমায় চা-টা করে দিয়েই দুখানা গরম লুচি ভেজে দিচ্ছি। আহা! কত ঘোরাঘুরি করে এসে, মুখাখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে। তোমাদের জীবন সার্থক ভাই। আমরা বৃথাই জন্মেছিলুম, দেশের জন্য কিছুই করতে পারলুম না।

জল ফুটিয়া উঠিল। রাধারানী চা তৈয়ারি করিয়া, আসন পাতিয়া বিশ্বেশ্বরকে বসাইয়া দিল। তাহার পর ক্ষিপ্রহস্তে লুচি কয়খানা ভাজিয়া তুলিয়া, সকাল বেলাকার পটল ভাজা ও সন্দেশের কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাই দিয়া তাহাকে খাইতে দিল। এমন সময় কাকার সাড়া পাইয়া খোকা উপরের বারান্দা হইতে ডাকিল, - কাকু! বিশ্বেশ্বর ছুটিয়া উপরে গিয়া তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া আসিল। তাহাকে পাশে বসাইয়া চা খাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে খোকাবাবুও

ভাগ পাইতে লাগিলেন। রাধারানী উনানে ডাল চড়াইয়া দিয়া সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, - কখানা হল?

এক জোড়া শাড়ি, এক জোড়া ধুতি ও খোকার জামার কিছু কাপড় হয়েছে। আনন্দে রাধারানীর চোখে জল আসিল। তাহা মার্জনা করিয়া সে কহিল, — আমার মনোবাঞ্ছা কি পূর্ণ হবে, ঠাকুরপো।

কেন হবে না, বৌদি, প্রাণ ঢেলে কাজ করলে সে কাজ সফল হয়-ই। তোমার এদিককার খবর সব ভাল ত? পাড়ার গুপ্তবৈঠক কেমন চলছে?

বেশ ভালই চলছে। আরও ৩/৪ জন মেয়ে পেয়েছি আমরা। এ পাড়ায় সব শুদ্ধ একুশ জন মেয়ে হ'ল। সকলেই প্রতিজ্ঞা করেছে, বিলাতী কাপড় আর বাড়িতে আনতে দেবে না - নিয়মিত চরকা কাটবে আর খদ্দর প্রচার করবে।

সবইত পারবে, কিন্তু খদ্দর প্রচার তোমরা কি ক'রে কববে, তা'ত আমি ভেবে পাইনে। তোমরা যে ঘরের বারই হও না।

তাতে কি? গঙ্গার ঘাট, নেমন্তন্ন-বাড়ি, আর রেলগাড়ি এ ক'টা জায়গাই ত মেয়েদের প্রচারের মস্ত জায়গা। সত্যি সত্যি চাইলে, কাজের সুযোগের অভাব কিছু নেই, ভাই!

বিশ্বেশ্বর বলিয়া উঠিল, — বাঃ, বাঃ, বৌদি! তুমিত বেশ বুদ্ধি বার করেছ। এ ত আমারও মাথায় আসেনি।

দায়ে ঠেকলে অনেক বুদ্ধিই মাথায় খেলে - আমি যে ভাই, "ঠেকে গেছি-প্রেমের দায়ে", বলিয়া রাধারানী হাসিয়া উঠিল। বিশ্বেশ্বর শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। তাহার পর বলিল, — আচ্ছা, তোমরা এটা এখনও গোপন রেখেছে কি করে? বাড়ীর কর্তারা কি কেউ জানেন না?

শুধু প্রভাদির স্বামী জানেন, তিনি যে একজন মস্ত অসহযোগী। তাঁর বাড়িতেই ত আমাদের চরকার স্কুল বসে। অবিশ্যি প্রত্যেকের বাড়িতেই একটা ক'রে চরকা আছে কিন্তু সে ত সব সময় চালাবার সুবিধা হয় না। এই আমারই ত দেখনা, পাছে তোমার দাদা টের পান ব'লে রাত তিনটে থেকে ৬টা পর্যন্ত

ছাদের কুঠরিতে বসে চরকা কাটি। অবিশ্যি প্রভাদি'র বাড়িতে ত নিত্যই দুপুরে চরকা কাটার বৈঠক বসে। শনি-রবি বারত আবার আমার যাওয়া হয় না, তোমার দাদা বাড়ি থাকেন।

তা' দাদাকে তুমি এত ভয় পাও কেন? তোমায় ত তিনি কিছু বলেন না।'

বড্ডই ঠাট্টা করেন যে। তাঁর বিশ্বাস, আমি এখনও সেই কচি খুকিটিই আছি, কিছুই বুঝি নে। কালও ত ঠাট্টা করে বলছিলেন, কিগো; তোমার মাথা থেকে চরকা আর খদ্দর গেছে ত? ও সব নাকি বক্তৃতাতেই বেশ শোনায়, কাজে নাকি করা অসম্ভব। কেউ নাকি মাসেও একখানা সুতো কাটতে পারে না। তাইত আমরা সকলেই ঠিক করেছি, কিছু কাপড় সঞ্চয় ক'রে নিয়ে তবে সব কথা ফাঁস করব।

হাসিতে হাসিতে বিশ্বেশ্বর বলিল, আচ্ছা, বৌদি, তুমি যে বড় বলতে, স্বামীর কাছে কোন কথা লুকুতে নেই, তবে কি ব'লে মনকে এখন প্রবোধ দিচ্ছ?

স্নিগ্ধ হাসিতে রাধারানীর মুখখানা ভরিয়া গেল। সে বলিল, সে এক কাহিনী ঠাকুরপো, এ ভাবনা কি কম ভেবেছি? ভেবে ভেবে ত মাথায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম। জীবনের দুটো মাসও ত ঐ করেই নষ্ট করেছি। কিন্তু তারপর যে কোথা দিয়ে, কেমন ক'রে হঠাৎ সব পরিস্কার হয়ে গেল, তা নিজেই জানি নে, তোমায় কি বলব? প্রাণের দেবতা প্রাণে ব'সে পথ দেখিয়ে দিলেন, আর ত আমার ভাবনা কিছু নেই।

বিশ্বেশ্বর মৃদুস্বরে বলিল, আর তুমিত অন্যায় কাজ কিছু করচ না।

জোরের সহিত রাধারানী বলিল, নয়-ইত! এতে ত তাঁর মঙ্গলই হবে। কথায় তিনি যখন বুঝবেন না তখন কাজ দিয়েই ত তাঁকে বোঝাতে হবে। আর কটা দিন গেলেই ত তাঁকে সব বলতে পারব।

তখন তুমি দাদাকে কি জব্দটাই না করবে।

জব্দ করাকরি কিছু বুঝিনে ভাই, জব্দ করতেও চাইনে। তবে তখন আমার

একটা জোর হবে, আর আমাকে ঠেকিয়ে রাখা তাঁর সাধ্য হবে না। এইবার ওপরে চল ঠাকুরপো, আরও কিছু সুতো জমেছে, তোমায় দিয়ে দিই গে, কাপড় ক'খানাও তুলে রাখি।

ওপরে আসিয়া রাধারাণী মোড়কটি খুলিল। নিজের হাতে-কাটা সূতায় বোনা শুভ্রসুন্দর কাপড় ক'খানা তাহার প্রাণে এক অপূর্ব পুলকের সৃজন করিল। কাপড় দু'জোড়া সে মাথায় ঠেকাইয়া আলমারিতে তুলিল। একটি সূতার পুঁটলি আলমারি হইতে বাহির করিয়া বিশ্বেশ্বরের হাতে দিয়া বলিল, এ দিয়ে মার জন্য এক জোড়া সাদা থান বুনিয়ে দিও, ভাই।

৫

সেদিন রবিবার। দুপুরে রাজশেখর আহারে বসিয়াছেন, রাধারানী অদূরে তদারক করিতেছে। খাইতে খাইতে রাজশেখর গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ নিরামিষ তরকারীগুলো কে রেঁধেছে?

শশ্যব্যাস্তে রাধারানী কহিল, কেন? ভাল হয় নি নাকি?

সে কথা পরে হবে, কে রেঁধেছে, তাই বল না! মার কাছে শুনলুম আজ একাদশী।

রাধারানী বলিল, বামুনদি'র উনোনে আমি রেঁধেছি।

তাই বল! আমি ভাবছিলুম বামুনদি'র হাতে স্বাদ হঠাৎ এমন বদলে গেল কি করে? সবগুলোই খুব ভাল হয়েছে কিনা।

ঠোঁট ফুলাইয়া রাধারানী বলিল, "তুমি বড্ডই আমায় ক্ষেপাতে ভালবাস বাপ। এমনি ভড়কে গেয়েছিলুম ভাবলুম বুঝি অখাদ্য হয়েছে। তুমি বুঝি আর জানতে না? শুধু বামুনদির রান্না দিয়ে প্রাণ ধরে তোমায় কখনও আমি খেতে দিতে পারি? মার রান্না করতে হয়, নেহাৎই দুটো রান্না করে উঠতে পারিনে, তাই না বামনি রাখা, না হ'লে এই ২/৩ জন লোকের জন্য কেই বা লোক রাখত?

রাজশেখর হো হো করয়িা হাসিয়া উঠিলেন। রাধারানীর মাতা এক বাটি দুধ হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন, রাধারানী উঠিয়া দ্বারের পাশে সরিয়া

দাঁড়াইল। দুধের বাটি নামাইয়া রাখিয়া মাতা বলিলেন, রাধে, কলা আর বাতাসা নিয়ে আয়।

রাধারানী সরিয়া গেল, তিনি অদূরে বসিয়া পড়িয়া স্বর যথাসম্ভব খাটো করিয়া কহিলেন, 'বাবা, রাধের জন্য দু'জোড়া কাপড় নিয়ে এস। আজ দু'মাস থেকে কাপড় সেলাই করে ক'রে পরছে। রোজই বলি জামাইকে বল্। তা শোনে না।

রাজশেখর আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "কই? কাপড় নেই তা আমায় বলেনি কেন?

কি জানি বাবা! অজকালকার মেয়েদের রকম সকম আমাদের বোঝা ভার। যতই বলি, কাপড় নেই, ব'লে দে আনতে, ততই বলে, না মা, তোমার পায়ে পড়ি, মা কিছু ব'ল না। আর আজকাল ত বাড়িতে মনই টেকেনা, দুপুরটি হবে আর নাকে মুখে দুটি ঘুঁজে পাড়া বেড়াতে বেরুবে। কি হয়েছে জানিনে, বাপু!

তা একটু বেড়াতে-টেরাতে যায়, সেত ভালই। লোক-জনের সঙ্গে মেলামেশা ত আমি ভালই মনে করি, কিন্তু কাপড়ের কথা আমায় লুকুবার কারণ ত কিছু বুঝতে পারলুম না।

রাধারানী কলা আর বাতাসা লইয়া আসিতে আসিতে স্বামীর শেষ কথাগুলি শুনিতে পাইল। ঘোর বিরক্তিতে তাহার মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। মা এ কি করিলেন? ছি ছিঃ স্বামী হয়ত কি ভাবিতে কি ভাবিলেন। সে আর সেখানে না দাঁড়াইয়া পানের ডিবা লইয়া উপরে চলিয়া গেল।

আহারান্তে রাজশেখর শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাধারানী জানালার নিকট বাহিরের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে. তিনি ডাকিলেন, রানি!

রাধারানী মুখ ফিরাইল, তাহার চক্ষুপল্লব আর্দ্র।

একটু ক্ষুন্ন স্বরে রাজশেখর বলিলেন রানু! তোমায় কি আমি পরনের কাপড় দিতে কুণ্ঠিত?

রাধারানী ব্যস্ত হইয়া বলিল, সে কি? আমি কি তাই মনে করি?

তবে ছেঁড়া কাপড় সেলাই ক'রে পরছে, অথচ আমায় বলনি কেন?

রাধারানী নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজশেখর বলিলেন, আমার কথার উত্তর দিবে না?

রাধারানী মুখ তুলিল। স্বামীর মুখের প্রতি স্থির স্থাপন করিয়া কহিল, তোমায় কাপড়ের কথা বলিনি, বল্‌লেই তুমি বিলিতী কাপড় এনে দেবে তাই।

বাজশেখর হাসিয়া উইঠলেন। ওঃ তোমাব মাথার ভূতটা এখনও ছাড়েনি তোমায়? আচ্ছা, রানু, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করছি, আজ যেন তোমায় আমি খদ্দর কিনে দিলুম. কিন্তু দু'দিন বাদে যখন আবার সেই বিলিতী কাপড় পরতে হবে, তখন লোকের কাছে মুখ দেখাবে কি করে?

কেন বিলিতী কাপড় পরতে হবে? আর কাবও কথা জানিনে, কিন্তু আমিত একবার খদ্দর ধরলে আর প্রাণ গেলেও বিলিতী কাপড় পরব না।

খদ্দর পাবে কোথায় গো? বিলিতী কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় খদ্দর কখনও পেরে উঠবে?

কিন্তু দেশের নেতারা ত প্রতিযোগিতার কথা বলছেন না। তাঁরা বলেন, প্রত্যেক পরিবারই যদি নিজের নিজের প্রয়োজন মত সুতো কেটে কাপড় তৈয়ারি করে নেন, তবে আর বাজারে কাপড় কেনবার দরকারই হবে না, প্রতিযোগিতার কথাই উঠবে না।

আরে ক্ষেপেছ? সে কি কখনও সম্ভব? ঘরে ঘরে সকলে অন্নের সংস্থান করবে, সংসারের খাটুনি খাটবে, ছেলেপিলে মানুষ করবে, রোগ শোকের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, না কাপড়ের সুতো কাটবে। গান্ধীজী হুকুম করলে অনেক কাজ হয় জানি, কিন্তু অসম্ভব কখনও সম্ভব হবে না।

কিন্তু আমাদের দেশে ত আগে তাই হত। ঠাকুরপোর কাছে শুনেছি, ঘরে ঘরে মেয়েরা যে সুতো কাটত, তাইতেই দেশের কাপড়ের অভাব মিটে যেত। শুধু তা নয়, উদবৃত্ত সুতো বিদেশে রপ্তানিও হ'ত।

ওরে বাসরে, রানু। তুমি যে বেশ তার্কিক হয়ে উঠেছ দেখছি। ওগো,

তর্কচূড়ামণি মহাশয়, সে কালের আর একালের মধ্যে যে অনেকখানি তফাৎ সে কথা ভুলে গেলে চলবে কেন? সেকালে কি সংসারের ভাবনাচিন্তায় মানুষ গুলোকে এমন বিব্রত হ'তে হ'ত? টাকায় ১৫/১৬ সের, আধ মণ দুধ চার পাঁচ পয়সা করে মাছের সের। অসুখ বিসুখের ধারও কেউ ধারত না। এখন কি ক'রে দু'বেলা পেট ভ'রে দুটি ভাত পাবে, কি করে ম্যালেরিয়া, কলেরাব হাত থেকে ছেলেপিলে গুলিকে বাঁচাবে, সেই ভাবনায়ই অস্থির, তার উপর আবার চরকা কাটবে কখন?

একটু হাসিয়া রাধারাণি বলিল সেই জন্যেই-ত চরকাকাটা আরও দরকার। চাল, ডাল সব জিনিসেরই দর বেড়েছে, তার উপর চড়া দরের কাপড় কিনে পরা মানুষের ত এক রকম অসাধ্য হয়েই দাঁড়িয়েছে। নিজে সুতো কেটে একজোড়া কাপড় তৈয়ারি করিয়ে নিতে খুব বেশী হলে ২ টাকা পড়ে। ২ টাকা জোড়ায় ত বাজারে কোন রকম কাপড়ই পাওয়া যায় না। আর এই কাপড়ের জন্য যে টাকাগুলি দেশ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সেগুলি দেশে থাকলে অন্নকষ্টও আর একটু কমে যেতে পারে।

সবই তো বুঝলুম গিন্নি ঠাকরুন। ও সব কথাই ত অনেকবার শুনেছি। কথায় আমায় কেউ যে বোঝাতে পারবে, তা পারবে, তা হবার নয়। কাজে কেউ দেখাতে পারত তবে বুঝতুম। কিন্তু আমিও তোমায় বলে দিচ্ছি তিন মাসেও একখানা কাপড়ের সুতো কেউ কখনও কাটতে পারে না।

রাধারানী মুখের উপর দিয়া একটা কৌতুকের হাসি খেলিয়া গেল সে আর কিছু না বলিয়া আহার করিতে নীচে নামিয়ে গেল।

বৈকালে বাড়ী ফিরিবার পথে রাজশেখর দু'জোড়া মিলের কাপড় আনিয়া তাহার হাতে দিয়া — বলিলেন এই নাও। বিলিতী কাপড় না পরতে চাও, মিলের কাপড় করতে ত দোষ নেই।

রাধারানী নীরবে কাপড় দু'জোড়া আলমারিতে তুলিল। তাহার আকাঙ্ক্ষিত দিন ত সমাগত, তাহার মনের ভারও অনেকটা লাঘব হইয়া আসিয়াছিল। তাহার আর তর্ক করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

শহরে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। সেই যে কলকার পক্ষ হইতে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক-দলকে বে-আইনী বলিয়া ইস্তাহার জারি করা হইয়াছে, সেই হইতে সহরে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ভারতবাসী আর এ অপমান সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে; ইহা প্রমাণ করিতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জাগিয়া উঠিয়াছে। দলে দলে যুবকগণ আসিয়া সেবকদলে নাম লিখাইয়া খদ্দর বিক্রয় করিতে করিতে জেলে যাইতেছে। পুলিশের হস্তে নির্দয় নির্মম ভাবে লাঞ্ছিত হইয়াও হাসিমুখে কারাবরণ করিতেছে। এমন অপূর্ব দৃশ্য আর কেহ কখনও দেখে নাই।

রাধারানী সারাদিন ছটফট করিয়া বেড়ায় কখন সন্ধ্যা হইবে কখন বিশ্বেশ্বর আসিবে। সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যায় অবসর প্রাপ্ত বিশ্বেশ্বর আসিয়া তাহাকে দিনের কাহিনী শুনায়। শুনিতে শুনিতে সে বিস্ময়ে বিহ্বল, আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়ে। দেশবাসীর এই অপূর্ব আত্মত্যাগ-কাহনী শুনিয়া গর্ব্বে — আনন্দে তাহার চক্ষু দিয়া শ্রাবণের ধারা ঝরিতে থাকে। তাহারও দুঃখের রজনী প্রভাত প্রায। তাহার আলমারিতে তাহাদের বৎসরের কাপড় প্রায় সঞ্চিত। আর এক জোড়া ধুতি তৈয়ারি হইলেই সে এক দিন স্বামীকে চমকিত করিয়া দিয়া ঈপ্সিত বর চাহিয়া লইবে। দুই-জোড়া মোটা কাপড় হইলেই তার ও তাহার মাতার বৎসর প্রায় চলিয়া যাইবে, কিন্তু স্বামীর পাঁচ যায়গায় যাইতে হয়, তাঁহার বেশী কাপডের প্রয়োজন। তাই সে একটু সময় নষ্ট করিয়াও অনেক যত্ন করিয়া, এক জোড়া ধুতির জন্য খুব মিহি সূতা কাটিয়াছিল। বিশ্বেশ্বর বলিয়াছে আর ২/৩ দিনের মধ্যেই সেই কাপড় জোড়া তৈয়ারি হইযা যাইবে। সেই অবধি সে দুই হাতে দিনগুলি ঠেলিতেছিল।

সন্ধ্যাবেলা গা ধুইয়া আসিয়া সে বিশ্বেশ্বরের প্রতীক্ষায় ছাদে বেড়াইতেছিল। খোকা বেড়াইতে গিয়াছে, মাতা, আহ্নিকে বসিয়াছেন। রাজশেখর আজ কয়দিন হইল, আদালত হইতে একটা জরুরি কাজে এক বন্ধু উকিলের বাড়ি যান। তাঁহার ফিরিতে রাত্রি প্রায় ৯/৯.৩০ টা হয়। রাধারানী বেড়াইতে বেড়াইতে গত ৮/৯ মাসের কথা ভাবিতেছিল। এই অল্পকালের মধ্যেই তাহার কতই না পরিবর্তন হইয়াছিল। গতবৎসরকার রাধারানী আর এই রাধারানীতে কত প্রভেদ।

এই এক বৎসরে সে যে কতখানি বড় হইয়া গিয়াছে, কত গাম্ভীর্য তাহার মধ্যে আসিয়াছে, কত শক্তিই তাহার ক্ষুদ্র মনখানির মধ্যে সঞ্চয় হইয়াছে ভাবিতে সে অবাক হইয়া যায়। গত বৎসর এই দিনে যদি কথাটা তাহার কাছে কেহ পড়িতে তবে সে তাহাকে নিশ্চই সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিত। কিন্তু আজ তাহার নিজেরই মনে হইতেছে, কেহ যদি আসিয়া তাহাকে বলে, তাহার স্বামী স্বেচ্ছাসেবকের দলে মিশিয়া কারাবরণ করিয়াছেন, তবে যে সে অন্তরের মধ্যে নিরতিশয় ক্লেশ বোধ করিবে, তাহা বোধ হয় না। অবশ্য স্বামী যত দিন কারারুদ্ধ থাকিবেন, ঐহিকের সকল সুখই তাহার কাছে মিথ্যা হইয়া যাইবে. সে গৃহে থাকিয়াও কারাক্লেশই বহন করিবে। কিন্তু এ কথাটাও ঠিক যে সেই সঙ্গে স্বামিগর্ব্ব তাহার ক্ষুদ্র বুকখানা ছাপাইয়া — উপচাইয়া পড়িবে, এ শক্তি তাহার কোথা হইতে আসিল। ভক্তিতে গদগদ হইয়া রাধারানী সেই সর্বশক্তির আধার যিনি, তাঁহার উদ্দেশে যুক্ত কর মাথায় ঠেকাইল।

সিঁড়িতে পদ শব্দ হইল, এবং অনতিকালের মধ্যেই একটি মোড়ক হস্তে বিশ্বেশ্বর আসিয়া দাঁড়াইল। মোড়কটি রাধারানীর হাতে দিয়া সে বলিল এই নাও বউদি, এবার আমার ছুটি।

অর্থাৎ?

সরকারী অতিথিশালার নেমন্তন্ন আর অগ্রাহ্য করতে পারিনে।

তার মানে কালই যাচ্ছে?

নাঃ আর কি থাকা যায়।? দেশের বড় বড় নেতারা অবধি চ'লে গেলেন, বাইরে মুখ দেখাতে এখন লজ্জা করে। নেহাৎ তোমার কাপড় জোড়ার জন্য পালিয়ে বেড়াচ্ছিলুম। আজ নাম লিখিয়ে এসেছি, কালই যাব।

যাও-ভাই যাও তোমারই মায়ের সুসন্তান, মায়ের মুখ উজ্জ্বল তোমারই করবে। আমরা কুসন্তান, আমাদের দ্বারা কিছুই হল না।

ও কি কথা বলছ, বউদি, তুমি যে কাজ করছে, সে কি কম কাজ, ও কাজটা সঙ্গে সঙ্গে না চললেত সবই পণ্ড হবে। সকলেরই ত এক কাজ নিয়ে থাকলে চলবে না। যার যার কাজ ঠিক মত করে গেলেই আমাদের আশা

পূর্ণ হবে। কালই ত তুমি দাদাকে সব কথা বলতে পাবে। তার সাহায্য পেলে আর তোমার ভাবনা কি?

বিশ্বেশ্বর উঠিতেছিল, শশব্যস্তে রাধারানী বলিল, — ওকি ঠাকুরপো, তা হবে না। আজ আমার কাছে তোমায় খেতে হবে। আজ নিজের হাতে রেঁধে তোমায় খাওয়াব।

হাসিয়া বিশ্বেশ্বর বলিল, — কেন? জেলে যদি ম'রে টরে যাই, সে জন্য না কি?

ষাট ষাট, ও কথা কি বলছ? কত দিন আর তোমায় পাব না, কাছে ব'সে খাওয়াতে পারব না, তাই আজ তোমায় খাওয়াব।

তা বেশত, বৌদি, ভাল খেতে তোমার এই দেওরটির কোন দিন কোন আপত্তি দেখেছ কি? বিশেষ করে ত মা-ও নেই যে, পথ চেয়ে ব'সে থাকবেন, তোমার কাছেই খেয়ে যাব।

তবে চল, আমি রান্না করব, তুমি আমার কাছে বসে গল্প করবে।

নীচে আসিয়া রাধারানী বামুনদিকে বিদায় করিয়া দিল। রান্নাঘরের দোরগোড়ায় একখানা আসন বিশ্বেশ্বরের জন্য পাতিয়া দিয়ো সে রাঁধিতে বসি। রান্নার যোগাড় সবই ছিল, কাজেই রান্না দ্রুতই অগ্রসর হইতে লাগিল। গল্পও সঙ্গে নির্বিবাদে চলিতে লাগিল।

এক সময়ে রাধারানী কি ভাবিয়া একটু হাসিল। বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল — হাসলে যে?

একটা কথা অনেক দিন পর মনে পড়ল। আমি মায়ের এক সন্তান জানই ত। আমার জন্মের আগে মার অনেকগুলি সন্তান নষ্ট নয়, আমার পরে আর সন্তান হয়নি। ভাই বোন কেউ নেই বলে আমার আজন্মই বড় দুঃখ ছিল। তার পর বিয়ের আগে যখন শুনলুম যার সঙ্গে বিয়ে হবে, তারও কেউ নেই, তখন বড়ই কষ্ট হয়েছিল, তের বছর তখন বয়স। কিন্তু মনে আছে, বিয়ের আগে এক দিন ঠাকুর ঘরে গিয়ে মাথা কুটে কেঁদে ছিলুম। — হে ঠাকুর। কেন আমায় এমন করলে, আমার যে একটি ভাই বা বোনের বড় সাধ ছিল।

আজ মনে হচ্ছে, ঠাকুর আমার সে কান্না শুনেছিলেন। তাই শিশির-ধোয়া তাজা ফুলটির মত এই ভাইটি আমি পেয়েছিলুম।

রাধারানীর চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, — সে অঞ্চলপ্রান্তে নয়ন মার্জনা করিয়া কহিল, — ভাই, ভেব-না, এ আমার দুঃখের অশ্রু! এযে আমার কত গর্বের — কত আনন্দের অশ্রু, তা' আমার অন্তরের দেবতা জানেন।

রাত্রিতে রাজশেখর ও বিশ্বেশ্বর পাশাপাশি বসিয়া খাইলেন। রাজশেখরের নিকট বিশ্বেশ্বর কোন কথা ভাঙ্গিল না। আহারের পর বিশ্বেশ্বর রাজশেখরও রাধারানীর পদধূলি লইয়া, খোকার ঘুমন্ত মুখে চুম্বন করিয়া বিদায় লইল। রাজশেখর আশ্চর্যান্বিত হইয়া চাহিলেন। বিশ্বেশ্বর বলিল, — কাল এক জায়গায় যাব। রাধারানীকে বিশ্বেশ্বর বলিল, — কাল অনেক কাজ আছে, কাল আর আসতে পারব না, বৌদি।

রাধারানী নীরবে তাহার মাথায় হাত দিয়ো আশীর্বাদ করিল। বৃথা বাক্য দ্বারা এই পবিত্র মুহর্তটি নষ্ট করিবার প্রবৃত্তি তাহার হইল না।

পরদিন সারাদিন রাধারানী নীরবে গৃহকার্য সমাধা করিল। তাহার মনটা থাকিয়া থাকিয়া বিশ্বেশ্বরের সংবাদের জন্য ব্যাকুল হইতেছিল, কিন্তু সংবাদ দিবে কে? তাই সে বার বার মনকে বুঝাইতে ছিল, — খবর আবার কি? বিকেল ৩টায় বেরুবে, ছটার মধ্যে নিশ্চয়ই ধরা পড়ে যাবে, এ ত জানাই কথা, তবু মনের ব্যাকুলতা সে একেবারে দূর করিতে পারে নাই।

বৈকালে গা ধুইয়া সে উপরে উঠিতেছিল, হঠাৎ স্বামীর সাড়া পাইল। সে আশ্চর্য হইযা মাঝ সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া পড়িল। তিনি ত এত শীঘ্র আসেন না। রাজশেখর সিঁড়িতে উঠিলেন, তাঁহার মুখ অসম্ভব গম্ভীর। রাধারানী তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কি, তুমি আজ অসময়ে বাড়ি এলে যে?

এই এলুম। শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি ধড়া চূড়া ছাড়িলেন, রাধারানী চিরদিনের প্রথামতই তাঁহার সাহায্য করিল। তিনি হাত মুখ ধুইতে গেলে, সে তাঁহার চা ও জল খাবার গুছাইয়া লইয়া আসিল। রাজশেখর আসিয়া ইজিচেয়ারে

বসিয়া পড়িলেন। পাশে ছোট টেবিলে খাবার দেওয়া ছিল, তিনি তাহা টানিয়া লইয়া নীরবেই আহার করিতে লাগিলেন। রাধারানী তাঁহার পায়ের কাছে মাটিতে বসিয়াছিল। সে আজ স্বামীর ব্যবহারে উত্তরোত্তরই আশ্চর্য হইতেছিল যে মানুষ বাড়িতে পা দিবামাত্র তাঁহার হাস্যরোলে ও কথায় গৃহ মুখরিত হইয়া উঠে, স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎমাত্র হাস্যকৌতুকে তাহার ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলাই যাঁহার স্বভাব, আজ তাঁহার এ কি হইল? রাধারানীরও কথা কহিবার মত মনের অবস্থা আজ ছিল না, তাই সেও নীরবেই বসিয়া রহিল। আহার শেষ করিয়া রাজশেখর ছোট তোয়ালেতে হাত-মুখ মুছিলেন। তাহার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, একটু কাশিয়া, একটু ইতস্তত করিয়া রাধারাণীর মুখের দিকে চাহিলেন। মনে হইল, তাহাকে একটা বড় আঘাত দিবার ভয়েই যেন অতি আস্তে বলিলেন, রানু বিশু আজ এসেছিল?

না।

সে যে এক কাণ্ড করে বসেছে।

কি কাণ্ড?

সে যে আজ জেলে গেল।

তা'ত আমি জানি।

অ্যাঁ—রাজশেখর খাড়া হইয়া বসিয়া বলিলেন, তুমি জানতে?

হ্যাঁ, কালই সে আমায় ব'লে গিয়েছিল।

রাজশেখর বিহ্বলের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। বিশ্বেশ্বরকে যে রাধারানী আপন ছোট ভাইটির মতই ভালবাসিত, তাহা তিনি জানিতেন। সেই বিশু আজ জেলে গিয়াছে, আর রাধারানী অম্লানবদনে বলিতেছে সে পূর্বেই জানিত। জানিয়াও সে বিশুকে নিবারণ করে নাই? আর তিনি কি করিয়া রাধারানীকে এই সংবাদ দিবেন — শুনিয়া সে যখন অস্থির হইয়া পড়িবে, তখন কি করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবে, এই চিন্তাতেই এতক্ষণ ছিলেন! না, নারী-চরিত্র বাস্তবিকই দুর্জ্ঞেয়। তিনি খানিকক্ষণ অভিভূতের ন্যায় রাধারানীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর অস্ফুট স্বরে তাহার মুখ হইতে বাহির হইল — আশ্চর্য!

উচ্ছ্বসিত হইয়া রাধারানী বলিয়া উঠিল, ওগো, আশ্চার্য কিছুই নয়। তুমি কি ভাবছ, আমার দুঃখ কিছুই হচ্ছে না? কত দিন তা'র মুখখানা দেখব না, জেলে তা'কে কতই না কষ্ট পেতে হবে, এ সব ভেবে আমার বুক কি ভেঙ্গে যাচ্ছে না? কিন্তু আজ আমার সকল দুর্বলতার উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে আমার ভ্রাতৃ-গর্ব্ব! ওগো, আজ দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে আমার সুখেরও সীমা নেই!

তাহার পর রাধারানী এক কাণ্ডই করিল। সে একেবারে কাঁদিয়া ভাঙ্গিয়া স্বামীর পায়ে লুটাইয়া পড়িল। রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, ওগো আজও কি তুমি বধির হয়ে থাকবে, আজও কি আমার প্রাণের কথা বুঝবে না? আমার বুক যে ভেঙ্গে যাচ্ছে, আমি যে আর পারছিনে।

পত্নীকে উঠাইয়া, তাহাকে সান্ত্বনা কবিয়া রাজশেখর বলিলেন, নাঃ আজ আমি তোমার কোন কথা ঠেলব না, কি বলবে বল?

কাতর নয়ন স্বামীব মুখের উপর স্থাপন করিয়া রাধারানী বলিল, তবে আজ আমায় এই ভিক্ষে দাও যে, বিলিতী কাপড় আর বাড়িতে আনবে না। নিজেও আজ থেকে খদ্দর পরবে, আমাদেরও পরতে দেবে।

পত্নীর মুখখানা বুকে চাপিয়া ধরিয়া রাজশেখর বলিলেন. 'ভিক্ষে কেন, রানু, আজ থেকে তোমার আদেশ বলেই এ আমি মেনে নেব। আজ যে দৃশ্য রাস্তায় দেখে এসেছ, নির্দোষ বালকদের পুলিশের হাতে যে নিগ্রহ দেকে এসেছি, তাতে পাষাণও জেগে ওঠে। কিন্তু একটা যে কথা আছে রানী, কেনা খদ্দর পরায় যে আমাব বড্ড আপত্তি। মিলের কাপড় পরলে কি হয় না?

কেনা খদ্দর কেন পরব? — বলিয়া রাধারানী স্বামীর হাত ধরিয়া আলমারির নিকট লইয়া গেল। আলমারি খুলিয়া দিলে, রাজশেখর দেখিলেন, একটি তাকে বোঝাই খদ্দরের ধুতি, শাড়ি ও ছোট জামা। আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, এর মধ্যে এত কাপড় কোথা থেকে জোগাড় করেছ?

সুতো কেটে কাপড় তৈয়ারি করিয়াছি।

এ্যাঁ তুমি বলতে চাও, এতগুলো কাপড়ের সুতো তুমি নিজে কেটেছ?

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, তাই বলতে চাই। আমি সুতো কেটেছি, ঠাকুরপো কাপড়

বুনিয়ে এনে দিয়েছে। এর পরও কি বলবে, কেউ ৩ মাসেও একখানা কাপড়ের সূতো কাটতে পারে না।

না — না, রানু, তোমার কথার উপর আর কোন দিন কোন কথাই আমি কইব না। এত দিন তোমায় দিন তোমায় নিয়ে শুধু পুতুলখেলাই করেছি, ভোগের জিনিস বলেই তোমায় অপমান করেছি। আজ বুঝতে পারছি, তুমি আমার গৃহের কল্যাণের প্রতিমা, আজ থেকে তোমার হাত ধরেই সংসারে পথে চলব, তুমিই আমায় পথ দেখিয়ে আমার গন্তব্য স্থানে নিয়ে যেতে পারবে।

সাফল্যের আনন্দে রাধারানী মৃদুমৃদু হাসিতে লাগিল।

পূজার তত্ত্ব

সীতা দেবী

সমস্ত দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর বৃন্দাবন সবে আপনার সর্ব্বদুঃখহারী হুঁকাটিকে হাতে লইয়া বসিয়াছে, এমন সময় তাহার ভাইঝি কাত্যায়নী আসিয়া ঝড়ের মতন তাহার পিঠের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। কোনোমতে নিজেকে এবং হুঁকা-কলিকা সামলাইয়া বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে কাতু, কাঁদছিস কেন?"

কাতু ফোঁপাইতে — ফোঁপাইতে বলিল, "জেঠাইমা মেরেছে।"

বৃন্দাবন কিছু বলিবার আগেই তাহার স্ত্রী ঘর হইতে গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, "না মারবে না, ওঁকে মাথায় ক'রে রাখবে। একটা জিনিস তো কোনদিন হাতে তুলে দিতে পারেনি এপর্যন্ত, আদরের ভাইঝি পাঠিয়েছেন, আমার বাপের বাড়ির দেওয়া জিনিসপত্র ভাঙতে।"

বৃন্দাবন একটু ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল, "কি আবার ভাঙল তোমার? এসে অবধি মেয়েকে কি যে বিষ নজরে দেখেছ! খিচিমিচির জ্বালায় আর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হয় না। নিজের পেটে ত একটাও হয়নি, এটাকেই না হয় একটু আদর যত্ন করো, তা তোমার কুষ্ঠীতে লেখেনি।"

হ্যাঁ আদর করবে, ঝাঁটা মারতে হয় অমন মেয়ের মুখে। শ্বশুরবাড়ি যাবার বয়স হ'ল, এখনও মেয়ে যেন বাঁদরের মতন নেচে বেড়াচ্ছেন। এই দেখনা আমার আরশিখানা কেমন কুচি -কুচি ক'রে ভেঙেছে। বৃন্দাবনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী লবঙ্গলতা একখানা ভাঙা আরশি হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

কাতু ততক্ষণ জ্যাঠার পিঠের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতেছিল। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনিয়া বলিল ,"ও বুঝি আমি ভেঙেছি ও ত পুষি ভেঙেছে।

লবঙ্গ চটিয়া গিয়া চড়া- গলায় বলিল, "পুষিকে শিকল খুলে আমার ঘরে ঢুকিয়েছিল কে?"

কাতু অম্লান বদনে বলিল, "আমি তোমার ঘরে মা-দুর্গার ছবি দেখতে গিয়েছিলাম, পুষি আমার কোল থেকে ঝাঁপিয়ে তোমার আরশির উপর পড়্‌ল ত আমি কি করব?"

"কি আর করবে, আদরের জ্যাঠার কোলে উঠে নালিশ করো গিয়ে আমার নামে" বলিয়া রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে লবঙ্গ নিজের কাজে চলিয়া গেল। কাতু খেলার সাথীর সন্ধানে বাহির হইল, বৃন্দাবন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার হুঁকায় মনোনিবেশ করিল।

বৃন্দাবনের ছোটো ভাই নিবারণ ও তাহার স্ত্রী বছর ছয় আগে কলেরায় প্রায় একই দিনে দেহত্যাগ করে। তাহাদের চার-বছরের মেয়ে কাত্যায়নী জ্যাঠার কাছে তাহার পর হইতে মানুষ হইতেছে। একটি বুড়ি ঝির সাহায্যে কিছু কাল কাজ চালানোর পর সেও যখন হঠাৎ ধরাধাম হইত বিদায় গ্রহণ করিল তখন পাড়া-প্রতিবেশীর পরামর্শে এবং নিজেও উপায়ান্তর না দেখিয়া, বৃন্দাবন পুনর্বার বিবাহ করিতে রাজি হইল। পাশের গাঁয়ের পরাণ মণ্ডলের মেয়ে বয়সেও বড় এবং দেখিতে শুনিতেও মন্দ নয় বলিয়া শোনা গেল, সুতরাং দিন-ক্ষণ দেখিয়া তাহাকেই বিবাহ করিয়া আনিয়া বৃন্দাবন গৃহে অধিষ্ঠিত করিল।

কিন্তু কাতুকে মানুষ করিবার জন্য যাহাকে বিশেষ করিয়া আনা হইল, দেখা গেল, বিশেষ করিয়া কাতুর প্রতিই তাহার বিরাগ সর্বাপেক্ষা বেশী। একে

বাপের বাড়িতে কিছু আদরে পালিত বলিয়া লবঙ্গের মেজাজ একটু অসহিষ্ণু এবং আরামপ্রিয় ছিল, তাহার উপর যে দেওরঝিটির ভার তাহার হাতে দেওয়া হইল, সেটিও অতিমাত্রায় আদর পাইয়া একেবারে শাসনের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিল। কাজেই জ্যাঠাই এবং দেওর-ঝির কলহ ও মারামারির চোটে শীঘ্রই বৃন্দাবনের বাড়ি মুখর হইয়া উঠিল। বৃন্দাবন-বেচারা হিতে বিপরীত দেখিয়া হুঁকার শরণ লইল, তাহাও যখন আর সান্ত্বনা দিতে অক্ষম হইল,তখন বাড়ি ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল কাজে এবং অকাজে। নববিবাহিতা স্ত্রীর সহিত প্রেমালাপের সুযোগমাত্র তাহার কপালে ঘটিয়া উঠিল না। একটা হাড়জ্বালানী পাজি মেয়ে তাহার ঘাড়ে তুলিয়া দেওয়ার জন্য পত্নীটিও তাহার প্রতি খুব যে খুশি হইয়া রহিল, তাহাও নয়।

হুঁকায় কয়েকটান দিতে না দিতেই বাইরের দরজায় ধাক্কা দিয়া কে উঁচু গলায় হাঁক দিল, ''বৃন্দাবন আছ হে?'' বৃন্দাবন ত্রস্ত হইয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া ডাকিল, ''কাতু, কাতু''! কাতু আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল ''কি বলছ?''

''চুপ কর অত চেঁচাস্‌নে, বাইরে নবীন এসেছে, ব'লে আয় জ্যাঠামশাই বাড়ি নেই। ''

কাতু বাহির হইয়া গেল, এবং উচ্চকণ্ঠে আগন্তুককে খবর দিল, ''জ্যাঠামশাই বাড়ি নেই গো!''

নবীন আসিয়াছিল সুদের টাকার খোঁজে, সুতরাং সহজে হাল না ছাড়িয়া সে বলিল, ''বাড়ি নেই কি ? আমি এই মাত্তর যে তাকে বাড়ি আসতে দেখলাম। কোথা গেল সে?''

অতশত জানিনে বাপু , আমাকে বলতে বলেছে বাড়ি নেই, তাই বললাম,'' বলিয়া কাতু ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া পলায়ন করিল, নবীন আরও কয়েকবার বৃন্দাবনের নাম ধরিয়া বৃথা হাঁক-ডাক করিয়া আপন-মনে গজ্‌গজ্ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

সে যে চলিয়া গিয়াছে এ বিষয়ে যখন আর কোনো সন্দেহ রহিল না, তখন বৃন্দাবন আস্তে আস্তে আসিয়া সদর দরজার কাছে দাঁড়াইল। লবঙ্গ চেঁচাইয়া

উঠিল, "এখুনি বেরোও যে? গিলতে কুটতে হবে না, বেড়িয়ে বেড়ালেই চলবে?"

"আর গেলাকোটা। তোদের জ্বালায় ঘরেও আমার দুদণ্ড বসবার জো নেই। বাইরে গেলে নব্‌নে পথে ঘাটে অপমান করে, আর ঘরে তোরা জ্বালাস, না মরলে, আমার জুড়বে না। "

স্বামীর অবস্থা দেখিয়া লবঙ্গ একটু নরম হইয়া গেল। অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে বলিল, তা হলে এখুনি বেরুচ্ছ কেন? নবীন খুড়ো এখনও হয়ত রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে —

"না গিয়ে আর করি কি? মেয়ে দেখতে দেখতে মস্ত হয়ে উঠল, এর পর বিয়ের চেষ্টা না করলে শেষে কি একঘরে হয়ে থাকতে বলিস?"

লবঙ্গ বলিল "মিথ্যে না বাপু । দশ বছরের মেয়ে কে বলবে! মাথা যেন তালগাছে গিয়ে ঠেকেছে। হবে না? যা আদরের ঘটা! মেয়েছেলেকে অমন গোগ্রাসে গিলতে দিতে আছে? পেট কাঁদিয়ে খেতে দেবে, উঠতে বসতে ঝাঁটা লাথি দেবে, তবে না সে-মেয়ে মেয়ের মতন থাকবে? তা কোথা যাচ্ছ এখন?"

বৃন্দাবন বলিল "একটা সম্বন্ধের কথা কাল শুনছিলাম দিবাকরের কাছে। ছেলের বয়স বেশী, দ্বিতীয় সংসার করবে, তাই একটু কম হ'তে পারে কিনা তাই দেখতে যাচ্ছি।"

ভাঙা-ঘরের বেড়ার ফাঁকে প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো যখন বাহিরের আঁধারের কোলে আসিযা পড়িয়াছে, তখন ম্লানমুখে বৃন্দাবন ফিরিয়া আসিল। লবঙ্গ ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হ'ল গা?"

বৃন্দাবন হতাশ ভরা সুরে বলিল, হবে আর কি আমার মুণ্ড! ঐ ত ছেলের ছিরি, তাও সাত আট'শ টাকার কম হ'য়ে উঠবে না।"

লবঙ্গ গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা অত টাকা কোথায় পাবে গো; শেষে কি ভাইঝির জন্যে লোকের ঘরে সিঁধ কাটতে যাবে?"

বৃন্দাবন বলিল, "সে বললে ত আর কেউ শুনবে না? শেষে কি বুড়ো বয়সে জাত খুইয়ে গো-ভাগাড়ে গিয়ে মরব? দেখি, এই বাড়ি আর বাগানখানা বন্ধক রেখে কি পাই। কাতুর মায়েরও দু-চারটে সোনা-রূপোর কুচি আছে,

দুইয়ে মিলিয়ে কোনোরকমে যদি কাজ উদ্ধার হয়।"

লবঙ্গ বলিল "বাড়ী ঘর বাঁধা দিয়ে কি পথে দাঁড়াবে? ভাইঝি তোমার কি স্বগ্‌গে বাতি দেবে যে তা'র জন্যে সর্বস্ব খোয়াতে বসেছ?"

"ও-ছাড়া আমার আর আছেই বা কে? ওর একটা ভালরকম হিল্লে লাগিয়ে দিতে পারলে আমার পথই বা কি আর ঘরই বা কি? ক'দিন আর আছি?"

লবঙ্গ একখানা পাখা হাতে করিয়া স্বামীর সেবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিল, স্বামীর মুখে এ-হেন উদার মন্তব্য শুনিয়া "তবে আমায় হাড় জ্বালাতে বিয়ে করেছিলে কেন? আমি পরের বাড়ি ভিখ্‌ মেগে খাবো এর পর," বলিয়া পাখাখানা আছড়াইয়া ফেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

যাহার জন্যে এত ভাবনা সে কিন্তু দিব্য নিশ্চিন্ত-মনে পা ছড়াইয়া বসিয়া কাঁচা পেয়ারা চিবাইতেছিল। জ্যাঠাই-মার রাগ বা জ্যাঠার দুশ্চিন্তায় তাহাকে একেবারেই কাবু করিতে পারে নাই। কান্নার শব্দে বাহিরে আসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "জ্যাঠাইমা কাঁদছে কেন?" বৃন্দাবনের মুখে কান্নার কারণ শুনিয়া সে বলিল "আমি বুড়োকে বিয়ে করব না, নিশি দাদা দেখতে বেশ ভালো, তাকেই বিয়ে করব। সে টাকা নেবে না বলেছে।"

এত দুঃখেও বৃন্দাবনের হাসি পাইল। সে কাতুকে কাছে টানিয়া লইয়া গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল "কা'কে বলেছে রে তোকে?"

"হাঁ কাল আমাকে জিগ্‌গেস করলে 'তোর জ্যাঠা তোকে নাকি বুড়ো বরে বিয়ে দিচ্ছে?' আমি বললাম 'কে জানে'। সে বললে 'বারণ কর না? আমি তোকে টাকা না নিয়েই বিয়ে করব।"

বৃন্দাবন বলিল "ছি মা! তুই এখন বড় হয়েছিস, ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে কি এখন খেলা করে, গল্প করে! ওতে নিন্দে করবে যে লোকে? শ্বশুরবাড়ি যাবি দুদিন পরে তা'রা শুনলে মন্দ বলবে।"

"বলুক গে, তাই ব'লে আমি খেলব না নাকি? আমি শ্বশুরবাড়ি চাইনে।"

কিন্তু না চাওয়া সত্ত্বেও তাহার একটি শ্বশুরবাড়ি জুটাইয়া দিবার চেষ্টায়

বৃন্দাবন প্রায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিতে বসিল। অনেক বলা-কহা অনুনয়-বিনয় করিয়া সেই দ্বিতীয় পক্ষের পাত্রটিকে সে জামাতৃত্ব স্বীকারে সম্মত করিয়া ফেলিল, কিন্তু টাকার সংখ্যা কমাইতে তাহাকে কোনো-প্রকারেই রাজি করাইতে পারিল না। লবঙ্গ বলিল, "হাঁ গা খুব ত পাকা কথা দিয়ে বসছ, কিন্তু এ ভাঙা বাড়ি বেচলেও তো আটশ টাকা হবে না, কোথা থেকে দেবে? "

"বাড়ী কেন আমাকে বেচলেও হবে না।"

"তবে রাজি হ'লে কি বলে?"

"রাজি না হয়ে আর উপায় কি? কোনোরকমে হাতে পায়ে ধ'রে বিয়েটা দিয়ে দেবো,তা'র পর কাতুর কপাল! আমার নিজের অপমানের জন্য ভাবি নে, দু-ঘা জুতো মারলেও সয়ে যাবো।"

লবঙ্গ বলিল "ওমা; তা'র পর সভায় ব'সে টাকা কম দে'খে যদি বিয়ে না করে, তখন যে জাতের জন্যে অত, তাই তো খোয়াবে। তোমার ঘটে কি এক ফোঁটা বুদ্ধি নেই?"

বৃন্দাবন বলিল, "তা করবে না। দিবাকরদের বাড়ি কাতুকে দেখে তা'র ভারী পছন্দ হয়েছে। নিজের ভাইঝি বলতে নেই, কিন্তু দেশে অমন মেয়ে আর-একটি -খুঁজ্‌লেও পাবে না। নিতান্ত অদেষ্ট তাই দোজবরের হাতে দিচ্ছি, তা না হ'লে কাতু আমার রাজার ঘরে পড়বার যুগ্যি। "

দেওর-ঝির রূপবর্ণণায় কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ না করিয়া লবঙ্গ রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে ঘরে চলিয়া গেল।

নিতান্ত না হইলে নয় এইরূপ দুচারখানা গহনা কাপড় প্রভৃতি কোনোপ্রকারে জোগাড় করিতে -করিতেই বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। বৃন্দাবনের জীর্ণ বাড়ি লোকজনের কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। কাতু এতদিন এ বিবাহে বিন্দুমাত্রও আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। আজ কিন্তু তাহার একটু ভাব পরিবর্তন দেখা গেল। এই ছেঁড়া সামিয়ানা, এই লাল চেলীর শাড়ী, রূপার ও সোনার গহনা, শোলার মুকুট, সব-কিছু তাহারই জন্য আমদানি হইয়াছে সে একটু উৎসাহ অনুভব না করিয়া থাকিতেই পারিল না। সমবয়সী বাল্য-সঙ্গিনীদের সঙ্গে সমানে চিৎকার

করিয়া, ফুর্তি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে যে বিয়ের কনে, তাহাকে যে এমন করিতে নাই, ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া বর্ষীয়সীরা তাহাকে বিন্দুমাত্রও দমাইতে পারিলেন না ।

চেলী-চন্দনে সুসজ্জিতা কাতুর কচি মুখের দিকে তাকাইয়া বৃন্দাবন কেবলই চোখ মুখ মুছিতে লাগিল। তাহার ঘর আঁধার করিয়া এই আনন্দরূপিণী স্নেহের পুত্তলি ত চলিল, কিন্তু তাহার অদৃষ্টেই বা কি আছে তাকে জানে? প্রাণপণ-চেষ্টা করিয়াও সে চার-শতের বেশী টাকা জোগাড় করিতে পারে নাই। বর পক্ষের হাতে নিজে সবরকম লাঞ্ছনা সহিতেই প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু কাতুকে যদি তাহারা ইহার জন্য যন্ত্রণা দেয়? উপবাস-ক্লিষ্ট বৃন্দাবন চোখে অন্ধকার দেখিয়াই যেন বসিয়া পড়িল।

কিন্তু বসিয়া থাকিবারই বা তাহার অবসর কোথায়? বরযাত্রীগণের শুভাগমনের শব্দে উঠিয়া পড়িয়া তাহাকে তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য ছুটিতে হইল। ছেঁড়া সামিয়ানার তলায় গম্ভীর-মুখে বর তাহার সাঙ্গোপাঙ্গো লইয়া উপবেশন করিলেন। কয়েকটা হুঁকা ঘন-ঘন এ হাত হইতে ও- হাতে ফিরিতে লাগিল, ফাটা চিমনি-ওয়ালা কেরোসিনের বাতি কয়েকটা প্রচুর ধূম উদ্‌গীরণ করিতে করিতে অন্ধকার-নাশের ব্যর্থ প্রয়াস করিতে লাগিল এবং বৃন্দাবনের আশঙ্কার কালিমায় ক্রমেই আগাগোড়া মসীলিপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

পণের টাকা লইয়া ষোল-আনা গোলমাল। অনুনয়-বিনয়, হাতে-পায়ে ধরা কিছুতেই কিছু হইল না । বরপক্ষ সভা ছাড়িয়া যাইবার জোগাড় করিল।

কিন্তু এ-হেন সময়ে প্রৌঢ় বরটি হঠাৎ বাঁকিয়া বসিয়া এমন পাকা ঘুঁটি একেবারে কাঁচা করিয়া তুলিল। কাতুর গৌরীর মতন ফুটফুটে মুখখানি তাহার কঠোর মনে বেশ একটু দাগ কাটিয়া বসিয়াছিল বোধ হয়। সে গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিল, আপনার মামা কাকা প্রভৃতির সম্মান রক্ষা করিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিবার কোন লক্ষণই দেখাইল না ।

বৃন্দাবন মনেমনে ইষ্টদেবতার নাম জপিতে-জপিতে কোণে দাঁড়াইয়া বলির পাঁঠার মতন কাঁপিতেছিল। সমস্ত ব্যাপারটা তাহাকে এমন করিয়া অভিভূত

করিয়াছিল যে, সে চোখের সামনে কি যে হইতেছে, তাহাও যেন ভালো করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার প্রতিবেশী যাদব যখন তাহাকে ঠেলা মারিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে নিতান্তই তাহার বাগ্মীতায় আজ শেষ রক্ষা হইয়াছে, তখনও সে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। যাদব তাহাকে আর-এক ঠেলা মারিয়া বলিল, "কি হে অমন ভেড়ার মতন তাকিয়ে রইলে যে? মেয়ে-সম্প্রদান করতে হবে না?"

বৃন্দাবন যন্ত্র-চালিতের মতন আগাইয়া আসিল। পুরোহিত তাহাকে মন্ত্র পড়াইলেন, সে যে বিড়-বিড় করিয়া কি বলিল, তাহা স্বয়ং ব্যাসদেবও বুঝিতেন কি না সন্দেহ। যাহা হউক, তাহাতে কাতুর বিবাহ আটকাইল না।

খাইতে বসিয়া বরের মামা একটা বিকট হাসিতে সমস্ত মুখখানা ভরিয়া তুলিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বেয়াই খুব ঠাট্টাটা আজ ক'রে নিলে। এর পর ঠাট্টার পালা আমাদের সেটা মনে রেখো; মেয়ে ত আমাদের ঘরেই থাকল।"

বৃন্দাবন তাহার রসিকতায় হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসি তাহার ঠোঁটের কাছে আসিতে-না-আসিতেই মিলাইয়া গেল!

পরদিন ভোর হইতে না হইতে বরযাত্রীর দল বর'কনে লইয়া বিদায় হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ক'নের মা নাই, কাজেই মেয়ে বিদায় হইবার সময় চেঁচাইয়া হাট বসানোর পালাটা লবঙ্গ কোনো-প্রকারে সংক্ষেপে সারিয়া লইল। কনের জিনিসপত্র গোছানো, তাহাকে সাজিয়ে দেওয়া প্রভৃতির ভার লইল পাড়া-প্রতিবেশিনীরা। কিন্তু সবাইকে অবাক করিল বৃন্দাবন। বর-কনে তাহাকে প্রণাম করিবামাত্র সে ভাইঝিকে জড়াইয়া ধরিয়া ছেলে মানুষের মতন হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আশীর্বাদের ধান-দূর্বা তাহার হাত হইতে খসিয়া কোথায় যে পড়িল তাহার ঠিকানা নাই, কান্নার আবেগে সে নিজেই যেন ভাঙিয়া দুমড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

একজন প্রতিবেশিনী ফিস্-ফিস করিয়া বলিল, এবাপু আদিখ্যেতামো। নিজের মেয়েও না, ভাইয়ের মেয়ে, তা'র উপর শ্বশুরঘর করতে যাচ্ছে, আর কিছু মন্দ না, তা'তে লোকটা করে দেখ না।"

লবঙ্গ এতক্ষণ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে স্বামীর কাণ্ড দেখিতেছিল, এতক্ষণে একজন মতে মত দিবার লোক পাইয়া বলিল, "যা বলেছ মাসি, ওর ধারাই অমনি সৃষ্টি ছাড়া। এই ক'বছর বিয়ে হয়েছে, এরই মধ্যে আমার হাড় ভাজা ভাজা করে তুলেছে।"

কাতু কাঁদিতে-কাঁদিতে বিদায় হইয়া গেল। তাহার পোষা বিড়ালছানা কাতরধ্বনি করিতে-করিতে এঘর-ওঘর করিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহার পরিত্যক্ত ঘরের জানলা ঝোড়ো-হাওয়ায় আছড়াইয়া-আছড়াইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল। একটা নিদারুন শূন্যতা বৃন্দাবনের বুকে যেন পাথরের মতন জাঁকিয়া বসিয়া রহিল, সে নির্জীবের মতন মাটিতে লুটাইয়া পড়িল, লবঙ্গের তীব্র কণ্ঠের বকুনিও তাহাকে কিছুমাত্র সচেতন করিতে পারিল না।

সন্ধ্যার আকাশটা কাল-বৈশাখীর ভ্রূকুটিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। পাঁজি দেখিলে যদিও দেখা যায় যে বৈশাখ মাস আর নাই ,তিনি প্রচণ্ডতর জ্যৈষ্ঠকে আসন ছাড়িয়া দিয়া ধরাতল হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তবু ঝড়ের বিরাম নাই। ধূলি ধ্বজা তুলিয়া প্রবল বিক্রমে তিনি জয়রথ হাঁকাইয়া চলিয়াছেন তাপক্লিষ্টা পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া ।

বৃন্দাবন দাওয়ার উপর বসিয়া গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতেছিল। তাহার জীর্ণ বাড়িখানির চেহারা জীর্ণতর হইয়া উঠিয়াছে, একটা নিরানন্দতার প্রলেপ কে যেন অদৃশ্যহস্তে গৃহ ও গৃহস্বামীর মুখে সমানভাবে মাখাইয়া দিয়াছে। কাতু নাই, তাই এ-বাড়ীতে আর হাসি নাই। আপনার দুঃখ ও চিন্তার ভারে অকালজরাগ্রস্ত বৃন্দাবন কোনোরূপে টিকিয়া আছে, স্বামী কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিতা লবঙ্গ আরো যেন কঠিন ও কঠোর হইয়া আপনার হৃদয়ের জ্বালায় চারিদিকে জ্বালা ধরাইয়া বেড়াইতেছে।

ভাঙা সদর-দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, তাহার পিছনে একটি কিশোরী বিধবা। দুজনের মাথাতেই বেতের প্রকাণ্ড ঝুড়ি। বৃন্দাবন আশঙ্কাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে তাকাইতেই বৃদ্ধাটি কাংস্যকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "খুব জায়গায় পাঠিয়েছিলে কায়েত খুড়ো। আমরা ছোটলোক বটি,

কিন্তু এমন ছোটলোকোমি বাপের কালে দেখিনি। তত্ত্ব তা'রা নিলে না গো, এই নাও তোমাদের জিনিসপত্তর।''ঝুড়ি দুইটা দুম্‌দুম্‌ করিয়া দাওয়ার উপর নামাইয়া তাহারা মায়ে-ঝিয়ে বসিয়া পড়িল।

একটা ঝুড়ি ভর্ত্তি বাসি মিষ্টান্ন, অল্পদামী খেলনা, পানের মশলা। আর একটাতে একখানা খয়ের-রঙের শাড়ি, গোলাপী কাপড়ের উপর কালো লেসের ঝালর-লাগানো একটি জ্যাকেট, লাল ডুরে গামছা, কোঁচানো ফরাসডাঙার ধুতি-চাদর, বিলাতী এসেন্স, চুলের তেল, সাবান, ফিতা কাঁটা। লবঙ্গ-কে ঘরের বাহিরে মুখ বাড়াইতে দেখিয়া বুড়ি আর-এক পালা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল "এই নাও গো জিনিস-পত্তর মিলিয়ে নাও। যেমন গেছে তেমনি এসেছে, কিছু তা'রা ছোঁয়নি। হেঁটে-হেঁটে পা দুটো ত খসিয়ে এসেছি; তাও যদি গাল-মন্দ ছাড়া একটা ভালো কথা শু'নে আস্‌তাম। কুটুমের বাড়ি প্রথম তত্ত্ব, কোথায় পেট ভ'রে খাবো, কাপড় টাকা বখ্‌শিশ পাবো, তা না এক-ফোঁটা জলসুদ্ধ মুখে দিতে বললে না গা, এমন চামার কুটুম করেছ।"

"তা আমায় বলছিস কেন লা, আমি কি তোদের পাঠিয়েছিলাম? যার সোহাগের কুটুম, তা'কে শোনাগে যা, জিনিস বুঝিয়ে দি'গে যা," বলিয়া লবঙ্গ দড়াম করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

দুই পক্ষ হইতে গাল-মন্দ খাইয়া বুড়ির মেজাজ ভীষণ রকম চড়িয়া উঠিল। সে চেঁচামেচি করিয়া একটা প্রলয় কাণ্ড করিবার জোগাড় করিতেছে দেখিয়া বৃন্দাবন ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল -" থাম্‌ বাছা থাম্‌, রাগ করিসনে। বৌটা নানা জ্বালা-যন্ত্রণা পেয়ে পেয়ে পাগলের মতন হ'য়ে গেছে, তা'র কথা কি ধরতে আছে? বোস্‌, একটু জিরিয়ে নে, জলটল খা, বুড়ো মানুষ এতটা পথ হেঁটে এসেছিস্‌!"

মিষ্ট কথায় একটুখানি শান্ত হইয়া বুড়ী বাক্যের স্রোত মাঝ-পথে থামাইয়া চুপ করিয়া গেল। তত্ত্বের ঝুড়ি হইতে মিষ্টান্ন তুলিয়া, ভাঁড়ার হইতে মুড়ি বাহির করিয়া আনিয়া বৃন্দাবন তাহাদের তৃপ্তিপূর্বক জলযোগ করাইল। তা'র পর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "তা'রা কি বললে?"

বুড়ী বলিল, "না বললে কি? শাশুড়িটা যেন সাক্ষাৎ রাক্ষুসী গা, আমাকেই যেন তেড়ে খেতে এল। বলে, নিয়ে যা তোর আড়াই আনার তত্ত্ব ,তা না হ'লে ঝাঁটা মেরে বিদায় করব। চার-শ টাকা দিতে এখনও বাকি, তা বেয়াই-বেহায়ার খেয়াল আছে? তা'র এক পয়সা না দিয়ে দুটো কাপড় আর মিষ্টি পাঠিয়েছেন মেয়ে জামাইকে সোহাগ ক'রে! লাথি মারে আমার ছেলে অমন তত্ত্বের মুখে। গিয়ে তা'কে বলগে যা, পূজোর. তত্ত্ব ভালো ক'রে করে যেন, ভালো চায় যদি। তখনো যদি টাকা না পাঠায় ত তা'র মেয়েরই একদিন কি আমারই একদিন।"

বৃন্দাবন শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "কাতুকে দেখিতে দিলে?"

"সেইসময় পুকুর থেকে জল নিয়ে ফিরল তাই দেখতে পেলাম, তা না হ'লে কি আর দেখা করতে দিত? আহা, অমন সোনার পিরতিমে, তা'র যা দশা হয়েছে খুড়ো! তুমি দেখলে চিনবে না; দুখানি হাড়-ছাড়া কিছু আর বাকি নেই, অমন যে দুধে-আলতা গোলা রঙ, তাওযেন কালি হয়ে গেছে।"

বৃন্দাবন বলিল'"কথাবার্তা কইলে কিছু?" শাশুড়িটা একবার ঘরের ভিতর গেল। তখন আমার কাছে এসে ফিস্‌ফিস্‌ করে বল্‌লে "কৈবর্ত্ত দিদি জ্যাঠাকে বলিস পূজোর সময় যেন ভালো ক'রে তত্ত্ব ক'রে আমায় নিয়ে যায়, তা না হলে এরা আমায় মেরে ফেলবে। আমাকে একবেলা মোটে খেতে দেয়, আর সবাই মি'লে বকে, মাঝে-মাঝে মারে।"

বৃন্দাবন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার সদাহাস্য-ক্রীড়াময়ী আদরিণী ভাইঝিটিকে এই ভয়াবহ বর্ণনার মধ্যে সে যেন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। খাইতে দেয় না, গাল দেয়, মারে। কি নিদারুণ যন্ত্রণার ভিতর সে স্বহস্তে তাহার স্নেহের পুত্তলিকে ঠেলিয়া দিয়াছে।

বৃন্দাবনের শীর্ণ বক্ষের পঞ্জর ভেদ করিয়া একটা বিপুল দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল। সে ত রিক্ত, সর্বস্ব হারা, কিসের জোরে তাহার নির্যাতনকারীদের হাত হইতে উদ্ধার করিবে? বাগান, বাড়ি, - সব মহাজনের কাছে বাঁধা পড়িয়াছে, দুদিন পরে তাহাকেই সস্ত্রীক পথে দাঁড়াইতে হইবে। নগদ

টাকা, কাতুর মায়ের গহনা, এমন কি নিজের পরলোকগতা পত্নীর এক-জোড়া সোনার বালা, যাহা সে অনেক কষ্টে এতকাল লবঙ্গের শ্যেন দৃষ্টি হইতে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সমস্তই কাতুর বিরাহে খরচ হইয়া গিয়াছে। নিজেকে বন্ধক রাখিলেও আর তাহার কোথাও এক পয়সা ধার-পাইবার আশা নাই। লবঙ্গের গুটিকয়েক গহনা আছে, কিন্তু তাহা সে চাহিবে কোন্ মুখে? নিজের বিবাহের পর স্ত্রীকে একটা সোনা-রূপার কুচি কখনও হাত তুলিয়া দেয় নাই, আদর-যত্নও যে অত্যধিক করিয়াছে তাহা কোনো শত্রুতেও বলিবে না। এখন কি বলিয়া সে লবঙ্গের বাপের দেওয়া গহনা-ক-খানা দাবি করিবে? আর করিলেই বা কি? লবঙ্গকে কাটিয়া ফেলিলেও যে সে আপনার শেষ সম্বলটুকু ছাড়িতে রাজি হইবে না, তাহা বৃন্দাবনের বেশ ভালো করিয়াই জানা ছিল।

"বসে ভাবলে আর কি হবে? যা হয় একটা বিহিত কোরো, মেয়েটা তা না হলে বাঁচবে না," বলিয়া কৈবর্ত্ত বুড়ি তাহার কন্যা লইয়া বিদায় হইয়া গেল। বৃন্দাবন পাথরের মতন বসিয়াই রহিল। খানিক পরে লবঙ্গ বাহির হইয়া তত্ত্বের জিনিষগুলা বকিতে বকিতে ঘরের মধ্যে লইয়া গেল।

বৃন্দাবন সারাদিন ভুতাবিষ্টের মতন ঘুরিয়া বেড়াইল। টাকার চেষ্টায় বৃথা সকলের দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়া অপমানিত হইয়া আসিল। সন্ধ্যা বেলা ঘরে আসিয়া মাটির উপর বসিয়া পড়িল, সহস্র সাধ্য সাধনা বাক্য-ব্যয় করিয়াও লবঙ্গ তাহাকে কিছু-একটা মুখে দেওয়াইতে পারিল না।

কিন্তু দিন কাটিয়াই চলিল। আষাঢ়ের বিপুল ধারা বর্ষণে জ্যৈষ্ঠের তাপ জুড়াইয়া গেল, আবার দেখিতে দেখিতে মেঘ কাটিয়া গেল, খালে, বিলে, কুমুদ-কহ্লারের আগুন ধরিয়া উঠিল, দূরে মাঠে শরৎলক্ষ্মী কাশখচিত হরিৎ বসনাঞ্চল দুলিয়া-দুলিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু ভগ্ন হৃদয় বৃন্দাবনের জীবনের মেঘ কাটিল না, বৈশাখের কাল ঝড় যেন তাহার বুকে চিরন্তন বাসা বাঁধিয়া বসিল।

পূজার ত আর দেরী নেই। বৃন্দাবন যেন পাগল হইয়া উঠিল। সে যার-তার কাছে গিয়া পায়ে ধরে, যাকে তা'কে মারিতে যায়। লবঙ্গ তাহার রকম-সকম দেখিয়া বলিল "আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও বাপু এখানে থেকে

কি শেষে পাগলের হাতে খুন হয়ে মরব?" বৃন্দাবন কিছু জবাব না দিয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেল। সারাদিন আর তাহার দেখাই পাওয়া গেল না।

তাহার ভাত আগলাইয়া বসিয়া থাকিয়া-থাকিয়া যখন শ্রান্ত লবঙ্গ রান্নাঘরেই আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িয়াছে তখন বৃন্দাবন চুপি চুপি ফিরিয়া আসিল। তাহার পদ-শব্দে জাগিয়া উঠিয়া লবঙ্গ নিদ্রা-জড়িত কণ্ঠে বলিল, "কে গা?"

বৃন্দাবন সাড়া দিয়া বলিল, "আমি । একবার এ-দিকে শুনে যাও। "

লবঙ্গ বিরক্ত হইয়া বলিল, "এখন শুনব কি ঘোড়ার ডিম, গিলবে না, কত-রাত আর বসে থাকব?

"না আমার ক্ষিদে নেই, তুমি শুনেই যাও না।" লবঙ্গ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও উঠিয়া আসিল।

বৃন্দাবন তাহাকে শোবার ঘরে টানিয়া আনিয়া বলিল, "তোমার গোটা দুই-গয়না আমায় ধার দাও। আসচে মাসে আবার গড়িয়ে দেবো।"

রাগে ও বিস্ময়ে লবঙ্গ প্রায় বাক্-রোধ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া সে চেঁচাইয়া উঠিল, "একেবারে সব লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে এসেছ? আমার গয়না চাও তুমি কোন হিসেবে? কখনো কিছু দিয়েছ আমায়? দাসীর মতন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে,এক-বেলা ভিক্ষে ক'রে ,ধার ক'রে খাই আমি, অন্য স্বামী হ'লে এতদিন গলায় দড়ি দিত স্ত্রীর এমন দশা দেখে । আর তুমি বুড়ো ধাড়ী এসে স্বচ্ছন্দে বলছ,'গয়না দাও, আবার গড়িয়ে দেবো। কি দিয়ে গড়াবে শুনি? এই ঘরের ভাঙা বাঁশ গুলো দিয়ে?"

বৃন্দাবন গোঁজ মুখ করিয়া বলিল, "যা দিয়েই গড়াই, দিলে'ই ত হল, তুমি এখন দাও না?"

লবঙ্গ গলার স্বর আরো চড়াইয়া বলিল, "আমাকে খুন করলেও দেবো না। কি করবে তুমি আমার গয়না নিয়ে?"

"কাতুকে আনব, তা'রা বাকি টাকা না দিলে কিছুতেই পাঠাবে না। ওকে তা'রা মারে, খেতে দেয় না, বড় যন্ত্রণায় আছে।"

"আর আমি বড় সুখে আছি না? খেয়ে-খেয়ে ফুলে উঠছি। মরুক গে

তোমার ভাইঝি, হাড়জ্বালানী, সর্বনাশী তা'র জন্যেই না এত দুর্গতি আজ।"

বৃন্দাবন চোখ পাকাইয়া বলিল, "গয়না দাও বলছি, তা না হ'লে ভালো হবে না।"

"মা গো, খুন ক'রে ফেললে গো, তোমরা কে কোথায় আছ, এস গো," বলিয়া লবঙ্গ এমন বিকট আর্তনাদ করিয়া উঠিল যে বৃন্দাবন ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।তাহার দুঃখভার-পীড়িত মস্তিষ্কে যেন আগুন ধরিয়া গিয়াছিল। হিতাহিত কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান একেবারেই লোপ পাইয়াছিল। সমস্ত মন জুড়িয়া বুদ্ধিকে অভিভূত করিয়া কেবল একটা কথাই জাগিয়াছিল, টাকা চাই।

চলিতে-চলিতে সে যে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাও তাহার জ্ঞান ছিল না। হঠাৎ সামনে জলরাশি দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। নিজের অজ্ঞাতে কখন সে গ্রাম ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এই ত তাহাদের গ্রামের সীমান্তপ্রবাহিনী বাঁকা নদী।সে চলিয়াছে কোথায়, কেনই বা?

শুক্লা দশমীর আধো জ্যোৎস্নায় বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল। জনমানব নাই, চারিদিক খাঁ-খাঁ করিতেছে। বৃন্দাবনের কোনো দিকেই খেয়াল ছিল না, কেবল একটা ভাবনাই তাহার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাইতেছিল, 'টাকা চাই।'

হঠাৎ একটা অস্পষ্ট মূর্তি তাহার চোখে পড়িল, আগা গোড়া বস্ত্রাবৃত, নদীর স্বল্প গভীর জল পার হইয়া তাহারই দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। বৃন্দাবনের গা'টা একবার ছম্-ছম্ করিয়া উঠিল, এই বাঁকা নদীর ধারেই যে তাহাদের দুই গ্রামের শ্মশান ! কিন্তু তাহার অভিভূত মন বেশীক্ষণ ভয়কেও আমল দিল না ভূতই যদি হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তাহার আর ভয় কিসের?

মূর্তিটি ততক্ষণ কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। ক্ষীণ আলোকে বৃন্দাবন দেখিল তাহার হাতে ছোটো একটি ক্যাশ বাক্স, চাদরের ভিতর হইতে উঁকি মারিতেছে। মানুষটি এমনভাবে চাদর মুড়ি দিয়াছে যে সে স্ত্রী কি পুরুষ তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

বৃন্দাবন হঠাৎ একলাফে তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়া ক্যাশবাক্সটি

কাড়িয়া লইল। মানুষটি অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া সেইখানেই বালির উপর গড়াইয়া পড়িল। তাহার আচ্ছাদন খুলিয়া গেল।

বৃন্দাবনের তখন সে- দিকে লক্ষ ছিল না, সে আছড়াইয়া ক্যাশবাক্সটা ভাঙিতে ব্যস্ত ছিল। দুইচারবার আছাড় দিতেই তাহার ডালাটা খসিয়া আসিল, গুটি-কয়েক ছোটো ছোটো গহনা বাহির হইয়া পড়িল।

এক-জোড়া সোনার বালার উপর চোখ পড়িতেই বৃন্দাবন সর্পাহতের মতন চমকিয়া উঠিল। তাহার পর বাক্স গহনা সব ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া আসিয়া সেই ভূপতিতা, নারী মূর্তির কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল। জ্যোৎস্না ক্ষীণ আলোয় দেখিল, সে বিস্ফারিত স্থির নেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে, বুকের উপর হাত দিয়া দেখিল সেখানে কোনো স্পন্দন নাই।

এমন-একটা হৃদয়-ভেদী হাহাকার সেই শ্মশানভূমিও কখনও শোনে নাই বোধহয়। "মা গো তুই আমার কাছে আসছিলি, আমিই তোকে যমের মুখে ঠেলে দিলাম।" তা'র পর দুইটি দেহ পাশাপাশি সেই বালির উপর পড়িয়া রহিল, কোণটি জীবিত, কোনটি মৃত কিছুই আর বোঝা গেল না।

ভোর হইতে না হইতে সেই পথে লোক চলাচল সুরু হয়। পথিকের দৃষ্টি ক্রমে তাহাদের উপর পড়িল। তাহার পর গাঁয়ের লোক, পুলিশ, দারোগা, ডাক্তার সবই একে একে উপস্থিত হইল।

ডাক্তার মৃত বালিকার দেহ সংক্ষেপে পরীক্ষা করিয়া রায় দিলেন, হৃদ-যন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছে।

জীবিতটিকে লইয়া যাহাদের কারবার তাহাদের কাজ অত সংক্ষিপ্ত হইল না। হতচেতন বৃন্দাবনকে কোনপ্রকারে সচেতন করিয়া যখন সহস্র প্রশ্নেও তাহার নিকট হইতে কোনো সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেল না, তখন মারের চোটে তাহাকে তাহারা পুনর্বার হতচেতন করিয়া ফেলিল।

একখানি গরুর গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। মৃতা বালিকা এবং তাহার জ্যাঠা পাশাপাশি শুইয়া চলিল।

কাতু পূজার সময় বাপের বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

পরিণীতা

নিখিলবালা সেনগুপ্তা

বেলা তখন প্রায় পাঁচটা, রন্ধনগৃহে বসিয়া মাধুরী-কচুরি ভাজিতেছে। এ বাড়িতে চায়ের কারবার নাই। বাড়ির কারারও যে চায়ে রুচি নাই, এ কথা বলা চলে না। তবে মুখ ফুটিয়া কাহারও সে রুচি ব্যক্ত করিবার সাহস নাই।

মাত্র কয়েকখানা কচুরিভাজা শেষ হইয়াছে, এমন সময় বিমল আসিয়া দরজায় হাতখানা রাখিয়া দাঁড়াইল। মাধুরী মাথার কাপড়টা একটু ঠিক করিয়া লইয়া বলিল, "এসো ভাই, এখানে বসেই খাবে কি? খাওনা, আমি গরম গরম ভেজে দিই।"

বিমল ধীরপদে অগ্রসর হইল, মাধুরী দেবরকে একখানি পিঁড়ি পাতিয়া দিল এবং একখানা রেকাবে গরম গরম কচুরি ভাজিয়া দিতে লাগিল। বিমল ও বিনা বাক্যব্যয়ে আহারে মন দিল।

মাধুরী বলিল, "কি ঠাকুরপো, মুখখানা অমন ভার যে? নতুন বিয়ে করেছ, স্ফূর্তি করবে। দুদিন পরেত বিদেশ চলে যাবে, তখন ও বেচারী কি স্মৃতি নিয়ে থাকবে? একটু হাস্যরস, একটু—"

বাধা দিয়া বিমল বলিল, —"আচ্ছা , যে বৌ-ই তোমরা এনে দিয়েছ! ছোট একটি পুতুল, এদিয়ে আলমারি সাজান চলে, আমার কি হবে? জীবনের বসন্ত সে ব্যর্থই হয়ে যাবে, তার আগমনী গাইবার কেউ নেই।"

"তা তোমাদের এঘরে ঐ ন'বছরের মেয়েটি এসেছে বলেই না ঘরে ঢুকতে পেরেছে। আমার মত ১৫/১৬ বছরের ধাড়ি মেয়ে যদি হত, তবে কি আর তোমরা সহজে ঘরে আনতে? মনে নেই তোমার? তোমার ভাই যখন আমায় বিয়ে করলেন, তখন থেকেই ৪/৫ বছর ত আর ওঁর এ বাড়িতে পা দেবার অধিকার ছিল না। অপরাধ, আমি ম্লেচ্ছ ভাষা ইংরাজি শিক্ষিতা! তারপর আমার সৌভাগ্যেই বল, আর দুর্ভাগ্যেই বল। উনি সেই কঠিন ব্যারামে

পড়লেন, তখন থেকে না আমাদের এ বাড়িতে পা দেবার অধিকার হ'ল। আর তোমাদেরও বালিহারি! যাঁদের বাপ অমন গোঁড়া সেকেলে, তাঁর ছেলেদের আবার এ সাহেবী কেন? তাঁদের আবার ইংরেজি জানা বৌ না হলে বৌ পছন্দ হয় না।"

"তোমার তাতে দুঃখ কি বৌদি তুমি না হয় ৪/৫ বছর বাপের বাড়ি আদরে ছিলে, তারপর এখানে এসেছে, এখানেও ত অনাদর পাচ্ছ না? শিক্ষিতা মেয়ে ছিলে, নিজের গুণে সকলকে আপনার করে নিয়েছো। দাদাও সুখী হয়েছেন। আর আমার কথা ভাবত ঐ ন'বছরের অশিক্ষিতা একটা পুতুল এনে দিয়েছেন, তাকে শেখাবেন সংস্কৃত আর সেকেলে রামায়ণ মহাভারত পড়া!"

"বেশ ত। তুমি বাপের বাড়ি রেখে, স্কুলে দিয়ে একেলে করে গড়ে নাও না?"

"তা হলেই হয়েছে! এ বাড়িতে আর আসতে হবে না— ওকেও না, আমাকে ও নায়। আর ঐ কচি মেয়েকে রাধাকেষ্ট নাম পড়াতে আমি সে বুড়ো হয়ে যাবো।"

" তা ৬/৭ বছর তা তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে: সেটুকু ধৈর্য না ধরলে চলবে কেন?

"আর দুঃখের কথা বৌদি, কাকেই বা বলি, কেই-বা শোনে! সেদিন দেখলুম কমলা গালে হাত দিয়ে আমবাগানে বসে বসে কি ভাবছে, সামনে তার পুতুল ছাড়ানো। মনে করলুম, আমার বুঝি কপাল ফিরল, এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুন— কি কমল, কার কথা ভাবছ? পোড়া কপাল সে বলে কিনা, 'সেই যে সইয়ের ছেলের সঙ্গে আমার একটা পুতুলের বিয়ে দিয়েছিলুম! আমার সব কবিত্বই পণ্ড হয়ে গেল, ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে এলুম।"

মাধুরী একটু চাপা হাসি হাসিয়া বলিল, "আহা বেচারা ত জানে না, কি বললে তুমি খুসি হতে। একটু সবুর কর, ওকে শিখিয়ে নিতে আমার বেশি দিন লাগবে না।"

গহনার রুনু রুনু শব্দে তাহাদের গল্প থামিয়া গেল। তাহারা পেছন ফিরিয়া

দেখিল, কমলা! মাধুরী ডাকিল, 'আয় ভাই কমলি আয়।'

কমলা আসিয়া একখানি পিঁড়ি লইয়া দিদির পার্শে বসিল। মাধুরী আদর করিয়া কমলার মুখখানি একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিল,—"কিরে কমলি, বরের যে তোকে পছন্দ হচ্ছে না; তোর পছন্দ হয় বরকে?

বাধা দিয়া কমলা বলিল,— "যাও দিদি, তুমি ভারি অসভ্য।"

'কেনরে, অসভ্য হলুম কিসে?'

'ঐ যে তুমি বল্লে,'— বর!'

কমলার কথা শুনিয়া মাধুরী ও বিমল উভয়েই হাসিল। কমলাকে ছেলে মানুষ পাইয়া তাহারা কোন কথাই উহাকে গোপন করিয়া বলিত না. নিন্দা. প্রশংসা উভযই তাহার সাক্ষাতেই করিত। কমলাও দিদি অথবা বর, কাহাকেও লজ্জা করিত না। বিপদে পড়িত বিমল। গুরুজনের কাছে কমলা সম্মুখে পরিলে, সে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিত।

২

শ্রীকান্ত রায় এককালে সরকারী কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। বর্তমানে তিনি সরকার হইতে পেনসন পাইয়া থাকেন। তাঁহার নিবাস নাকি কোন পল্লীগ্রামে ছিল। সেই পিতৃপিতামহের বসতবাটি এখন নদীগর্ভে লীন, সুতরাং তিনি সপরিবারে ঢাকাতেই বাস করেন, তাঁহার তিনটি কন্যা—সকলেই বিবাহিতা। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নির্মলচন্দ্র রায় কলিকাতার একজন বড় ডাক্তার। মাধুরী নির্মলের পত্নী। বিমলচন্দ্র রায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এবার সে বি.এ পাশ করিয়া কলিকাতায় দাদার দাদার বাসায় থাকিয়া এম.এ পড়িতেছে, শ্রীকান্ত রায় চাকুরী করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন. তাই পাঁচ জনে তাঁহাকে একটু ভয় ও শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখে। তিনি মনে করিতেন বর্তমানের ইংরাজি শিক্ষিতা মেয়েরাই যত অনর্থের মূল। তাহারাই সেকালের সুখের যৌথ পরিবারের প্রাচীর চূর্ণ করিয়া দিয়া, ভাই-ভাই ঠাই ঠাই করিয়াছে; স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার দাবি করিয়া সংসারের সুখের নীড় ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। সুতরাং বালিকাদিগকে যথার্থ সুশিক্ষায় শিক্ষিতা করিবার জন্য তিনি উচ্চ ইংরাজি

বালিকা বিদ্যালয়ের পার্শ্বে মহাকালী পাঠশালা স্থাপিত করিয়া ছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, বালিকাদিগকে খনা লীলাবতী, গার্গী অথবা এমনই একজন তৈয়ার করিবেন।

বলা বাহুল্য, মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীগণ তথাকার বিদ্যা শেষ করিয়া পার্শ্বস্থিত উচ্চ ইংরাজি বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে কিছু মাত্র কুণ্ঠা বোধ করিত না। তখন সেই উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের বালিকারাও তাহাদিসকে একটু টিটকারি দিতে ছাড়িত না,— 'কিরে খনা, লীলাবতীরা, এখানে এলি যে মেমসাহেব হতে?'

শ্রীকান্ত বাবু তাঁহার বাড়ীর মেয়েদিগকে ইংরাজি বিদ্যালয়ে দেন নাই। বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তিনি তাহাদিগকে বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কবল হইতে উদ্ধার পাইয়া তাঁহার শিক্ষিতা কন্যারা যে তাঁহার দেওয়া শিক্ষার কোন মর্যাদাই রক্ষা করিত না, তাহা তিনি জানিতেন।

ভুলও করিয়াছিলেন তিনি মস্ত। মেয়েদের তপস্বিনী করিয়া তিনি তাপস কুমার জামাতার সন্ধান করেন নাই। সেখানে তিনি সংস্কৃত পড়া পণ্ডিত অপেক্ষা ইংরাজি শিক্ষিত অধ্যাপককেই আমল দিতেন বেশী। নিজের পুত্রদিগকেও তিনি ইংরাজি শিক্ষায় চরম স্থানে পৌঁছিতে বাধা না দিয়া বরং উৎসাহিতই করিতেন। কিন্তু বধূ ঘরে আনিতে গিয়া ইংরাজি শিক্ষিত অস্পৃশ্যবৎ বর্জন করিতেন।

যখন বিমল পাশ-কার একটি মেয়ের মত সঙ্গিনী চিত্র মনে মনে আঁকিতেছিল, এমনি সময়ে পিতা তাহার গলায় গাঁথিয়া দিলেন কমলার মত একটি ক্ষুদ্র অশিক্ষিতা বালিকাকে। বিমলের বধূ পছন্দ হইল না; কিন্তু পিতা যাহা করিতেন তাহার বিরুদ্ধে কথা বলিবার ক্ষমতা বাড়িতে কাহারও ছিল না— মাতারও না। কাজেই বিমলের অন্তরের ক্ষোভ অন্তরে রহিয়া গেল।

শ্রীকান্ত রায় নিজের বাড়ির মেয়েদিগকে মনের মত করিয়া গড়িয়া পরের ঘরে দিতে বাধ্য হইতেন। সেখানে তাহারা তাঁহার দেওয়া শিক্ষা-দীক্ষা জাহ্নবীর জলে বিসর্জন দিয়া পরের মনের মতই গড়িয়া উঠিত। আবার পরের ঘর হইতে যে সকল কন্যা তিনি নিজের ঘরে আনিতেন, তাহারও পরের দেওয়া

শিক্ষার গণ্ডী এড়াইতে পারিত না। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিবার জন্যই বুঝি এবার নবমবর্ষীয়া বালিকা-বধূ গৃহে আনিয়াছেন। তিনি একবার ভাবিয়াও দেখেন নাই যে, যাহাকে এই বালিকার সমস্ত জীবনের সঙ্গী হইতে হইবে, এ বিবাহে তাহার একটা মতামতের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, আর ভাবিবেনই বা কেন? হিন্দু বিবাহ— এখানে বর অথবা কন্যার রুচি-অরুচির প্রশ্ন লইয়া কেই বা কবে মাথা ঘামাইয়াছেন?

৩

দুই বৎসর হইল বিমল কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে। সেই অবধি কমলা তাহার পিত্রালয়েই বাস করিতেছে। তাহার বয়স অল্প, সুতরাং আরও দুই এক বৎসর পিতৃগৃহে বধূকে রাখিতে শ্বশুরের আপত্তি ছিল না।

কমলার পিতার কর্ম্মস্থানে উচ্চ ইংরাজি বালিকা বিদ্যালয় ছিল। কমলা মাতার সঙ্গে ঐ বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী সভায় উপস্থিত থাকিয়া বালিকাগণের পুরস্কার উৎসাহের সঙ্গে দেখিত। অবশেষে সে একদিন বায়না ধরিল, সেও পড়িবে। পিতা ভাবিলেন, বিদ্যালয় তাঁহার বাড়ির অতি নিকটে, এ অবস্থায় গেলই বা কমলা। সেখানেত আর কোন ব্যাটাছেলে নাই; শিক্ষার ভার ত সব মেয়েদেরই হাতে। তারপর, কাহার কপালে কি আছে কে জানে। অন্তত ম্যাট্রিকটা যদি সে পাশ করিতে পারে, তবে ত আর তাহাকে অন্ন-বস্ত্রের জন্য পরের গলগ্রহ হইতে হইবে না।

কমলাকে তিনি স্কুলে দিলেন। এক বৎসর সে স্কুলে পড়িয়া ক্লাশে প্রথম হইয়া প্রমোশন পাইয়াছে। আনন্দ তাহার ধরে না। ইতিমধ্যে কি জানি কেমন করিয়া বধূর এই অনধিকার চর্চার খবরটি শ্রীকান্ত রায় মহাশয়ের কানে পৌছিয়াছে। বৈবাহিকের এইরূপ স্পর্দ্ধা দেখিয়া তিনি ত চটিয়াই লাল।

বিলাতী শিক্ষায় শিক্ষিতা পুত্র বধূকে তিনি আর গৃহে অনিবেন না, পুত্রকে আবার বিবাহ করাইবেন ইত্যাদি রূপে শাসাইয়া তিনি কমলার পিতাকে পত্র দিলেন। কমলার পিতা ভাবিয়াই পাইলেন না যে, মেয়েকে স্কুলে দিয়া তিনি কি এমন অপরাধ করিয়াছেন। অভিমানে তাঁহার হৃদয় ভাঙিয়া গেল। তাঁহার

কন্যা কি এতই একটা তুচ্ছ জিনিষ যে, পান হইতে চুন খসিলেই বৈবাহিক পুত্রকে পুনহায় বিবাহ করাইবেন। তিনি বৈবাহিকের পত্রের কোন উত্তর দিলেন না।

বিমল প্রথম শ্রেণীতে এম.এ পাশ করিয়াছে, কমলার পিতা তাহা শুনিলেন এবং জামাতেকে একবার শ্বশুর-গৃহে যাইতে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিলেন।

উত্তরে বিমল অন্যান্য কথার সঙ্গে লিখিল,—'পুতুল খেলার বয়সও আমার অনেক দিনই চলে গিয়েছে সুতরাং ওখানে গিয়ে আর কি কর্ব?

জামাতার পত্রের শ্লেষটুকু বুঝিতে শ্বশুরের বিলম্ব হইল না। তিনি একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কন্যাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন, যেন বিমলের কৃত অবজ্ঞার দানটুকু তাহার নিবিড় স্নেহের ধারায় ধুইয়া দিবেন। বালিকা কন্যার শিশু হৃদয়ে এই সকল স্নেহ বা তাচ্ছিল্য কোন রেখাই পাত করিতে পারিল না। বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগলি; কমলা পিতৃগৃহেই রহিয়া গেল। শ্বশুর বাড়ীর কেহই তাহার কোন খোঁজ করিল না কমলার পিতাও স্থির করিলেন, তাঁহার কন্যাকে তিনি চিরকুমারী করিয়াই রাখিবেন।

৪

কয়েক বৎসর যাবৎ বিমল কলিকাতায় স্কটিশচার্চ কলেজে গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপকের কাজ করিতেছে। বিবাহের পর হইতে তার প্রাণে আর শান্তি নাই। বিবাহের পূর্বে বরং সে ছিল ভাল— মুক্ত বিহঙ্গের মত। তারপর একটি অবোধ বালিকার সঙ্গে পিতা তাহার এ সম্বন্ধটা কেনই বা স্থাপিত করিলেন। সেই শিশুর সঙ্গে তাহার কদিনেরই বা সম্বন্ধ। এখন সে যে বিবাহিত নহে, একথাও সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না; আবার সে বিবাহ করিয়াছে এ কথাটাও বলিতে তাহার প্রাণ চায় না। কমলা এখনও না জানি কত বড়ই হইয়েছে হয়ত এই মালতীর মতই হইয়া থাকেবে। কিন্তু হায় রে কোথায় মালতী আর কোথায় সেই গ্রাম্য অশিক্ষিত কমলা! হায় কাহার সঙ্গে সে তাহার তুলনা করিতে বসিয়াছে।

নিজের ঘরে একখানি চেয়ারে বসিয়া বিমল যখন এই সকল চিন্তায় মগ্ন, তখন গৃহে প্রবেশ করিল মাধুরী। বিমল হঠাৎ একটু চমকাইয়া সপ্রতিভভাবে বলিয়া উঠিল,— এই যে বৌদি এসেছ, তোমার কথা ভাবছিলুম! বসো।

মাধুরী বসিল।

বিমল জিজ্ঞাসা করিল। "বাবাকে বলেছিলে, বৌদি?"

"কি কথা, মালতীকে বিয়ে করতে যে তুমি ক্ষেপে উঠেছ, সেই কথা? —হ্যাঁ, বলেছিলুম।"

বিমল সোৎসুক নয়নে তাহার পানে তাকাইয়া বলিল—

—"তিনি কি বল্লেন?"

"তাঁকে বোঝাতেই পারলুম না যে, মালতীরা খৃস্টান নয়। তিনি বলেন, 'যদি ওরা হিন্দুই হবে, তবে স্কটিশ চার্চে গিয়ে ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে বি-এ পড়তে যাবে কেন? বিমলের এসব কথাও বিশ্বাস করতে বল? বৌমা, ছেলেটা কি শেষে খৃস্টান হয়ে যাবে?' আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি কি প্রশান্তবাবুকে একথা বলেছ কি যে, তুমি বিবাহিত হয়েও মালতীকে বিয়ে করতে চাচ্ছ?"

বিমলের মুখখানা হঠাৎ ম্লান হইয়া গেল। সে যে বিবাহিত, তাহার নিকট মালতীর মাতুল প্রশান্ত বাবু অথবা মালতীর পিতা কন্যা দান করিতে স্বীকার কেন করিবেন? তবে কি সে বিবাহের কথাটা গোপন করিয়া যাইবে? আর তাহার পিতার কথা? না হয়, সে পিতার অমতেই বিবাহ করিবে।

বিমলের চিন্তা স্রোতের বাধা দিয়া মাধুরী বলিল,—'ঠাকুর পো, একটা কথা বলব?'

'কি বলবে বলে।'

'কমলাকে তোমরা কি অপরাধে ত্যাগ করলে? তাকে আনলে হয় না? তোমার অনেকখানি আকাশ কুসুম ভেঙ্গে দিচ্ছি বোধ হয়। কিন্তু সে বেচারীও ত তুই এক বৎসর স্কুলে পড়েছিল। আর এই অপরাধেই না তোমরা তাকে ত্যাগ করলে? আবার সেই পড়োই আর একজনকে বরণ করে ঘরে আনবার সঙ্কল্প কর্ছ! অন্যায় করা হবে না তার প্রতি?

"অপরাধটা ত আমার কাছে নয় বৌদি! সে যদি ঐ মালতীর মতই হতো, তবে কি তারই মত আমার সুপ্ত আশা আকাঙ্খা জাগিয়ে তুলতে পারত না? ভেবে দেখতে, দুজনের শিক্ষা-দীক্ষা দুরকম হলে ভাব গাঢ় হতে পারে কি?"

মাধুরী কথা কহিল না। তাহার স্নেহ কোমল হৃদয় কমলার ব্যথায় হাহাকার করিতেছিল।

মালতী প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাগনী। তাঁহারই কলিকাতাস্থিত বাসভবনে থাকিয়া কলেজে পড়ে, আবার ছুটি হইলে পিতার নিকট চলিয়া যায়। প্রশান্তবাবুর পরিবারবর্গ আধুনিক ধরণের সুতরাং মালতী স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়িবে, এ বিষয়ে বাড়িতে কাহার ও কোন আপত্তি ছিল না, বিশেষত প্রশান্তবাবু ও যখন ঐ কলেজের একজন অধ্যাপক। প্রশান্তবাবু পড়াইতেন দর্শন শাস্ত্র। গণিতের অধ্যাপক বিমলের, তাহার বন্ধু প্রশান্তের বাড়ি যাতায়াত ছিল। আর মালতী যখন তাহার ছাত্রী, তখন তাহাকে অঙ্কটা মাঝে মাঝে বুঝাইয়া দিতেই বা বিমলের বাধা কি? কিন্তু মালতীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মেধাশক্তি ও চালচলনে যে বিমল ক্রমেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিলন, তাহা বুঝি মালতীর চক্ষু এড়াইল না। সুতরাং সে তাহার পড়ার ঘরে বিমলের নিকট পড়িতে আপত্তি করিত, বলিত কলেজেই সে বুঝিয়াছে। বাসায় কোচিং এর আর তাহার প্রয়োজন নাই। কিন্তু মামা যে কেন তাহার এ আপত্তিতে কোন আমলই দিতেন না, তাহা সে বুঝিতে পারিত না।

সে দিন বিমল মনে মনে স্থির করিল আজ প্রশান্তের কাছে যেমন করিয়াই হউক বিবাহের কথাটা উত্থাপন করিতে হইবে। আর গ্রীষ্মের বন্ধও ত আসিল, মালতীও তখন পিতার নিকট চলিয়া যাইবে। এবার নাকি তাহারা আম খাইতে দেশে যাইবে। নিজের বিবাহের কথাটা কি সে গোপন করিয়া যাইবে?— করিলই বা। কমলার খবর ত সে ৮/৯ বৎসর পায় না; সে ইহজগতে আছে কি না তাহাই বা কে জানে? সে যদি থাকিতই তবে তাহার পিতা কি একবারও জামাতার সংবাদ লইতেন না?

কলেজ হইতে ফিরিবার পথে বিমল প্রশান্তকে জিজ্ঞাসা করিল—'মালতী ত পড়াশুনা বেশ ভালই করছে, তাকে আর কতদূর পড়াবে?'

'যতদূর সে পড়তে চায়।'

পরীক্ষার ত আর দেরী নেই, এর পর কী ইউনিভারসিটিতে পড়তে দেবে?'

'ক্ষতি কি?'

বিমল দেখিল, সে কথাটা সে পাড়িতে চায়, প্রশান্ত তাহার ধার দিয়াও যায় না। অগত্যা সে নিজেই বলিল,— 'হিন্দুর মেয়ে বিয়ে দেবে না?'

'মেয়ে যেমন বিদূষী হয়ে উঠেছে, তার উপযুক্ত পাত্র পাচ্ছি কোথায়?'

'কেন, বাংলায় কি পাত্রের এতই অভাব?'

'পেতুম যদি তোমার মত একটা জ্ঞানী, গুণী পাত্র, তবে কি আর মালতীর বিয়ে আজও বাকী থাকত?

প্রশান্ত বিমলের মুখের পানে তাকাইয়া দেখিল, তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ্যে বলিল,—

'বিমল তুমি বিয়ে করনি?

সেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়। বিমলের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল, সে কোন উত্তর দিল না। প্রশান্তবাবু ও আর এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলেন না। মালতীর বি এ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে; সে দেশে চলিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কথাটা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অনেকে বিমল ও মালতী সম্বন্ধে কানাকানি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

বিমলের পিতা দেখিলেন, কাজটা তিনি ভাল করেন নাই। যদি পুত্রের বাসানানুরূপ একটি বধূ ঘরে আনিতেন, তবে আর এমন হইত না, হইতই বা বধূ ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিতা। মাধুরী ত ম্যাট্রিক পাশ মেয়ে। সে ত তাহার সেবা যত্নের এতটুকু ত্রুটি করে না, তাহার কার্য্যাকলাপে ত তিনি একটুকু খুঁত খুঁজিয়া পান না। তবে তাঁহার এ গোঁড়ামি কেন? সংসারে এ অশান্তির সৃষ্টি তিনি কেন করিলেন? কালের প্রবল স্রোতের বিপরীত দিকে তিনি চলিত

চাহিয়াছিলেন; কৃতকার্যতা লাভ ত তাঁহার কোন দিনই হয় নাই। তবে বৃথা এ প্রচেষ্টা কেন?

এবার তিনি বধূকে গৃহে আনিবেন, স্থির করিলেন! তাহাকে একেবারে ত্যাগ করিবেন, এ কল্পনা তাঁহার কোন কালেই ছিল না। তিনি মনে করিয়াছিলেন বৈবাহিক তৎকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু সেই তরফ হইতে যখন এইরূপ কোন প্রার্থনা আসিল না, তখন তিনি যে বধূকে আর আনিবেন না বলিয়াছিলেন, তাহাকে আবার আনিবার প্রস্তাব কেমন করিয়া করিবেন? প্রস্তাবটা কি অপর পক্ষ হইতেই হওয়া বেশী বাঞ্ছনীয় ছিল না? কিন্তু তাহা যখন হইল না, তখন ত আর বিলম্ব করিবার সময় নাই। সুতরাং বৈবাহিকের নিকট ক্রটি স্বীকার করিয়া তিনিই অনেক কাল পর তাঁহাকে পত্র দিলেন এবং বধূকে সাদরে গৃহে আনিবার সঙ্কল্প ও জানাইলেন।

আজ বিমলের কর্মস্থলে, কমলা আসিবে, শ্রীকান্তরায় বহুপূর্বেই কলিকাতাবাসী হইয়াছিলেন। মাধুরীর আজ আনন্দ ধরে না।

কিন্তু বিমল?— আজ তাহার অন্তরে যে তুফান উঠিয়াছে, তাহা কবে, কেমন করিয়া থামিবে, কে জানে? প্রশান্তকে সে সে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবে? আর মালতী! সেকি তাহার মনের ভাব টের পাইয়াছে? প্রশান্ত যদি তাঁহাকে আভাস দিয়া থাকে! মালতী তবে তাহাকে কি মনে করিবে?—মনে করিবে না কি সে প্রতারক! উঃ তাহার মাথা যেন ঘুরিতেছে।

এমন সময় বাহির হইতে প্রশান্তবাবু ডাকিলেন—"বিমল"—বিমলের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! ধীরপদক্ষেপে সে বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিতে চলিল। তাহাকে দেখিয়া প্রশান্ত বাবু গম্ভীর সুরে বলিলেন,—"কি হে, আজ নাকি তোমার পত্নী আসছেন? এ কথাটা কি তোমার এতদিন বলা উচিত ছিল না? আগে জানালে কি আর তোমায় মালতীর সঙ্গে মিশতে দিতুম? জীবনটা এমন হেলায় নষ্ট করতে তোমার বিবেকে একটুকু ও বাধল না?"

অবনত মস্তকে বিমলের নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া প্রশান্তবাবু চলিয়া গেলেন। মনে মনে বলিলেন— কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!

তিরস্কৃত হইয়া বিমল যন্ত্রচালিতের মত আসিয়া নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল। অন্তরে কে যেন তাহার দাবানল জ্বালাইয়া দিয়াছে। তবে কি মালতীও তাহাকে ভালবাসিত? যদি না বাসিবে, তবে ইদানিং সে বিমলের সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিত না কেন?

মাধুরী দরজায় আসিয়া ডাকিল,—"ঠাকুরপো, উঠে দেখ, কমলা এসেছে।"

বিমলের চিন্তা সূত্র ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল, সে বিছানায় উঠিয়া বসিল। কমলার মুখখানা অবগুণ্ঠনে সম্পূর্ণ আবৃত নহে। মালতী যেমন করিয়া ঈষৎ অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া কলেজে যাইত। কমলাও ঠিক তেমনি করিয়াই আসিয়াছে, এ কে?— বিমল কি স্বপ্ন দেখিতেছে? বেচারা আবার চক্ষু মুছিয়া কমলার দিকে ভাল করিয়া তাকাইল। মাধুরী কমলাকে রাখিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

বিমল অবাক বিস্ময়ে কমলার পানে চাহিয়া বলিল,

"মালতী, তুমি—তুমি-?"

নত মস্তকে, একটু সলজ্জহাসি হাসিয়া; কমলা বলিল,—আমি মালতী নই, মিষ্টার রায়, আমি কমলা, বাবা ইউনিভার্সিটিতে আমার নাম বদলে দিয়েছিলেন মাত্র।"

"ও, বুঝেছি, তবে প্রশান্ত সব জানত। আর তুমি—?

"আগে জানতুম না, পরে শুনেছিলুম।"

বাহির হইতে প্রশান্ত বাবু ডাকিলেন,—"বিমল-"

বিমল প্রসন্ন মুখে, ত্বরিত পদে বাহিরে গেল। প্রশান্তবাবু বলিলেন— 'কি হে, বৌ পেয়ে ত মশগুল। এই নাও, মালতী তোমার বৌয়ের জন্য প্রেজেন্ট পাঠিয়েছে।"

বিমল দেখিল, তাহাদেরই বিবাহকালীন আলোকচিত্র!

রিক্তা

পূর্ণশশী দেবী

কাল তোমাদের স্কুলে খুব ধূম— না ঠাকুরঝি?

বেলার বাসন্তী রঙের ছোপানো শাড়িখানা কুঁচিয়ে দিতে দিতে উমা জিজ্ঞাসা করলে। কিশোরী বেলা তক্তপোষে বসে' নিবিষ্ট মনে সরস্বতীর বন্দনা মুখস্থ করছিল, কালকের সভায় শোনাতে হবে বলে। উমার প্রশ্নে কাগজ থেকে চোখ তুলে সে একগাল হেসে আনন্দে বলে' উঠল - ও, তা আর বলতে। শুধু পুজোই তো নয়, আরও কত রকমের আয়োজন করা হয়েছে- প্রবন্ধ, কবিতা -পাঠ, গান, বাজনা, অভিনয় ... ভারী আমোদ হবে বৌদি! সত্যি তুমি যদি দেখতে ...

- কি করে আর দেখি ভাই, আমি তো তোমাদের স্কুলে পড়ি না যে ...

- বা রে, তা' কেন? কত মেয়ের মা বোন বৌদি'রা সব আসবে। কি করি, মা যে বেরোতেই চান না, নইলে না নিয়ে গিয়ে ছাড়তুম না কি? অন্ততপক্ষে তোমাকে ...

উমার অধরপুটে চকিতে ফুটে উঠল, একটু মৃদু করুণ হাসি — পাগল!...

সমারোহে সে যোগ দিতে পারে কেমন করে - ভগবান যাকে বঞ্চিত করেছেন সকল দিক থেকে। ... কিন্তু এ তো শুধু উৎসব নয়, - এযে পূজা, দেবী বীণাপাণির আরাধনা—যাঁর আশীর্বাদ এই নশ্বর মরজগতের মানবকে অমর করে' রাখে যুগে যুগে। মহিমা যাঁর রিক্ত নিঃস্বকে পূর্ণতা দান করে মহিমান্বিত করে তোলে, যাঁর প্রসন্নতা দুঃখীর দুঃখকে, ব্যথিতের বেদনাকে সহনীয় করে তুলতে পারে, সেই মহিমাময়ীর পূজার অধিকারে বঞ্চিত থাকে সে কোন্ অপরাধে? ...

উমার আনত মৌন মুখের পানে তাকিয়ে, তার মনের ভাব উপলব্ধি করে' বেলা আস্তে আস্তে বললে— তা' হ'লে মাকে একবার বলি বৌদি?

— কি?

— এই কালকের সভায় যাবার জন্যে। তিনি না যান, তোমাকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দেবেন।

— না ভাই, মিছে কেন... কি হবে?

উমার কালো চোখদুটিতে পলকে জেগে উঠল ব্যথার আভাস, সেটুকু গোপন করতেই সে যেন কোঁচানো কাপড়খানায় পাক দিতে লাগল হেঁট হ'য়ে।

কি হবে? — এই প্রশ্ন যেন তার বিড়ম্বিত জীবনটাকে একান্ত অনাবশ্যক, দুর্বিষহ ক'রে তুলেছে। সকল কথায়, সকল কাজে — কি হবে?

শাশুড়ি যেদিন মমতাপরবশ হয়ে তার জটপাকানো চুলগুলো আঁচড়ে দেন, বা ময়লা কাপড়খানা ছেড়ে ফেলতে বলেন, কি ভাতের পাতে এক হাতা দুধ দিয়ে যান, তখন উমার নিজের মনে স্বতঃই উদয় হয় এই কথাটি — কি হবে? কিন্তু এদিক থেকে ও প্রশ্ন ওঠবার যথার্থ কোন হেতু আছে কি? সব হারানো জীবনে তার বাস্তবিক কিছুই হ'বার সম্ভাবনা নেই কি আর?

একে পল্লীগ্রামের মেয়ে তায় মামার বাড়ি মানুষ । শিক্ষার সুযোগ উমা সেখানে পায়নি। মামাতো ভাইটির কাছে কোনমতে দ্বিতীয় ভাগ শেষ করেই সে চলে এলো শ্বশুর-ঘর করতে।

বিদ্বান স্বামীর সহধর্মিণী হবার যোগ্যতা তার ছিল না।

অনিল প্রথম যেদিন তার এক শিক্ষিতা বন্ধু-পত্নীর লেখা একখানি চিঠি উমাকে পড়তে দিয়ে বললে — দেখো দেখি, কি সুন্দর চিঠি! পড়তেও মনে আনন্দ আসে। গুছিয়ে একখানা চিঠি লিখতে পারতে, তুমি যদি এরকম লেখাপড়াও শিখতে।

নিজের অপারগতার লজ্জায় উমা যেন মরমে মরে' গেল। সত্যই তো! এ চিঠির তুলনায় — তার কাঁচা হাতের আঁকাবাঁকা লেখা, বানানে যার দশটা ভুল... ছি!

আরক্ত মুখখানি নামিয়ে নিয়ে ব্যথাক্ষুব্ধস্বরে সে বলেছিল — কেউ

শেখায়নি যে।

— আচ্ছা আমি তোমায় শেখাব।

শুধু মুখের কথাই নয়. অনিল তার বালিকা বধূর শিক্ষকতায় লেগে গেল পরম উৎসাহে।

বাল্মীকি যেমন 'মরা' 'মরা' বল্‌তে বল্‌তে 'রাম ' নাম উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন, তেমনই প্রথমটা শুধু স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য লেখাপড়া করতে গিয়ে শেষে উমার অন্তর থেকেও একটা প্রেরণা এসেছিল।

মাসিক—পত্রিকায় মেয়েদের লেখা পড়তে পড়তে তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতো পরম বিস্ময়ে! এরকম লিখতে সে কি পারবে কোনদিন!

সে কথা শুন্‌লে অনিল তা'কে আদর করে হেসে বলত — কেন পারবে না? খুব পারবে। আমার উমারাণীর লেখা একদিন কাগজে কাগজে বেরুবে— দেখো তখন।

স্বামীর সেই আশ্বাস, ভবিষ্যদ্বাণী মনের কোণে গোপন রেখে উমা গৃহকর্মের অবসরে এতটুকু বিশ্রাম না নিয়ে লেখা-পড়া করতে লাগল, বিপুল আগ্রহে ও উৎসাহের সঙ্গে। কিন্তু সে ক'দিনই বা? উমার বিয়োগান্ত জীবননাট্যে সুখের অঙ্কে যবনিকা পড়ে গেল- এত দ্রুত, এমন সহসা যে, মনের আশা মনেই রয়ে গেল তার ।

এমন অসমাপ্ততা দিয়ে সে কি করবে- আর কিসের জন্যেই বা করবে? .. কোন দরকার নেই তো!

তবু যে জিনিসের আস্বাদ সে পেয়েছে, তা' ভুলে যাওয়া অসম্ভব। তাই ননদ বেলা যখন সকাল সকাল নাকে-মুখে ভাত গুঁজে বই-টই নিয়ে তাড়াতাড়ি স্কুলের বাসে গিয়ে ওঠে, উমা তখন হাতের কাজ ফেলে রেখে জানলায় ছুটে আসে শুধু একবারটি দেখতে ।

তখন ওর চোখে সেই দৃষ্টি দেখা যায় — পথের কাঙাল ধনীর উচ্চ সৌধশিখর পানে তাকিয়ে থাকে যে দৃষ্টিতে।

বৈকালে ফিরে এসে বেলা জলখাবার খেতে খেতেই গল্প আরম্ভ করে

দেয়- ওদের স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদের গল্প। উমা অবাক হয়ে তা' শোনে।

আবার সন্ধ্যার পর বেলা যখন তার বই , খাতা-পত্র সব ছড়িয়ে স্কুলের পড়া করতে বসে, তখন উমা কোন এক ছুতায় এসে তার পাশটিতে বসে চুপ করে দেখে।

বেলা বয়সে উমার চেয়ে ছোট হলেও লেখাপড়ায় অনেক এগিয়ে গেছে। ওর শিক্ষার ত বাধা নেই, বরং শিক্ষিতা হলে বর পাওয়া সহজ,কাজেই...

কিন্তু উমার পক্ষে ....

অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে সে একদিন বেলাকে বললে- আমাকে তুমি একটু করে পড়াবে ঠাকুরঝি? যেটা বুঝতে না পারব-

— বেশ ত, পড়ো না। বেলা খুশি হয়েই বললে।

কিন্তু কথাটা বেলার মার কানে যেতেই, তিনি ভ্রূকুটি করে এমন ভাবে বললেন — কি হবে? বেচারী উমার আর সাহস হ'ল না, প্রবৃত্তি হ'ল না পড়তে।

দেবর সুনীল একবার একখানা কবিতার বই এনে দিয়েছিল ওকে পড়তে। কোনো মহিলা কবির লেখা। উমা কবিতাগুলির খুব প্রশংসা করছে দেখে সুনীল বললে- ইনি একজন বাল-বিধবা, জানো বৌদি।'খুব অল্প বয়সে -এই তোমারই মত আর কি। তবু কেমন সুন্দর লিখেছেন দেখো।

তাই ত।

উমার মর্ম মথিত করে একটা আকুল নিঃশ্বাস ঝরে পড়ল।

মর্ম্মাহত প্রাণের অব্যক্ত গোপনতম অনুভূতি মনের গহন-তলে গুমরে-মরা অসহায় ব্যথা ব্যাকুলতার উচ্ছ্বাস যিনি এমন মধুরভাবে সুষ্ঠু ভঙ্গিতে ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন, জীবনে তার নিরবিচ্ছিন্ন দুঃখের শেষ হয়নি নিশ্চয়!

আর যাই হোক, ব্যথার পথে তার একটা লক্ষ্য আছে, বৈচিত্র্য আছে এবং একটু সার্থকতাও আছে বোধ হয়। আর সে?...

এরপর দুদিন রাত জেগে কবিতা লেখার চেষ্টা করে মাথা ঘামিয়ে হয়নি কিছুতেই। ছত্র মেলে না, অক্ষর কম বেশী হয়ে যায়। যদিই বা মেলে তো

ভাষা মনের মত হয় না, খট্ মট্ লাগে নিজের কানেই। একটা কবিতা যদি বা শেষপর্যন্ত একরকম দাঁড়াল,তা আর একবার নিখুঁতভাবে দেখতে গিয়ে মনে হ'ল — অদ্ভুত! এ কবিতা হয়েছে, না ছাই! ভাগ্যে কেউ দেখেনি, দেখলে...

কাগজখানা কুচিকুচি করে' ছিঁড়ে উমা শুয়ে পড়ল। তখন বুক ভেঙে তার কান্না আসছিল যেন। গভীর রাতের নীরবতার মধ্যে বিনিদ্র হয়ে উমা কতদিন ভাবে, সেকালের মহাকবি কালিদাসের মত সেও যদি একবার মুহূর্তের জন্য মা সরস্বতীর দেখা পায়, তা' হ'লে তখুনি তার রাঙা চরণদ'ুটি জড়িয়ে ধরে' একবার বর চেয়ে নেয়, যেন সে ওইরকম সুন্দর বই লিখতে পারে।

শ্রীপঞ্চমীর দিন সকালেই সভায় যাওয়ার উল্লাসে প্রায় নাচতে নাচতে, বাসন্তী ফিতার ফাঁস-বাঁধা বেণীটি দুলিয়ে, বাসন্তী শাড়ীর রঙিন আঁচল বাতাসে উড়িয়ে বেলা যখন একটা আনন্দের হিল্লোলের মত হাসতে হাসতে গিয়ে গাড়িতে উঠল, তখন বেচারী উমা জানলার কবাট ধরে' কতক্ষণ নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রইল সেইদিকে।...

কী পার্থক্য দুজনে! অথচ বয়সে কতই বা তফাৎ? বড় জোর বছর দুই কি তিন। কিন্তু উমার যে সব শেষ হয়ে গেছে। অভাগী সে, একথাটা ভুলে যায় সে কেন, কেন যে তার মনে থাকে না ...।

বাড়ীর ছেলেমেয়েরা সব আমোদ করে' দেবী সরস্বতীর চরণে অঞ্জলি দান করলে। উমাকে কেউ ডাকলে না, জিজ্ঞাসাও করলে না একবার।

স্কুল থেকে ফিরেই বেলা উচ্ছ্বসিত আনন্দে পঞ্চমুখ হ'য়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে বলতে আরম্ভ করলে- আজ সভায় কি কি হয়েছে — কোন মেয়েটির প্রবন্ধ হয়েছে সবচেয়ে ভাল, কোন মেধাবিনী ছাত্রী সব চেয়ে ভলে সরস্বতীর বন্দনাগীতি শুনিয়ে সকলকে মোহিত করেছে, কার অভিনয় সবচেয়ে ভাল হয়েছে, কার হয়নি, কে কি পেয়েছে... ইত্যাদি...

সে সব বিচিত্র কাহিনী উমার ভাবপ্রবণ মুগ্ধ তরুণ মনকে এমন স্বপ্নাচ্ছন্ন করে' তুললে যে, বেচারী তার নিত্যকার কাজে পদে পদে ভুল করে' ফেলতে লাগল,- শাশুড়ির কাছে বকুনি খেলে কতবার।

একখানা বড় জলচৌকির ওপরে দেবী বীণাপাণির পট নামিয়ে রাখা হয়েছিল। তা' ছাড়া, মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ প্রভৃতি খানকতক বাছা বাছা বই, মাটির দোয়াত, খাঁকের কলম, আর বেলার এস্রাজটা। সকলকার অঞ্জলি দেওয়ার নিদর্শন ফুল, যবের শীষ আর আবিরের গুঁড়ো তার ওপর ছড়ানো — সেইদিকে তাকিয়ে উমা স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল, করজোড়ে।

তার অযত্নে জড়িয়ে রাখা এলো খোঁপা থেকে আলগা হয়ে পড়া সামনের ছোটো ছোটো চুলের গোছা কপাল বেয়ে গালে এসে পড়েছে; বালিকার তারুণ্যমাখা বড় কোমল সে মুখশ্রী, সরুপাড় সাদা কাপড়খানা তার সাথে খাপ খায়নি মোটেই। অকরুণ বিধাতা!...

অকম্পিত দীপশিখার স্নিগ্ধ আলোটুকু সেই দীন স্তব্ধ মুখে, ব্যথাভরা দুটি কালো চোখের ওপর পড়ে' আরও করুণতর করে' তুলেছে যেন।

পুষ্পপাত্রে পড়েছিল পূজা শেষে দুটি গাঁদা ফুল। তাই দেবীর চরণতলে তুলে দিয়ে, বেদীর তলায় মাথা লুটিয়ে উমা ভক্তি-গদগদ হ'য়ে বললে—

সরস্বত্যৈ মহাভাগে বিদ্যা কমল-লোচনে।

বিদ্যারূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাং দেহী নমস্তুতেঃ।।

মা গো, দয়া কর, দয়া কর! এ অধম সন্তানকে পূজার অধিকার, সেবার অধিকার দাও মা!

সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ বেয়ে তার গড়িয়ে পড়ল কয়েকটা অশ্রুবিন্দু। চকিতে তা' মুছে ফেলে উমা উঠে দেখলে দেবীর কমল নয়নেও যেন অশ্রুর আভাষ!...

অসহায়ের আর্তবেদনা মায়ের বুকে বেজেছে বুঝি ! .....

সহযোগ

সরযুবালা বসু

।। এক।।

রাত্রি আটটা বাজে — এলাহাবাদের বাদশাহীমণ্ডির একটি গলির চোর-কুঠরির মত বাড়ির একটি ঘরে বসিয়া একটি শ্যামাঙ্গী তরুণী কোলের মেয়েকে নানা ছড়া কাটিয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। মেয়েটি কিছুতেই ঘুমাইতেছে না। সেই যে বৈকাল হইতে সে একটানা নাকি সুরে কান্না ধরিয়াছে, তার জের যেন আর কিছুতেই মিটিতে চাহে না। গলির উধারে দোতলা বড় বাড়ির একটি ঘরে ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিল। তরুণী চমকিয়া উঠিয়া, মেয়ের কানে পিঠে দ্রুত চাপড়াইতে শুরু করিয়া বলিয়া উঠিল, "ঘুমো না হতভাগী, কখন আজ রান্না চড়াব?" শিশু যদি বা মা'র কণ্ঠের ঘুমের ছড়া শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে কান্নার সুর পঞ্চম হইতে খাদে নামাইয়া আনিতেছিল, এখন তিরস্কারের আভাষে সে আবার সে সুর সপ্তমে চড়াইল। এই সময় দোতলা বাড়ির সামনের ঘরটির জানালায় একটি হৃষ্টপুষ্ট শিশুকে কোলে লইয়া একটি বধূ আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল— রানুর মা , রানুকে বুঝি কিছুতেই ঘুম পাড়াতে পারলে না?"

অসহিষ্ণু ভাবে তরুণী কহিল— "না দিদি সেই যে বিকেল থেকে কান্না জুড়েচে, তা আর হতভাগা মেয়ের কিছুতেই থামচে না। এখনো রান্না চাপাতে পারি নি, অদৃষ্টে আমার দুর্গতি আছে।"

বধূটি মমতা ভরা কণ্ঠে কহিল—"মেয়ের বোধ হয় অসুখ করেচে; নইলে এত কাঁদে না ত । ওকে বোকো না ভাই,আদর করে ঘুম পাড়াও। ছেলের অসুখ , তা তুমি কাজ করবে কি করে। না হয় নাই রাঁধলে, —বাজার থেকে কিনে আনিয়ে খাবে।"

বধূর উপদেশ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই "খুকি" বলিতে বলিতে সুধীর আসিয়া ঘরে ঢুকিল। ওদিকের জানালা হইতে চকিতে বধূটি সরিয়া গেল; কিন্তু

এ ঘরের কথাবার্তাগুলা শুনিবার জন্য কান দুটি তার উৎকর্ণ হইয়া রহিল। তাই দৃষ্টিপাত হইতে সরিয়া গেলেও সে একেবারে চলিয়া গেল না।

তরুণীর নাম শ্যামা, সুধীর গরে ঢুকিয়াই জামা খুলিয়া আলনায় ছুঁড়িয়া দিয়া বসিয়া জুতা খুলিতে খুলিতে কহিল, খুকি এখনো জেগে আছে, , তবে আমার কোলে দিয়ে শিগ্‌গির খাবার দাও,—খেয়েই আমায় বেরুতে হ'বে।"

শ্যামা কহিল — "একটু দেরী হবে, খুকি বিকেল থেকে কেবলি কাঁদচে, রাঁধতে পারিনি।"

সুধীর মখ ভ্যাঙচাইয়া কহিল—"খবর শুনিয়ে কেতাত্থ করলে আর কি! নটায় বায়স্কোপ হবে, দেখতে যাব কথা দিয়ে এলুম, উনি এখনো রান্না করে রাখেননি। ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মারো!"

তারপর সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—রাঁধতে হবে না। আমি এক টাকার মাংস রুটি কিনে বাজারেই খেয়ে নেবো। তোমার হাতের কুমড়োর ঘাঁট আর শুকনো রুটি খেয়ে অরুচি ধরেচে।"

শ্যামা কহিল —"সে ত আমার দোষ নয়! আমায় যে দিন যা এনে দাও তাই রাঁধি।"

সুধীর কহিল — "তা আমার টাকায় না কুলোলে আনব কোত্থেকে? একলা ছিলাম, ফুর্তির প্রাণ যা চেয়েছি তাই করেচি। মাসি মাগী তোমায় চাপিয়েই না সর্বনাশ করেচে । জন্মে তো একদিন খোঁজ নেয় না।"

স্বামীর এসব টীকা — মন্তব্য বেচারী শ্যামার তিন বৎসরের বিবাহিত জীবনে গা সহা হইয়া গিয়াছিল। উত্তর দিয়া কথা কাটাকাটি করিতে সে অভ্যস্ত ছিল না, আজও কোনো উত্তর দিল না। খুকি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া ঘরের বাহিরে আসিল। সুধীর তখন উঠানে কলতলায় দাঁড়াইয়া গা হাত ধুইতেছে। শ্যামা সাহস করিয়া কহিল — "মাইনে পেয়েচ বোধহয়?"

সুধীর গম্ভীর কণ্ঠে কহিল "হুঁ।"

শ্যামা কহিল—"খুকির জন্যে দুটো জামা কিনে দিও।"

সুধীর কহিল -- "এ মাসে হবে না; কুড়ি টাকা দেনা আছে, সেটা শোধ করতে হ'বে। ভারী আমার মেয়ে, তার আবার তিন সন্ধ্যে জামা, জুতো। তবু যদি মার মতন কালিন্দী না হয়ে সুন্দরী হোতো।"

শ্যামার সাহস হইল না যে বলে, চামড়া কটা ও কালোর জন্য সন্তানের প্রতি বাপ -মার ভালবাসার তারতম্য হওয়া হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম নয়। আজই জগতে শ্যামাকে স্নেহ যত্ন করিতে কেহ নাই,— শৈশবে সে এমন দুর্ভাগিনী ছিল না। দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেও পিতা -মাতা তাঁহাদের হৃদয়ের অনাবিল স্নেহ সুধা ঢালিয়াই মানুষ করিয়াছিলেন। তাহার দুটি ভাইয়ের সহিত সমান আদরেই সে বাবা-মার আশ্রয়ে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। স্নেহ-ভালবাসার প্রাচুর্য সাংসারিক অভাব অনটনকে সম্পূর্ণ রূপে ঢাকা দিয়াছিল। তার পর হঠাৎ সে কি দুর্দৈব। প্লেগে দুটি ভাই মারা গেল, শোকে মা মারা গেলেন। কিছু দিন পর বাবাও তাহার অনুসরণ করিলেন। মাসি তখন আদর করিয়া শ্যামাকে আশ্রয় দিলেন। সুধীরের কোন আত্মীয়- স্বজন ছিল না। সুদূর বঙ্গদেশ হইতে সে এলাহাবাদে চাকুরি করিতে আসিয়াছিল. এবং বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার গুণে চাকুরিও ভাল পাইয়াছিল। কিন্তু ক্রমেই অসৎসঙ্গে তার চরিত্রদোষ ঘটে। মাসি ইহা জানিয়াও বড় গ্রাহ্য করেন নাই! বয়স্থা শ্যামাকে আর ঘরে রাখা চলে না; অথচ মুখ-চোখ সুন্দর হলেও কালো রংয়ের জন্য তার বিবাহ হইতেছে না; বিশেষ আবার যৌতুকের অভাব। এ অবস্থায় জোগাড়-যন্ত্র করিয়া তিনি শ্যামার বিবাহ ঘটাইলেন। অতঃপর বয়স্থা বধূর পাহারায় সুধীর শীঘ্রই সচ্চরিত্র হইয়া উঠিবে, এই বিশ্বাসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। পুরুষের চরিত্রদোষ- সুরাপান, ব্যাভিচার — এ কি আর ধর্তব্যের মধ্যে? বিশেষ আবার প্রথম যৌবনে।

সুধীরের চারিপাশে অনেকগুলি মোসাহেব জুটিয়াছিল। শ'খানেক টাকা ছিল তার মাহিনা। এতদিন না ছিল তার পোষ্য, না ছিল তার তাগিদ্‌দার (অবশ্য পেটের তাগাদা ছাড়া)। সুতরাং মোসাহেবের দল তার সঞ্চয়ের যাহা কিছু মধু সবটুকু নিঃশেষে পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইত। সুধীরের বিবাহের সময়ও সকলে

সুধীরের পয়সায় খুব স্ফূর্তি করিল। ইংরাজী বাংলায় পদ্য বা ছড়া লিখিয়া সুধীরকে প্রীতি উপহার দিল। আর বারবার করিয়া একথাটাও আবৃত্তি করিল, — "আর এই শেষ দাদা । এরপর বৌ ঠাকরুনের রাঙা পায়ে জন্মের মত দাসখত লিখে দেবে।" সুধীর পুরুষবাচ্ছা, — সে সগর্জনে প্রতিবাদ করিল, "কক্ষনো না, কক্ষনো না, দেখে নিও তোমরা , দাসখত আমি লিখবো না, বরং লিখিয়ে নেবো। আমি মরদ, মেয়ে নই।" তারপর তার বিবাহিত জীবনের কথা। বন্ধু - বান্ধবদের কাছে সত্যই সে মাথা উঁচু করিয়া চলে। সে যে স্ত্রীর "ভেরুয়া" নয়, এ কথা প্রমাণ করিবার জন্য, মাহিনা পাইলেই সেই দিনই সে বন্ধুদের লইয়া জুয়া খেলিতে যায় বা শুঁড়ির দোকানে দেনা দিয়া ও নূতন করিয়া ধার লিখাইয়া আসে। সময়ে সময়ে বাহিরেই রাত্রি যাপন করে। বন্ধুরা তখন তাহাকে 'বাহবা' দেয়, 'সাবাস' বলে। এর পরে আর কি বলিবার আছে?

।। দুই।।

রাত্রি তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে। বধূ নীলিমা জানালার কাছে আসিয়া চাপা গলায় ডাকিল- "রানুর মা, অ-রানুর মা, ঘুমলে না কি?"

অন্ধকার বিছানার ঘুমন্ত মেয়েটির পানে তাকাইয়া চুপ করিয়া শ্যামা বসিয়া ছিল; চমকিয়া উঠিয়া আসিয়া জানালার গরাদে হাত রাখিয়া সাড়া দিল— "না দিদি যে গরম ঘরের ভিতর- শুয়ে চোখ বোজবার সাধ্যি কি, ছট্ফটিয়ে মরচি।"

নীলিমা কহিল, — তোমার জন্যে বড় দুঃখ হয় ভাই। একলাটি ,- ঘরে দোসর কেউ নেই যে মুখ চাইবে। একলাটি বুঝি বাইরে শুতে পারলে না? তা ছেলেমানুষ, ভয় করে বৈ কি।" শ্যামা উত্তর দিল না, নিঃশ্বাস ফেলিল। নীলিমা আবার কহিল- "তিনি বুঝি বাইরে চলে গেলেন? আচ্ছা মানুষ তো! তুমি নেহাৎ ভালমানুষ , কিছু বলো না, তাতেই বোধহয় আরও তোমায় গ্রাহ্য করেন না। " হায় হায়, দাসী যাইবে প্রভুকে বুঝাইতে? দিন রাত্রি যে মানুষ প্রতি কথায় প্রতি চরণক্ষেপে শক্তির অহঙ্কার, অর্থের গর্ব প্রচার করিয়া স্ত্রীর

ক্ষুদ্রত্ব প্রমাণ করিবার জন্য সচেষ্ট, — কোন্ স্পর্ধায় বেচারী শ্যামা তাহার মুখের উপর গিয়া বলিবে যে "এ কাজ আমি ভালবাসি না , তুমি করিও না!"

এবারেও শ্যামার উত্তর না পাইয়া বধূ কহিল—"কিছু খেলে না , উপোস করে রইলে? কর্তা তো বাজারে গিয়ে নানা জিনিষ খেয়ে পেট ভরাবেন। তুমি যদি ঘরে কিছু না খেয়ে উপোস করে থাকো, নিজেই ঠকবে।"

ম্লান হাসি হাসিয়া শ্যামা কহিল- "জিতেই বা কি লাভ দিদি, এ প্রাণ কি সহজে বেরুবে?

"ওগো, এদিকে এসো"— স্বামীর আহ্বান শুনিয়া চঞ্চল চরণে নীলিমা চলিয়া গেল। শ্যামা জলভরা চোখে আবার ঘুমন্ত রানুর কাছে আসিয়া বসিল। অসহ্য জ্যৈষ্ঠ মাসের গ্রীষ্মে ঘরের বন্ধ বাতাস যেন আগুন হইয়া উঠিয়াছিল। মাত্র অপরিসর দুটি জানালা- বাহিরের বাতাসের সাধ্য নাই তার মধ্য দিয়া অবাধে যাওয়া আসা করে। খোলা আঙিনায় মুক্ত বাতাস তখন দাবদগ্ধ ধরণীর গায়ে মৃদু বীজন শুরু করিয়াছে। মনের ভিতর যত জ্বালাই থাক, আপাতত দেহের জ্বালা জুড়াইবার জন্য শ্যামার লুব্ধ দৃষ্টি বার কয়েক আঙিনার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল; কিন্তু একা একা বাহিরে শয়ন করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। সারা দিনের কর্ম-শ্রান্ত দেহ-মন লইয়া অভাগিনী তখন মেয়েটির পাশেই শুইয়া পড়িল। উদরে অন্ন নাই। যত্নাভাবে কেশ বেশ শ্রীহীন। পরিধানের শাড়িখানিও ছিন্ন। আর চক্ষে তার অশ্রুর ঝরণা। হায় নারী! ভাগ্য-বিধাতা পতি-দেবতা তার সেইসময় সাঙ্গোপাঙ্গো লইয়া হেটেলে গিয়া চপ্ কাটলেট্ প্রভৃতি মুখরোচক জিনিসগুলি লইয়া বোতলগুলির আরাধনায় নিযুক্ত। শাস্ত্র, সমাজ, সকলের স্বাক্ষরিত ছাড়পত্র হাতে লইয়া অস্থান কুস্থান সর্বত্রই তার অবাধ গতিবিধি। সে যেখানেই যাক, যেস্থানেই বিচরণ করুক, অন্তঃপুরে নারী তার দুটি চক্ষে আরতির দীপশিখা জ্বালিয়া, সতী-মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া, একান্ত মন প্রাণে তারই আশায় পথ চাহিয়া আছে। অবসর সময়ে দেখা দিয়া সে তাহার নারীজন্মকে সার্থক করিবে বৈ কি!

।। তিন।।

বেলা তখন চারটা। রানুর শরীর কাল হইতে ভাল, একটু জ্বরভাব হইয়াছে। কয়েকদিন অসহ্য গুমোটের পর আজ বেলা তিনটার সময় হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছিল। রানু কান্না ভুলিয়া এতক্ষণ চুপচাপ বসিয়া তাহা দেখিতেছিল। সেই অবসরে শ্যামা তাহার অনেকগুলি কাজ সারিয়া লইয়াছে। এইবার উনান ধরাইয়া রান্নার উদ্যোগ করিতেছিল, -বৃষ্টি থামিয়া গেল, রানুও বায়না জুড়িয়া মার কোলে আশ্রয় লইল। শ্যামা অগত্যা মেয়েকে কোলে লহয়াই সাধ্যমত কাজ করিতে লাগিল।

রাত্রে সুধীর বাড়ি আসে নাই। সকালে উচ্ছৃঙ্খল বেশভূষা লইয়া রক্ত চক্ষে যখন সে বাড়ি ফিরিল, তখন স্বামীর দিক চাহিয়া শ্যামার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। কিন্তু যাক্ সে কথা,এ কিছু নূতন দৃশ্য নয়। তিন বৎসরের বিবাহিত জীবনে এ দৃশ্য তার কাছে দিনের পর দিন পুরানো পাঠের মতই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে।

স্নান করিয়া সুধীর খাইতে বসিয়াছিল; কিন্তু আজ ভাত তরকারি অখাদ্য হইয়াছে বলিয়া এক গ্রাস মুখে দিয়াই ইতি করিয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল। এবেলা শ্যামা ভয়ে ভয়ে রান্নার ব্যবস্থা করিতেছে, স্বামী দেবতা এখন প্রসন্ন হইলে হয়। চারটা বাজিবার পরই সুধীর বাড়ি আসিল- হাতে একটি ছোট পুঁটুলি। রান্নাঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া কহিল—"কি রাঁধচ এ-বেলা?" শ্যামা ভয়ে ভয়ে কহিল—"ডিমের তরকারি আর রুটি করচি।"

সুধীর কহিল—" আচ্ছা আর দেখ, বেশ ভালো মাংস এনেছি, মাংস চাপিয়ে দাও। আর খানিকটা চপের মাংস এনেছি, খানকতক গরম গরম চপ ভেজে দাও, - গণেশ, বিমলেন্দু, শরৎ এখুনি আসচে। তারা তোমার হাতের চপ-ভাজা খেয়ে খুব প্রশংসা করে।"

আদেশসহ সার্টিফিকেটের সংবাদেও শ্যামার মন বড় প্রসন্ন হইল না। সারারাত্রি অনিদ্রায় আর সমস্ত দিন রুগ্ন শিশুর আব্দার সহিয়া শরীর তার বড় বেশী ক্লান্ত হইয়াছিল, এখনও মেয়েকে কোলে লইয়াই সে কাজ করিতেছে।

রান্না শেষ হইলে সে তবু তাহাকে লইয়া একটু বসিয়া বিশ্রাম করিতে পায়। যাহা হউক, স্বামীর আদেশ শিরোধার্য করিয়া সে মাংস রান্নার জোগাড় করিতে লাগিল। সুধীর জামা জুতো খুলিয়া, মুখ হাত ধুইয়া শ্যামাব কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা কারল—"খুকি কেমন আছে?"

শ্যামা কহিল — সে ভারি কাঁদচে, কাজকর্ম কিছু করতে দিচ্ছে না।" সুধীর খুকীর দিকে হাত বাড়াইয়া কহিল—"আয় খুকি আমরা বাইরে যাই।"

মেজাজ ভাল থাকিলে সুধীর খুকিকে লইয়া আদর যত্ন করিত। খুকিও বাবার কোলে থাকিতে ভালোবাসিত। এখন সে হাত বাড়াইয়া বাবার কোলে গেল। সুধীরও তাহাকে কোলে লইয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল। একটু পরেই প্রতিশ্রুত বন্ধুগণের শুভাগমন হইল। সুধীর অভ্যর্থনা করিয়া কহিল- "এসেচ — আমি মনে করছিলাম, ফাঁকি দিলে বুঝি।"

গণেশ কহিল—"ফাঁকি কি রকম? পাঁচটা টাকা হেরেছি তা আর দেব না? এ শরৎ নই, যে, পরিবারেরই কথায় ওঠ বোস — আমি দাদা তোমারই ভাই।"

শরৎ কহিল — "তা আমিই বা কবে বাজী হেরে টাকা দিইনি বল। তবে বে-থা হয়ে দু পাঁচ টাকার বাজী রাখিও না, দিইও না । তোমাদের মত দেনদার হয়ে ফূর্তি ওড়াবার বান্দা আমি নই। যা পয়সায় কুলোয় তাই করব।

গণেশ তাচ্ছিল্যভরে কহিল—আরে যা যা, তোর যা মুরোদ, এক বচ্ছর বিয়ে করেই তা জানিয়েছিস্। পুরুষ হয়ে মেয়েমানুষের নাকি কান্নাকে এত ভয়?"

শরৎ পিছু না হটিয়া কহিল- "আর তুমি বুঝি ভয় খাও না? মনে আছে সেদিন সোনিয়া বাইজির কান্না? চোখে একটু রুমাল তুলে দিয়েচে, আর তুমি তাকে তোমার আংটিটা দিয়ে দিলে, মনে আছে কি? আমি না হয় ঘরের বউয়ের কান্নাকে ভয় পাই; আর তুমি?"

গণেশকে অপ্রস্তুত দেখিয়া বিমলেন্দু কহিল- "রাখ তোমাদের কচকচি, বের কর বোতল। সুধীর দা তোমার গেলাস নিয়ে এস। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া

দিয়েছে। "অনেকদিনের গুমোট গরমের পর এমন ঠাণ্ডা দিনটি - একে মাটি হতে দিও না বাবা।"

শরৎ কহিল—"আমি ভাই তোমাদের বোতল ছুঁচ্ছি না। খানকতক চপ আর খাবার টাবার যা দেবে খাব।"

গণেশ নাকি সুরে কহিল- " বঁউ বঁকবে বুঁঝি?"

শরৎ কহিল—"বকবে না তো কী করবে? কাল তোমাদের পাল্লায় পড়ে যে বকুনি খেয়েচি। মা কত গাল মন্দ করেছেন। আজ সকালে সকালে বাড়ী ফিরব"।

ইতিমধ্যে রানু কান্না জুড়িয়া দিল। সুধীর তাহাকে শ্যামার কাছে দিবার জন্য বাড়ির মধ্যে আসিয়া, রান্নাঘরে উঁকি দিয়া দেখিল, শ্যামা মাংস চাপাইয়া রুটি বেলিতেছে। মাকে দেখিয়াই রানু বাবার কোল হইতে নামিয়া মার কোলে আশ্রয় লইল। শ্যামা বিরক্ত হইয়া মেয়েকে ঠেলা দিয়া কহিল - "তোকে কোলে নিয়ে আমি রুটি বেল্‌ব কি করে, সরে যা।"

খুকি মাতার আদেশ পালনে কিছুমাত্র অনুরাগ না দেখাইয়া, ভাল রকমে কোলটি জুড়িয়া বসিল। এদিকে সুধীর প্রশ্ন করিল — চপের জোগাড় করেচ?"

নতমুখে শ্যামা কহিল — "করব"।

সুধীর এ উত্তরে আদৌ সন্তুষ্ট হইল না। সন্ধ্যা আসন্নপ্রায়, বন্ধুরা বোতল খুলিয়া গরম গরম চপ-ভাজার মুখ চাহিয়া বসিয়া আছে। ভদ্রলোকদের কতক্ষণ এভাবে বসাইয়া রাখা যায়? সে কহিল- "অন্ধকার হয়ে এল যে, একটু চট্‌পট্ নাও না, ওরা আর কতক্ষণ বসে থাকবে।"

তারপর সে বন্ধুদের আশ্বস্ত করিবার জন্য আবার বাহিরেব ঘরে গিয়া দেখা দিল। গণেশ বলিয়া উঠিল-"কতক্ষণ আর বসিয়ে রাখবে দাদা? এর চাইতে তোমার হোটেলে গেলে যে ভাল ছিল।"

বিমলেন্দু কহিল —"সেখানে কিন্তু বউদিদির মতন ওস্তাদী হাতের সোয়াদ্ মিলত না।"

শরৎ কহিল — "ততক্ষণ একটু গান টান গাই এস হে, নেহাৎ চুপ্

চাপ—"

বাধা দিয়া সুধীর কহিল- "না হে গান টান গেয়ো না। সেদিন সামনের ডাক্তার ভারী বকাবকি করেছিল। লোকটা বড় সুবিধের না।"

গণেশ কহিল- "বাঃ, এত ভারি মজার কথা । হরিনাথ ডাক্তার ভারী কড়া লোক ত ! তোমার বাড়িতে তুমি গান করবে, নাচবে, তা ওর তাতে চোখ টাটায় কেন? টাটায় তো চোখে ঠুলি দিয়ে থাকুক না ।"

সুধীর কহিল- "তোমরা সেদিন নেশার ঝোঁকে যা তা গান গাইতে শুরু করেছিলে, তা বকবে না? ভদ্রলোকের বাড়ী ওসব ঠিক নয় ভাই।"

গণেশ কহিল- "আরে তোমার ভঁদ্দর লোক! ফূর্তি বুঝি ছোটলোকেরই একচেটে? একে তো দেশে কোথাকার কে এক গান্ধীর হুজুগ উঠেচে 'মদ খেয়ো না, হেন কোরো না, তেন কোরো না'- তার পর হুকুম জারি হবে এখন , 'থুতু ফেলো না, চোখ চেয়ে দেখো না , নাকে শুঁকো না।"

বিমলেন্দু কহিল- "পেটে না পড়তেই যে তোমার বোলচাল ফুটতে শুরু হ'লো হে, গতিক তো ভাল নয়।"

গণেশ সুধীরকে ঠেলা দিয়া কহিল- " যাও দাদা, দয়া করে শ্রীহস্তের প্রসাদ নিয়ে এস গে। "

সুধীর আবার তখন আসিয়া রান্নাঘরে উঁকি দিল। রানু তখন বিষম কান্না জুড়িয়াছে। কাঁচা লঙ্কার রসাস্বাদন করিতে গিয়া বেচারী বড়ই দাগা পাইয়াছে। সেই লঙ্কার হাত চোখে মুখে লাগাইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। শ্যামা রান্না ফেলিয়া মেয়েকে লইয়া উঠানে আসিয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। সুধীর তখনও চপ ভাজিবার উদ্যোগ হয় নাই দেখিয়া প্রসন্ন হইল না। ঝাঁজের সহিত কহিল- "অন্ধকার হয়ে গেল, এখনো আলো জ্বলল না, মেয়ে নিয়েই সোহাগ হচ্ছে, রান্না শেষ হবে কখন?" শ্যামার নিজের শরীর ভাল ছিল না। তার উপর অসুস্থ মেয়ে। লঙ্কা খাইয়া এক ফ্যাঁসাদ বাধাইয়াছে। স্বামীর তাহাতে সহানুভূতি দূরে থাকুক, বন্ধুদের "মদের চাট' জোগাইবার তাগিদের আর অন্ত নাই। এহেন অবিবেচনার ব্যাপারে তার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। সে বলিয়া ফেলিল—

"দুটো হাত নিয়ে কত কি করব, আলো জ্বালব, না মেয়ে ভোলাব, না রাঁধব।"

সুধীব তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া হ্যারিকেনটি টানিয়া জ্বালিবার উদ্‌যোগ করিতে করিতে উত্তর দিল, "আলো আমি জ্বেলে নিচ্ছি, তুমি প্যান্‌পেনে মেয়েকে নামিয়ে ফেলে রেখে রান্না দেখ গে। এই খুকি, ফের কাঁদ্‌বি তো মেরে হাড় ভাঙব।" বাবার বকুনির সঙ্গে সঙ্গেই খুকিব কান্না সপ্তমে চড়িল। সুধীর রাগিয়া কহিল — "মরুক কেঁদে দাও নামিয়ে।"

শ্যামা কহিল—" ওকে চুপ না করিয়ে আমি কিছু করতে পারব না।"

সুধীর হুঙ্কাব করিয়া কহিল — "কি বললে. পারবে না? পার্‌তে হবে।"

শ্যামা উত্তর দিল না, আপন মনে খুকিকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এদিকে হ্যারিকেন জ্বালিতে গিযা উহা তৈলশূন্য দেখিয়া সুধীর কেরোসিনের বোতল সংগ্রহ করিয়া, বকিতে শুরু করিল—"এমন সব হতভাগা যে, ঠিক সময় তেলবাতিটুকুও কবে রাখ্‌তে পারে না। মুখে আগুন এমন কুড়েমির। মাসির ঘবে খেটে খেটে শুকিয়ে মরতে, সেই ছিল ভাল। এখানে এসে দিন দিন বিবি হযে উঠেচেন।"

শ্যামার ধৈর্যচ্যুতি হইল। সে কহিল - "বড় সুখে রেখেচ কি না, - এর চাইতে মরণ হলেই বাঁচতাম। " সুধীর স্ত্রীর মুখে এতখানি স্পর্ধার উত্তর কোনদিন শোনে নাই। প্রথমটা শুনিয়াই সে চমকিয়া উঠিল, কি সর্বনাশ! যে মানুষ 'সাত চড়ে রা দিত না', আজ সে এমন কথা বলিতেছে? না জানি, প্রশ্রয় পাইলে এব পরে আরও কত কি বলিয়া বসিবে। সে তখনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল -"কি এত বড় স্পর্ধা ! নেহাৎ দয়া করে বিয়ে. করে এনেছি তাই না? মাসী মেসো পায়ে কত তেল মালিশ করেছিল, মনে আছে? অই তো কালো বউ, কেউ তো কাছে ঘেঁসে নি, ভাগ্যিস উদ্ধার করেছিলাম।"

শ্যামার চোখ ফাটিয়া জল আসিয়াছিল। সে রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল - "এ উদ্ধার করা নয়, জ্যান্তে খুঁচিয়ে মারা - এ যে রাত দিন সহ্য হয় না গো" খুকিকে নামাইয়া দিয়া শ্যামা চলিয়া যাইতেছিল, সুধীর পথ আগুলিয়া কহিল —"আবার ঐ সব প্যানপ্যানানি? বলচি, ভাল চাও তো রান্নাঘরে গিয়ে রান্না

শেষ কর। তার পর তোমার ব্যবস্থা আমি করচি।"

শ্যামা রুক্ষ কণ্ঠে কহিল- "আমি কিচ্ছু করতে পারব না, আমার মাথা ব্যথা কর্‌চে।"

সুধীর কহিল—"নেহাৎ মার খেয়ে মরবে কেন, এখনো বলচি -"

স্বামীর হাতের প্রহার - সুখেও মধ্যে মধ্যে শ্যামা বঞ্চিত ছিল না তবে খুব সাবধানে চলিত বলিত বলিয়া, সুধীর তাহাকে বকাবকি করিয়াই ক্ষান্ত দিত। আজ শ্যামার মাথায় যেন ভূত চাপিয়াছিল। সে জবাব দিল- "মেরে ফেললেও কিছু পারব না।"

"বটে? এত বড় আস্পর্দা? মর তবে পুড়ে।"*বলিয়াই সুধীর হাতের কেরোসিন -পূর্ণ বোতল স্ত্রীর গায়ে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া, দেশলাই জ্বালিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গেই আগুন লক্‌লক্ জিহ্বা মেলিয়া শ্যামার তরুণ দেহখানি জাপটিয়া ধরিল। শিশু রানু আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। শ্যামারও করুণ কণ্ঠের আর্তনাদ বাতাসে ভাসিয়া অনেক দূর পর্যন্ত সাড়া পৌঁছাইয়া দিল।

।। চার ।।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। নীলিমা ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াইয়া, নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে ডাক্তার স্বামীর প্রত্যাগমন-পথ চাহিয়া আছে। জানালায় মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া, শ্যামার গৃহের দিকে তাকাইয়া, ঘরের খবর কিছু কিছু জানিবার জন্য কৌতূহলের তার আর অন্ত নাই। কিন্তু কিছুই বুঝা যাইতেছে না। সন্ধ্যার সময় আর্তনাদ কানে আসিবামাত্র, তার মনে হইয়াছিল, ছুটিয়া গিয়া শ্যামার কাছে দাঁড়াইয়া, তাহাকে বুকের মধ্যে জাপটিয়া ধরে। কিন্তু বধূ সে, বিশেষ শ্বশুর বাড়ির বধূ। সুধীর মাতাল বলিয়া হরিনাথ স্ত্রীকে তাহার বাড়িতে যাইতে দিতেন না। হরিনাথের পিতা মাতারও আপত্তি ছিল। তবে শ্যামা অবসর মত ইহাদের বাড়ি বেড়াইতে আসিত, তাহাতে কাহারও আপত্তি ছিল না। নীলিমা অল্প দিনের পরিচয়েই তার এই অবসর—সঙ্গিনীটিকে ভালবাসিয়াছিল। মাতৃপিতৃহীনা স্বামী-স্নেহ-বঞ্চিতা শ্যামার প্রতি মনের টান তার কতকটা করুণা

মমতাতে পরিপূর্ণ ছিল। শ্যামার আর্তনাদ কানে আসিয়া পৌঁছিতেই, সেই সর্ব প্রথমে ঝিকে খবর লইতে পাঠাইয়াছিল। শাশুড়ী বরং বধূর অত্যন্ত ব্যস্ততায় বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন — "মাতাল মানুষ, নিজের পরিবারকে নেশার ঝোঁকে হয়ত মার-ধোর কিছু করছে, — তাতে তোমারই বা কি, আমারি বা কি। তুমি বউ মানুষ, চুপ চাপ করে ঘরের কোণে আছ তাই থাক, — পাড়ার কে কি করছে সে খোঁজে মাথা ব্যথার দরকার কি?" যাহা হউক, ঝি আসিয়া যে সর্বনাশের সংবাদ দিয়াছিল, তাহাতে নীলিমা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। তার পর সুধীর নিজেই পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া ডাক্তার হরিনাথকে ডাকিয়া লইয়া যায়। হরিনাথ সেইসময় হইতে সেইখানেই রহিয়াছেন' নীলিমা শ্যামার সবিশেষ সংবাদ জানিবার জন্য উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

সহসা পদশব্দে নীলিমা বুঝিল, স্বামী আসিতেছেন। সে সত্বর দ্বারের কাছে গিয়া হরিনাথের মুখোমুখি হইতেই জিজ্ঞাসা করিল- "কেমন আছে গা? বাঁচবে তো?" হরিনাথ চেয়ারে বসিয়া জামা জুতা খুলিতে লাগিলেন। নীলিমা পাখা লইয়া বাতাস করিতে করিতে স্বামীর উত্তর শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিল। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া হরিনাথ কহিলেন - "মানুষ না পশু, — কাণ্ড দেখে আমি অবাক। স্বামী স্ত্রীতে কি বচসা হয়েচে, আর তার গায়ে তেল ঢেলে আগুন জ্বেলে দিয়েচে। বউটার অবস্থা কি ভয়ানকই হয়েচে। বাঁচবে না বলেই মনে হয়। আর যে যাতনা - না বাঁচাই ভাল।"

নীলিমাও একথা অস্বীকার করে না। কিন্তু অভাগিণী শ্যামার জন্য তার প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। দুটি চোখে তার মুক্তাধারা ঝরিতে লাগিল। হরিনাথ স্ত্রীকে সাদরে বুকের উপর টানিয়া লইয়া কহিল — "তুমি কেন কাঁদচ নীলা, তোমার সে তো কেউ নয়।" নীলিমা উত্তর দিল না, তার অশ্রু উথলিয়া আসিতে লাগিল। হরিনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন — "বউটিকে তুমি একবার দেখতে যাবে নীলা? জ্ঞান আছে, মানুষ চিন্তে পারচে। মুখ ছাড়া সর্ব্বাঙ্গ ঝল্‌সে গেছে। একটু একটু কথাও কইতে পারচে। তোমায় হয়তো চিনতে পারবে।"

নীলিমা কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া কহিল — "যাব আমি, কিন্তু বাবা মা বকাবকি করবেন, - দোহাই তোমার, যদি মত করাতে পার।" তার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "তুমি বলচ সে আমার আপনার কেউ নয়। আচ্ছা, বল দেখি, আপনার না হলে কি কষ্ট দেখে কষ্ট হতে নেই? তুমি যে ডাক্তার মানুষ, তোমারও তো দেখে কষ্ট হচ্ছে? আর আমি একজন স্ত্রীলোক হয়ে স্ত্রীলোকের কষ্টের কথা শুনে স্থির থাকতে পারি? হরিনাথ স্ত্রীর এই সহানুভূতির অনুমোদন করিলেন। আহারান্তে হরিনাথ বিশ্রাম শয্যায় শয়ন করিয়া শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলেন। নীলিমা আহার নিদ্রা ভুলিয়া অধীর উৎকণ্ঠায় জানালায় বসিয়া একমনে ভগবানের নিকট শ্যামার কামনার সহিত ঊষালোক ভিক্ষা করিতে লাগিল। কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইবে, সে একবার শ্যামাকে দেখিতে পাইবে।

।। পাঁচ।।

সদ্যঃজাগ্রত পাখির কাকলি তখন সবেমাত্র প্রভাত - পবনকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। কনক ঊষার রক্তিম রাগ মেঘহীন নীলাম্বরকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে মাত্র। সেই আলোকের একটি রেখা স্বল্পপরিসর ক্ষুদ্র জানালার পথে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নিশার প্রদীপের সহিত কোলাকুলি করিতেছে। সেই সময় মৃত্যু -পথ যাত্রিনীর পাণ্ডুর ললাটের উপর কম্পিত অধর রাখিয়া কান্না ভরা কণ্ঠে নীলিমা ডাকিল- "শ্যামা, বোনটি একবার চেয়ে দেখ্ বোন", শ্যামা স্তিমিত দৃষ্টি মেলিবার চেষ্টায় সফলকাম হইল না, সে আধখোলা চোখেই নীলিমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল - "কে, দিদি, এসেছ?"

তারপর দুজনেই নীরব। অভাগিনীর বিবর্ণ দেহের দিকে চাহিয়া নীলিমার মনের যে অবস্থা হইতেছিল, তাহা বর্ণনার বিষয় নয়। মৃত্যুর নীল ছায়া যার সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া ফেলিতেছে, — চক্ষের শেষ জ্যোতিটুকু নিভাইবার অপেক্ষামাত্র, তাহাকে সে আর প্রশ্নের খোঁচা কি দিবে? আর সান্ত্বনা দিবারও তো কিছুই নাই। একান্ত সম্বল আঁখিজল — তাই লইয়া নীরবেই শ্যামার মুখের দিকে চাহিয়া নীলিমা বসিয়া রহিল। ওদিকে সদ্য নিদ্রাভঙ্গে রানু ও ঘর হইতে এঘরে

আসিয়া দাঁড়াইতেই, নীলিমা হাত বাড়াইয়া ডাকিল - রানু, কোলে এস মা —''

রানুর শিশু-হৃদয় পূর্ব দিনের ঘটনায় স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। ঘটনার পর সুধীরের বন্ধুগণেরও নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল; সকলেই তৎপর হইয়া সময়োচিত ব্যবস্থায় লাগিয়া গিয়াছিল। সুধীর মেয়েকে কোলে কোলেই রাখিয়াছিল। যাহা হউক, রানু মাকে অচৈতন্য অবস্থায় শয়ান দেখিয়া কিছুতেই যেন স্থির থাকিতে পারিতেছিল না। অনেক কান্নাকাটির পর সে রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এখন উঠিয়াই মাকে দেখিতে আসিয়াছে। সে নীলিমার কোলে গিয়া বসিলে, নীলিমা ডাকিল, ''শ্যামা রানুকে দেখবে?''

ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া শ্যামা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার ক্ষীণকণ্ঠে কহিল - ''চললাম তাতে দুঃখ নেই দিদি, মেয়েটাকে দেখবার কেউ রইল না এই দুঃখু। তবে মরে যায় সেও ভাল। নইলে যদি আমারই মতন — '' কথা তার শেষ হইল না। জীবনের দুঃসহ দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য মৃত্যুর কামনা নিজের জন্য হইলেও সন্তানের জন্য যে কোন অবস্থাতেই মৃত্যু কামনা করা মাতার পক্ষে বড় নিদারুণ ক্ষোভের কথা । শ্যামা তাই সে কথা শেষ করিতে পারিল না। চোখের জলে ক্ষীণ দৃষ্টি আরও ঘোলাটে হইয়া গেল।

তারপর? তারপর যথাসময়ে সব শেষ হইয়া গেল। শ্যামার ক্ষুদ্র জীবন-দীপ নিভিবার সবিস্তার কথা লিখিবারই প্রয়োজনই বা কি। তবে এইটুকু লেখা দরকার যে সুধীরের বন্ধুগণ মৃতদেহ সৎকার করিতে যাইবার জন্য ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইতে বিশেষ বেগ পাইয়াছিল। ''সহজ মৃত্যু'' বলিয়া সার্টিফিকেট দিতে হরিনাথ কিছুতেই রাজি হয় নাই। অগত্যা পাড়ার কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোককে আনিয়া তাঁহার নিকট হতে ''স্বাভাবিক মৃত্যু''র সার্টিফিকেট আদায় করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের সহিত হরিনাথ বাবুর কথাবার্তা হয় এইরূপ, - যথা-

১ম ভদ্রলোক - আপনার কথা মানচি ডাক্তারবাবু, লোকটা কাজ যা করেছে তা খুবই অন্যায়। কিন্তু — ''হরিনাথ (উত্তেজিত ভাবে) অন্যায়? শুধু

অন্যায়। যাকে বলে murder, তাই নয় কি? এর শাস্তি কি জানেন - যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কিম্বা ফাঁসি।

২য় ভদ্রলোক — সে তো বটেই মশায়! তবে লোকটা সহজ অবস্থায় এ কাজ করে নি, —নেশায় ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, নইলে --

হরিনাথ (রাগিয়া) বেশ তো মশাই, আদলতে জেরায় ঐ কথা বলে আপনারা লোটাকে বাঁচিয়ে দেবেন। আমি তা বলে false certificate দিতে রাজি নই। দোষীর শাস্তির বিধান করবই।

৩য় ভদ্রলোক - রাগচেন কেন মশাই, একটু ঠাণ্ডা হয়েই কথাটা বুঝুন না। ও কিছু আমাদেরও আপন কুটুম্ব নয়, আপনারও নয়। তবে বাঙালি হয়ে বাঙালীর আপনজন বটে। হোতো বাঙলা দেশ যা ইচ্ছে করা যেতো। একে এই পশ্চিমে বাঙালির সংখ্যা অল্প, তার ওপর জানেন তো হিন্দুস্থানীরা কথায় কথায় খোঁটা দেয়- বাঙালি বাঙালি ভাই ভাই লড়তে রহে। তার ওপর গান্ধী মহারাজের হুজুগ চলছে। এখন যদি আমরা ঘরে ঘরে নন-কো-অপারেশন চালাই, তা হলে বাঙালির নিন্দের কি মুখ পাওয়া যাবে? আজ যদি এই কেলেঙ্কারি ঘটনা প্রকাশ পায় কাল সহরে - আপনিও তো একজন পদস্থ বাঙালি, - আর কি মাথা উঁচু করে চলতে পারবেন? পারবেন না, কি বলেন?

কথাগুলি এবার হরিনাথকে একটু খোঁচা দিল। সত্যই ঘটনাটি প্রকাশ হইলে প্রবাসী দুর্নামে সহরের সর্বস্থান ভরিয়া যাইবে। যাহা হউক, সে কণ্ঠের তেজ মৃদু করিয়া উত্তর দিলেন - "তা হ'লে আপনারা কি বলেন দোষীর শাস্তি হবে না? আবার ও সবার মধ্যে বুক চিতিয়ে চলাফেরা করবে। তার পর মাস না যেতে যেতে আবার একটি মেয়েকে বিয়ে করে আনবে। তার পর তাকেও একদিন পুড়িয়েই হোক, আর ছুরি মেরেই হোক, খুন করবে। এই তো ? ইচ্ছে ক'রে এই সব হত্যাকে প্রশ্রয় দেবো, - একি conscience সায় দেয় মশাই?

৪র্থ ভদ্রলোক কহিলেন— বারে বারে কি আর তাই করে মশাই, - এবারেই ওর চৈতন্য হয়েছে , — নেড়া ক'বার বেলতলায় যায়?

ইহার উপর আর তর্ক চলে না। অগত্যা হরিনাথকে সুবোধ বালকের ন্যায় সার্টিফিকেটখানি "natural death" বলিয়াই লিখিয়া দিতে হইল। নহিলে অবাঙালি সমাজে বাঙালির সহযোগিতার সম্মান রক্ষা হয় কি করিয়া ?

মৃতার অভিশপ্ত জীবনের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস সেই সহযোগিতার উপর কিসের স্পর্শ বুলাইয়াছিল, কোন্ সর্বদর্শী তাহা আমাদের বলিয়া দিবে? অনুমানের অপেক্ষা কিছুই থাকে কি?

চাকুরে ভাই

দীনেন্দ্রকুমার রায়

(পল্লীচরিত্র)

।। এক ।।

কার্তিক ও গণেশ দুই ভাই পুঁটিমারির হাবাধন দে-র পুত্র। হারাধন পুঁটিমারি গ্রামে 'কয়ালের' কাজ করিত। কৃষকদের ধান্যাদি শস্য মাপ করিয়া দিয়া, কখনও বা মহাজনের গদিতে পাট ওজন করিয়া দিয়া, যে কিঞ্চিত 'কয়ালি' পাইত, তাহাতেই তাহার দিন অতিবাহিত হইত। আবার ধান কাটা-মারার সময় - সে এক ধামা মুড়ি-মুড়কি লইয়া কৃষকদের খোলায় খেলায় ঘুরিয়া বেড়াইত; এবং কৃষকদের যে পরিমাণ মুড়ি-মুড়কি জল খাইতে দিত, তাহার তিনগুণ ধান আদায় করিয়া সহর্ষে বাড়ি ফিরিত। তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, ছেলেদুটিকে কোনও প্রকারে মানুষ করিয়া তুলিবে। মাতৃহীন শিশুদ্বয়কে সে পিতার স্নেহ ও মাতার আদরযত্ন ঢালিয়া দিয়া মানুষ করিয়া তুলিতেছিল।

পরিণত বয়সে স্ত্রীর মৃত্যুর পর হারাধন চারিদিকে অন্ধকার দেখিলেও একটি বিষয়ে সে কৃতনিশ্চয় ছিল; বৃদ্ধবয়সে একটি 'দ্বিতীয় পক্ষ' ঘরে আনিয়া অরণ্যে গমন করিতে তাহার আগ্রহ ছিল না। যেদিন তাহার ভগিনী ক্ষেত্রমণি তাহাকে বলিয়াছিল, "কতদিন আর খালি ঘরে বাস করবে?- ও পাড়ার নিতাই হালদারের মেয়ে, খাসা চোখ-মুখের গড়ন; আর ন-বছরের মেয়ে — দেখতে

যেন বারো বছরের!- তাকে বিয়ে করো না কেন দাদা।''- সেদিন হারাধন তাহার ভগিনীর সহিত 'বিপরীত' ঝগড়া করিয়াছিল। হারাধান বলিয়াছিল, ''তুইও ক্ষেপলি নাকি ক্ষেতু! এই তিন-কুড়ি-সাত বছর বয়সে নিতাই হালদারের দুধের মেয়ে বিয়ে করব?- বৃষকাঠের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। জাত-বেহায়ার কাঁধে চড়ে মড়ুইখালির (শ্মশানের নাম) ঘাটে বিয়ে করতে যাব। তিনকুড়ি-সাত বছরের বুড়োকে বিয়ের কথা বলতে তোর লজ্জা করলো না? - থাকলো তোর ভাতের থালা, - চললাম আমি যে দিকে দুচোখ যায় সেই দিকে।''

হারাধন তখন খাইতে বসিয়াছিল; সক্রোধে উঠিয়া কোনরকমে হাত-মুখ ধুইয়া হুঙ্কার দিল, ''একটা পানটান দিবি, না শুধু মুখেই চলে যাব?''

ক্ষেত্রমণি বলিল, ''পান তৈয়ারি করবার লোকই ত আনতে বলছিলাম, আমার যেমন অদেষ্ট!' বললাম এক, বুঝলে আর এক!-কে তোমার সংসারের বোঝা টানে বল দিকিন?''

হারাধন বলিল, ''তুই টানবি আবার কে টানবে? বিয়ে-টিয়ের কথা মুখে আনিসনে। ছেলে দু'টোকে মানুষ কর, যেন বাপের ভিটেয় পিদ্দিম জ্বলে।''

তাম্বুল চর্বণ করিতে করিতেই ভগিনীর সহিত হারাধনের সন্ধি হইয়া গেল! - সেইদিন হইতে ক্ষেত্রমণি আর ভ্রাতার বিবাহের কথা মুখে আনে নাই। নিতাই হালদার বুড়োকে কন্যাটি 'গছাইয়া' কিছু টাকা আদায় করিবার ফন্দিতে ছিল, তাহার আশা এইভাবে নির্মূল হওয়ায়, সে শিবু সা'র আবগারি দোকানে গিয়া গঞ্জিকা-ধূমপানে মনঃক্ষোভ নিবারণ করিতে লাগিল।

।। দুই।।

কার্তিক বড়; তাহার বয়স যখন পনের, আর গণেশের বয়স দশ, সেই সময় বুড়া হারাধন দে তিনদিনের জ্বরে মড়ুইখালির শ্মশানে বাসরযাপন করিতে গেল। তাহার দীর্ঘকালের কামনা পূর্ণ হইল। ক্ষেত্রমণি ভ্রাতৃশোকে আকুল হইয়া জমিদার বৃন্দাবন বাবুর জননীর সঙ্গে কাশীবাস করিতে চলিল। অগত্যা সংসারের সকল ভার কার্তিকের স্কন্ধে পড়িল। সে অনেক শোক তাপ সহ্য করিয়া এই

বয়সেই বেশ বিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল। যাহাদের মধ্যে কিছু বস্তু থাকে, তাহারা বিপদে পড়িয়া স্বাবলম্বন শিক্ষা করে; আর যাহাদের ভিতরটা একেবারেই অসার, তাহারা বনের জলে ভাসমান 'টোপাপানার মত ধ্বংসের পথে ভাসিয়া যায়। কার্তিকের ভিতর 'বস্তু' ছিল, সে তাই ছোট ভাইটিকে লইয়া ভাসিয়া গেল না। লেখাপড়া শিখিলে সে মানুষ হইতে পারে, - এই আশায় কার্তিক পুঁটিমারির ছাত্রবৃত্তি স্কুলে গণেশকে ভর্তি করিয়া দিল। ছোট ভাইটিকে মানুষ করিয়া তোলাই তাহার জীবনের ব্রত হইল।

গণেশ বেশ বুদ্ধিমান; তাহার স্মরণশক্তিও ভারি তীক্ষ্ণ ছিল। বছর তিনেকের মধ্যে সে ছাত্রবৃত্তি 'পাশ' করিয়া তিন টাকার বৃত্তি পাইল।

পুঁটিমারির দুইক্রোশ দূরে হাজিনগর মহকুমায় একটি এন্ট্রেন্স স্কুল আছে। হাজিনগরের স্কুলের সম্পাদককে ধরিয়া কার্তিক গণেশকে স্কুলে বিনা বেতনে ভর্তি করিয়া দিল। গণেশ প্রত্যহ বাড়ী হইতে স্কুলে পড়িতে অসিত; আবার ছুটি হইলে বাড়ি ছুটিত। চতুর্দশ বৎসর বয়স্ক বালক এইরূপে প্রত্যহ চারিক্রোশ হাঁটিয়া পাড়ি দিত! এমন ছেলে প্রায়ই মূর্খ হয় না। সে চারিবৎসরে এন্ট্রেন্স ক্লাসে উঠিল। আর একবৎসর পরে ভাই পাশ হইবে, এবং পাশ হইলেই মুন্সেফী আদালতে একটা আলমগিরি পাইবে- এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া কার্তিক প্রাণপণ পরিশ্রমে তাহার ভ্রাতার অন্নবস্ত্র ও পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করিতে লাগিল। কতদিন দেখা গিয়াছে, গণেশ 'মেঠো' পথ অতিক্রম করিয়া বেলা দশটার সময় স্কুলে আসিতেছে। তাহার পায়ে জুতা নাই; ধূলা হাঁটু পর্যন্ত মোজা বুনিয়া দিয়াছে; কাঁধে একখানি ময়লা চাদর - কত জায়গায় ছেঁড়া তা গণিয়া ঠিক করা কঠিন। পথশ্রমে মুখখানি ম্লান; সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতেছে। কার্তিক বহু চেষ্টাতেও তাহার জন্য একজোড়া জুতা সংগ্রহ করিতে পারে নাই! যদি কেহ কার্তিককে পরামর্শ দিত, ''বিয়ে-থা কর, কতদিন একা হাত পুড়িয়ে রেঁধে মরবি?''- কার্তিক বলিত, ''হুঁ, বিয়ে করচি ! — এতদিনেও ভাইয়ের পায়ে একজোড়া জুতো জোটাতে পারলাম না। পরের মেয়ে ঘরে এনে 'উপোস পাড়িয়ে' রাখবো?''- কার্তিক তখন পর্যন্ত অকৃতদার।

।। তিন ।।

কিন্তু প্রজাপতি কার্তিককে কৃপা না করিয়া ছাড়িলেন না! - পুরন্দরপুরের সাতকড়ি বিশ্বাস পাটের দালালী করিয়া কিছু টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল; তাহার কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ না দিলে নয়। হঠাৎ কার্তিকের ভাই গণেশের উপর তাহার নজর পড়িল। গণেশ ছেলেটি বেশ, লেখাপড়া শিখিলে মানুষ হইতে পারিবে; আর বিবাহে তাহার কোন দাবি-দাওয়াও থাকিবে না। সাতকড়ি কার্তিকের নিকট এই বিবাহের প্রস্তাব করিতেই সে মহা আহ্লাদে রাজি হইল; তখনও কিন্তু কার্তিকের বিবাহ হয় নাই!

পুরোহিত ঠাকুর সাতকড়িকে বলিলেন, "গণেশের সঙ্গে তুমি যে 'প্রেভা'র বিয়ে দিতে যাচ্ছ; তা যদিস্যাৎ অগ্রে কার্তিকের বিয়েটা হয়ে যেতো , তা হ'লে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু বড়ভাইয়ের বিয়ে না হ'লে ছোটভাইয়ের বিয়ে কেমন করে হ'তে পারে?"

সাতকড়ি বিলক্ষণ সপ্রতিভ। সে বলিল, "কার্তিক ত চিরকুমার!"

যাহা হউক কার্তিকের জন্য নানাদিকে 'কনে' খোঁজ করা হইল; কিন্তু কেহই তাহাকে মেয়ে দিতে চাহিল না; এমন মূর্খকে কে মেয়ে দিবে?

পাড়ার ছোঁড়ারা ছড়া আওড়াইতে লাগিল;-

"বড় থাকতে ছোটর বিয়ে,

'মাইতোর' (মধ্যম) বেড়ায় গালে হাত দিয়ে!"

কিন্তু এক্ষেত্রে মাইতোর কেহ ছিল না, সুতরাং 'মাইতোরে'র কোনও দুশ্চিন্তা না থাকিলেও পল্লী-বধূরা স্নান করিতে গিয়া ঘাটে দাঁড়াইয়া তুমুল আন্দোলনের তরঙ্গ তুলিতে লাগিল।

শেষে ধর্মরক্ষা হইল। সাতকড়ির এক খাতক ছিল, তাহার নাম রাধু প্রামাণিক। রাধু মুদিখানার দোকান করিয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করিত; কিন্তু সাতকড়ির কাছে অনেক টাকা কর্জ করিয়া সে 'দেনদার' হইয়া পড়িয়াছিল। সাতকড়ি সুযোগ বুঝিয়া তাহার বাড়ীসমেত তিনকাঠা লাখরাজ জমি বন্ধকস্বরূপ রেজেস্টারি করিয়া লইল। রাধুকে ভিটাছাড়া করিবে সাতকড়ির এরূপ দুরভিসন্ধি

ছিল না তবে সে রাধুকে ভয় দেখাইয়া যখন- তখন কাহিল করিয়া তুলিত।

রাধুর একটি আইবুড়ো মেয়ে ছিল; বার বৎসরের মেয়ে - অমাবস্যার অন্ধকারের মত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; তাহার উপর ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া উদরটি ঢক্কাকার, এবং মস্তকের কেশগুলি প্রায় নিঃশেষিত। সাতকড়ি রাধুর প্রতি দয়াপরবশ হইয়া বলিল, "তোমাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করে দিচ্ছি। - তোমার মেয়ের জন্য একটা ভাল 'পাত্তর' ঠিক করেছি।"

রাধু তাহার উত্তমর্ণের সহৃদয়তার কোনও পরিচয় এ পর্যন্ত পায় নাই; সে কিছু সংশয়াপন্ন হইয়া বলিল, "এ খুব ভাল কথা। ছেলেটি কে? সাতকড়ি মাথা চুলকাইয়া ঢোক্ গিলিয়া বলিল, "ঐ যে কি বলে পুঁটিমারির - ভাল ছাই নামটাও মনে আস্‌ছেনা, - ঐ যে হারাধন দে ছিল, - তারই ছেলে কার্তিকচন্দ্র। ছেলেটি ভাল; বেশ দু'পয়সা ক'রে খাচ্ছে। অরে ঘরেও স্ত্রীলোক নেই; তোমার মেয়ে গিয়ে একেবারে গিন্নি হয়ে বসবে।"

রাধু বলিল, "কার্তিকে! দিব্বি ছেলে ঠিক করেছেন! - আমার মেয়ের বিয়ের কথা হচ্ছে স্বরূপপুরের জমিদার বিশ্বনাথবাবুর ছেলের সঙ্গে। আপনি বলেন কি? কার্তিকের সঙ্গে আমার সৌদামিনীর বিয়ে দেব! হারু'দের ছেলে কার্তিক হবে আমার জামাই?"

সাতকড়ি বলিল, "হাঁ স্বরূপপুরের বিশ্বনাথ চৌধুরী এ তল্লাটে আর মেয়ে খুঁজে পেলে না! ভাল বললে মন্দ বোঝো! আচ্ছা তা দেওগে, যেখানে পার তোমার মেয়ের বিয়ে। আমি কিন্তু আসছে সোমবার মামলা রুজু করবো। এতগুলো টাকা আর ফেলে রাখতে পারচি নে।"

রাধু ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল! - অবশেষে কার্তিকের সহিত সৌদামিনীর বিবাহেই সে সম্মত হইল। বিবাহের ব্যয় নির্বাহের জন্য সাতকড়ি শতকরা মাসিক তিনটাকা দুই-আনা সুদে রাধুকে একশত টাকা কর্জ দিয়া পরোপকার - ব্রতের পরাকাষ্ঠা প্রর্দশন করিল।

কার্তিকের বিবাহের তিনদিন পরে সাতকড়ি তাহার কন্যা প্রভাবতীর সহিত গণেশের বিবাহ দিল; এবং এক বৎসর পরেই গণেশ 'এন্ট্রেন্স' পাশ করিয়া

হাজিনগর মুন্সেফী আদালতের নকলনবিশী লাভ করিল।

এতদিনে তাহাদের সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল হইল।- কার্তিক ভাইকে চাকুরে দেখিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সে ভাবিল, সংসার পালনের জন্য তাহাকে আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হইবে না। এতদিনে তাহার চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম সফল হইল; সে এখন চাকুরে ভাইয়ের দাদা!

এবার কার্তিক সংসারের কর্তা হইয়া বসিল।

।। চার।।

মুন্সেফী আদালতের চাকরিতে বেশ উপরি-পাওনা আছে। এমন কি, সাত-আট টাকা বেতনের পেয়াদাগুলি পর্যন্ত মাসে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা উপার্জন করে! অনেক পেয়াদার পায়ে বিলাতী জুতা, এবং গায়ে শাল পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষত মুন্সেফের ডিক্রিজাজির সেরেস্তাটি কমলার মৌচাক। নানা উপায়ে মুন্সেফবাবুর মনোরঞ্জন করিয়া গণেশ বছর দুই মধ্যে ডিক্রিজাজীর মুহুরিগিরি লাভ করিল।

কিন্তু একটা বাধা উপস্থিত হইল। পুঁটিমারীর জমিদার রাজারাম লাহিড়ি দুর্ধর্ষ লোক। হারাধন দের বাড়িখানি উঠবন্দী জমিতে ছিল; জমিদার গণেশকে জানাইলেন, জমি মৌরসি না করিয়া সে ইমারত গাঁথিতে পারিবে না; গণেশও জানিত, উঠবন্দী জমিতে ইমারত প্রস্তুত করা নিরাপদ নহে। কিন্তু জমিদার তাহার বাস্তুজমি মৌরুসি করিয়া দিতে একদম পঞ্চাশটাকা 'সেলামি 'হাঁকিয়া বসিলেন! জমিদার লাহিড়ি মহাশয় জানিতেন, মুন্সেফী আদালতের ডিক্রি জারি মুহুরি পঞ্চাশ টাকা সেলামি দিতে কষ্ট বোধ করিবে না! পঞ্চাশ টাকা ত তাহার দশদিনের উপার্জন!

জামাতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাতকড়ি জামাতার প্রতি অধিকতর স্নেহবান হইয়া উঠিল। সে এখন মধ্যেমধ্যে জামাই-বাবাজির গৃহে পদধূলি প্রদান করে, এবং নানাবিষয়ে হিতোপদেশ দেয়। গণেশের দাদা সপরিবারে তাহার গলগ্রহ হইয়াছে, এবং তাহার বহুকষ্টে উপার্জিত টাকাগুলি পরের পেট ভরাইতেই ফুরাইয়া

যাইতেছে,- একথা সাতকড়ি গণেশের হৃদয়ঙ্গম করাইতে কোনদিন চেষ্টার ক্রটি করিল না। গণেশ প্রথম-প্রথম এইপ্রকার হিতোপদেশে কিছু বিরক্ত হইত। যে দাদা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তাহাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছে , নিজে উপবাসী থাকিয়া তাহাকে দুইবেলা আহার দিয়াছে, যে দাদা না থাকিলে সে 'মানুষ' হইতে পারিত না, সেই দাদাকে সে এখন উপার্জনক্ষম হইয়া প্রতিপালন করিতেছে,- ইহা ত তাহার কর্তব্যকর্ম। সুতরাং কার্তিক সংসারের কর্তৃত্ব করিতেছে ইহা গণেশের তেমন অস্বাভাবিক মনে হইত না। কিন্তু সাতকড়ি তাহাকে বুঝাইয়া দিল, — সে যাহা কর্তব্য মনে করিতেছে -— সেই কর্তব্য পালন করিতে করিতেই তাহাকে সর্বস্বান্ত হইতে হইবে।বিশেষত, কার্তিকের যখন দুই-চারটি 'কাচ্চা-বাচ্চা' হইবে, তখন তাহার সংসারের ভার বহন করা গণেশের দুঃসাধ্য হইবে। সুতরাং সময় থাকিতে সাবধান হওয়াই কর্তব্য।

কিন্তু কিরূপে সাবধান হওয়া যায়- গণেশ তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে গণেশ শ্বশুরের পরামর্শে একদিন কার্তিককে বলিল,"দাদা বাড়ির জমিটা মৌকুসী না করিলে ত পাকা ইমারত তৈয়ারি করা যায় না, আর তা উচিতও নয়। কিন্তু জমিটা মৌরুসি করিয়া দিতে জমিদার ৫০ টাকা নজর চান; খাজনাও বার্ষিক ছয় আনার জায়গায় তিন টাকা হইবে। জমিদার মশায় বলেন, তিনি যার কাছে নজরের টাকা পাইবেন, লেখাপড়াটা তাহারই নামে হইবে। আপনি যদি টাকাটা যোগাড় করিতে পারেন, তাহা হইলে লেখাপড়াটা আপনার নামেই হয়।"

কার্তিক মূর্খ মানুষ, বিশেষত সে একান্ত ভ্রাতৃবৎসল। গণেশ যে কোন গুপ্ত অভিসন্ধির বশবর্তী হইয়া এ কথা বলিল, তাহা সে ধারণা করিতেই পারিল না, সে গণেশকে বলিল, "আমি পঞ্চাশটাকা কোথায় পাব, ভাই? আমার বাপদাদারা কোনও পুরুষেপোকাঘরে শোন্‌নি। তুমিই ইমারত তৈয়েরি করিবার মতলব করেছ, জমিদারের সেলামিটাও তুমিই কোনও রকমে জোগাড় করে দাও; লেখাপড়া তোমার নামেই হোক। আমি ভাই ও সকল কিছু বুঝি না।"

পঞ্চাশ টাকা নজর পাইয়া জমিদার গণেশের নামেই মৌরুসিপাট্টা লিখিয়া

দিলেন। তখন পাকা ইমারতের গঠনোপযোগী মালমশলা সংগৃহীত হইতে লাগিল।

গণেশ বলিল,"দাদা কিছু ইঁট খরিদ করা যাক।"

কার্তিক বলিল," রাম:, ইঁট কিনে ইমারত দেওয়া কি আমাদের পোষায়? - তুমি দশ টাকা হাজার ইট কিনে বাড়ি তৈয়েরি করতে গেলে ফেরার হবে। আমি বলি কি, কিছু কয়লার যোগাড় কর, আমি ইট তৈয়েরি করিয়ে দিচ্ছি। তাতে হাজার-করা পাঁচটাকার বেশী খরচা হবে না। একলাখ ইট তৈয়েরি কর্তে তোমার বড়জোর পাঁচশো টাকা লাগবে। একটা পাঁজাপোড়ানোতে চারিদিকেই সুবিধা। সুরকির জন্যে আলাদা ইট কিনতে হবে না; খোয়া, রাবিস্, সকলই পাঁজাতে পাওয়া যাবে। এমন সুবিধা কি ছাড়তে আছে?"

গণেশ বলিল, "কিন্তু দাদা, তাতে বড় ঝঞ্ঝাট। কে দেখে, কে শোনে? আমি ত নথির তাড়া নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকি; বাড়িতে বস্তাবন্দি নজির বোঝা টেনে এনে কাজ শেষ করতে পারিনে। ইট তৈয়েরির হাঙ্গামা সব করে কে? দেখা—শোনার লোক কোথায়?"

কর্তিক সোৎসাহে বলিল, "সে জন্য তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না, ভাই! তুমি টাকার জোগাড় দেখ, অমি সব ঠিক করে দেব। মেহন্নত করতে আমি কোনও দিন কাতর নই। গতর খাটিয়ে যতটুকু যা হয়, আমি তা করতে পারবো।"

কার্তিক ইট প্রস্তুতের ভার লইল। কয়মাস তাহার পরিশ্রমের সীমা রহিল না। সে প্রাণপণ পরিশ্রমে এক লাখ ইটের একটি পাঁজা প্রস্তুত করাইল। ফাল্গুন মাসের শেষে যেদিন সে পাঁজায় আগুন দিল, সেদিন কার্তিকের স্ফূর্তি দেখে কে?

ইট পোড়ানো হইলে গণেশ একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাহার শ্বশুরকে বলিল, "দাদা খুব পরিশ্রম করে ইটগুলো পুড়িয়েছেন; নগদ টাকায় ইট কিনতে হলে মবলগ টাকা লেগে যেতো।"

গণেশের শ্বশুর বলিল, " হ্যাঁ তোমার দাদাকে পরিশ্রম করতে হয়েছে বই কি? পরিশ্রম ভিন্ন পৃথিবীতে কোন কাজটা হয়? তা তোমার দাদা যে

ব্যাগার দিয়েছে; তা মনে কোরো না। তোমার এই পাঁজার দৌলতে তোমার দাদার নিতান্ত কম করে ধরলেও, শতখানেক টাকা লাভ হয়েছে। স্বার্থ না থাকলে কি আর কেউ পরিশ্রম করে?"

গণেশ শ্বশুরের কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। ইট কিনলে তাহার বেশী টাকা খরচ হইবে বলিয়াই কি দাদা পাঁজা পুড়াইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে নাই ? সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, এ কোন কাজের কথা নয়!- দাদা মিথ্যা হিসাব দিয়ে আমার পয়সা চুরি করবে? মহাভারত!"

গণেশের শ্বশুর বলিল,"ঐ ত বাপু তোমার দোষ! তুমি মাথা খাটিয়ে, কায়দা করে দু'টাকা উপার্জন করতে পার বটে, কিন্তু আজও মানুষ চিনতে শেখনি। তোমার দাদা একটি 'চিজ্'। তুমি গরুর মত খাটচো, আর তিনি সপরিবারে ব'সে ব'সে 'পাতড়া মারচেন! আমি না জেনেশুনেই কি আর এতবড় কথাটা বলেছি? — তোমার দাদার শ্বশুর রাধু প্রামাণিক আমার একজন খাতক, তা জানো? আজ কয়েকদিন হ'লো তার কাছে পাওনা টাকা না পাওয়ায় দুই কিস্তি খেলাপের জন্য আমি ডিক্রি জারি করতে উদ্যত হই, তখন সে আমাকে একশত টাকা এনে দিলে; শুনলাম টাকাটা সে তার মেয়ের কাছে পেয়েছে। তা আর মেয়ে- তোমার দাদার স্ত্রী— এতটাকা কোথায় পেলে? তুমি বাবু তোমার দাদাকে যতখানি সরল মনে কর, সে তত সরল নয়।"

এরূপ অকাট্য প্রমাণ পাইয়া আর শ্বশুরের কথায় অবিশ্বাস করিতে গণেশের প্রবৃত্তি হইল না। ক্রমে দাদার উপর তাহার সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠিল; দাদার হাতে সে খরচের টাকা দেওয়া বন্ধ করিল। ইমারত প্রস্তুত হইতেছে, মিস্ত্রী ও মজুরের সঙ্গে সমস্ত দিন খাটিয়াই কার্তিক খুশী। গণেশ সন্ধ্যাকালে নথির বস্তা লইয়া বাড়ি আসিয়া মিস্ত্রিদের দৈনিক মজুরি স্বয়ং মিটাইয়া দিত; কার্তিকের তাহাতে অসন্তোষের কোনও কারণ ছিল না। — পাঁচছয় মাসের মধ্যেই ঘর প্রস্তুত হইয়া গেল।

।। পাঁচ ।।

গণেশ যে ইমারত প্রস্তুত করাইল,- তাহা তেমন বড় নহে; দুইটি কুঠরী এবং একটি দালান। দুইটি কুঠরির একটি গণেশর ও অন্যটি কার্তিকের বাসের জন্যে নির্দিষ্ট হইল।

মাসদুই পরে একদিন গণেশের স্ত্রী প্রভাবতী কার্তিকের স্ত্রী সৌদামিনীকে বলিল, "দিদি বাড়ীতে মোটে ত ছোট দুটি কুঠরি; তার একটা কুঠরিতে আমার কুলোয় না। তোমার দেওর বলছিলেন, তিনি তোমাদের জন্য ঐ গোয়ালখানার পাশে একখানা খড়োঘর তুলে দেবেন। আর ধরতে গেলে- এঘর বাড়ি ত তোমার দেওরের টাকাতেই হয়েছে; জমিজিরেতও তাঁর নামেই লেখাপড়া হয়েছিল। এত টাকা খরচ করে যে চিরকাল অসুবিধে সইব, তা কি করে হবে?"

সৌদামিনী একথার কোন জবাব দিল না; সে রাত্রিতে কার্তিককে সকল কথা বলিল। কার্তিক কথাগুলি শুনিয়া খনিকটা দম ধরিয়া থাকিল। হঠাৎ তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল; সে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অগত্যা বসিয়া বসিয়া দুই ছিলিম তামাক টানিল।তাহার পর ভগ্ন স্বরে স্ত্রীকে বলিল, "কথায় বলে, 'ভাই ভাই-ঠাঁইঠাঁই'।- দেহের রক্ত জল করে, শরীরপাত করে আমি এ বাড়ি তৈয়েরি করিয়েছি; পয়সা গণেশের বটে, কিন্তু কেবল পয়সাতেই কাজ হয় না। তা গণেশই এ বাড়িতে থাক, আমার ঘরে দরকার নেই। আমি পথ দেখছি।"

প্রভাবতী গাঁটা দিয়া ভাসুরের কথাগুলি শুনিল। কার্তিককে লক্ষ করিয়া বলিল, "বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপানা 'চক্কোর'! বসে বসে দুজনে 'পাতড়া' মারবেন, আর সরিকি করবেন! গতর খাটালেই যদি অট্টালিকা তৈয়েরি হতো, তা হলে এতকাল বাপদাদার আমল থেকে কুঁড়েঘরে বাস করতেন না।"

গণেশ একটা হ্যারিকেনের সামনে বসিয়া নথি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বলিল, "তা কি করি বল? দাদাকে ত আর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি নে।"

কথাটা সে নিতান্ত ছোট করিয়া বলে নাই। কার্তিক তখন বারান্দা দিয়া সুবল দাস বাবাজির আখড়ায় কীর্তনের দলে খোল বাজাইতে যাইতেছিল।

হঠাৎ গণেশের কথা কয়টি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে আর আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া বলিল,"তাড়াতে হবে না গণেশ! আমরাই পথ দেখচি তোমার বাড়িতে আমার কোন দখল নেই, তা কি আর অমি জানিনে?"

কার্তিক প্রস্থান করিলে প্রভাবতী সৌদামিনীর শ্রুতিগম্যস্বরে বলিল, "ওঃ, ভয়ে ত মরে গেলাম! কে এতকাল পথ দেখতে বারণ করেছিল? দু'পয়সা রোজগার করার ক্ষ্যামতা নেই, যোল আনা সড়িকি, আর আঠারো আনা রাগ! চিরদিন কে দুটো মানুষকে পুষতে পারে?"

সৌদামিনী সংসারের সকল কাজ করিত, রাঁধিবার ভারও তাহার উপরেই ছিল প্রভাবতীর শরীর খারাপ, আগুনের তাত তাহার সহ্য হইত না; এবং সখ করিয়া কোনদিন হেঁসেলে যাইলে উনানের ধোঁয়ায় তাহার মাথা ধরিত। আজ মনঃপীড়া পাইয়া সৌদামিনী রাত্রিতে আর রান্নাঘরে গেল না। স্বামীর উপর অভিমান করিয়া শুইয়া রহিল; কিন্তু সেই পাকা ঘরের মেঝের প্রতি ইঞ্চি স্থান যেন কেউটে সাপের মত ফণা তুলিয়া তাহাকে দংশন করিতে লাগিল।

প্রভাবতী গণেশকে বলিল, "দেখলে আক্কেলখানা? আমাদের জব্দ করার জন্যে আজ হেঁসেলে যাওয়া হলো না; এমন হিংসুটে মেয়েমানুষ ভূ-ভারতে কি আর দুটি আছে?- সেই বেলা ন'টার সময় আধসিদ্ধ ডাল-ভাত নাকে-মুখে গুঁজে গিয়েছ; রাতে কি খাবে সে কথাটা একবার ভাবলে না। আমাদের হয়েছে দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পোষা।"

গণেশ বলিল, "চিড়ে- মুড়ি কিছু থাকে তাই ভিজিয়ে দাও, দু'থাবা খেয়ে রাতটা ত কাটিয়ে দিই; কাল একটা উপায় করা যাবে।"

প্রভাবতী সানুনাসিকস্বরে বলিল, "উপায়ের অভাব কি?- কথায় বলে 'ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব!' — কতদিন থেকে মনে করছি, আমার মাসিমাকে কাছে আনিয়ে রাখি। সময়-অসময়ে ভাত-জল দেবে; তা রাজ্যের অপুষ্যি পুষতে তোমার কষ্ট হয় না, আমার মাসি যে দু'দিন এখানে এসে দাঁড়াবেন, তা তোমার সহ্য হয় না।"

আচ্ছা সেই ব্যবস্থাই কোরো, আজ রাত্রিটা ত গোহাক।" বলিয়া গণেশ

নথির বাণ্ডিল বাঁধিয়া তামাক সাজিতে বসিল। তাহার পর চিঁড়ার ফলার করিয়া শয্যায় দেহ প্রসারিত করিল। সংকীর্তন শেষ করিয়া গভীর রাত্রে কার্তিক বাড়ি আসিয়া দেখিল, ঘরে ভাত নাই; সৌদামিনী মেঝেয় পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

স্বামীকে দেখিয়া সৌদামিনী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া এবং সবেগে নাক ঝাড়িয়া বলিল, "একমুঠো ভাত দেওয়ারই যদি ক্ষমতা নেই, তবে বিয়ে করতে গিয়েছিলে কেন?"

কার্তিক দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "সে কেবল গণেশকে সংসারী করবার জন্যে। ভারি ভুল করে ফেলেছি। তা এখন ত শুধরাইবার উপায় নেই, এখন ঘরে কিছু খাবার টাবার আছে?"

সৌদামিনী বলিল," এ ঘরে কিছু নেই, ছোটবৌর ঘরে সাঙ্গার উপর হাঁড়িতে চিড়ে আছে,- আমি তা চাইতে পারবনা।"

কার্তিক বলিল,"তার আর দরকার নেই। আজ হরিমটর!"— স্বামী-স্ত্রী সে রাত্রে অনাহারে কাটাইল।

।। ৬।।

পরদিন প্রভাতে কার্তিক হুঁকাহাতে খড়ম পায়ে দিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল, "দেখ গণেশ, আমি চিরকাল যে বসে-বসে তোমার অন্ন ধ্বংস করি, - এটা ভাল দেখায় না। আমার শ্বশুর লিখেছিলেন, তাঁদের গ্রামে দত্তদের আড়তে খরিদ-বিক্রীর জন্যে একজন লোকের দরকার আছে, চেষ্টা করলে আমি সেকাজটা পেতে পারি। তা আমি একবার চেষ্টা করে দেখি। আজই আমি তোমাদের বৌকে সঙ্গে নিয়ে পুরন্দরপুরে যাচ্ছি।"

পুরন্দরপুর পুঁটিমারী হইতে তিনক্রোশ দূর, নদীপথে যাওয়া যায়। হাজিনগর হইতে পুঁটিমারি দুই ক্রোশ। — গণেশ 'বাইসিকলে' এই পথ অতিক্রম করিয়া বাড়ি হইতেই প্রতিদিন অফিসে যাতায়াত করিত।

কার্তিক একখানি ময়লা চাদর কাঁধে ফেলিয়া জেলেপাড়ার দিকে চলিল,

এবং বারো আনায় উমেশ হালদারের জেলেডিঙ্গিখানি ভাড়া করিয়া স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্যে বাড়ি ফিরিল।

সৌদামিনী পিতৃগৃহে যাইবার জন্য তাহার ক্ষুদ্র হলদে পোর্টম্যান্টটি সাজাইয়া, গাঁটরি বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিল। আজ সে 'হেঁসেলের' দিকে যায় নাই। এই একদিনেই সংসারের প্রতি সে বীতস্পৃহ হইয়া উঠিয়াছিল। সে' কি চিরকাল রাঁধুনিগিরি করিবার জন্য তাহার দেবরের সংসারে আসিয়াছে? স্বামীর উপার্জ্জনে অক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়া সে সর্বদাই মর্মপীড়া ভোগ করিত। এক একবার তাহার মনে হইত, পরিবার প্রতিপালনে যাহার শক্তি নাই সে কেন বিবাহ করে? ভাগ্যে তাহার সন্তানাদি হয় নাই! যদি তাহার গর্ভে দুই-একটি ছেলে-মেয়ে জন্মিত, তাহা হইলে তাহাদিগকে কিরূপে প্রতিপালন করিবে,— এই চিন্তায় সেই সন্তানহীনা যুবতীর সন্তানলাভের আগ্রহ তিরোহিত হইত। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিত, "না হয়েছে, বেশ হয়েছে!"- কিন্তু তথাপি সে যখন দেখিত, তাহার দেবরের ছয় বৎসরের মেয়ে হৈমবতী তাহার মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া সোহাগ করিয়া চুমো খাইতেছে, বা মায়ের নিকট কত আবদার করিতেছে,- তখন মুহূর্তের জন্য অপরিতৃপ্ত বাৎসল্যরস তাহার হৃদয়ে কি অতৃপ্তি, কি অভাব জাগাইয়া তুলিত, আমরা পুরুষ-লেখক তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা কোথায় পাইব?সৌদামিনী কখন কখন হৈমবতীকে কোলে তুলিয়া লইত, তাহাকে সোহাগ করিয়া, নানাপ্রকারে তাহার মনোরঞ্জন করিয়া, তাহার শূন্যহৃদয়ের অপূর্ণতা দূর করিবার চেষ্টা করিত। হৈমবতী জ্যাঠাইমার বড়ই বশীভূতা ছিল।

নিষ্কর্মা কার্তিক হৈমবতীক প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়াছিল। 'জেঠামশায় তাহাকে তেল মাখাইয়া কোলে লইয়া নদী হইতে স্নান করাইয়া আনিত; গাছে উঠিয়া পাকাপাকা পেয়ারা পাড়িয়া দিত; তাহাকে সঙ্গে লইয়া বসিয়া খাইত। জেঠামশায়ের সঙ্গে না খাইলে তাহার পেট ভরিত না। জেঠামশায় তাহাকে কাপড় পরাইয়া না দিলে কাপড়পরা মঞ্জুর হইত না। সুতরাং জেঠামশায় ও জেঠাইমা যখন মাঝির মাথায় মোট দিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিল — তখন হৈমবতী জেঠামশায়কে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কোতায়

যাচ্ছ, জেঠামশায় আমি যাবো।" কার্তিক হৈমবতীকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন,"না মা! সে অনেক দূর, সেখানে যায় না।" কার্তিকের আপত্তি দেখিয়া সে আরও বাঁকিয়া বসিল। সে তাহার কোল হইতে নামিতে চাহিল না।

গণেশের কাছারির বেলা হইয়াছিল, সে তখন আহারে বসিয়াছিল। দাদার ব্যবহারে সে মনে মনে তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু ঘাড় হইতে এতবড় একটা বোঝা অতি সহজে নামিয়া গেল দেখিয়া , সে যে যথেষ্ট আরাম অনুভব করে নাই, এ কথাও বলা যায় না। সে খাইতে খাইতে মেয়েকে ডাকিয়া বলিল,"খুকি, কেন গোলমাল কচ্ছিস্? অয়, আমার সঙ্গে ভাত খেতে।"- অন্যদিন হইলে হয় ত সে যাইত, কিন্তু সে আজ সে কথা গ্রাহ্যও করিল না।

আজ প্রভাবতীর আগুনের আঁচে তেমন কষ্ট হয় নাই; সে সকালে উঠিয়াই স্বামীর কাছারীর ভাত রাঁধিতে রান্নাঘার প্রবেশ করিয়াছিল। সে ঘোমটা টানিয়া, নথ ঘুরাইয়া, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ডাকিল, "হেমা এদিকে আয় বলছি। কোন চুলোয় যাবেন, তার ঠিক নেই।"

এবার কার্তিক জোর করিয়া ভাইঝিকে মাটিতে নামাইয়া দিল। সে মাটিতে পড়িয়া দুই পা দাপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,"জেঠামশায় আমাকে নিয়ে যাও, জেঠামশায়! তোমার পায়ে পড়ি, জেঠামশায়!"

কার্তিক সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া পত্নীসহ দ্রুত বাড়ির বাহির হইয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিল। সৌদামিনীর চক্ষুদুটিও ছলছল করিতেছিল। সে একবার সতৃষ্ণ নয়নে তাহার বাসগৃহের দিকে চাহিয়া বনচ্ছায়াশ্যামল নদীর পথে অগ্রসর হইল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নিঃশব্দে চলিতে লাগিল। বহু দূর হইতে প্রভাতবায়ুতে যেন সেই ভূমিলুণ্ঠিতা, রুদ্যমানা, ব্যথিতা বালিকার মর্মভেদী আর্তনাদ ভাসিয়া আসিয়া তাহাদের কর্ণমূলে প্রবেশ করিতে লাগিল, "আমাকে নিয়ে যাও, জেঠামশায় তোমার পায়ে পড়ি!"

।। সাত ।।

কার্তিকের শ্বশুরের স্ত্রী ভিন্ন আপনার বলিতে সংসারে আর কেহ ছিল না। তাহার পর্ণকুটিরে আসিয়া কার্তিক ও সৌদামিনীর দিন একরকম সুখেদুঃখে কাটিতে লাগিল। পুরন্দরপুরের দত্তদের আড়তে কার্তিক আট টাকা বেতনের একটি চাকরি পাইয়াছিল; পাইকেরদের মালপত্তর ওজন করিয়া দিতে হইত, এবঃ বিভিন্ন গ্রামে পাইকেরদের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া প্রাপ্য টাকার তাগাদা করিতে হইত।

পুঁটিমারি গ্রামেও দত্তদের পাইক ছিল। পুঁটিমারির প্রামাণিক ও বসাক মহাশয়েরা বনিয়াদী তন্তুবায়। যাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা বলেন, "গৌরদাস বসাক আমাদের 'আজা মশায়' হইতেন" যাঁহারা শিক্ষিত হন নাই, তাঁহারা মামাতো ভই বা খুড়তুতো দাদা কালাচাঁদ বসাক উকীল মহাশয়ের ফরাসে বসিতে পান না,- 'কলকে পাওয়া'ত দূরের কথা! — অগত্যা তাহারা ঘরে বসিয়া তাঁত বোনেন, কেহ বা 'অটোনিটার'কল আনাইয়া মোজা বোনেন, এবং স্বদেশী মোজা ফ্যাক্টরী বলিয়া রাস্তায় 'প্ল্যাকার্ড' মারেন। ইহাদের অনেকেই পুরন্দরপুরের দত্তদের পাইকের।

কার্তিক মধ্যে মধ্যে পুঁটিমারিতে তাগাদায় যাইত, বোধ করি একটু ঘন ঘনই যাইত। সে যখন যাইত, — একবার 'গণেশের বাড়ীতে প্রবেশ করিত;— তাগাদার জন্য নহে — তাহার ভাই-ঝি হৈমবতীকে দেখিবার জন্য। হৈমবতীর জন্য তাহার হৃদয় সর্বক্ষণ হাহাকার করিত। সে কখন দু'টি রসগোল্লা,কখন দু'খানা বড় জিলিপি লইয়া, চোরের মত তাহার আজন্মের বাড়িতে প্রবেশ করিয়া কম্পিতকণ্ঠে ডাকিত, "হেমা" হৈমবতী উত্তর না দিলে তাহার বুকের মধ্যে দুরুদুরু করিয়া উঠিত। হেমা ভালো আছে ত?— যদি হঠাৎ সে ছুটিয়া গিয়া "জেঠামশায় এসেছেরে!" বলিয়া তাহার ধূলিধূসারিত, মলিনবস্ত্রাচ্ছাদিত জানু ধরিয়া, বিস্ফারিত-নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার কোলে উঠিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত, তাহা হইলে'কার্তিকের মুখে হৃদয়ের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। কার্তিক তাহাকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিত। বহু কষ্টে সে

তাহাকে কোল হইতে নামাইয়া, সন্দেশ দুটি হাতে দিয়া, যখন গৃহত্যাগ করিত, তখন তাহার বুকের ভিতর হইতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠিয়া শূন্যে মিলাইত, তাহা সে বুঝিতে পারিত না।

একদিন প্রাচীরর বাহিরে আসিয়া সে ভ্রাতৃবধূর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল, "মিন্‌সে নিত্যি আসেন, মায়া দেখাতে! ভেবেছেন এমনই করে ভুলিয়ে আবার এ বাড়িতে ঢুকবেন। তা হচ্ছেনা! একদিন মুখের মত জবাব পাবেন। এসে আবার হুঁকো-কলকের খোঁজ করা হয়! বেহায়া মিন্‌সে! — ও সন্দেশ ফেলে দে, হেমা! তোকে ওসুদ-টোসুদ করবে ব'লে সন্দেশ দিয়েচে। বিশ্বাস কি? ফ্যাল্ বলচি!"

হেমা সন্দেশ দ'টি দুইহাতে বুকের মধ্যে আঁকড়িয়া ধরিয়া কাঁদো-কাঁদো মুখে বলিল, "জ্যাঠামশায় দিয়েছে আমি খাবো। আমি ফেল্‌বো না।"

মুহূর্তপরে হেমারপৃষ্ঠে সবেগে চপেটাঘাত ও তাহার হাত হইতে সন্দেশের ভূপতন! ভোলা কুকুরটা এক লাফে আসিয়া তাহা গ্রাস করিল। তাহার পর লাঙ্গুল আন্দোলিত করিতে করিতে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে হেমার মুখের দিকে চাহিয়া ডাকিল,-"ভাউ।"

প্রাচীরের বাহিরে কার্তিক ক্ষণকাল বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর মাতালের মত টলিতে টলিতে চলিয়া গেল। পাঁচ বৎসরের মধ্যে কার্তিক আর পুঁটিমারির বাড়ীতে প্রবেশ করে নাই! এই পাঁচ বৎসরে তাহার চুল অনেক পাকিয়া গেল। যৌবনেই তাহাকে বুড়া বোধ হইতে লাগিল । এক-একদিন সে স্বপ্নাঘোরে কাতর কণ্ঠে ডাকিত, "হেমা! হেমা!"

।। আট ।।

পাঁচ বৎসর পরে হৈমবতীর বিবাহ। গণেশ তখন মুন্সেফী আদালতের পেস্কারী লাভ করিয়া, দুইহাতে উপরি লুটিয়া লাল হইয়া গিয়াছিল। পূর্বাবস্থার কথা আর তাহার মনে ছিল না। কার্তিক নামে তাহার একটি বর্ণজ্ঞানহীন, ভদ্রসমাজে বসিবার অযোগ্য, অসভ্য দাদা আছে, — এ কথা মনে হইলে তাহার মুখ

লজ্জায় লাল হইয়া উঠিত। হৈমবতীর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, সে তাহার মূর্খ দাদার সহিত পরামর্শ করা অতি অপমানজনক মনে করিল। তাহাকে সংবাদ পর্যন্ত দিল না।

তিনক্রোশ দূরে চিংড়িপোতা গ্রামে , নরহরি বিশ্বাসের জ্যেষ্ঠপুত্র ভজহরির সহিত হৈমবতীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। নরহরি বিশ্বাস গ্রামের একজন মাতব্বর গৃহস্থ। বাড়িটি পাকা, এবং ছেলেটি চিংড়িপোতার মাইনর ইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ক্রমাগত তিনবৎসরকাল অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যার বনিয়াদ পাকা করিতেছিল। বিশেষত, নরহরি সঙ্গতিপন্ন মহাজন ও প্রচণ্ড সুদখোর বলিয়া সন্নিহিত পল্লীসমূহে অসামান্য প্রতিপত্তি সঞ্চয় করিয়াছিল। সুতরাং গণেশচন্দ্র কিছুদিন যাবৎ মহা উৎসাহে কলা-মূলার মত তাহার পুত্রের দরদস্তুর করিয়া। অবশেষে অনেক বেশী দাম দিয়া ভজহরিকে কিনিয়া লইল; — বিবাহের কথা পাকা হইয়া গেল।

আষাঢ় মাসে বিবাহ। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে গণেশচন্দ্র চিংড়িপোতায় ঘরবর দেখিতে গেল।পাঁচটাকা দিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করা হইল; সঙ্গে চলিলেন, গণেশচন্দ্রের জেঠ্শ্বশুরের ভায়রাভাইয়ের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত পঙ্কজলোচন মজুমদার L. A. F. (অস্যার্থএল,এ, ফেল, — ইনি তাঁহার পিতাঠাকুর চাঁদপুরস্থ দাঁয়ের দোকানের গোমস্তা রামচন্দ্র মজুমদারকে পত্র লিখিবার সময় নিজের নামের শেষে এই লেজুড় জুড়িয়া দিতেন)। পঙ্কজলোচন বাবু বহুদিন হইতে হাজিনগর এন্ট্রেন্স স্কুলে চতুর্থ-শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন; শিক্ষকতা করিতেন বলিলে, সত্যের অপলাপ করা হইবে; কারণ তিনি হাজীনগর স্কুলের সম্পাদক উকিল ক্ষুদিরামবাবুর সর্বশ্রেষ্ঠ মোসাহেব ছিলেন। রাত্রে উকিল বাবুর সহিত পাশা খেলিতেন, প্রভাতে গৃহস্থালীর কাজ দেখিতেন, মধ্যাহ্নে ক্লাসে বসিয়া ঝিমাইতেন। কখন-কখন নিদ্রা অপরিহার্য হইয়া উঠিলে- সম্মুখস্থ টেবিলে পা তুলিয়া দিয়া, চেয়ারে ঠেস্ দিয়া 'হা' করিয়া ঘুমাইতেন; এবং হঠাৎ চৈতন্যোদয় হইলে ছাত্রবৃন্দকে 'লেখ্‌রে লেখ্ বলেয়া হুঙ্কার দিয়া নাসাগর্জন আরম্ভ করিতেন। একদিন হেডমাস্টার তাহাকে এবম্বিধ অবস্থায় দেখিয়া, তাঁহাকে ডাকিয়া ঘুম

ভাঙাইলেন; সমগ্র ছাত্রমণ্ডলীর সম্মুখে তাঁহাকে তিরস্কার না করিয়া বলিলেন, "চেয়ারে ঠেস দিয়াও ত মাস্টার মশায় বেশ ঘুমাইতে পারেন!" -পঙ্কজলোচন মুখব্যাদানপূর্বক আকণ্ঠ-প্রসারিত হাই তুলিয়া দক্ষিণ হস্তে সবেগে তুড়ি দিয়া বলিলেন, "তবু ত মাথায় বালিশ ছিল না!" হেডমাস্টার স্কুলের সেক্রেটারি ক্ষুদিরাম বাবুর নিকটে গিয়া পঙ্কজলোচনের নিদ্রালুতার কাহিনী বর্ণনা করিয়া, বালিসের রহস্য ভেদ করিলে- খুদিরাম বাবু মুখবিবর হইতে ধূমপুঞ্জ নিঃসারিত করিয়া বলিলেন, "লোকটা ভারী রসিক, ঐ গুণেই আমি ওকে ভালোবাসি। কথাটার দাম লাখ্ টাকা! বাদশার মজলিসে এমন কথা বললে একখান জায়গির বক্শিস হয়ো যেতো।"

এহেন রসিক পঙ্কজলোচন,— গণেশচন্দ্রের সঙ্গী হইলেন। ভবজলধি বাবু হাজিনগরের ফৌজদারি আদালতে মোক্তারী করিতেন,- তিনিও সঙ্গী হইলেন। ভবজলধি খ্যাতনামা মোক্তার; তাঁহার তেজস্বিনী বক্তৃতায় ভীত হইয়া হাকিম তাঁহাকে মামলা জিতাইয়া দেন, হাজিনগরের জনসাধারণের মনে এইরূপ ধারণা ছিল। তিনি একটু নাকি সুরে কথা কহিতেন। শওয়াল-জবাবে সুদক্ষ ছিলেন বলিয়া গণেশ তাঁহাকেও সঙ্গে লইল। গণেশচন্দ্রের মুরুব্বী গ্রামবিগ্রহ গোপালদেবের পুরোহিত হরচন্দ্র 'দাদাঠাকুর' মহাশযও পাত্র আশীর্বাদ করিবার জন্য গণেশচন্দ্রের সঙ্গে চলিলেন।

হরচন্দ্র দাদাঠাকুর কিন্তু সরল প্রকৃতির লোক; এই বৈষয়িকেরা তাঁহাকে 'বোকা' বলিত। কেহ কেহ মজা দেখিবার জন্য একদিন বলিল,—"হরচন্দ্র দা তুমি না কি নানারকম মন্ত্রতন্ত্র জান; আচ্ছা ঐ বোলতার চাকখানাতে তোমার লাঠির খোঁচা দেও দেখি!"

হরচন্দ্র তৎক্ষণাৎ টিকিতে ভালো করিয়া গেড়ো দিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তোমরা সব সরে যাও! বোল্তায় তাড়া করবে কিন্তু-" সঙ্গে সঙ্গে হরচন্দ্র বোলতার চাকে এক খোঁচা দিলেন। দর্শকগণ উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। সুতরাং ক্রুদ্ধ বোলতাগুলো বোঁ বোঁ শব্দে ছুটিয়া আসিয়া হরচন্দ্রের সর্বশরীরে 'হুল' চালনা করিল। হরচন্দ্র লাঠি ফেলিয়া দিয়া, কাঁধের চাদর ঝাড়িতে ঝাড়িতে

নৃত্য করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন," ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা,ওঃ,— খেয়ে ফেল্লে রে বাবা!" কিছুকাল পরে মজা-উপভোগলিপ্সু ভদ্রসন্তানেরা সেই স্থানে আসিয়া সমবেদনাভরে বলিলেন, "আহা হরচন্দ্রদাকে আধমরা করেছে; বোলতার হুলের চোটে দাদাঠাকুরের গাল, কপাল ফুলে উঠেছে!"- হরচন্দ্রদাদা হাসিয়া বলিলেন," ফোলে, কিন্তু জ্বলে না!" -এইরূপ অদ্ভুত ক্ষমতাশালী দাদাঠাকুরও ঘোড়ার গাড়ির সোয়ারি হইলেন।

গাড়ীতে উঠিবার সময় দাদাঠাকুর গণেশকে বলিলেন," আহা মস্ত একটা ভুল হয়ে গেল!- কার্তিককে খবরটা দেওয়া হলো না?- সে হ'লো মেয়ের জ্যাঠা।"

গণেশ কার্তিকের প্রসঙ্গে চটিয়া আগুন হইয়া বলিল,"তোমার যেমন কাণ্ডজ্ঞান নেই, দা-ঠাকুর! ভদ্দরলোকের বাড়ি তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাচ্ছ? তার ফাটা-পা নিয়ে যখন বেয়াই-মশায়ের ফরাসে বসবে; তখন আমার কি বল্‌তে ইচ্ছা হবে না,-'মা বসুন্ধরে তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি।"

দাদাঠাকুর বলিলেন,"তা না নেও চল; কিন্তু মা বসুন্ধরা তোমার আবদার শুনবেন না; অনেক পাপিষ্ঠকে বুকে বয়ে বয়ে তাঁর বুক পাষাণ হয়ে গিয়েছে।"

পাকাদেখা শেষ হইলে, আষাঢ় মাসের যে দিন হৈমবতীর বিবাহ, তাহার পূর্বদিন সকালে গণেশের নাপিত ঈশ্বর পরামাণিক একখানি পত্র লইয়া পুরন্দরপুরে উপস্থিত হইল, এবং পত্রখানি কার্তিকের হস্তে প্রদান করিল। ইহা তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র; পত্রের নিচে লেখা ছিল-"লৌকিকতা গ্রহণে অক্ষম বিধায় ত্রুটি মার্জনা করিবেন।"

কার্তিক পত্রখানি পাঠ করিয়া দোকানের একটা বস্তার উপর বসিয়া পড়িল; তাহার প্রাণাধিকা ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ, অথচ এ পর্যন্ত তাহাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করা হয় নাই! আজ সে কুটুমের মত নিমন্ত্রিত হইতেছে। এই ভাইকে সে নিজে না খাইয়া মানুষ করিয়াছে; স্বয়ং মোট-বহিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছে। তাহার দুই চক্ষুতে দুইবিন্দু অভিমানের অশ্রু দেখা দিল।

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কার্তিক মনিবের নিকট হইতে ছুটি লইয়া বাড়ী গেল; নিমন্ত্রণপত্রের কথা স্ত্রীকে বলিয়া, কি দেওয়া যায় এবং বিবাহে যাওয়া উচিৎ কি না, তৎসম্বন্ধে স্ত্রীর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল।

সৌদামিনী বলিল,'মেয়ের বিয়ে, ঠাকুরপো একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে না; আমাদের নিয়ে যাবার নামটি নেই। এক নেমন্তন্নপত্র পাঠিয়েই দায় সেরেছে! সেখানে কখন যাওয়া উচিৎ নয়। যদি তুমি রোজগেরে ভাই হ্তে, তা হ'লে কি এমন হেনেস্তা করতে পারতো? তবে কিছু নকুতা পাঠাতে হবে।- একখান বগিথাল কিনে একথাল সন্দেশ গোবিন্দর মাকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও!

হাতে টাকা ছিল না, কার্তিক তাহার সোনার অঙ্গুরীটি বাঁধা দিয়া আটটি টাকা আনিল; এবং রামহরি নন্দনের দোকান হইতে এক্খানি খাগড়াই বগিথাল ছয়টাকা দিয়া কিনিয়া অনিয়া দু'টাকার রসগোল্লাসহ 'আইবুড়ো ভাত' পাঠাইল। —সেইদিনই হৈমতীর বিবাহ।

গোবিন্দর মা প্রত্যুষে বাহির হইয়া বেলা দশটার সময় ঘর্মাক্ত কলেবরে গণেশচন্দ্রের উৎসব ভবনে উপস্থিত হইল ভাসুরের নিকট হইতে বিবাহের তত্ত্ব আসিয়াছে শুনিয়া গণেশপত্নী প্রভাবতী বাহিরে আসিয়া একবার অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে রসগোল্লাপূর্ণ থালখানার দিকে চাহিল; তাহার পর নথ সরাইয়া বলিল,"ভাইঝির বিয়ে, নিজে এলেন না, তত্ত্ব পাঠিয়েছেন! লোক- দেখানো বড়মান্‌সি! — তা,ও তত্ত্ব নিয়ে আমি খোঁটা সইতে পারবো না। যার ইচ্ছে হয় সে রাখুক ওগুলো; আমি ঘরে তুলচি নে।"

'যার ইচ্ছা হয় সে' অর্থ গণেশ! — গণেশ আসিয়া বলিল, — ওঃ দাদার কি দরদ!— না গো বাছা, ও তত্ত্ব তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও, দু টাকার জিনিস রেখে পরে কে দশকথা শুন্‌বে? তোমাদের কর্তাকে বোলো, আমি আমার মেয়ের বিয়েতে জ্ঞাতি-কুটুম্বদের কাছে নকুতা চাই নে।"

গোবিন্দর মা যে-মুখে আসিয়াছিল, সেই-মুখে চলিয়া গেল। একমুঠো চিড়ে-মুড়কীও তাহার ভাগ্যে জুটিল না।

দেবর তত্ত্ব ফেরত দিয়াছে দেখিয়া সৌদামিনী অভিমানে, অপমানে অভিভূত হইয়া পড়িল; স্বামীকে বলিল,"তোমার চাকুরে ভাই গরিবের তত্ত্ব ফেরত দিয়েছে! এত অহঙ্কার, ভগবান কি এর বিচার করবেন না?"

কার্তিক বলিল, "তার যা ভালো মনে হয়েছে, তা করেছে। আমি হেমাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি; আজ তার বিয়ে, আজ বড় আনন্দের দিন, গিন্নি; ভগবান গণেশের মঙ্গল করুন, সে আমাদের যতই অপমান করুক , অশ্রদ্ধা করুক, আমরা যেন কখন তার মন্দ চিন্তা না করি।"

কিন্তু মুখে এ কথা বলিলেও, সহোদরের ব্যবহারে কার্তিকের চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইতে লাগিল; কোনরকমে আত্মসংবরণ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইল। সে তাহার দারিদ্র্যযন্ত্রণা মর্মে মর্মে অনুভব করিতে লাগিল। আজ হৈমবতীর বিবাহ, এমন দিনে সে একবার তাহাকে চোখেও দেখিতে পাইল না। কার্তিক অন্তর্যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তাহার মনের কষ্ট কাহাকেও বুঝাইবার নহে; মনের বেদনা সে কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না।

কার্তিক সমস্ত দিন অস্থিরভাবে এদিকে-ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়া, অপরাহ্নকালে তাহার ময়লা চাদরখানি কাঁধে ফেলিয়া, মোটা লাঠিগাছটা হাতে লইয়া পুঁটিমারি গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। রাত্রি চারিদণ্ড উত্তীর্ণ হইলে সে আলোক-সমুজ্জ্বল উৎসব-ভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

তখন গণেশের গৃহে মহাসমারোহ। বিবাহ আরম্ভ হইয়াছিল। বরযাত্রী, কন্যাযাত্রী বিবাহ সভায় বসিয়া নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিয়াছেন; ডাবাহুকায় ঘনঘন তামাক চলিতেছে। বাহিরে চাটাই ও মাদুরের উপর ঢুলি-বাদ্যকরেরা বসিয়া গাঁজায় দম দিতেছে। রসুন-চৌকির দল আটচালা- ঘরের দাওয়ায় বসিয়া একটি মিষ্টি গৎ বাজাইতেছে;- এবং অন্তঃপুর হইতে বহু রমণীর কণ্ঠে কণ্ঠে ঘনঘন হুলুধ্বনি উত্থিত হইতেছে।

কার্তিক সকলের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া বিবাহসভার একপাশে গিয়া দাঁড়াইল। এবং নির্নিমেষ নেত্রে হৈমবতীর দিকে চাহিয়া রহিল। হৈমবতীর মুখ তখন লাল চেলির অবগুণ্ঠনে আবৃত; সে জ্যাঠামহাশয়কে দেখিতে পাইল না।

বিবাহ শেষ হইলে, পুরোহিত বলিলেন, "গণেশ এখন মেয়েজামাইকে বরণ করিয়া ঘরে তোল। গুরুজন যে যে উপস্থিত আছেন, সকলেই বর-কনেকে আশীর্বাদ করুন।"

তখন কার্তিক আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে সমাগত বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীর ভিড় ঠেলিয়া ছাতনাতলায় গিয়া দাঁড়াইল, এবং বরণডালা হইতে ধানদূর্বা তুলিয়া লইয়া হৈমবতীর মাথায় দিয়া অবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "মা আশীর্বাদ করি, জন্ম-'এয়োস্ত্রী'হও, পাকা চুলে সিঁদুর পর, হাতের নোয়া অক্ষয় হোক; আমি তোর গরিব জেঠা, আমার আর কি সম্বল আছে, যে তাই দিয়ে মা তোকে আশীর্বাদ করবো?"

এমনস্থানে এমনভাবে জেঠাকে দেখিতে পাইবে হৈমবতী তাহা একবারও ভাবিতে পারে নাই। সে মুখ তুলিয়া চকিতনেত্রে জেঠার মুখের দিকে চাহিল। স্থান কাল সে বিস্মৃত হইল, লাল চেলির অবগুণ্ঠন মাথা হইতে খসিয়া পড়িল। তাহার ইচ্ছা হইল, সে ছেলেবেলার মত তাহার জেঠার কোলে লাফাইয়া উঠিয়া, তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া লয়! কিন্তু সে তাহা পারিল না, লজ্জা আসিয়া বাধা দিল; তাহার কজ্জলরঞ্জিত চক্ষু হইতে অশ্রুধারা ঝরিয়া গণ্ডস্থিত চন্দনচর্চা ধৌত করিল। চোখের জলে তাহার অবগুণ্ঠন ভিজিয়া গেল; সে চারিদিক ঝাপ্‌সা দেখিতে লাগিল।

কিন্তু এমন স্থানে, এমন সময়ে, মলিন-বস্ত্রপরিহিত সেই অসভ্য চাষাটাকে উপস্থিত দেখিয়া বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী উভয়পক্ষই বিস্ময় স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল! লজ্জায়, ঘৃণায় গণেশের মাথা যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল! — গণেশের বৈবাহিক নরহরি বিশ্বাস কার্তিককে চিনিত না। সে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা বরিল, "এ লোকটা কে হে, ব্যাই!"

গণেশ উত্তর দিবার পূর্বেই কার্তিক বলিল,"কেমন করে চিনবে মশাই! মাথায় মোট ব'য়ে যাকে মানুষ করেছি, সেই যে চেনে না!"

তাহার পর সে নৈশ অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হইল — কেহ দেখিতে পাইল না; এবং কেহ তাহার সন্ধান লওয়াও আবশ্যক মনে করিল না।

দেবদূত

রাসবিহারী মণ্ডল

।। ১।।

সে যেন শুধু আমাদের পথটুকু সরল করে দেবার জন্যই কোন্ স্বর্গ হতে ছিটকে এসে আমাদের সংসারের মাঝে পড়েছিল। সে যদি তার ফুলের মত কচি হাত দুখানি প্রসারণ করে, ব্যবধান-পথে সেতুর মত আমাদের মধ্যে এসে না দাঁড়াত,হয়ত বা লক্ষ্যভ্রষ্টের ব্রত আমাদের জীবনস্রোতের গতি ভিন্ন পথে ফিরে যেত।

সে আজ অনেকদিনের কথা। প্রথম যখন তাকে আমি দেখি, তখন সবে আমার জীবনের প্রথম প্রভাত। অজ্ঞাতে হৃদয়ের মাঝে কে যেন ধীরে-ধীরে একটা সোনালি তুলি বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল, — নয়নে সৌন্দর্যের অঞ্জন পরিয়ে দিয়েছিল, যার স্পর্শে সংসারের সমস্ত সৌন্দর্যই যেন কেন্দ্রীভূত হয়ে সম্মোহনরূপ আমার নয়ন সম্মুখে ভেসে উঠত। হৃদয়খানা যেন এক বিচিত্র পুষ্পাস্তরণে পরিণত হ'য়ে তার প্রস্ফুটিত প্রসূনরাজির সৌরভে আমায় আকুল করে তুলত'। আমি সেই স্তূপীকৃত অসংখ্য ফুলরাশির ভারে অবনত হ'য়ে কার, কোন্ দেবতার চরণে অঞ্জলি দেবার জন্য শুধু অপক্ষোয় আকুল আগ্রহে পথ চেয়ে থাকতুম, পাছে সে সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলরাশির সৌরভটুকু সমীর-প্রবাহে মিশিয়ে যায়, - পাছে তার আসার পূর্বেই তা ম্লান হয়ে যায়।

দেবতা দর্শন দিলেন আমাদেরই বাড়িতে। আমি যে ডালি নিয়ে এতদিন ধরে অপেক্ষায়-অপেক্ষায় কাল কাটাচ্ছিলুম, প্রথম দর্শনেই সে প্রসূন সম্ভার তাঁর চরণ প্রান্তে ঢেলে দিলুম। তিনি কিন্তু তা গ্রহণ করেছিলেন কি না জানি না, মরুকগে তা জান্‌বারই বা আমার কি প্রয়োজন ছিল? সে বয়সে যে কেবল 'আত্মদানেই তৃপ্তি! — নিজের জন্য নিজের বলতে কোন কিছু রাখবার আকাঙ্ক্ষাও ছিল না, অবসরও ছিল না।

তিনি আমার দিদির দেবর। দিদি সন্তান-সম্ভাবনায় বাড়ি এসেছিলেন,

তাই তিনি কলেজের ছুটিতে দিদিকে দেখতে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। দিদি আমার বিদ্যাবুদ্ধির অনেক পরিচয় দিলেন,— রূপেরও যথেষ্ট প্রশংসা করলেন। আমি লজ্জায় লাল হয়ে নেয়ে উঠলুম। তিনি আমার দুরবস্থা দেখে মৃদ-মৃদু হাস্‌তে লাগলেন। আমার বড় লজ্জা করতে লাগল; - কিন্তু সে ভুবন-ভোলানো হাসিটুকু দেখবার প্রলোভন ত্যাগ করে ত' আমি ঘর হতে উঠে যেতেও পারলুম না! কি সরল, সুন্দর হাসিটুকু! সেই হাসিটুকু সম্বল করেই যে এখন এই জীবনের পথ ধরে চলেছি।

মধ্যাহ্নে বাবা, মা ও দিদি বাবার ঘরে বসেছিলেন,—বাবা তামাক খাচ্ছিলেন। আমি দু'তিনবার মিথ্যা অছিলা করে, পাশের ঘরটায় গিয়ে দেখে এলুম, তিনি ঘুমুচ্ছেন। ফিরে এসে বারান্দার রেলিঙ ধরে দাঁড়াতেই শুনলুম বাবা দিদিকে ওঁর নাম করে বলছেন, "সুধার সঙ্গে আমাদের এর বিয়ে হ'লে বেশ মানায়, না সরো?" মা বললেন, "আমি অনেক দিন ধরেই মনে করেছিলুম,— ছেলেটিকে দেখে আমার ভারী পছন্দ হয়েছে বাছা! আহা! যেমন চেহারা, তেমনি লেখাপড়ায়! সরো! তোমাকে মা, জামাইয়ের মত করাতেই হবে;— ঘরে এমন পাত্র থাকতে, কোথায় দোরে দোরে ঘুরতে যাবো?" দিদি হাসতে-হাসতে বললেন, "মা! তাঁর মতের জন্য ত' ভাবনা নেই ছেলের মত করাতে পারলেই হয়! আমার শ্বশুর শাশুড়ি নেই, — শেষকালে না আমাদের দোষে। তবে আমার খুব অনুগত, — কথা ঠেলবে না বোধহয়।"

মা একটা আশ্বাসের নিশ্বাস ফেলে বল্লেন, "হাঁ মা তুমি একটু মনোযাগ কর। আর আমার সুধাও ত' বাছা কাল-কুৎসিত নয়, যে অপছন্দ হবে!"

"না অপছন্দ বোধ হয় হবে না। তবে আজ-কাল যে এক বায়না ধরেছে — বি-এ পাশ করে বিলেত যাবে।"

বাবা বলে উঠলেন, "বেশ ত'— বিয়ে থা করে যাবে। সুধাও আমাদের বেশ লেখাপড়া শিখেছে। বিয়ের পরও সে যাতে ভাল রকম শিখতে পারে, আমি তার বন্দোবস্ত করে দেব।"

দিদি হাসতে হাসতে বল্লেন "সর্বনাশ ! তা হলেই মাটি করেছেন। ও

বাই ওর ছাড়াতেই হবে। তা না হ'লে কি আর ও আমাদের থাকবে? আর আমার ঐ একটা সম্বল।" বাবা বলে উঠলেন, "পাগলি মা! সবাই কি আর বিলেত গেলেই অমনি পর হয়ে যায়? যে দিন-কাল পড়েছে, তাতে লেখাপড়া শিখে একবার ঘুরে আসতে পারলে একটা মানুষের মত হবে।"

" তোমাদের ঐ এক কথা! আচ্ছা বাবা! আমাদের দেশে থেকে লেখাপড়া শিখলে কি মানুষ হয় না? -ঐ যে কি এক ভুল ধারণা তোমাদেব আমি বুঝি না,—তাঁরও ঐ এক কথা!"

দিদি বাহিরে এসেই আমায় নিয়ে পড়লেন। চুল বাঁধতে, সাজগোজ কর্তেই বিকেল হয়ে গেল। সেদিন আমার সাজগোজের প্রতি দিদি যেন একটু বেশী মনোযোগী হয়ে পড়লেন। আমার চুল বেঁধে দিচ্ছিলেন, হঠাৎ কি জানি কি ভেবে একটা টান মেরে আমার চুলগুলো খুলে দিয়ে পিঠের উপর ছড়িয়ে দিলেন, মাঝখানে শুধু একটা লাল রেশমি ফিতের ফাঁস দিয়ে দিলেন। সাবান দিয়ে মুখখানা ধুয়ে দিয়ে একটু ক্রিম, ঠোঁটে একটু রঙ দিয়ে দিলেন। আমি অবাক্ হয়ে দিদির মুখের পানে চেয়ে রইলুম। তিনি গম্ভীর ভাবে একখানা বাদামী-রঙ করা শাড়ি এনে আমায় পড়তে বলে, একখানা বেশ বড় 'টিপ' কপালে বসিয়ে দিয়ে, আমার চিবুকখানা তুলে ধরে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "আজ ভাইমণির আমার মুণ্ডুটি ঘুরে যাবে!"— আমার ভারী লজ্জা করতে লাগল। দিদির গায়ে একটা ছোট্ট চিমটি দিয়ে বল্লুম, "যাঃ! আমি এমন সং সেজে সাম্‌নে বেরুব কি না?"

"খর্বদার! দুষ্টুমি কর্লে মরবি!"

ঠিক্ সেই সময়ে "বৌদি! বৌদি!" বলতে-বলতে একেবারে তিনি নীচে নেমে আমাদে" সামনে এসে দাঁড়ালেন। একবার অতি কষ্টে চোখ তুলে তাঁর মুখের পানে চেয়ে দেখলুম, তাঁর সুন্দর আয়ত চক্ষু দুটি আমারই উপর নিবদ্ধ। আর পিছনে দাঁড়িয়ে দিদি মুখ টিপে হাসছে। আমার ত' লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছা হল'।

।। ২।।

নির্দিষ্ট সময়ে দেবদূতের মত একটি দিব্যি টুকটুকে খোকা এসে দিদির কোল ও আমাদের ঘর আলো করে দিলে। বাড়িময় একটা আনন্দের সোরগোল পড়ে গেল। জামাইবাবু খোকাকে দেখে গেলেন। কিন্তু কি ছাই তাঁর' লেখাপড়া,— তিনি আর একদিন সময় করে এত আদরের খোকামণিকে দেখতে আস্‌তে পারলেন না? আমার ত' ভারী রাগ হত'! দিদিকে বললে তিনি কেবল মুখ টিপে হাসতেই থাকেন- হয় ত' মনে ভাবতেন আমার গরজ কিছু বেশী। কাজেই দিদির সামনে আর সে প্রসঙ্গের উত্থাপন করতুম না। খোকা হওয়ার পর তিনি দিদিকে প্রায়ই চিঠি দিতেন। দিদি সূতিকাগৃহে,- কাজেই সে চিঠিগুলো পড়ে আমিই দিদিকে শোনাতেম,আরও লুকিয়ে অনেকবার পড়তুম, যেন পড়ে লুকানো থাকতো, আমি দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে যেতুম। বিশ্বজগতের সমস্ত মাধুর্য যেন সেই অক্ষর দুটির মধ্যে জড় হয়ে বায়োস্কোপের ছবির মত আমার চোখের সামনে সদাই উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ত । আমি অনেকবার ঠিক তেমনি ভাবে ঐ অক্ষর দুটি জোড়া'দিয়ে লেখবার চেষ্টা করতুম; কিন্তু তেমনটি যেন কিছুতেই হতে চাইত না। আমি মনে- মনে কত কল্পনার স্বপ্নজাল বুনতে বুনতে চিঠিগুলো নাড়াচাড়া করতুম। সে ভাব, সে মাধুর্য রবিবাবুর কবিতার মধ্যেও খুঁজে পেতুম না। কিন্তু তার পরের চিঠিগুলো খুঁজে খুঁজে যখন তাদের সারা মুখের উপর ঐছোট্ট নামটি, সামান্য দুটি অক্ষর একত্র, একসঙ্গে দেখতে পেতুম না, তখন একটা রুদ্ধ অভিমান আমার সমস্ত অন্তরটা জুড়ে হাহা করে ঘুড়ে বেড়াত। আমার চোখদুটি জলে ভরে আসত'- মনে হত, নিষ্ঠুর দেবতা! এটুকু দিতেও এত কুণ্ঠিত!

বুকে-পিঠে করে যখন খোকাকে পাঁচ মাসেরটি করে তুললুম, সেই সময় একদিন হঠাৎ জামাইবাবুর কাছ থেকে দিদির তলব হল উনি আসছেন দিদিকে ও খোকাকে নিতে। আমার দেবতার দর্শন ও খোকার বিচ্ছেদ, এই দুই আনন্দ ও ব্যথায় প্রাণটা ভরে উঠল। খোকা তার কচি মোমের মত হাত-দুখানি দিয়ে আমার একগুচ্ছ চুল ধরে টানতে টানতে আমার মুখের পানে চেয়ে একগাল

হেসে উঠল; অমার চোখ-দুটি সহসা ভারী হয়ে উঠে, খোকার বুকের উপর টপ্‌টপ্ করে দুফোঁটা তপ্ত অশ্রু পড়ে গেল। খোকা যেন বিস্মিত আতঙ্কে আমার মুখের পানে চেয়ে রৈল — তার মুখের হাসিটুকু সহসা নিবে গেল। আমি অজস্র চুম্বনে খোকাকে আচ্ছন্ন করে দিলুম।

খোকাকে কোলে নিয়ে দিদি যখন গাড়িতে উঠলেন, আমার প্রাণটা যেন একেবারে খালি হয়ে গেল। অজস্র ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ে আমার গণ্ড প্লাবিত করে দিলে। তিনি গাড়ীতে ওঠবার সময় আমার হাত ধরে বল্লেন, "কান্না কি সুধা!— এই ও-মাসে খোকার ভাতের সময় আমাদের বাড়ি গিয়ে আবার তাকে দেখে আসবে।" — কি মধুর সম্বোধন! কি প্রাণময় স্পর্শ! আমি তাঁর পাদমূলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লুম। তিনি হাসতে হাসতে গাড়ীতে উঠে, খোকাকে কোলে নিয়ে বল্লেন — " ছিঃ পরের ছেলের উপর কি এত মায়া বসাতে আছে?"

খোকা বাবুও তাঁর চশমার পানে চেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল।

।। ৩।।

খোকার অন্নপ্রাশনের পর প্রায় দেড় বৎসর কেটে গেল। কতদিন খোকাকে দেখিনি। দিদি তার সংসারে একা,-তাঁর এ-বাড়ি আসার বড়-একটা সুবিধা হয়ে উঠত না। খোকার জন্য আমার বড় মন কেমন করত;—ভাবতুম সে এতদিনে কত বড়টি হয়েছে, — কেমনটি হয়েছে! — কেন তিনি এত নিষ্ঠুর হয়ে আমার সযত্নে-গড়া তাসের ঘরটি পায়ে ঠেলে ভেঙে দিলেন? বিলাতই যদি যান, তাঁর বিয়ে করে যেতে কি ক্ষতি ছিল? সেখান হতে ফিরে এলে কি তাঁর মনের মত হতে পারতুম না? কেন তিনি বলে দিলেন না? - কেন তিনি শিখিয়ে দিলেন না? তিনি যেমনটি শেখাতেন, আমি তেমনটি প্রাণপণে শিখতুম,- তাকে অদেয় ত' আমার কিছুই ছিল না। তবে কেন নিষ্ঠুর দেবতা ! — তবে কেন আমায় দূরে ঠেলে ফেলে দিলে? তিনি গান ভালবাসেন, — তা আমি যেমন জানি, লজ্জাসম ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তাঁকে শুনিয়েছিলুম। কেন তিনি বল্লেন

না,- আমি ভাল করে শিখতুম! তবে কি আমি তাঁর অযোগ্য? অযোগ্য ত' বটেই! পায়ের নীচে থাকতে চেয়েছিলুম — দেবতার যোগ্য হবার স্পর্ধা ত' কখন কোন দিন রাখিনি কেন তবে আমায় এই আঁধারের মধ্যে ফেলে দিলেন? এমনি একটা কাল নিরাশভরা আকুলতায় আমার হৃদয় সদাই ভারী হয়ে উঠ্‌ত। আমার অজ্ঞাতে গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে, উপাধান সিক্ত করে দিত। একটা অখণ্ড, অবশ্যম্ভাবী বিপদের ভয়ে আমার ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না, - শ্রান্তির অবসন্নতার মত একটা ঘন কাল ছায়া আমায় ঘিরে ফেলেছিল।

দিদির নিমন্ত্রণে আমি খোকাকে দেখতে গিয়েছিলুম। খোকাকে কাছে পেয়ে যেন আমার হৃদয়ের কাল ছায়াটুকু অপসৃত হয়ে কেল। সে বেশ হাঁটতে এবং আধ-আধ কথা বলতে শিখেছিল। তার সঙ্গে খেলা-ধূলায়, আর নিষ্ঠুর দেবতার দর্শনের মধ্যে দিয়ে, আমার দিনগুলো বেশ সহজভাবেই কেটে যাচ্ছিল। খোকার কল্যাণে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাটুকু দিন-দিন অলক্ষ্যে বেড়ে উঠছিল। তাঁর সম্মুখে প্রাণপণ প্রয়াসে হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন ব্যথাটুকু গোপন করে, তাঁর রহস্যালাপে যোগ দিতুম; খোকাকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে খেলা কর্তুম; সময়মত তাঁর অনেক ছোটখাটো কাজও করে দিতুম। তিনি যখন আমার সেই সমস্ত ক্ষুদ্র প্রসাধনগুলির অনর্গল প্রশংসা করে যেতেন, তখন চোখ-দুটো আমার ভারি হয়ে উঠ্‌ত,- আমার মনে হত, তাঁর পা দুখানার উপর আমার মাথাটা চেপে ধরে বলি, 'ওগো! আমার চির আকাঙ্খিত! ওগো আমার বাঞ্ছিত দেবতা ! আমায় অধিকার দাও, আমার লজ্জা নিবারণ কর!'—

|| ৪ ||

উপরের বারান্দায় পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে আমি খোকাকে নিয়ে গল্প করছিলুম। নক্ষত্রখচিত নির্মল আকাশে, গাছের মাথায়-মাথায় কে যেন তুলি বুলিয়ে দিয়েছিল। দূরে পাংশুবর্ণ খণ্ড - মেঘগুলো আকাশে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল। খোকা একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিল, তার কুসুম-পেলব মুখে-চোখে জ্যোৎস্নার ধারা ঝরে পড়ছিল। আমার উন্মুক্ত কবরী হতে প্রস্ফুটিত বেলফুলের

গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল। উনি হঠাৎ সেখানে এসে খোকাকে আমার কোল হতে একেবারে বুকে তুলে নিলেন। আমি তাড়াতাড়ি উঠে কাপড়খানা সংযত করে নিলুম। খোকা তাঁর মুখপানে চেয়ে হেসে বলে উঠল, "কাকাবাবু! দুষ্টু!"- তিনি আমার মুখের পানে চেয়ে, হাসতে হাসতে তার গালে-মুখে অজস্র চুম্বন দিয়ে, তাকে উত্যক্ত করে তুল্লেন। খোকার হাসির বেগ একটু উপশম হতেই, কোল হতে নেমে পড়ে দুষ্টু ছেলে বলে উঠলো, "কাকা! মাসী চুমু।"- আমি লজ্জায় মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলুম। কিন্তু এ কি? — সহসা তিনি আমায় আলিঙ্গনে বন্দিনী করে, আমার উত্তপ্ত ওষ্ঠের উপর তাঁর কম্পিত ওষ্ঠাধর দুখানি সংযত করে দিলেন। আমার নিষ্পন্দ ওষ্ঠ-দুখানির মধ্য দিয়ে সর্ব শরীরে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটে গেল। উপরে আকাশে নক্ষত্রগুলো দপ্‌দপ্ করে জ্বলে উঠল, — একটা গন্ধোমোদিত দমকা বাতাস ছুটে এসে আমায় আকুল করে তুলল। একটা স্ফুরিত জ্যোৎস্নালোক আমার মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ল। আবেশে আমার চক্ষুদুটি মুদে এল। আবেগে কাঁপতে কাঁপতে আমি নিথর হ'য়ে তাঁর শীতল বক্ষের উপর আচ্ছন্নের মত ঢলে পড়লুম- তিনি আমায় বেষ্টন করে বুকের মাঝে চেপে ধরলেন। সহসা খোকার হাস্যধ্বনিতে আমার চমক ভাঙতেই, আমি তাড়াতাড়ি খোকাকে কোলে তুলে নিলেম,- তিনি ঝড়ের মত বেগে তাঁর ঘরে চলে গেলেন।

ধরার বুকে সেদিন কি অপরূপ সৌন্দর্যই ঝরে প'ড়েছিল। তরল রজত জ্যোৎস্নার বন্যায় ধরাকে ডুবিয়ে দিয়েছিল! সে মাধুর্য, সে সৌন্দর্য যেন ঠিক উপলব্ধি করা যায় না। আমি পরিপূর্ণভাবে সে সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্যই যেন সেই সৌন্দর্যের মধ্যে নিজের সমস্ত সত্তা ডুবিয়ে দিয়ে, উপরে নক্ষত্র-খচিত সীমাহীন নীলিমার পানে চেয়ে রইলুম। অলক্ষ্যে কোথা হতে একটির পর একটি করে কত নদী, নালা, খানা ডিঙিয়ে রাশিরাশি চিন্তা ছুটে এসে আমার ভাবপ্রবণ হৃদয় মধ্যে আছড়ে পড়তে লাগল। কি সে তৃপ্তি! কি সে মাদকতা! কি সে উন্মাদনা! আমার কেবলই মনে হতে লাগল,-

"— লুটিয়া সর্বস্ব মোর,

দিলে মোরে ধন্য করে—"

খোকা তার মায়ের কাছে যাবার বায়না ধরতেই, আমি তাকে নিয়ে নীচে দিদির কাছে নেমে গেলুম। খোকা একেবারে একগাল হেসে তার মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু কি দুষ্টু ছেলে গো! বলে কি? সে দিদির চিবুকখানি ধরে হাস্‌তে-হাস্‌তে বলে উঠলে, "মা কাকা আমা চুমু,—মাসি চুমু"— আমার ইচ্ছা হল, হাত দিয়ে খোকার মুখখানা চেপে ধরি! কিন্তু সে যে জেঁকে তার মার কোল অধিকার করে বসেছিল। দিদি হেসে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "কি হয়েছে খোকন? কাকা তোমার কার চুমু খেয়েছে?" ছিঃ! ছিঃ! কি লজ্জা! দুষ্টু ছেলে একেবারে পেয়ে বসেছে! সে আবার আমার মুখে হাত দিয়ে বলে উঠল, "কাকা আমা চুমু—মাসি চুমু,—না মাসি?"

হঠাৎ দিদির মুখের হাসিটুকু নিবে গেল। তিনি খুব গম্ভীর হয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে রইলেন। আমি আর সেখানে দাঁড়াতে পারলুম না,- আমার ভারি কান্না আসতে লাগল। আমি ঝড়ের মত বেগে সেখান থেকে পালিয়ে গেলুম।... ... ...'

পরদিন প্রভাতে দিদি আমাকে বরণ করে এ-বাড়ীর বধূর আসনে প্রতিষ্ঠার মানসে একেবারে শুভদিন স্থির করে বাবাকে চিঠি লিখলেন। দেবতা নিজে এসে ধরা দিয়েছিলেন,- তার পর আর যে তাঁর কোন পথই ছিল না; — তিনি যে আমার ওষ্ঠপল্লব দুখানির মাঝে অমৃতের ধারা ঢেলে দিয়ে, নিতান্ত আপনার করে নিয়ে, তাঁর অভয় বুকে আমায় স্থান দিয়েছিলেন। খোকার কল্যাণে আমার নারী -জীবন সার্থক হলো ভেবে, আমি তাকে প্রগাঢ় হর্ষে ও স্নেহে বুকের মাঝে নিষ্পেষিত করে, অজস্র চুম্বনে আচ্ছন্ন করে ফেললুম।

॥ ৫ ॥

সে যেন শুধু এইটুকুর জন্যই দেবতার আশীর্বাদের মত আমাদের দুজনার মধ্যে ঝরে পড়েছিল। আমার দেবতার মন্দিরে আমার প্রতিষ্ঠার জন্যই যেন সেই দেবদূতের মত শিশুটি স্বর্গ হতে আমাদের গৃহতলে খসে পড়েছিল; —

তাই কাজ শেষ করেই বাছা আমার দেবলোকে ফিরে গেল। স্বর্গের ফুল, স্বর্গ থেকে ঝরে পড়ে ধরার মাঝে শুধু তার গন্ধটুকু রেখে চলে গেল।

আজ পাঁচ বৎসর আমি এই গৃহতলে বধূর আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি,—কিন্তু এই দীর্ঘ দিনের. এমন একটি দিনও যায়নি, যে দিন না একবার সেই রাঙা মুখখানি আমার মনের মাঝে ভেসে উঠেছে। সে যে ভোলবার জিনিষ নয় গো!' তাকে কি ভোলা যায়? আমার স্নেহময়ী দিদির মুখের অম্লান জ্যোৎস্নার মত সেই পরিপূর্ণ হাসিটুকু যেন সে কোন্ সীমাহীন আঁধারের গর্ভে ডুবিয়ে দিয়ে চলে গেছে! তাঁর মুখে যেন শ্মশানযাত্রীর মতই বিরাট একটা নির্লিপ্ততা!

দিদির আর কোন সন্তান-সন্ততি হয়নি। আমার একটি খোকা। আমার খোকাকে, দিদির কোলে দেখলে - আজও যখন উনি আদালতে যাবার সময় আমায় আবেগে আলিঙ্গন করে, তাঁর সেই নিত্যকার অভ্যাসটুকুর লোভ সংবরণ কর্তে পারেন না—তখনি একখানি ছোট্ট কচি মুখের ঝাপ্সা আলো ফুটে উঠে, বুকের নীচে কাঁটার মত বিঁধতে থাকে।

মায়ের দিন

মণীন্দ্রলাল বসু

রাতের অন্ধকার যখন পাতলা হয়ে আসে, শুকতারাটা দপ্‌দপ্ করে তেল ফুরিয়ে যাওয়া শিখার মত, ভোরের ঠান্ডা বাতাস বয়, আর মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা-ফেলা গাড়িগুলোর চাকার ঝনঝনানি শব্দে ঘুমন্ত নগরের জনহীন পথ আকুল হয়ে ওঠে, তখন কমলার ঘুম ভেঙে যায়। সেই সময়ে তার স্নেহঘেরা ছোটখুকির চোখ থেকেও ঘুম চলে যায়; গাছের পাতা-ঢাকা নীড়গুলিতে পাখিদের গান গেয়ে ওঠার সময় স্নিগ্ধ ভোরবেলায় ছড়ানো বিছানাতে মা ও মেয়ের খেলায় মায়ের দিনের আরম্ভ হয়। তরল অন্ধকারে মায়ের বড় মুখখানির দিকে চেয়ে সদ্য-জাগা পাখীর ছানার মত 'আঁা' 'আঁা' শব্দ করে খুকি আপন মনে হাত-পা ছোঁড়ে, কমলা তার নবীন কোমল অধরে চুম্বন দিয়ে এলানো শাড়িটা

কোনমতে জড়িয়ে বিছানা থেকে ওঠে, ছেলেমেয়েদের গায়ে বিছানার চাদরটা টেনে দেয়। সন্ধ্যেবেলায় যে চাদরটা বিছানাতে পাতা হয়েছিল, ভোরবেলায় সে চাদরটা যে কি করে কুণ্ডলী পাকিয়ে মেঝেতে গিয়ে পড়ে, ছেলেমেয়ের নিদ্রাপদ্ধতির সে এক রহস্য। স্বামীর খাটের পায়ের দিকের জানলাটা বন্ধ করে দেয়, ভোরের আলো ও ঠান্ডা বাতাস যেন স্বামীর ঘুমের ব্যাঘাত না করে। তার পর, সে আবার বিছানাতে শুয়ে ছোটখুকি চাঁপুকে বুকে টেনে নেয়, তার তুলতুলে পায়ে হাত বুলিয়ে চাঁপার কলির মত আঙুলগুলি নিয়ে খেলা করে। সারা দিনের কাজে খুকিকে যে একটু আদর করবে তারও সময় হয় না কি,- এই ভোরবেলা হচ্ছে কমলার মাতৃ-স্নেহলীলার সময়। খুকী মায়ের মুখের দিকে চেয়ে হাসে আর দুধ খায়,- মাঝে মাছে সুর করে বলে ওঠে-অ্যাঁ,অ্যাঁ, অ্যাঁ।

— দুষ্টু চাঁপু, চুপ, এক্ষুনি বাবার ঘুম ভেঙে যাবে। চাঁপু তার ফুলের কুঁড়ির মত চোখ দু'টি নাচায়।

খাটের ওপর স্বামী শোন; তলায় মেঝেতে লম্বা বিছানা,- এক দিকে খুকী আর খুকির মা, তার পর লাখি, তার পর রানু, তার পর মনা, তার পর শোভা,-বয়সের বাড়তি অনুসারে শোয়, মাঝে একটি করে পাশ-বালিশ ব্যবধান। এই পাশ-বালিশ হচ্ছে প্রত্যেকের বিছানা-বাসের সীমানা। লাখির কিন্তু দু'দিকে দুই পাশ-বালিশ ও পায়ের দিকেও একটা বালিশ চাই,- তার বয়স চার কিনা,-সেজন্যে চারটে বালিশ না হলে তার চোখে ঘুম আসে না। রানু কিন্তু ভারি লক্ষ্মী। সে বলে, তার একটা পাশ-বালিশও চাই না। কি হবে মা, বাজে বালিশ নিয়ে, আমি ত আর লাখীর মত ছোট নেই যে গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে যাবো। ছ'বছর তার বয়স, এরই মধ্যে গিন্নি। সবচেয়ে দুষ্টু হচ্ছে মনা। তার ওপর রাতে ঘুমের ঘোরে সে ঘুরপাক খায়,-শোভা বেচারাকে লাথি মেরে তার ওপর দিব্যি পা তুলে মহানন্দে ঘুমোয়। শোভা যে সবার বড়দিদি এই গর্বটুকু বজায় রাখবার জন্যে সে আর নালিশ করে না,- ছোট ভাই ঘুমের ঘোরে হাত পা ছোড়ে, তা কি করা যায়। সে মাঝে মাঝে বলে বটে, মা, ও চরকির পাশে আমি শোব না, কিন্তু সন্ধ্যে-বেলায় আর আলাদা বিছানা

করতে দেয় না, সে মনার পাশেই শোয়।

দু'টো মোটা পাশ-বালিশের দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে শোভা ভাবে আজ নিরাপদে ঘুমানো মেঝেতে,- চাদরটা তালগোল পাকিয়ে থাকে,— কিন্তু কারুর ঘুমের কোন কমতি বা ব্যাঘাত হয় না।

খুকির দুধ খাওয়া শেষ হলে খুকির চোখ ধীরে ধীরে বুজে আসে, আবার সে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু খুকির মায়ের আর ঘুমানো চলে না। কমলা ধীরে উঠে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে, চুলগুলো মাথায়কুণ্ডলী করে বেঁধে, ঘুমন্ত ছেলেমেয়েগুলির দিকে সস্নেহ নয়নে চেয়ে দেখে। ইচ্ছে করে প্রত্যেককে জড়িয়ে ধরে চুমো খায়, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে না। লাখিকে সোজা করে শুইয়ে দিয়ে তার চার-পাশে চারটি বালিশ ঠিক করে রাখে। রানু কি শান্ত ভাবে ঘুমোচ্ছে,- তার কোলের পুতুলটিরও নড়চড় হয়নি। মনাটাকে মেঝে থেকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দেয়,- মনা কি বিড়বিড় ক'রে বকে ওঠে-'গোল' 'গোল', আর সঙ্গে সঙ্গে পা ছোঁড়ে—'সারা বিকেল ফুটবল খেলে তার আশ মেটে নি।

চারি দিক নিঝুম, সবাই ঘুমোয়,—ভোরের আলো পূবের পাঁচিল দিয়ে আসে-ময়নাটা খাঁচায় উসখুস করে। কমলা ময়নাটাকে বলে, গোলমাল করিস না। তারপর ঝি-চাকরদের জাগাতে নীচে চলে যায়। মধুটা কোনদিন যদি সকালে ওঠে,— দালান, বারান্দা সিঁড়ি সব ধুতে হবে,—ধুয়ে শুকিয়ে যাবার আগে যদি সবাই উঠে পড়ে, পায়ে পায়ে কাদা হয়ে যায়। এই ধোওয়া নিয়ে স্বামীর সঙ্গে কত গোলমাল না হয়েছে। স্বামী বলেন, 'আচ্ছা কলকাতা শহরের সব বাড়ীর দালান বারান্দা সিঁড়ি উঠান সব জল দিয়ে যদি ধুতে হয়, কত জল লাগে বল ত! অত জল মিউনিসিপ্যালিটি দেবে কি করে?'

কমলা বলে, 'তা হিঁদুর বাড়ি আমি ম্লেচ্ছপনা করতে দেবো না।'

মধুর ঘরের শিকলি ঝনঝন শব্দে বেজে ওঠে।-' হতভাগা ওঠ্ না, কলে জল এসেছে কতক্ষণ।'

- 'উঠি মা!'

কমলা নিজেই বালতি ও ঝাঁটা নিয়ে সিঁড়ি ধুতে আরম্ভ করে,- জানে

ঝাঁটার শব্দ না শুনলে মধু উঠবে না। আর মা ধুচ্ছে জানলে সে আর শুয়ে থাকতে পারবে না। চোখ রগড়াতে রগড়াতে মধু ছুটে আসে—' মা আমায় দিন্, আমায় দিন্।'

কমলা দরজা খুলে রান্নাঘরে ঢোকে,—সব ঠিক আছে,— রাতে তাহলে বেড়াল ঢোকে নি। উনানের ছাই নিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে বাহির হয়ে আসে -ওসব ক্রিম, পাউডারে দাঁত মাজা তার পোষায় না।

মুখ ধুয়ে কমলা ওপরে উঠে আসে,—সব দরজার গোড়ায় জল-ছড়া দেয়,—শাশুড়ী ঠাকরুণের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে,— মা রাতে কেমন ঘুম হল।' উত্তর আসে, 'ভাল্লো না মা'। কয়েক দিন হল শাশুড়ীর হাঁপানিটা বেড়েছে। শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়ায়, খুকির সুখস্বপ্নহাস্যভরা মুখখানি দেখে, তার পর মনাকে ডাকে, 'খোকা' 'খোকা'। মনা রোজ মাকে বলে, মা ভোরে উঠিয়ে দিও, পড়া মুখস্থ করবো; কিন্তু কোন দিন সে ভোরে উঠতে পারল না। কমলা দু'তিনবার ডাকে, হাত ধরে ঝাঁকুনি দ্যায়। মনা গাঁইগুঁই করে বসে। আবার শুয়ে পড়ে। ঘুম-ভরা ছেলেকে টেনে তুলতে কমলার মনে বাজে,-বলে, ঘুমোক, কত পড়বে!

স্বামীর, ছেলেমেয়েদের দাঁত মাজার সরঞ্জাম ঠিক করে রেখে, ওপরের ঠাকুর-ঘর মুছে, উনানে আগুন দিয়ে, স্নান করে কমলা যখন রান্নাঘরে ঢোকে, তখন সূর্য উঠে গেছে- অরুণ-রথচূড়া পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে । তাড়াতাড়ি চায়ের জল বসিয়ে দিয়ে গয়লার কাছ থেকে দুধ মেপে নেয়। মধুর সিঁড়ি বারান্দা ধোওয়া হয়ে গেছে,— সে এসে দাঁড়ায়—মুখ ধোওয়া হয়েছে?'

'মুখ ধোওয়া কোথায় মা, সব এখন যুদ্ধ হচ্ছে।'

'যুদ্ধ কি রে?'

'বালিশ ছোঁড়াছুঁড়ি।'

'আবার আজ হচ্ছে রোস দেখাচ্ছি!'

বিছানা ধামসানো বা বালিশ ছোঁড়া কমলা মোটেই পছন্দ করে না,- তার বুকে যেন বাজে,-হনহন করে সে ওপরে চলে যায়।

শোবার ঘরে দু'পক্ষে যুদ্ধ চলে,- এক দিকে মনা আর লাখি, অপর দিকে শোভা আর রাণু,—তাদের বাবাও মাঝে মাঝে যোগ দেন। মনা সবচেয়ে ওস্তাদ,— তার তাগটা ঠিক হয়। লাখি বেচারার ছোট বালিশগুলিই সবাই টেনে টেনে ছোঁড়ে। সে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে।'আমার বালিশ, আমার বালিশ।'তার পর নিজের পক্ষের জয় হচ্ছে দেখে হেসে ওঠে। এই যুদ্ধক্ষেত্রে চাঁপু কিন্তু সুখে নিদ্রা যায়।

মাকে দেখে যুদ্ধটা হঠাৎ থেমে যায়,— মনা কিন্তু হাতের বালিশটা শোভাকে মারতে ছাড়ে না।

— 'হতভাগা ছেলেরা, সকালে উঠে কাণ্ড দেখ না, মেরে'-

সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে —'মা, মনাই ত আরম্ভ করলে'—

'আমি! বাঃ, বাবা ত প্রথমে'

'মা দেখো না, আমার বালিশ, এই তুলো বেরিয়ে গেল।'

'মনা শীগ্‌গীর ওঠ্, হতচ্ছাড়া ছেলে- আর হ্যাঁ গা, তুমি বুড়ো মিনসে,তুমি কি শিং ভেঙে বাছুরের দলে'-

স্ত্রীকে দেখেই স্বামী শুয়ে পড়েন,— তিনি নীরবে চোখ বোজেন। মনা দৃপ্ত ভাবে উঠে চলে যায়,—জানে মা এখন স্নান করে কাচা কাপড় পরে, সুতরাং তার ওপর কোন চড় বা চাপড় পড়ার আশঙ্কা নেই।

স্বামীর চা ও ছেলেমেয়েদের সিদ্ধ ওটমিল-মিশ্রিত দুধভরা বাটিগুলি সাজিয়ে মধুর হাতে দিয়ে কমলা ভাঁড়ার ঘরে তরকারি কুটতে বসে,—ঠাকুর এখুনি এসে পড়বে। মধু এসে দাঁড়ায়।-বাজার কি আনতে হবে মা'। ঝি ঝামা দিয়ে কড়া মাজতে-মাজতে কলতলা মুখর করে তোলে। লাখি এসে দাঁড়ায় সঙ্গে শোভা।

'দেখ মা, লাখি দুধ খাচ্ছে না।'

'মা, আমায় বাবা একটু চা দিচ্ছে না কেন।'

কমলার সামনে বঁটি,-চারিদিকে তরকারির পাহাড়,—আলু চেরা, পটল কাটা চলছে। তার সঙ্গে হুকুম করা,-ছেলেমেয়েদের অভিযোগের মীমাংসা করা,—

বামুনঠাকুরের ফরমাজ শোনা, সব চলেছে।

'লক্ষ্মী লাখু, দুধ খাওগে, আমার সঙ্গে চা খেও। ওই রে চাঁপু জেগেছে,-রানু নিয়ে আয় ত মা দুধটা খাইয়ে দে'না ।'

শোভা হচ্ছে পড়ুয়ে মেয়ে—সে সংসারের কাজে ঘেঁসে না। রাণুর প্রথম ভাগ শেষ হয়েছে,-'ঐক্য বাক্য'আর তার পোষাচ্ছে না,-মূর্খতার অখ্যাতি সে বহন করতে রাজি আছে,—বিদুষী বলে সে বিখ্যাত হতে চায় না।সেজন্যে সংসারের একটু কাজ করতে পারলে সে খুশি,-ততক্ষণ ত মাস্টার মহাশয়ের কাছে পড়াটা ফাঁকি দেওয়া যায়। সে সর্বদাই মাকে সাহায্য করতে ব্যস্ত,- চাঁপু কাঁদলেই সে পড়ার ঘর থেকেও ছোটে।

ঠাকুরের চাল ডাল বের করে, তরকারী বুঝিয়া কমলাকে একবার ওপরে যেতে হয়। বাড়িখানা এতক্ষণে সরগরম হয়ে উঠেছে। পড়ার ঘরে মনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রানু, চেঁচাচ্ছে,—কলতলায় ক্ষেত্তরের মা বাসন মাজার সঙ্গে বকবক করছে,-রান্নাঘরে তেলের কলকল শব্দ হচ্ছে,— আর শোবার ঘরে কেষ্ট খাটের বিছানা তুলছে,—তলায় বিছানাতে লাখিতে চাঁপুতে স্বামীতে মিলে হাসাহাসি চেঁচামেচি চলছে,—বারান্দাতে ময়নাটাও তার সঙ্গে ডেকে উঠছে। কমলা শোবার ঘরের দিকে এখন যায় না,—চাঁপু 'মা বলে চেঁচালে, তাকে কোলে না নেওয়া দুপক্ষের পক্ষেই কষ্টকর ব্যাপার হবে, শেষে ক্রন্দনের জয়ই হবে। সে সিঁড়ির পাশে ঠাকুর ঘরে চলে যায়,- সকাল থেকে ঠাকুর-দেবতার একটু নাম করবার সময় পায় নি। সাদা শাড়িটা ছেড়ে একটা তসরের কাপড় পরে; কিন্তু আহ্নিক করতে বসে নীচের কলরব কানে আসে,— মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। নীচে মধুর গলা শোনা যায়। কি-মাছ পেল, কত পয়সা ফিরলো,— এসব জানতে মন উসখুস করে,— আহ্নিক তাড়াতাড়ি সেরে চলে আসতে হয়।

মাছ কত ভাগ করে কুটতে হবে বলে, রান্নাঘরটা পরিদর্শন করে ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকে কমলা দেখে, শাশুড়ি ঠাকরুণ নীচে নেমে এসে ভাঁড়ার-ঘরের এক কোণ দখল করে বসেছেন,-তাঁর স্নান-আহ্নিকও হয়ে গেছে। শাশুড়ী বলেন, 'দাও বৌমা, পানগুলো আমিই সাজছি; না, বাপু, তোমার এ মেয়ের জ্বালায়

পারা গেল না।' চাঁপু ঠাকুরমার কোলে চড়ে নেমে এসেছে, এখন কোল থেকে নামতে চায় না, আলুর খোসা দিয়ে তাকে ভুলোতে হয়।

সকালের ঘড়ির কাঁটাগুলো ছুটে চলে,— ঠাকুরের ঝোল সাঁতলানো হতে না হতেই কলের ঘরে ছেলেমেয়েদের ভিড় লেগে যায়।

লাখি দিগম্বর হয়ে এসে বলে,'মা, আমায় কেউ ছান করিয়ে দিচ্ছে না।'

মনা বলে,'আমার খদ্দরের সার্ট কোথায় মা?'

শোভা বলে, 'আমি কোন শাড়ি পরব?'

রানু মুখ লাল করে বলে, 'মা আজ এক মেম আমাদের স্কুল দেখতে আসবেন, আমি সেই সোনালী ফ্রকটা পরব?

শোভা মনে মনে বলে ওঠে ,'সিল্কের শাড়ী পরে গেলে আবার হেডমিস্ট্রেস চটেন, — নিজেরা ত বিকেলে কত সাজ গোজ করে বেরুন হয়।'

'হ্যাঁ রে স্কুলে যাবি, আবার সাজগোজ করে যাওয়া কি রে।'

রানুর ইচ্ছা আজ ফ্রক না পড়ে শাড়ি পরে যায়, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারে না।

দিদিদের দয়া হলে তারা লাখিকে স্নান করিয়ে দেয়। কিন্তু স্নানের সময় লাখি এত জল ছোঁড়ে, দুষ্টুমি করে,— একবার গা মুছিয়ে দিয়ে আবার গা মোছাতে হয়,—দেরী হয়ে যায়,—সেজন্যে সহজে তারা কেউ লাখিকে স্নান করাতে রাজী হয় না। কমলাকে স্নান করাতে হয়। এই নবনী-কোমল দেহে তেল রগড়ানো, সাবান মাখানো, ধোয়ানো, জল মোছানোতে আনন্দ আছে, কিন্তু রোজ সে সুখ উপভোগ করবার সময় কোথায়, মধুকে ডাকতে হয়- দে বাবা লাখিকে চান করিয়ে।' কমলা চাঁপুকে স্নান করায়।

তার পর দালানে আসন-পিঁড়ে সশব্দে পড়ে যায়। 'ঠাকুর ভাত দাও।''শিগ্‌গির!' ছেলেমেয়েরা গোগ্রাসে গিলতে থাকে।

হ্যাঁ রে মনা, এই ত সাড়ে নটা, আস্তে খা'—

'মা, আমার আজ পরীক্ষা।'ওজর একটা আছেই কিন্তু পরীক্ষা আছে বলে আধ ঘণ্টা আগে স্কুলে যাবার কারণ সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করল না।

মনার মনে শুধু জাগে, কাল দুটো লাট্টু হারিয়েছি, আজ সেগুলির উদ্ধার করতে হবে।

তাড়াতাড়ি পটল ও লুচি ভেজে এ্যালোমিনিয়ামের বই এর মতন টিফিনের বাক্স সাজায়। বামুন ঠাকুরের আলুর দম এখনও হয়ে ওঠেনি। ভাঁড়ার ঘরের চৌকাঠে বসে ঠাকুমা কিছু তদারক করেন।

'গাড়ি আয় বাবা।' শোভা আর রানু ঝড়ের মত ছোটে — পিঠের ওপর বেণী দোলে, — জুতোর হিলগুলো সিঁড়িতে খট্‌খট করে,-বুঝি হিলওয়ালা জুতো শুদ্ধ ঠিকরে পড়ে। ওরে খাবারের বাক্স? সেদিকে তাদের হুঁশ থাকে না,— খাতা-বইগুলো বুঝি হাত থেকে পড়ে যায়। মধু টিফিনের বাক্স নিয়ে পেছনে ছোটে, কমলাও উঠে এসে ভাঁড়ার-ঘরের জালতি-দেওয়া জানলা দিয়ে দ্যাখে,- মেয়ে দুটো উঠল, দরজা বন্ধ হল, বাস্ চল্ল।

'মা, স্কুলে যাচ্ছি।' বইভরা চামড়ার ব্যাগটা দুলিয়ে মনা সামনে এসে দাঁড়ায়। 'আজ পরীক্ষা বুঝি?''হ্যাঁ মা,' বলে সে তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম সেরে নেয়।

পরীক্ষার দিন মাকে প্রণাম করে গেলে ফলটা ভাল হবেই, এ বিশ্বাস তার দৃঢ়। কমলা তার সার্টের কলারটা ঠিক করে দেয়, গলার বোতামটা আটকাতে চায়।'থাক মা ওটা খুলে রাখা ফ্যাশন, আর যা গরম।' নিমেষের মধ্যে খোকা অন্তর্হিত হয়ে যায়। এ দিকে স্বামী খেতে বসেন; তাঁর পাশে লাখি ও চাঁপু।

চাকরদের জলখাবার দিয়ে, এক হাতে এক বড় পেতলের বাটিতে চা ও আর এক হাতে পাখা নিয়ে কমলা স্বামীর কাছে এসে বসে। চা নয়, চায়ের সরবৎ- তাতে চায়ের চেয়ে দুধ ও চিনির ভাগই বেশী,- এতেই বেলা একটা পর্যন্ত চলবে।

মায়ের সঙ্গে চা খাবে, না, বাবার সঙ্গে গরম মাছ ভাজা খাবে,- এ সমস্যা সমাধান করে উঠতে পারে না। 'চা ছাই না' বলে' গরম মাছ-ভাজাই খেতে আরম্ভ করে। তারপর মায়ের গলা জড়িয়ে চায়ের বাটির দিকে এমনভাবে চায় যে চা একটু দিতেই হয়। চাঁপু কিন্তু একটু আলু খেয়েই সন্তুষ্ট,-লক্ষ্মী

মেয়ে!

পান নিয়ে যখন কমলা উপরে আসে, স্বামীর অর্ধেক সাজগোজ হয়ে গেছে,-মধু পাখার বাতাস করছে। সে মাকে দেখেই পাখাটা রেখে অকারণে চলে যায়। কমলা পাখা করতে করতে দু'একটা সংসারের কথা বলে। সকালের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর এই মিলন, — অফিসের পোযাক পরার অবসরে পাখার বাতাসে সাংসারিক প্রেমালাপ হয়। কমলা কোটটি ধরে, স্বামী দুটো হাত তাতে ভরে বলেন,- থ্যাঙ্ক ইউ ডিয়ার।' তারপর এক হাতে কমলার ঠাণ্ডা নরম গালে আদর করেন। কমলার গাল-দুটিতে রক্ত ফেটে পড়ে; বলে, 'যাও, ঢং করতে হবে না।'

স্বামী বলেন, 'সংসার সংগ্রামে রণক্ষেত্রে যোদ্ধার বেশ পরিয়ে পাঠাচ্ছো,— বিজয় তিলক দাও।' কমলা একটু ঘাড় বেঁকিয়ে দরজার কাছে যেন পথ রোধ কার দাঁড়ায়। এই ভঙ্গিতে তাকে বড় সুন্দর দেখায়। কোন দিন বা উচ্ছ্বাসের আবেগে স্বামী একটি চুমো খেয়ে ফেলেন। কমলার সমস্ত দেহে পুলকের শিহরণ লাগে।

'তবে আসি প্রিয়ে।'

স্বামীর জুতোর শব্দ মিলিয়ে যায়,—সদর দরজা বন্ধ হবার শব্দ কানে আসে,-- ঘরের মাঝে কমলা উদাস ভাবে যেন স্বপ্নের ঘোরে দঁড়িয়ে থাকে,- সব কাজ ভুলে যায়। বাড়িখানা স্তব্ধ, নিঝুম মনটা ভারি হয়ে আসে। আঁচল দিয়ে খাটের পায়াগুলো ঝাড়ে,— অকারণে কুলুঙ্গি থেকে তেলের ঔষধের শিশিগুলো নামিয়ে ঝাড়তে আরম্ভ করে, কিন্তু কাজে মন থাকে না। সকালের সেই কর্মময়ী কমলা যেন বদলে গেছে কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

দালানের কোণ থেকে একটা ডাক আসে-'মা, মা, দেখো না—'

'হয়েছে মা'।

সাবান দিয়ে ধোবার জন্যে রুমাল, গেঞ্জি, মোজা, খুকির জামা সব জড়ো করে মধুকে দিয়ে কমলা লাখিকে মাগুর মাছের ঝোল ভাত খাওয়াতে বসে। লাখী একটু পেটরোগা,- বাবা মা দাদা দিদিদের সঙ্গে বার বার খাওয়াই তার

কারণ। মুখ তার সারাদিন টুক্‌টাক্‌ চলছে। স্বামী তার জন্যে বকেন, আবার নিজেই দিতে ছাড়েন না,—খাবার সময় সামনে এসে বসলে কিছু মুখে না দিয়ে থাকা যায় না।

লাখিকে খাওয়াতে বসলেই চাঁপু কোথা থেকে টলতে টলতে চলতে চলতে এসে থালার কাছে থপ্‌ করে বসে পড়ে বলে,-'ম্যা ম্যা, ভত্‌ ভৎ', তএর ওপর এমন একটা জোর দেয় যে না হেসে থাকা যায় না।

সকালে কাজ হচ্ছিল দ্রুতগতিতে, যেন মেলগাড়ির ইঞ্জিন ছুটে চলেছে। এখন কাজ চলে ঢিমেতেতালে। ভাঁড়ার-ঘরের খুঁটিনাটি, বসার ঘরের টেবিল সাজানো, শোবার ঘরের ঝাড়পোছ চলে অলস ভাবে। এই ধুলোঝাড়া, গোছানো, সাজানো, মোছা যেন পরম উপভোগের সুখকর কাজ।

গির্জের ঘড়িতে বারোটা বাজে,- দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করে,-গলির জনস্রোত, গাড়ী চলা মন্দ হয়ে আসে। খাঁচার ময়নাটা ছাতু ছোলা খেয়ে ঝিমোয়, শাশুড়ি ঠাকরুন মাঝে মাঝে হাঁক দেন,'বৌমা, আর কত বেলা করবে।'

'এই যে'মা ছাদের কাপড়গুলো তুলে যাচ্ছি।'

ছাদের সিঁড়ির মাঝে জানলার কোণে কিন্তু দাঁড়াতে হয়, -- পাশের বাড়ির একটি মেয়ের অসুখ,-খবরটা নেওয়া দরকার। জানলায় দাঁড়াতেই পাশের বাড়ির বৌ ডাকে, 'দিদি, এখনও খাওয়া হয়নি?'

'দেখ না ভাই কাজের কি আর শেষ আছে।'

'আর তোমার আবার যে রকম ঝরঝরে কাজ ভাই।'

তার পর জানলায় দাঁড়িয়ে সংসারের সুখ-দুঃখের কথা আরম্ভ হয়। পাশের বাড়ীর বৌ বলে, মেয়েটার জ্বর আর ছাড়ছে না,— বাঙ্গালীর ঘরে কি অসুখ লেগেই থাকবে? বউয়ের মেজাজ আজ ভাল ছিল না,-সংসারের টানাটানি। তার পর কমলার কাছ থেকে দশ টাকা ধার চেয়ে বসে। কমলা জানায়, পাঁচ টাকা সে কোনমতে দিতে পারে,- সন্ধ্যেবেলায় যেন বৌ আসে। কিছু টাকা পাওয়া যাবে শুনে বৌএর মলিন মুখ একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে-- মেয়েটার ঔষধ-পথ্য টাকার অভাবে হচ্ছে না। তার পর পাড়ার গল্প ওঠে,— কার

ছেলে পিকেটিং করে জেলে গেছে,-কার মেয়ে রোজ পিকেটিং করতে যায়, এত সাহসও আজকাল মেয়েদেব! এবার পুজোয় খদ্দর ছাড়া কিছু কিনবে না ঠিক করেছে, কিন্তু খদ্দরের যা দাম— তারপর কমলার নতুন চুড়ির প্যাটার্নটা দেখতে চায়।

একটা ছেলের কান্নার শব্দ আসে,- দুপুরের জানলায় নিভৃত আলাপ ভেঙে যায়।

শাশুড়ি ঠাকরুনকে খাওয়াতে বসিয়ে নিজে খেতে বসতে দেড়টার আগে হয় না,— বাহিরে দালানে ঝি-চাকররাও একসঙ্গে খেতে বসে।

খাওয়ার পরও কি কাজের বিরাম আছে,-একগাদা। সেলাই পড়ে,- ছেলেমেয়েগুলো কাপড় ছিঁড়তে ওস্তাদ। তার পর এসব কাপড় সেলাই করাও হাঙ্গামা। মনা কিন্তু খদ্দর ছাড়া কিছু পরবে না, আর সেই বেশি ছেঁড়ে। তবু হাপ প্যাণ্ট করে ছেঁড়া কিছু কমেছে। যাক ! নিঝুম অপরাহ্ন, চাপু মেঝেতে একটা কাথার উপর ছোট বালিশ মাথায় দিয়ে ঘুমোয়। লাখি পাশে বসে অসম্ভব সব কথা বলে, 'মা, আচ্ছা তুমি বড় না বাবা বড়? আচ্ছা, তোমার ত বাবার মত গোঁফ নেই, মেয়েদের থাকে না বুঝি, - লাখিকে বুকে টেনে চুমো খেয়ে কমলা বলে, 'চুপ কর লাখী, একটু ঘুমো না বাছা!' লাখি তার জন্তু-জানোয়ারের রঙীন ছবিভরা এ,বি,সি, ডির বইখানি নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে নিজের মনে মনে কথা কয়। কখন তার চোখ ঢুলে পড়ে, কমলা তাকে কোলে টেনে সরু সুরে গান গেয়ে ঘুম পাড়ায়। ছাদে দু'একটা পায়রা বক্‌বকম্ করে।

চারি দিক নীরব। জনহীন পথে একটা ফেরিওয়ালার ডাক করুণ সুরের মত ঘুরে ঘুরে ফেরে। একটা চিল ছাদ দিয়ে উড়ে যায়। নীচে চাকরেরা ও ওপরে ছেলেমেয়েরা ঘুমোয়। বাড়িখানা স্তব্ধ, যেন রৌদ্রময়ী রাত্রি, একটা মাছি ভন্‌ভন্ করে ঘোরে।

লাখিকে শুইয়ে দিয়ে কমলার আর সেলাই করতে ভাল লাগে না। আলমারিটা যেন টানে, যাদুমন্ত্রে ভুলোয়। আলমারী খুলে সে সাজানো কাপড়গুলি আবার সাজাতে আরম্ভ করে। কিন্তু আলমারি সাজানো আসল ব্যাপার নয়,-

আলমারীর ওপরের তাকের পেছনে নীল সিল্কের রুমাল মোড়া দুটি ছোট্ট জামা বের করে, সে দুটির দিকে চেয়ে মেঝেতে বসে পড়ে,—তার মন কোন অজানা দেশে উড়ে যায়—এই সময়টা তার দিন-রাতের সুখ-দুঃখের কর্মের বাহিরে। জামা দুটি তার প্রথমা কন্যার,-— এক বছর হতে না হতে নিউমোনিয়াতে সে মারা গেছল; — সে কতদিন, -পনেরো যোল বছর হবে। সেই প্রথম জাতাকে হারানোর সুপ্তলোক অপরাহ্ণের নিস্তব্ধ প্রহরে মনের অতল থেকে জেগে ওঠে- এখন সে লোকের দুঃখজ্বালা নেই,— বেদনা গভীর নয়,— রহস্যময়,— মন কোন্ স্বপ্নালোকে চলে যায়। কমলা ভাবে সে যদি আজ বেঁচে থাকতো, পাড়ার নীলিমার মত হয় তো সুন্দরী হত, হয় তো তার এতদিনে বিয়ে হয়ে যেত,- ফুট্‌ফুটে খোকার মা হত। হয় তো সে কিন্তু তাকে বড় করে ভাবতে যেন সে পারে না,—সেই এক-বচ্ছরের ননীর পুতুলটিই চোখে ভেসে ওঠে,- চোখ ছলছল করে।

জামা দুটি ভাল করে পাট করে তুলে রেখে আলমারি বন্ধ করে মেজেতে আঁচল পেতে সে বসে। এই অলস মধুর অপরাহ্ণটুকু তার স্বপ্ন দেখার, স্বপ্নবোনার, মন নিয়ে খেলা করার সময় — কত কথা কত সাধ মনে হয় — ঘুমন্ত লাখীর দিকে চাঁপুর দিকে চেয়ে — সাদা মার্বেলের ওপর কালো চুল এলিয়ে সবুজ পাড় ছড়িয়ে শোয়, কখন ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে। বারান্দার ঘড়িটা টিকটিক করে,- সময় কেটে যায়,— বাড়ি নীরব,— যেন রূপকথার ঘুমন্ত রাজকন্যার স্বপ্নপুরী।

ঝনঝন শব্দে কড়ার শব্দ হয়, সদর দরজর নড়ে ওঠে। মধু ছুটে গিয়ে দরজা খোলে। দুড়দাড় করে ছুটে, দালান পেরিয়ে, সিঁড়িতে খটমট শব্দ করতে করতে মনা স্কুল থেকে আসে,— সমস্ত বাড়ী জেগে ওঠে। কমলার ঘুম ভেঙে যায়, চাঁপু চীৎকার করে কেঁদে ওঠে, — ঘুম থেকে জেগে একটু কাঁদা তার স্বভাব। বইয়ের ব্যাগটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে মনা তাকে ভুলোতে বসে। চাঁপু চুপ করলে মনা লাখির চুল ধরে টানে, কমলা বকে উঠলে, মনা পকেট থেকে দুটো পেয়ারা বের করে বলে, 'তোমার জন্যে এনেছি মা।' কমলার আর বকুনি

দেওয়া হয় না। শুধু বলে, 'জুতো খোল। সার্ট ছেড়ে হাত মুখ ধুতে যা, ভূত কোথাকার।'

'মা বড্ড খিদে।'

'হাত মুখ ভাল করে সাবান দিয়ে ধুগে, পথের যত ময়লা গায়।'

একটু পরেই মেয়েরাও স্কুল থেকে এসে পড়ে। কাপড়জামা না ছেড়েই রানু চাঁপুকে আদর করতে বসে, — স্কুল থেকে একটি ফুল এনেছে, সেটি তার হাতে দেয়।

কমলার সংসারের কাজ আবার আরম্ভ হয়। ছেলেমেয়েদের কাপড়-ছাড়া, হাত মুখ ধোওয়া তদারক করতে হয়। তারপর সবাইকে জলখাবার দিয়ে চাঁপু ও লাখিকে দুধ খাওয়াতে বসে। বেলা গড়িয়ে যায়, রান্না ঘরে আঁচ পড়ে, বাড়ি ধোঁয়াতে ভরে ওঠে। কমলা ঝিকে বকে, 'এত দেরীতে আগুন দিস্, এখন যদি বাবু এসে পড়েন।' স্বামী আসার আগে চুল বেঁধে গা ধুয়ে নিতে হয়। শাশুড়ি ঠাকরুন বলেন, 'এসো বৌমা, চুলটা বেঁধে দি। 'নিজেই বেঁধে নিচ্ছি মা।' আয়না নিয়ে চুল বাঁধতে বসে। চাঁপু এসে আয়নায় উকি মারে, আপন মনে হাসে, মাথার ফিতেটা টানে — চুল বাঁধতে দেরি হয়ে যায়।

'বড় জ্বালাতন করিস চাঁপি।' চাঁপুর কিন্তু বকুনিতে গ্রাহ্য নেই, নিজের মুখখানা আয়নায় দেখতে সে ব্যস্ত, চিরন্তনী নারী!

কোন দিন শাশুড়ি ছাড়েন না,— চুল বাঁধতে বসেন। চুল বাঁধা হলে সীমন্তে সিন্দুরেখা টেনে বলেন, 'জন্ম এয়াস্ত্রী থাকো, আশীর্বাদ করি।' মুখ রাঙা করে শাশুড়ির পায়ের ধুলো সীমন্ত মুছে কমলা গা ধুতে যায়, বুক দুরদুর করে।

স্বামী আসার আগেই কমলা ফলের রেকাব, জল-খাবারের রেকাব সাজিয়ে ধোওয়া কাপড় গুছিয়ে ঘরে বসে থাকে,—টুকটাক কাজ করে, যেন প্রতীক্ষা করছে না, কাজ করছে।

ঘরে ঢুকেই খাবারের রেকাব দেখে স্বামী খুশি হন, কমলার সদ্য সাবান-ধোওয়া গালে আদর করে বলেন, 'সাঙ্গ হয়েছে রণ! তুমি এস এস নারী,

আন তব হেমঝারি!'

'যাও! হ্যাঁগা, এ প্যাকেটটাতে কি?'

'তোমার জন্যে নতুন শাড়ি।'

'হ্যাঁ! খালি ঠাট্টা! খোকার বিস্কুট এনেছ?'

'ওই ভুল হয়ে গেল।'

'দশটা টাকা দিতে হবে আজ!'

'কাউকে দিতে হবে বুঝি।'

'না, আমার হাতে কিছু টাকা নেই।'

'দেখ, কি সময় পড়েছে, এ টানাটানির বাজার কিছু টেনে খরচ করতে হয়।'

এই রকম সাংসারিক প্রেমালাপ কিছুক্ষণ চলে। বেশীক্ষণ চলতে পারে না। সাজগোজ ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে খাবার খেয়ে স্বামী যান বেড়াতে অর্থাৎ মিত্তিরদের বাড়ীব তাসের আড্ডায় অথবা ইউনিয়ন ক্লাবে।

'ওগো আজ সকাল সকাল এসো।'

'হ্যাঁ, বেশী রাত হবে না।'

কিন্তু সাড়ে নটা দশটার আগে আর বাড়ি ফেরা হয় না।

তার পর ভাঁড়ার-ঘরে রান্নাঘরে কাজের অবধি থাকে না। ঠাকুরকে সব রান্নার জিনিস দিতে, রান্না বুঝিয়ে দিতে সন্ধ্যে হয়ে আসে। সন্ধ্যার শাঁখ বাজিয়ে ছাদে তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে প্রণাম করে। তার পর তার কাজের বেগে নিশ্বাস ফেলার সময় থাকে না— দুধ জ্বাল, রুটি লুচি বেলা, কত কাজ! কাজের মাঝে মন উস্‌খুস্ করে, রানু, লাখি ও চাঁপুকে নিয়ে মধু পাড়ার পার্কে কখন বেড়াতে গেছে, এখনও ফিরল না কেন, মনাও এখনও হকি খেলে আসে নি, শোভাটা পাড়ার কোন বাড়ির ছাদে আড্ডা দিচ্ছে! হাতের লেচিগুলো কমলা তাড়াতাড়ি পাকায়।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে লাখি বলে, আমার পটল ভাজা কৈ?'

খেতে বসে কিন্তু লাখীর সব ঘুম চলে যায়, সে আর রান্নাঘর ছেড়ে

উঠতে চায় না। দাদা-দিদিরা যখন মাস্টার মশায়ের কাছে পড়াশোনা সেরে দালানে খেতে বসে, তখন তার মুখ চলছে। সবার খাওয়া শেষ না হলে সে উঠতে চায় না। খাওয়া শেষে শোভা নিজে মুখ ধুয়ে লাখীর হাতমুখ ধুইয়ে দেয়, বলে, 'চ , শুতে।'

দল বেঁধে হল্লা করে সবাই শুতে যায়; চাঁপুর দুধের বাটি নিয়ে কমলা ওপরে আসে,-সবাই কোথায় কি রকম শুল তদারক করে। চারটে বালিশ চার ধারে ঠিক আছে কি না তা দেখে লাখি নিশ্চিন্ত মনে শোয়। মনা স্কুলের গল্প করে; রাণু বলে ওঠে, 'বেশী বক্‌বক্ করিস নে, ঘুমোতে দে।' হঠাৎ লাখি উঠে বসে, বলে, 'বিছানা বড় ঠাণ্ডা।' অয়েল-ক্লথের ওপর কাঁথা দিয়ে সে শোবে না, সে কি চাঁপুর মত ছোট।

মনা অম্নি বলে ওঠে, 'কিন্তু রাত্তিরে বিছানা ভেজাতে'-

রানু বলে,-' তুমিও ত বাপু সেদিন'—

'যাঃ! সে বুঝি আমি'- কথাটা তোলা যে ভুল হয়েছে, তা মনা বুঝতে পেরে চুপ করে।

চাঁপু মায়ের কোলে শুয়ে দুধ খায়, ছেলেমেয়েদের চোখে ঘুম ভরে আসে, ঘরের আলো নিভে যায়, দালানের আলোটা মিট্‌মিট্ জ্বলে, আবার বাড়ি নিঝুম নিদ্রিত হয়।

ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে কমলা সিঁড়ির পাশে দালানের কোণে একটা সেলাই বা একখানা বাংলা মাসিক পত্রিকা নিয়ে বসে। আজ সন্ধ্যেতে অজিত, কি নির্মল, কি সারদা, কেউ আসে নি সেই কথা মনে পড়ে। এরা হচ্ছে পাড়ার ছেলে, তাকে দিদি বলে ডাকে। সন্ধ্যেবেলায় দালানে প্রায়ই তাদের বৈঠক বসে। কেউ ফার্স্ট ইয়ার, কেউ থার্ড ইয়ারে পড়ে। কচি বয়স, তরুণ মন। সবাই এসে দিদির কাছে কত সংবাদ দেয়, কত অভিযোগ কত আবদার জানায়— সঙ্গে সঙ্গে চা, খাবার, মাঝে মাঝে মাছের কচুরি বেগুনি লাভ হয়। কি তর্ক করতে পারে ছেলেগুলো! এখন দেশের কাজে বড় ব্যস্ত।

বাংলা মাসিকের একটা গল্প কমলা পড়তে আরম্ভ করে- স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে

বনিবনা হচ্ছে না, স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে — এই রকম প্লটের একটা গল্প। কি করে স্বামীকে সংসারকে ছেড়ে মেয়েমানুষ চলে যেতে পারে, কমলা তা কল্পনা করতে পারে না। সেই দুঃখিনী হতভাগিনীর জন্যে তার চোখে জল আসে, গল্প পড়তে ভাল লাগে না, পত্রিকা মুড়ে রাখে। সিঁড়িতে মস্‌মস্‌ জুতোর শব্দ হয়, কমলা চমকে ওঠে, তার চোখের তন্দ্রা চলে যায়, স্বামী আসছেন।

স্বামীকে খাইয়ে নিজে যখন খেতে বসে রাত এগারোটা বেজে যায়। তার পর ঝি-চাকর খেলে রান্নাঘর ধোওয়া হয়। সদর দরজা বন্ধ আছে কি না দেখে, ভাঁড়ার ঘরে কুলুপ দিয়ে পান চিবোতে চিবোতে কমলা যখন ওপরে ওঠে, দেখে, স্বামী দিব্যি খাটে শুয়ে, নাসিকা গর্জন হচ্ছে।

দালানে একটু চুপ করে বসে, আকাশে তারাগুলো ঝিলমিল করে, গাছের পাতা কাঁপিয়ে মৃদু বাতাস বয়। সুখনিদ্রা-শান্ত শিশুগুলির দিকে সস্নেহ নয়নে চেয়ে সে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করে।'প্রভু, এদের তুমি সুখে শান্তিতে রেখো।'

মায়ের ঘুম ভেঙে যেতে পারে ভেবে গোলমাল করছে না,— ফিস্‌ফাস কথা হচ্ছে।

স্বামী বল্লেন,'কি গো এত দেরি আজ শরীরটা খারাপ?'

'কেন, একদিন দেরি হতে পারে না! আমি কি কল নাকি যে রোজ এক সময়ে উঠতেই হবে, না আমি কলের কুলি যে ভোরের ভোঁ বাজলেই কাজে ছুটতে হবে!'

'না, তা বলছি না।'

কারুর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে কমলা নীচে নেমে গেল। মায়ের মেজাজ আজ সুবিধের নয় দেখে ছেলেমেয়েরা সেদিন হল্লা বা বালিশ ছোঁড়াছুঁড়ি করতে সাহস করলে না।

সারা সকাল কোন কাজে কমলার মন লাগল না, — দেহ শ্রান্ত, মনটা কেমন ভার,— গত রাতে ভাল ঘুম হয় নি।

দেরীতে উঠে সব বিশৃঙ্খল হয়ে গেল সেদিন; দশটা প্রায় বাজে, সব রান্না হল না, ছেলেমেয়েরা শুধু ডাল ভাত ও ভাজা খেয়ে স্কুলে গেল। কমলা

আপন মনে বলে উঠল, 'আমি কি মাইনে করা চাকরানি, আমার যেমন খুশি আমি কাজ করবো।' স্বামী স্নান করে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন, 'ঠাকুর, যা হয়েছে দাও।'

সেদিন কমলা বিশেষ কিছু খেলে না, খেতে অরুচি। মধু ও বামুন ঠাকুর খাওয়াতে কত পীড়াপীড়ি করলে, তাদেরও ভাল করে খাওয়া হল না। শাশুড়ি ঠাকরুন বল্লেন, 'আজ শরীরটা ভাল নেই বৌমা, শুয়ে থাকগে।' কমলা মনে মনে বল্লে, 'আঁা, শুয়ে থাকবো, সংসারের কাজ কে করবে।'

অপরাহ্ণে সে নিজের ঘরে এলিয়ে শুয়ে পড়ল, কোন সেলাই বা বই হাতে নিল না। লাখি একটা আবদার করতে গিয়ে থাপ্পড় খেয়ে কেঁদে ঘুমিয়ে গেল।

কমলার মন বড় চঞ্চল মনে হল; তার সেই প্রথম-জাতা কন্যার কথা বার বার মনে পড়তে লাগলো। তার ছোট জামা দুটি বের করে বুকে জড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদতে আরম্ভ করলে। কেন যে কাঁদছে, তা সে নিজেও বুঝতে পারলে না, কোন অজানা বেদনা শান্ত হল। কাঁদতে কাঁদতে মন হাল্কা হয়ে আসতে লাগলো, বিদ্যুতের ঝিলকির মত তার মন চমকে উঠল, ততক্ষণে সে বুঝতে পারল তার কি হয়েছে আজ; মুখ প্রথমে গম্ভীর হল, তার পর রহস্যময় মধুর সুন্দর হয়ে উঠল।

সারা দিনের কাজ সেরে রাতে যখন কমলা শুতে গেল, সে শোবার ঘরে ঢুকল না, সামনের বারান্দায় লালপাড়-ওয়ালা আঁচল পেতে শুয়ে পড়ল, -তারা-ভরা আকাশের দিকে চেয়ে রইল, একটা তারা খসে পড়ল।

স্বামী কখন সামনে এসে বসেছেন জানতেই পারে নি। স্বামী তার মাথায় হাত বুলাতে সে স্বামীর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলে, স্নিগ্ধ স্বরে

বল্লে— 'ওগো।'

— 'কি!'

স্বামীর মুখ তার মুখের উপর নত হয়ে পড়তে সে স্বামীর কানে কানে কি কথা কয়ে রহস্যময় হেসে উঠল, তারা-ভরা আকাশ ঝিকমিক করতে লাগলো।

মানস-স্বপ্ন কে বলতে পারে!

তারাগুলির দিকে চেয়ে কত কথা ভাবতে ভাবতে গভীর রাতে কমলা ঘুমিয়ে পড়ল।

কইমাছ

আশাপূর্ণা দেবী

" তুই যদি হোস ভালোমানুষের পো,
কাঁটাখানা খেয়ে মাছখানা থো?...

"দেখেছ, এই বড় বড় কৈ মাছ এসেছে ওবাড়ি! কোথা থেকে যে এসেছে এই মাগগিগণ্ডার বাজারে! ভেবে পাইনে।"

পাইন-গিন্নি, লতিকা মন্তব্য করেন।

"বললেই হল, বললেই হল নাকি? এমনি এসব আসে নাকি?"

পাইন-গৃহিণীর বিধবা অন্তেবাসী ননদ প্রভা মন্তব্য করে। মাঝারি কালো পাড় শাড়ি পরে সে একখানা চ্যাটাইয়ে বসে বড়ির ডাল ফেনাচ্ছিল সযত্নে। ফর্সা মুখে, টিকলো নাকে, টানা চোখে ভ্রাতৃবধূ লতিকা এককালে সুন্দরী ছিল। মেদভারে ও চাপা অভিমানে ও অহঙ্কারে সে এখন স্ফীত, যেন একটা মানানসই লেচিকে বেলুনে বেলে চ্যাপ্টা করে বড় করে তুলেছে কেউ। গা-ভর্তি ঝক্‌ঝকে সোনার গয়না। একটু সোনার রঙ মলিন হবার জো নেই। লতিকা তক্ষুনি পালিশ করাবে.—"আমি ময়লা গয়না পরতে পারি নে বাপু।"

বড় ননদ প্রভা তিনকূল খুইয়ে এখন ছোট ভাই প্রদীপের কণ্ঠাগত কাঁটা। দুই ভাইয়ের মধ্যে প্রদীপ শাঁসালো। বড় ভাই পরমেশের টেনেটুনে সংসার চলে। ভিন্ন হবার কালে সে নিয়েছিল বৃদ্ধা মায়ের ভার। কিছুদিন পরে কালের নিয়মে মাতা গত হলেন। কিন্তু প্রভা বয়সে অনেক ছোট, স্বাস্থ্যে শক্ত হওয়ায়

তার গতি হল না।

লতিকা স্বীয় আত্মীয়দের কাছে ক্ষোভ জানায়," এতদিন বাঁচবে জানলে আমি ভার নিতাম নাকি?"

অথচ শ্বশুরের বাড়িঘর, টাকাকড়ির ভার নেবার সময়ে লতিকার কি জানা ছিল না যে ভাগ এবং ভার দুটো পাশাপাশি চলে?

ভাইবৌর প্রচ্ছন্ন বিরক্তি অনুমান করে প্রভা সর্বদা সঙ্কুচিতা ও মনোরঞ্জন-প্রয়াসিনী। যতটা পারে কাজকর্ম করে, যতটা পারে নিজের জন্য কম করচ করে সাশ্রয়ের চেষ্টায় তৎপর থাকে। স্বামী-সন্তানহীনাকে কেউ তো শেখায়নি যে পিতৃগৃহ তারও নিজের ঘর।

কলকাতার উপকণ্ঠে এই বাড়িখানা দু ভাই ভাগ করে নিয়েছে। বড় বাড়ি, সংলগ্ন জমিও প্রচুর। ছোট ভাই নিজের অংশে বাড়িখানা বাড়িয়েছে প্রয়োজনে, কিন্তু বড় ভাই পারে নি। সে সভ্যজগতে কথিত বেকার। কিছু জমিজিরেত এখানে ওখানে করেছে। নিজে লাঙল না চালালেও সে নিরন্তর চাষী। ক্ষেতে দেখাশোনা করতে হয়। বড় ছেলে ভালো কাজ করে বাইরে। সে টাকা পাঠায় নিয়মিত । নিজের সংসার আছে। তবু পিতৃঋণ স্মরণ করে মাসের প্রথমে দাঁতে দাঁত চেপে উত্যক্ত চিত্তে টাকা পাঠায় । শুধু তো ভয়-ভালোবাসার ঋণ নয়, বাড়িখানার অংশও তো রাখতে হবে। ছোটভাই পিতৃগৃহে থেকে কলকাতায় স্কুল-মাস্টারি করে। সে হাতের কাছে আছেই।

পরমেশের ছোট ভাই প্রদীপ সাধারণের পক্ষে উত্তম চাকুরি করে। অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। ছেলেটি এখনও পড়ুয়া।

পিতার মৃত্যুর পরে কিছুদিন একসঙ্গে চলেছিল, তারপরে একদিন এরা আলাদা হয়ে গেল। বাড়ির অংশ ভাগ করে একটা প্রাচীর উঠল। নিজের অংশ প্রদীপ প্রাচীরে ঘিরে নিল। পরমেশ বাঁশের বেড়া দিল।

ঠকঠক করে ওপাশে লতিকার ঠিকে-ঝি সুবর্ণ কতকগুলো ডাল আর চালের গুঁড়ো হামানদিস্তায় কুটছিল। লতিকার জামাই সরুচাকলি ভালবাসে। তাই জামাইয়ের পছন্দমত খাবারদাবার করে পাঠাবার সময় সরুচাকলি ভোলে

না লতিকা।

লতিকার রাঁধবার বামুনঠাকুর, বারোমাসের ঝি আছে। পরমেশের বাড়ি মাত্র একটা ঠিকে ঝি। দুই জায়ের মধ্যে রেষারেষির প্রশ্ন ওঠে কই। এতটাই পার্থক্য যেখানে?

চাল-ডাল-গুঁড়ো গুছিয়ে রাখে সুবর্ণ, "আচ্ছা মিহিন করে কুটছি গো মা। দেখ কেমন সুতার হয় সরুচাকলি।"

প্রভা অন্যমনস্ক ভাবে বলে উঠল, "দাদা বড় সরুচাকলি ভালবাসত"

"তোমার কেবল দাদা হ্যান ভালবাসত দাদা ত্যান ভালবাসত। যাও না, দাদার কাছে থাকো যেয়ে ঠাকুরঝি।" লতিকা একখানা টুলে বসে ননদের দাসীবৃত্তির তদারক কবছিল , এখন মুখ ঘুরিয়ে সুবর্ণকে প্রশ্ন করল, "হ্যাঁরে সুবর্ণ অত বড় কৈ এল কোত্থেকে ওদের ঘরে জানিস? এদিকে অর্ধেকদিন মাছ আসে না শুনি।"

প্রভা বাক্যবাণে কর্তিত হয়ে চুপ করে ছিল নিরুপায় দুঃখে। এখন আলোচনার বেড়ার ছ্যাঁদার ফাঁকে উটের মতো গলা বাড়িয়ে লতিকার মন যোগাতে চাইল," বললেই হল, এখানকার বাজারে এমন মাছ ওঠে নাকি, যদিবা ওঠে দাদার কেনার ক্ষামতা আছে? বললেই হল!"

এ বাড়িতে দাদা কি ভালবাসে সে কথা বলাও যে মস্ত অপরাধ সেটা হৃদয়ঙ্গম করে রাখা সর্বদা গেঁয়ো প্রভার সম্ভবপর নয়। অপরাধের ভারটা হাল্কা করি এখন দাদার বিরুদ্ধে বলে কয়ে-প্রভা ভাবল।

"তাই তো।" মনে মনে খুশি হলেও বেশী উৎসাহ দেখালে খেলো হয়ে যেতে পারে তো, তাই ওইটুকু বলে দাসীকে নির্দেশ দেয় লতিকা," অত বড় কই, দাম তো কম নয়! দেখ না কোথা থেকে এল, না রাতারাতি গুপ্তধন পেলেন ভাশুর!"

হি-হি করে পেত্নীর হাসি হেসে রান্নাঘরের তাকে চালডালের গুঁড়ো রেখে চলে গেল সুবর্ণ খবরাখবর নিতে। প্রায় তক্ষুনি ফিরে এল সে,"বড়বাবুর বন্ধু সুন্দরবন থেকে এনে দিয়েছেন কই মাছ। কাল ওবাড়ি খাওয়া-দাওয়া হবে।"

"হঠাৎ খাওয়া-দাওয়া? এদিকে তো দেখা হলে দিদির নাকে কাঁদুনি লেগে আছে।" লতিকা ঈর্ষার কামড় খেয়ে বলে।

"মাছ এসেছে তাই।" সুবর্ণ রান্নাঘরের দিকে গেল। ঠাকুর রাত্রের রান্নার মশলা পিষতে ডাকছে।

এমন সময়ে ঘর্‌ঘর করে ছ্যাকরাগাড়ির মত একখানি ঝরঝরে মোটর থামল। দূর-আকাশে তখনও সূর্য। প্রদীপ বাড়ি এল নিজে গাড়ি চালিয়ে।

টিনের গ্যারেজে গাড়িখানা তুলে দিয়ে সে উঠে এল। সামনের বারান্দায় একখানি ক্যানভাসের ইজিচেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে বসল আরাম করে। ঘরের দরজা দিয়ে পেছনের বারান্দা দেখা যায়। গলা বাড়িয়ে বলল,"খুব তো বড়ির ধূম। খাওয়াচ্ছ কাকে?"

লতিকা এগিয়ে এল,"ভাদ্রের রোদ ফুটেছে, তাই বড়ি দেওয়া হচ্ছে। ও ঠাকুরঝি আর কেন? সন্ধ্যা লেগে এল। এবার সরুচাকলিতে হাত লাগাও। কাল অপিসের গাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হবে যে।"

ও বাড়ির সিমেন্ট-বাঁধা দাওয়ায় কয়েকটা বড় বড় মোড়া রাখা আছে। পরমেশ শ্রান্ত-ক্লান্ত ভাবে এসে মাথার টোকা নামিয়ে বসল।

নীচু প্রাচীর, বাঁশের বেড়া। ওপাশে বেশ দেখা যায়। প্রদীপ একবার চেয়ে বলল, "দাদার শরীরটা বড় ভেঙে গেছে।"

তার স্বরে একবিন্দু করুণা ছিল- ছিল এককোঁটা স্নেহ। মুখরা লতিকার শান দেওয়া গলা শোনা গেল,"হ্যাঁ। দিনরাত টোকা মাথায় চাষাভুষোর কাজ করলে ভদ্দরলোকের দেহ থাকে নাকি? অফিসের খাটুনি খেটে খেটে তোমারই বা কি ছিরি আছে? দিব্যি গুছিয়ে নিয়েছেন উনি। এত ক্ষেত খামার হল কি করে? ভাগবাঁটোয়ারার সময় নিশ্চয় নিজের দিকে ঝোল টেনেছেন।"

প্রদীপ বিরক্ত হল, কি বলছ? নগদ টাকা তো সমান ভাগ করা হয়। আমার টাকা দিয়ে আমি কিনলাম গাড়ি আর তোমার সখের রেফ্রিজারেটর।"

লতিকার নীচতায় প্রদীপ মাঝে মাঝে বিরক্ত হত নিশ্চয়। কিন্তু শান্তিপ্রিয় লোক সে , সাত-পাঁচে থাকতে চাইত না। সারাদিন অফিসের হাড়ভাঙা খাটুনি

ও উপকণ্ঠ থেকে ভাঙা গাড়ি চালিয়ে যাতায়াতের শ্রমের পর তার বিদ্রোহের ইচ্ছা বা অবকাশ থাকত না। তাছাড়া মুখরা লতিকাকে সে মেনে চলতে অভ্যস্ত।

লতিকা আবার মুখনাড়া দেয়," ওগো, অত কথা বোল না গো। ফ্রিজটা আছে বলে তোমরা ভালমন্দ খেতে পারছ। বড়গিন্নি হ্যাংলার মতন ছুটে আসেন এটা ওটা রাখতে। কই, দেওর বলে কখনও কিছু রেখে যায়?"

"কেন পিঠে তো দিয়েছিলেন বউদি? আর রাখেনও তো বছরে দু-তিনবার।"

"ওঃ দরদ উথলে উঠছে যে বৌদির জন্যে! এই যে চুপড়ি-ভরা কইমাছ এল। তোমাকে দেবে নাকি?"

প্রদীপ কিছু না বলে চুপ করল। বামুনঠাকুর তখন চা ও লুচি-তরকারি এনে ফেলেছে। হাতমুখ ধুয়ে এসে খাওয়া দরকার।

প্রভা বড়ির হাত ধুতে ধুতে তাকিয়ে একবার দেখল। তারপরে সরুচাকলির আয়োজনে লেগে গেল।

— এই এতগুলো সরুচাকলি; একখানাও রাক্ষুসী দেবে না ওবাড়ি। অথচ দাদা সেদিন গাছের টোম্যাটো দিয়ে গেছে। তারা গরিব মানুষ,বাজারে বিক্রি করে নিজেদের খেতে হয়। বেশী দেবে কি করে? ও তিন মাস আগে দেবার মধ্যে লতিকা দিয়েছিল দাদাদের ওল। সেই ওলে গলা ধরে, সর্ষেতেল মেখেও বেশী খেতে পারেনি, তাই।

প্রভার মনে মনে বলা কথাগুলো টেপরেকর্ডে ধরে ধরে দিচ্ছি পাঠকের কানে।

ঠাকুর রাত্রের রান্নায় ব্যস্ত। তোলা উনুনে প্রভাকেই একগামলা সরুচাকলি ভাজতে হচ্ছে। মনের মধ্যে কথার স্রোত বয়ে যাচ্ছে ওর।

— বউদির ঠিকে-ঝি সম্বল। চালডাল কুটে একহাতে সরুচাকলি ভাজবে কখন ? অথচ দাদা যে কি ভালবাসে। জন্মদিনে মা জিজ্ঞাসা করত, 'কি খাবি পরমা?'ও বলত, মা সরুচাকলি কর।'সবাই তা জানে। এক টিপিনক্যারি ভরে জেঁতে জেঁতে পাঠাবে জামাইবাড়ি। প্রদীপ গাড়ি করে নিয়ে পৌঁছে দেবে, সঙ্গে

মাংসের কাবাব। ভাগ্যি ও সমস্ত করতে আমি জানিনে, নইলে নির্ঘাৎ আমাকে মাংস ঘাঁটাঘাঁটিতে লাগিয়ে দিত, বিধবা বলে বেয়াৎ করত না। ধম্মো-কম্মো কিছু নেই, জলের মতন মিথ্যে বলে যায়, ওদের হিংসেয় ফেটে মরে। প্রদীপ কি করে ওটাকে সহ্য করে জানি নে, বাবা! মাঝে মাঝে মনে হয় এবার বুঝি ক্ষেপে উঠবে। কিন্তু সামলে তো নেয় শেষ পর্যন্ত। ওর একটা কড়া শিক্ষা দরকার। কিন্তু প্রদীপ যে কেমন মিনমিনে হয়ে গেছে আজকাল। দাদাকে তো দারুণ ভালবাসত প্রদীপ। ডাকিনীর প্ররোচনায় আলাদা হল। কেন? না, দাদার যে অবস্থা খারাপ, যদি টানতে হয়। সবই বুঝি আমি। চুপ করে থাকি।—

আমরাও চুপ করে থাকি। চোখের সম্মুখে শরৎচন্দ্রের 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'নিষ্কৃতি', রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি', তারাশঙ্করের 'চাঁপাডাঙার বৌ' ইত্যাদি বহু আখ্যায়িকা আমাদের সম্মুখে সাজানো থাকা সত্ত্বেও ঘরে ঘরে কেন এমন হয়? এরা সে-সমস্ত বই এর সিনেমা দেখে আসে হাস্যমুখে, বইগুলো দিবানিদ্রার মৌতাতরূপে ব্যবহৃত হয়। তবু সর্বপ্রকার নীতিবোধ বিলুপ্ত, মানুষের সহজাত মায়া-দয়াটাও থাকে না, ভ্রাতৃপ্রেম তো দূরের কথা।

বরঞ্চ নিদারুণ বিদ্বেষ, অস্বাভাবিক হিংসা দেখা দেয়, যেটা বন্ধুর প্রতি হয় না। রক্তের মধ্যে সহজাত ভালবাসার আবেগ রূপান্তর গ্রহণ করে তীব্র ঈর্ষায়। তাই ভ্রাতৃ বিরোধ এত হিংস্র।

লতিকার ছেলে এল কলেজ থেকে।

"শোন্, আজ লুচিতরকারি না খেয়ে দুখানা সরুচাকলি খা, গরম ভাজা হচ্ছে।"

মায়ের কথায় ধেড়ে খোকা হাত ছুঁড়ে বলে, "রাবিশ! সরুচাকলি-ফাকলি খাব না। যত্তো বুড়িদের খাবার।"

লতিকা হেসে গড়িয়ে পড়ে স্বামীকে শোনায়, "শোন কথা খোকার। বুড়ীদের খাবার! তোর জামাইবাবু বেজায় ভালবাসে। সে কি বুড়ী নাকি?"

অন্যদিন প্রদীপ হয়তো স্ত্রীর মনোরঞ্জনের হেতু কিছু অর্থহীন মন্তব্য করত। কিন্তু দৃষ্টি ছিল তার পাশের বাড়ির বারান্দায়। মোড়ায় বসে পরমেশ একবাটি

তেলনুনমাখা মুড়ি খাচ্ছে।

আজ একটি বড়দরের লোক গত হওয়ায় তাড়াতাড়ি ছুটি মিলেছে। দিনের আলোয় দাদার মুখ অনেকদিন এমন করে চেয়ে দেখেনি। সে মুখে যুগান্তের শ্রান্তি।

ভ্রূকুঞ্চিত করে প্রদীপ ভাবল, দাদা একদম কিছু করতে পারল না। আধুনিক যন্ত্রপাতি না হলে চাষে লাভ হয় নাকি? তাছাড়া জমিও বা কোথায় বেশি?

এদিকে খোকা বারান্দায় চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছে, "দাও দাও খাবার শিগগির। জামাইবাবু আমার আদর্শ নাকি যে সে খেলে আমারও সরুচাকলি গিলতে হবে? সে তো একটা ওঁল্ড ফসিল। অমি লুচি খাব।"

"বলিস কি? এমন বিলেত-ফেরত জামাইবাবু এনে দিলাম, তুই তাকে ফসিল বলিস?" লতিকা আদরে গলে রান্নাঘর থেকে লুচি-তরকারি এনে ছেলেকে দিল।

"উঁহু, মিষ্টি কোথায়?" হাঁউ হাঁউ করে তরকারি মুড়ে লুচি গিলতে গিলতে গিলতে খোকা 'বলে।

"আজ অনেক মাংস এসেছে, কাবাব খেও রাত্রে। মিষ্টি আর আনিনি তাই।"

"বাঃ, রাত্রে খাব তবে এখন খাই কেন? এটুকু না দিলেও পারতে - বাঃ!"

লতিকা ধেড়ে ফোর্থ ইয়ারে পড়ুয়া খোকাকে তোয়াজ করে,"খেঁয়ে নে বাবা। দেখ না ওবাড়ির ত্রিদিব স্কুল পড়িয়ে এসে কেমন সোনাহেন মুখে তেলমুড়ি খাচ্ছে — তোর তো —"

"রাখো,রাখো। ওরা চাষাভুষো লোক যা পায় তাই খায়। ঘাস দিলেও খেত।"

প্রদীপ অন্যমনস্ক ভাবে কি যেন ভাবছিল, পুরনো দিনে বোধহয় ফিরে গিয়েছিল। হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেল, —"ওকি হচ্ছে? ত্রিদিবেশ তোমার গুরুজন না?"

"ওঃ!" মুখে ভেংচি কেটে খোকা বলে উঠল," গুরুজন! গুরুজন! ওসব কথা এখন আছে নাকি?"

প্রদীপের মুখ লাল হয়ে ওঠে, ক্রুদ্ধ হয়ে কিছু সে বলতে চাইছিল, সবেগে বাধা দিল লতিকা,"হয়েছে! হয়েছে! মাকে ছেলে আহ্লাদ করে কি বলছে সে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তোমাকেও বলি ঠাকুরঝি, ভাই না হয় ডায়াবেটিসের ভয়ে মিষ্টি খেতে চায় না , কিন্তু যখন দেখলে খোকার মিষ্টি আনা হয়নি, একটুখানি ছানা কেটে কাঁচাগোল্লা করে রাখলে পারতে! খোকা যে মিষ্টি ছাড়া লুচি খেতে পারে না।"

স্বামীর অপ্রসন্ন মুখের দিকে আড়চোখে চেয়ে লতিকা এবার আধোস্বরে বলে, "ঠাকুরঝি, তুমি আজ কিন্তু মুড়ি চিড়ে গিলো না। কখানা সরুচাকলি আগেই সরিয়ে রেখে দাও। এঁটোকাঁটা ছোঁয়াছুয়ি হলে আর তো তোমার খাওয়া চলবে না, ঠাকুরঝি।"

প্রদীপের মুখ কিছু অপ্রসন্ন হল, তবু ঈশানকোণে মেঘের মত মনের কোণে কাঁটার একটা আভাস জেগে রইল। সে শিক্ষিত, কর্মস্থানে বহু পদস্থ ও উচ্চস্তরের লোকের সঙ্গে মেলামেশায় জীবনে অন্যসুরও বাজে। তখন লতিকা থাকে না পাশে। পড়াশোনায় ভাল প্রদীপের মা-বাবা ও দাদার সংসারে নীতিবদ্ধ জীবন চলেছিল। বৌদি এলেন। জীবনে সুর লাগল। তারপর লতিকা রূপযৌবনে বেঁধে ফেলে তাকে নিজের কবলগত করল।

নীচতা, হিংসা, মিথ্যা তখন তার চোখে ধরা পড়লেও সে তো ধরে নিয়েছিল রূপসীর ছেলেমি, বয়সকালে শুধরে নেবে। কিন্তু চোরাবালির অতলে কখন তলিয়ে গেল, কখন মাথাও ডুবিয়ে দিল টের পেল না সে।

ঠক্ করে খাবার প্লেট টেবিলে নামিয়ে খোকা বলল,"এঃ! বিলেতফেরৎ জামাই সরুচাকলি খাবেন, আমিও তাই খাব বুঝি? জার্মেনি-ফেরত, তার আবার কথা! স্টেট্স ঘুরে এলে বুঝতাম।"

বারান্দা থেকে লনে নেমে হাততালি দিয়ে বলে উঠল খোকা," বুড়ির খাবার খাব না। মোড়ের মাথায় 'বুড়ির পাকা চুল' বিক্রি হচ্ছে। তাই খাইগে।

চাই বুড়ির পাকা চুল, বুড়ির পাকা চুল!"

চোঙা প্যান্ট, হাইহিল জুতো, কাঁধে নামানো চুল. খোকা ছুটে চলে গেল।

লতিকা হেসে গড়িয়ে পড়ে মুখে শাড়ির আঁচল চেপে।

প্রদীপ হাসতে পারে না।

কিছুদিন পূর্বে অফিসের রিক্রিয়েশান ক্লাব শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে' অভিনয় করেছিল। আজ শীর্ণ শ্রান্ত পরমেশকে দেখে কেন জানি না যাদব চরিত্রের কথা মনে হল তার। এখন ছেলের ভাব দেখে চট করে নরেন-চরিত্রের কথা মনে হল— এলোকেশীর পুত্র।

কোথায় যাচ্ছে তারা সব?

এদিকে রান্নাঘরে সরুচাকলি তৈরি করতে করতে প্রভা মনে মনে গরগর করছে।

—ছেলে তৈরি করছে দেখ ছোটলোকের বেটি। ওরা চাষা-ভুষো! দাদা লেখাপড়ায় মাটো ছিল বলে প্রদীপকে সুযোগ দিয়েছিল বেশি পড়াশোনায়। তখন বাবার অবস্থা খারাপ, আমার বিয়েটা সবে দিয়ে উঠেছেন। ধারদেনা চারদিকে, বড় জমি নিয়ে বাড়ি ফেঁদেছেন। দাদা বললে,'আমার লেখাপড়া হবে না। প্রদীপকে পড়াও। আমি বরঞ্চ জমিতে তরিতরকারি ফলাই। ধীরে ধীরে বড় করে পরে দুভাই একটা খামার করে ফেলব। ততদিনে ও পাশ করে বেরুক।'

বাবা কত খুশী, মাকে বললেন, 'দেখলে পরমার কত বড় মন। আমার আর ভয় নেই। পরমা লেখাপড়া বেশি না শিখলেও. দু ভাই মিলেমিশে থাকবে। প্রদীপ পরমাকে দেখবে।'

তা প্রদীপ তো জানে দাদা কতটা ছেড়েছে ওরই ভবিষ্যতের জন্যে। তবু বাবা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে বউ এর প্ররোচনায় আলাদা হল।—

প্রভার চিন্তাধারা ব্যাহত হয় লতিকার গলায়,"হাত চালাও ঠাকুরঝি, এতগুলো নইলে উঠবে না তো। ঠাকুর রাতের রান্না, কাবাব বানানো সেরে এদিকে আসতে পারবে না।"

"বললেই হল, ঠাকুর পারবে কি করে? এক্ষুনি হয়ে যাবে, ভেবো না

তুমি।" থতমত খেয়ে প্রভা বলে। যখনি লতিকার সঙ্গে কথায় যায় ও, মুখ থেকে বার হয়ে আসে, "বললেই হল।" এটা একটা নার্ভের ব্যাপারে, যেমন মাথাটা টিক-টিক্ করে নড়ে ওঠে কারুর কারুর। অন্য সময়ে ওর মুদ্রাদোষ থাকে না।

লতিকা এবার ঘরে ফিরে রেডিও খুলে বসে। প্রদীপও ঘরে উঠে একখানা পত্রিকা খুলে বসল। পড়াশোনার অভ্যাসটা এখনও রাখার চেষ্টায় আছে।

দিবাসন্ধির সময় মন আপনি উদাস হয়ে যায়। আজ গাড়ি চালাতে চালাতে পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনটা কেমন করে উঠল। দাদাব মুখের দিকে হঠাৎ চোখ পড়ে মনটা আবার হাতছাড়া হয়ে গেল।

অমল জীবনের স্বপ্ন সে দেখেছিল। সে কি এই ঘরবাড়ি, আসবাব, রেডিও, রেফ্রিজারেটব, গাড়ি? সে কি মেয়েকে বিলাত-ফেরতের হাতে দেওয়া, বা ছেলেকে ফরেনে পাঠানোর স্বপ্নের মধ্যে শেষ হয়ে যায়? স্ত্রীর গায়ের গয়নার ঔজ্জ্বল্যে, নিজের স্যুটের চাকচিক্যে সে দীপ্তি ধরা দিল না তো?

দাদা একদিন অ্যাগ্রিকালচারাল ফার্ম খুলবে তার সহায়তায়, কথা ছিল। যোগ দিলে তো ভালই হত। ক'বছর পরে পেনশন হয়ে যাবে, তখন কি করব এই আধাপাড়াগাঁয়ে বসে? অবশ্য এখনও সক্রিয় ভাবে যোগ না দিলেও যোগ রাখা যায়। কিন্তু আর হয় না। কাচ ভাঙলে জোড়া চলে, কিন্তু হীরা ভাঙলে খণ্ডগুলো আলাদা গহনায় সন্নিবিষ্ট করতে হয়।

তারা অলাদা হয়ে গেছে — আর এক হওয়া যাবে না কি? কইমাছ! অতীতের স্মৃতি মনে পড়ে তার। এই ঈষৎ শক্ত সুস্বাদু মাছের প্রতি দারুণ লোভ থাকলেও কখনই সে ঠিকমত কাঁটা বেছে খেতে পারত না। মা রান্নাবান্না ও অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকতেন। দাদা সর্বদা মাছের কাঁটা বেছে দিত তাকে। কই মাছ এলেই দাদা ডাকত, "প্রদীপ এখানে বোস, আমি কাঁটা বেছে দেব।"

মনকে জোর করে পূর্বস্মৃতির কণ্ডুয়ন থেকে নিবৃত্তির পরে প্রদীপ বইএর পাতায় মন দিল।

এদিকে প্রকাণ্ড টিফিন-ক্যারিয়ার ভরে ভরে তুলছে প্রভা খাবারে, আর

মনে মনে কথার স্রোত বইয়ে দিচ্ছে।

— এত খাবার আমাকে দিয়ে করায়, এখানে ওখানে পাঠায় দাদাকে একটুও দেয় না, ত্রিদিবকে ডেকে একমুঠো খাওয়ায় না, বাড়িতে ভোজ দিলেও। বলি শাকচুন্নি, নিজের ভাই, নিজের দাদা এলে টিপে টিপে যে খাওয়াস, কলকাতায় তারা থাকে না তাই রক্ষে। যদি কখনও সেখানে থাকে কতদিন ওই ভেড়ো প্রদীপটাকে দিয়ে কত খাবার, রান্না পাঠিয়ে দেয়।

তুই রোজগার করিস না মাগী, যার পয়সায় নিজের ভাইদের খাওয়াস, তার ভাইকে কিছু দিতে বুক ফেটে মরিস কেন?

দেখিস, তোর বউ এসেও বাপের বাড়ি নিয়ে থাকবে। আশ্চয্যি! এখানকার রীতি কি? বউ এসেই স্বামীকে হাত করে বাপের বাড়ি ঢেলে দেয়! শ্বশুরবাড়িকে থোড়াই কেয়ার করে। যেটুকু চক্ষুলজ্জায় বা দায়ে পড়ে না করলে নয়, সেটুকু মাত্র করতে হয়। যেমন আমাকে দায়ে পড়ে রেখেছে। আমার যে যাবার জায়গা নেই। মা যাবার সময় আমাকে রেখে গেল কেন? ছোট ভাজ কেমন শোনাল, দাদার কাছে যেয়ে' থেকো।'

চট করে আঁচলে একবিন্দু জল মুছে ফেলে প্রভা। এমন সময়ে একটু বাধো বাধো পায়ে দেখা দিল পরমেশ-মহিষী রমা। রোগা হ্যাংলা চেহারা, বড় বড় চোখে জ্যোতি নেই। আধময়লা সাদা শাড়ি গায়ে জড়ানো। হাতে একটা ছোট টিন।

"প্রভা, লতিকা কোথায়?" রমা উঠে এল বারান্দায়।

"তোর মুখখানা এত শুকনো কেন রে? জ্বর-জ্বারি হয়েছে নাকি? চারপাশে জ্বর লেগেই আছে। ত্রিদিব কয়েকদিন মাত্তর ভাত খেয়েছে।"

উনুনের আঁচে ও মনোকষ্টে বিশুষ্ক মুখখানা আঁচলে মুছে প্রভা বেরিয়ে এল।

"বস, বউদি। কিছু হয়নি আমার। হাতে কি?"

লজ্জিত হাসির সঙ্গে রমা বলল, "তোর দাদার বন্ধু নেপেন ঠাকুরপো সুন্দরবন থেকে বড় বড় কই এনে দিয়েছেন। কাল কয়েকজনকে খেতে বলেছেন

তোর দাদা। সেই মাছগুলো তেদের ফ্রিজে রেখে যাব, সকালে নিয়ে কাটব।"

"ক'জন খাবে?"

"নেপেন ঠাকুরপো স্ত্রীকে নিয়ে আসবেন। ওঁর এক বন্ধু সেই যে ভক্তিভূষণ। এতবার খাইয়ে রেখেছেন যে একদিন না বললে হয় না। ত্রিদিবের স্কুলের বন্ধু একজন মাস্টার। তিনিও দু-তিনবার খাইয়েছেন।"

হাত ধরে চেয়ারে বসায় প্রভা, "ক'টা কই পেলে?"

"আটটা মাত্তর। তবে বেশ বড় বড়। একটা করে হয়ে যাবে সাতজনের। ঝি-টা কাটবে-কুটবে ওকেও দিতে হয়।"

"আর কি রাঁধছ, বৌদি?"

"ত্রিদিবের ইচ্ছা ছিল মাংস হয়। তা যা দাম। এত বড় বড় মাছের সঙ্গে না করলেও হয়। ভাবছি চুনো মাছের চচ্চড়ি করব। ক্ষেতের রাঙা আলু উঠেছে, চাটনি হবে। গাছের নারকোল দিয়ে ছোলার ডাল। নেপেন ঠাকুরপো বকফুল ভাজা ভালবাসেন, পোবভাজা করব বেসন দিয়ে। মাচার কুমড়োর ছক্কা।"

প্রভা একটু ছোট গলায় বলল, "দই মিষ্টি আনাবে না?"

"তা তো আনাতেই হবে। আমি যাই আমার মেনকা বড় ভাল। বাড়তি কাজে আপত্তি করে না। বাটনাগুলো বাটিয়ে নিই। ছোটবৌ কোথায়?

এবার লতিকার গলা শোনা যায়, "কি দিদি এত খাওয়াচ্ছ লোকজন, আমাদের বলতে এসেছ নাকি?"

ঘরে বসে প্রদীপও সে সমস্ত কথা শুনছিল। এখন বেরিয়ে এল।

রমা হাসির চেষ্টা করে, "ভাই, তোমাদের খাওয়াব সে ভাগ্যি কি করেছি? ভগবান দিন দিলে খাওয়াব বইকি। আমি বড়, আমার তো খাওয়ানই উচিত। এখন আজকের মত এই মাছকটা তোর ফ্রিজে রেখে যাই। সকালে নিয়ে যাব।"

"রাখ, নিজের হাতে গুনেগেঁথে রেখে যাও। আমি ছোঁবও না।"

রমা অপ্রতিভ হয়ে বলে, "না না সে কি কথা! তুমি ছুঁলে কি হয়? একেবারে কয়েকটি মাত্তর, নইলে তো তোমাকেও দিয়ে যেতাম। দেখি, আবার যদি

আসে—"

"থাক থাক, দিদি। ভবিষ্যতের আশায় বসে থাকে কে? রেখে যাও না।"

লতিকার বয়ানে মরমে মরে রমা নিঃশব্দে কইগুলো মেশিনে রেখে বার হয়ে গেল দেওরের বাড়ি থেকে।

প্রভা সেদিকে চেয়ে চেয়ে নিজের মনেই যেন বলে,"বৌদির দিকে আর চাওয়া যায় না। একা হাতে খেটে খেটে, ক্ষেতের ফসলের হেফাজত করে করে শেষ হয়ে গেল লোকটা। আহা!"

এতক্ষণের চাপা রাগ লতিকার এবার ঝংকারে বার হয়ে এল,"ওঃ, তো দরদ থাকে যাও না। দাদার বাড়ির রান্না সেরে দাও। এখানে তো তোমার রান্নাবান্না, কাজকর্ম কিছুই করতে হয় না।"

প্রভা কেন জানি না প্রতিদিনের মত মাথা নামিয়ে সরে গেল না। নার্ভাস হয়েছিল অবশ্যই, মুখ দিয়ে পুরনো মুদ্রাদোষটি বেরিয়ে গেল," বললেই হল, আমার কি কাজ নেই? তবে তোমার যখন আপত্তি নেই কালকের পাটটা হাতে হাতে সেরে দিয়ে আসব। ছোটর তো বড়র বিপদে পাশে দাঁড়ানো উচিত।"

ঘরের মধ্যে অসহিষ্ণু প্রদীপ রেডিওর স্বরটা বাড়িয়ে দিল উচ্চ তীব্রতায় এবার।

পরের দিন রবিবার পড়লেও অফিসের একটা কাজে প্রদীপকে শহরে যেতে হল। সাধারণত এরূপ ক্ষেত্রে সে পেট্রোল বাঁচায় বাসে যেয়ে। কিন্তু জামাইবাড়ি সরুচাকলি-কাবাব বইতে হবে বলে গাড়িখানা বার করে ভোরবেলায় চলে গেল। খাবার আগে ফিরবে।

প্রভা সত্যি করেই পাশের বাড়ি চলে গেল বৌদিকে সাহায্য করতে।

লতিকা একটু ভীত। এবার প্রভা এত সাহস পেল কোথা থেকে? এক-আধবার সে বৌদিকে সাহায্য করতে গেছে অবশ্য লতিকাকে বলে। কিন্তু এমন বিতণ্ডার মধ্যে তো নয়। এ কি বিদ্রোহের অগ্রদূত?

রমার উপর রাগে লতিকা ফুলতে লাগল। ছোটলোক, মাছ রেখে গেলি, একটাও দিয়ে গেলি না প্রাণে ধরে! দেওর এত ভালবাসে কই মাছ, আমি

মাছ পেলে কিছু চাই না। খোকা অবশ্য মাছ-টাছ পছন্দ করে না, মাংস ডিম ছাড়া খায় না কিছু। পারলি না তবু একটা দিতে? তোর শাস্তি হওয়া উচিত। কিপ্টের হাড়!

প্রদীপ একটা নাগাদ বাড়ি ফিরল। জামাই বাড়ির নানা কুশল জানানোর পর খাবার টেবিলে বসল।

"খোকা খেয়েছে? দিদিকে দেখছি না?"

"খোকা নাটকের মহড়ায় গেছে খেয়েদেয়ে। ক্লাবে পূজোয় নাটক হবে। ঠাকুরঝি বৌদির দুঃখে, এতগুলো রান্না সে পারবে কেমন করে ভেবে, দাস্যবৃত্তি করতে গেছে ওবাড়ি। ভালই হল, গেরস্তের চাল বাঁচল।"

"হুঁ!"

বামুনঠাকুর দুজনের খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল। এবার লতিকা রেফ্রিজারেটার খুলে বার করল প্রকাণ্ড দুটি তেল-কই।

"এ কি বৌদি দিয়েছেন বুঝি?"

"সে দেবার পাত্রী বটে। তুমি এত ভালবাস, আমি যোগাড় করেছি। জব্দ করে দিলাম আচ্ছা! হাঃ হাঃ।"

হাসির ধমকের মধ্যে মধ্যে শরীর কাঁপাতে কাঁপাতে বলে লতিকা। আজ আবার হাল্কা নীল শাড়ি, লাল জামা পরে সাজপোশাক করেছে সে। ননদের ভাবগতিক সুবিধার নয়, স্বামীকে হাতে রাখা প্রয়োজন।

"জান, সকালে উঠেই মেছো-পেত্নী মাছ মাছ করে এসে হাজির। আমি ভালমানুষটি সেজে এসে বললাম,'ওই রেখে গেছ দিদি, ওইখানেই রয়েছে। নিয়ে নাও। তারপরে টিন দেখে বলে, ওমা, আর দুটো মাছ গেল কোথায়?"

আমি বললাম, 'কি জানি দিদি, আমি তো দেখিনি। দেখ তো লাফিয়ে পালিয়ে গেছে বুঝি।' বড় গিন্নির সে কি খোঁজাখুঁজি! তখন আমি বললাম, 'ওহো সুবর্ণ বলছিল মাখনদানী সকালে বার করতে যেয়ে একটা মাছ নাকি লাফিয়ে ভেতরের উঠানে পড়ল। অমনি কাক ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল। অন্যটার খবর জানি নে।' মুখ চুন করে টিন নিয়ে চলে গেল।"

"কি করেছ? মাত্র আটটা মাছ, অতগুলো লোক!"

"না হয় নিজেরা না খাবে। আমি বাপু তোমার জন্যে লোভ সামলাতে পারিনি গো। না হয় পরে একদিন কই মাছ কিনে পাঠিয়ে দেব। একটা তোমারি, একটা আমার। তবে, "তুই যদি হোস ভালমানুষের পো, কাঁটাখানা খেয়ে মাছখানা থো।' ছড়ায় বলে না?"

"তাই রাখব।"

প্রদীপ স্ত্রীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। এই চোখ দুটি শুভদৃষ্টিতে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল লতিকা। ও চোখে উত্তাপ দেখলেও কখনও কখনও আজ কি যেন দেখা যায়? আধো-আধো স্বরে লতিকা বলে, "তুমি এখনও কাঁটা বাছতে পার না। এস, আমি ভাল করে বেছে দিই।"

প্রদীপ খাবার টেবিল থেকে উঠে ঘর পার হয়ে লনে নামল। হাতে কই মাছের প্লেট।

ভীত লতিকা পেছু পেছু ছোটে, "ও কি? কোথায় যাচ্ছ?"

"যাচ্ছি কাঁটা বাছাতে। তোমার অনেক আগে যে আমার কইমাছের কাঁটা বেছে দিত তারই কাছে।"

বেড়া পেরিয়ে যেতে যেতে প্রদীপ উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল, "দাদা আমি কই মাছ খেতে আসছি।"

পরমেশের প্রসন্ন কণ্ঠ ভেসে এল, "আয় জায়গা আছে।"

এই আমার কইমাছের ইতিবৃত্ত।

মাথাধরা

আশাপূর্ণা দেবী

সকাল থেকে মাথাটা ধরে আছে। রগের শিরটা এতো দপদপ করছে, অসিতের মনে হচ্ছে বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে বোধহয় ওই দপদপানিটা; অথচ ওই নিয়েই চালিয়ে যেতে হচ্ছে, সকাল থেকে রাত অবধি।

যেতে হচ্ছে, সকাল থেকে রাত অবধি।

কত বাত অবধি?

স্থিবতা নেই তার।

প্রতিদিন যে পরিমাণ অভিযোগ জমা হবে অসিতেব বিরুদ্ধে, রাতের পরিমাপ হবে সেই হিসেবে। কখন ঘুম আসবে ঠিক নেই; ঘুমের ওষুধগুলোও আজকাল পুরনো হয়ে যাওয়া চাকরের মতো কাজে শিথিলতা দেখাচ্ছে।

কিন্তু ঘুম ভাঙার টাইমটা ঠিক রাখতেই হয়। কাঁটায় কাঁটায় ন'টার সময় অফিস পৌছতে হয়। বাড়ি থেকে সতেরো মাইল দূরে অফিস।

যাওয়া-আসাটা অবশ্য কোম্পানির গাড়িতেই। দিযেই রেখেছে কোম্পানি গাড়িটা,তাদেব ছোট ডিরেক্টর সরকার সাহেবকে। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যেও দিয়েছে।

শুধু রবিবার দিনটা ড্রাইভারকে ছুটি দিতে হয়, সেইদিনই শুধু অসিত নিজে গাড়ি চালায়। তা সেটা কলকাতায় থাকতে যত হতো, এখন এই ব্যাঙ্গালোরের অফিসে বদলি হয়ে এসে ততো হয় না। এখানে কোথায় বেড়াবে? আত্মীয়-বন্ধুর বালাই তো নেই, সিনেমা-থিয়েটারও এমন আকর্ষণীয় নয় যে তার জন্যে একটা আগ্রহ থাকবে। দ্রষ্টব্য-ট্রষ্টব্য যা কিছু, সে তো এসে পৌছবার দু'চার দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে।

কলকাতার মতো অপ্রয়োজনে মার্কেটিং করার নেশাটাও কাটাতে বাধ্য হয়েছে করবী, কারণ কোম্পানির এই নিজস্ব এলাকায় অবস্থিত কোয়ার্টার্স থেকে ওই 'মার্কেট' বস্তুটা অতি সুদূরে। অতএব করবী বাড়ীতেই সান্ধ্য আড্ডা বসিয়ে

ফেলেছে। আর এই আড্ডাটা বসিয়ে ফেলার পর থেকে যেন কলকাতার শোকটা কিছুটা ভুলতে পেরেছে।

তাসের নেশা বড় নেশা, মদের নেশার থেকেও কিছু কম নয়, যদি খেলার অন্তরলোকে থাকে মধুভাণ্ড। আজকের হালকা পকেট যেমন আগামি কালকের জন্যে তীব্র প্রেরণা দেয়, কালকের ভরা পকেট তেমনি পরশুর জন্যে দুর্নিবার আকর্ষণে টানে।

ফুটপাথের লাইটপোস্টের নিচের চটপাতা আসর থেকে শুরু করে অভিজাতদের উচ্চমানের বাসর পর্যন্ত আড্ডার চরিত্র এক ও অবিনশ্বর।

অতএব করবীর এই সান্ধ্য-আসরে তা-বড় তা-বড় সাহেবরা এসে জোটেন, এবং একেবারে ঘড়ির কাঁটায়। অবশ্য এই এসে জোটার একটা সুবিধে, সকলেই কোম্পানির কেষ্ট-বিষ্টু, কাজেই তাঁদের বাসস্থানের এলাকাটা একই। অফিস থেকে একটু ফ্রেস হয়ে আসতে যেটুকু সময় লাগে ব্যস। কোম্পানি প্রদত্ত গাড়ি আছে সকলেরই, সিকি মাইল পথ বহন করতেও সে চারপায়ে খাড়া।

এই তাসের আড্ডা বসানোর পর থেকেই যা করবীর কলকাতার শোক কিঞ্চিৎ লাঘব হয়েছে। বেচারী কোথায় মনে মনে বম্বের সমাজের স্বাদ পাবার আশায় স্পন্দিত হচ্ছিল, সে জায়গায় কিনা ব্যাঙ্গালোর! ছবির মতো সাজানো শহর, তাতে কী লাভ হলো? ছবির কী প্রাণ আছে যাকে সাদা বাংলায় বলে লাইফ!

তবু এই সন্ধ্যেবেলাটায় একটু লাইফের স্বাদ মেলে।

আসেন নিয়োগী সাহেব, আসেন মিস্টার ত্রিবিক্রম, আসেন পট্টনায়ক, আসে জেকব। সে আবার সস্ত্রীক আসে। ম্যাড্রাসি ক্রিস্টান, স্ত্রী কেরালার মেয়ে। তাসে ঘুঘু।

তাছাড়া রাও তো আসেই, বিকেল থেকেই এসে বসে থাকে। চা খায়, বোর্নভিটা খায়, বাড়ির বানানো ফুচকা খায় এবং তখনও তাসের 'সাহেব বিবিরা' এসে না পৌঁছলে করবী আর তুতানে'র সঙ্গে দুহাত চালায়। তেরো বছরের তুতান এখনই এমন ওস্তাদ খেলিয়ে হয়ে উঠেছে যে, মাঝে মাঝে করবীর

ঈর্ষার খোরাক জুগিয়ে বসে।

অসিতও প্রথম প্রথম, মানে যখন তুতান বছর দশেকের ছিল, মেয়ের তাস নেবার গুণপনাতে মুগ্ধ হতো, বলতো, 'আমার তো বাবা ওরকম বয়সে সব ছবিগুলোকেই একরকম মনে হতো, লাল কালো ছাড়া কোন তফাৎ ধরতে পারতাম না।' আজকাল আর মেয়ের সম্পর্কে বিস্ময় নেই। তাছাড়া কিছুদিন থেকে এই একটা রোগ অসিতকে পেয়ে বসেছে, এই মাথাধরা। প্রতিটি বিষয়ে ক্লান্ত করে তুলেছে অসিতকে এই অদৃশ্য ব্যাধিটি।

আজ খুব বেশী কষ্ট পাচ্ছে অসিত। এক-আধ দিন হয়তো কিছুটা কম থাকে, কিন্তু ধরেই রোজ। অথবা ধরেই থাকে, ছাড়ে না। শুধু একএকদিন রগের শিরটা বড় বেশী দপ দপ করে, মনে হয় বুঝি বাইরে থেকেও দেখা যাচ্ছে। (হয়তো বা যায়ও, কে লক্ষ্য করছে।)

কোম্পানির আজ কোন মিটিং ছিল না, পট্টনায়ক, ত্রিবিক্রম, জেকব, নিয়োগী সবাই যথাসময়ে এসে গেছেন, অসিতের দেখা নেই। অথচ একইসঙ্গে বেরিয়েছে। করবী বিরক্ত দৃষ্টি মেলে বার বার গেটের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, যখন টেবিলে এসে বলে উঠেছে, 'ওর জন্যে আর অপেক্ষা করবার কোন মানে হয় না, আসুন আমরা খেলা শুরু করি' — তখন অসিতের গাড়ির আলোর আভাসটা দেখা গেল, গেটের বাইরে দূরের থেকে।

যাঁরা তাস নিয়ে অধৈর্য চিত্তে বসে বসে 'সাফ্‌ল' করছিলেন, এবং গৃহিণীর দুএকবারের অনুরোধকে সৌজন্যের খাতিরে গ্রহণযোগ্য মনে করছিলেন না, গৃহকর্তার জন্যে অপেক্ষার প্রস্তাব করছিলেন,তাঁদের অবস্থা প্রায়,'এইবার ডাকিলেই খাইতে যাইব' হয়ে এসেছিল, কাজেই ডাকটায় হাত ধুয়ে 'খেতে' বসতে উদ্যত হচ্ছিলেন,এই সময় কিনা ওই বাগড়াটা।

দেরিই যদি করলি করলি তো খেলা বসে গেলেই এলে পারতিস ভাবলেন ওরা, অসিত লোকটা যাচ্ছেতাই রকমের বেরসিক। করবী দেবী এমন একখানি উজ্জ্বল উচ্ছল, প্রাণবন্ত মহিলার কিনা ওই স্বামী!

অফিসে অবশ্য খুব কেজো আর দুঁদে, কিন্তু বাড়ীতে যেন নিষ্প্রাণ নির্জীব।

ওর স্তিমিত নিরুৎসাহ ভাবের মুখটা করবী দেবীর ওই হাসিতে ফেটে পড়া পাকা ডালিমের মতো মুখের পাশে এতো বেমানান লাগে!

'মিঃ সরকারের বোধহয় কোথাও ঘুরে আসবার ছিল?' বললেন পট্টনায়ক।

করবী ঝলসে উঠলো, 'কোথায় আবার ঘুরে আসবে? আমার অজানা কোন এ্যাপয়েন্টমেন্ট ওর থাকে নাকি? কিছু ছিল না।'

তাহলে তো ধরতেই হয়-'মুচকি হেসে বলেন ত্রিবিক্রম, 'মিস্টার সরকাব আপনার অজানিতে কিছু ঘটাতে শুরু করছেন।'

'ইস।' করবী হাতের রুমালের ঝাপট মারে - ত্রিবিক্রমের গায়ে ঠিক নয়, সোফায়, 'এখনো ওর দিকে কেউ তাকাতে পারে। এ বিশ্বাস আপনার বুঝি?'

'জগতে কিছুই অসম্ভব নেই।'

'হয়তো কোন বিষয়েই নেই, তবে আপনাদের ওই সরকার সাহেবের ওই 'নতুন' কিছু ঘটাটা স্রেফ অসম্ভব। যা ভারী মুখ! উঃ! নেহাত না কি অগ্রাহ্য করে চলি, তাই টিকে আছি ওর ঘরে;'

হাসির হুল্লোড় পড়ে যায়, ততক্ষণে অসিতের গাড়িটা এসে পোর্টিকোয় ঢোকে। অসিত গাড়ি থেকে নামতে নামতে হুল্লোড়টা শুনতে পায়।

আগে আগে এরকম মোক্ষম মুহূর্তে এসে পড়লে, অসিত হাতের পোর্টফোলিওটা দোলাতে দোলাতে বলতো, আমার অনুপস্থিতিতে এতো হাসি যে? হাসির কারণটা আমি নই তো?'

আজকাল আর তেমন বলছে না।

'এই যে কতক্ষণ?' এই ধরণের কিছু বলে চলে যাচ্ছে। লন-এর মধ্যে প্যাগোডার ধরনের শেড লাগানো কাচঘেরা গোল ঘরটা হচ্ছে খেলার আস্তানা, কাজেই বাড়ীতে ঢোকার সময় দেখা হতেই হবে।

তবু আজ অসিত এ্যাভয়েড করলো । ওই আলো-ঝলমল কাচের ঘরটার দিকে না তাকিয়ে বারান্দায় উঠে গেল নিজের মনে।

'সরকারের শরীর খারাপ হয় নি তো?' বললেন নিয়োগী। কলকাতার

অপিস থেকে একসঙ্গেই আছেন, একসঙ্গেই এসেছেন। সমপর্যায়, এবং সমবয়সীও। নিয়োগীর কণ্ঠে তাই একটু উদ্বেগের সুর ফুটলো।

সে উদ্বেগ নস্যাৎ করে দিলেন মিসেস সরকার। তাচ্ছিলের ভঙ্গিতে বললেন, 'শরীর খারাপ হতে যাবে কেন? যাক গে আর পারা যাচ্ছে না, আসুন।'

অর্থাৎ, খেলি আসুন।

নিয়োগী তবু বললেন, 'না না আপনি বরং একবার দেখেই আসুন মিসেস সরকার।'

নিয়োগীর এতোটা বাড়াবাড়িতে পট্টনায়ক অলক্ষ্যে ঠোঁট বাঁকাল জেকব হাতের সিগারেটটা শেষ হবার আগেই অ্যাশট্রের মধ্যে গুঁজে দিল। ধোঁয়াতে লাগলো সেটা, হয়তো তার মনোভাবের প্রতীক হিসেবে।

করবী বললো আমার দায় পড়েছে। ভিতরে কুট্টি আছে, দীনেশ আছে, তুতানও আছে।'

হ্যাঁ তুতানও আছে, রাওযের সঙ্গে চাইনিজ চেকার খেলছে। আজ আর ওর বুড়োদের আড্ডায় বসতে ইচ্ছে হয়নি। তাই রাওকে ছাড়ে নি। রাওই একমাত্র তরুণ।

ত্রিবিক্রম মুচকি হেসে বললো, 'যান যান মিসেস সরকার। মিস্টার নিয়োগী যখন ঘরে ফেরেন, মিসেস নিয়োগী তখন কিচেন থেকে ছুটে বেরিয়ে আসেন।... আমার নিজের চোখে দেখা।'

করবী মনে মনে ঠোঁট বাঁকায়।

মিসেস নিয়োগীর সঙ্গে করবীর তুলনা! ... মিসেস! নিয়োগীগিন্নি বল না বাবা! সেই হাতে শাঁখা, কপালে টিপ, সোজা করে শাড়ী পরা, সর্বদা রান্নাঘর নিয়ে মশগুল স্ত্রীলোকটিকে 'গিন্নি ছাড়া আর কিছু বলাটা বাড়াবাড়ি বাহুল্য। কর্তা ঘরে ফিরলে ছুটে ছুটে বেরিয়ে আসবে, ওর পক্ষেই এই স্বাভাবিক। তবে এখন করবীরও সেই ইচ্ছেই করছিল, কারণ অসিতকে একবার দেখে নেওয়া দরকার। ভেবেছে কি ও? কী চায়! মান্যগণ্য অতিথিদের সামনে করবীকে অপদস্থ করতে চায়? কিন্তু ইচ্ছেটা কাজে পরিণত করতেও লজ্জা করছিল। 'অনুগামিনী

ভার্যার ভূমিকাটা লজ্জার বৈ কি!

নিয়োগী সাহেব ইচ্ছেপূরণের সুযোগটা করে দিলেন।... অথবা ত্রিবিক্রম। করবী হি হি করে হেসে উঠে বললো, 'তাই নাকি? আপনার নিজের চোখে দেখা? তাহলে আরও একবার তেমন দৃশ্য দেখাতে হয় আপনাকে। তবে এই চললাম ছুটে ছুটে।

ওর কিশোরী মেয়ে তুতানের ভঙ্গিতে ছুটে চলে গেল।

ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য ভঙ্গিটা পাল্টে যায়, অত রঙচঙে মুখটাও কালচে তামাটে দেখায়, পর্দা ঠেলে ঘরে ঢোকাটা কঠোর কঠোর দেখতে লাগে।

'তোমার কী হলো?'

অসিত আস্তে আস্তে পোযাক বদল করছিল, আস্তেই বললো। 'কী হবে?'

'কী হতে পারে সেটা আমার জানা নেই। তবে ওই লোকগুলোর সঙ্গে অভদ্রতা করার উদ্দেশ্য কী, সেটাই জানতে চাইছি।'

'অভদ্রতা!'

'হ্যাঁ। আকাশ থেকে পড়ছো যে!' করবীর গলা থেকে তাব অনেকদিন শেখা এই গ্রাম্য মন্তব্যটা বেরিয়ে পড়ে ।

'ওভাবে না তাকিয়ে চলে আসাটা বুঝি তোমার খুব স্বাভাবিক এবং সভ্যতা মনে হচ্ছে?'

অসিত ছেড়ে রাখা প্যান্টটা হ্যাঙারে ভরতে ভরতে বলে, 'খুব টায়ার্ড লাগছিল — মাথাটা ধরেছে।'

'ওটা তো তোমার দৈনিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, অথচ ডাক্তারের পরামর্শ নেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছো না।'

অসিত কথা বললো না।

করবী একটু অপেক্ষা করলো, দেখলো অসিত প্যান্ট সমেত হ্যাঙারটা ওয়ার্ডরোবে ঢোকাতে গেল, বুঝলো অসিত উত্তর দিলো না।

দেবে কোথা থেকে, উত্তর দেবার কিছু থাকলে তো?

মাথাধরা না হাতি! লোকগুলোকে আর পছন্দ হচ্ছে না। তাই মাথা ধরছে। টায়ার্ড! সবাই সারাদিন যা করেছে, তুমিও তো তাই করেছো। কেউ টায়ার্ড হলো না, তুমিই হলে! এমনই টায়ার্ড হলে যে সামান্য সৌজন্যজ্ঞানটুকুর ধার পর্যন্ত ধারলে না।

তোমার মাথা ধরা আর টায়ার্ড ফিল করা বার করছি আমি। কিন্তু এখন সময় নেই, তার জন্যে রাত্তির আছে। ঘুমের ওষুধ খেয়ে আমার হাত এড়াতে পারবে না। এখন অতিথিরা বাড়িতে । ওদের সঙ্গে ভদ্রতার দায় আমাকেই পোয়াতে হবে।অথচ ওই সব লোকগুলোকে আদর করে বাড়ির দরজা চিনিয়েছো তুমি। আমি ওদের ডেকে আনতে যাই নি। ... অজস্র কথা মনের মধ্যে পাক খেয়ে গলায় উঠে আসতে চাইছে, তবু সেই চাওয়াটাকে প্রশ্রয় না দিয়ে করবী ঠোঁট টিপে বলে চা খাবে? না কফি? না বোর্নভিটা?'

'যাহোক খেলেই হবে —' অসিত বাথরুমে ঢুকতে ঢুকতে বলে,'তার জন্যে তোমায় আটকে থাকতে হবে না। কুট্টি তো রয়েছে।'

'আমি আটকে থাকতে চাইও না' - করবী ঠিকরে ওঠে, 'তোমার ওই কুট্টি থাকলেই যথেষ্ট তা জানি। আমার এই আসাটাই একটা ফার্স, তাও জানি। কী করবো লোকের কাছে তো মুখ রাখতে হবে। দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি যাবে এ প্রত্যাশাটুকু করতে পারি বোধহয়?'

'যাব?'

অসিত ফিরে দাঁড়ালো।

অসিত বাথরুমের দরজাটা ঠেলে খুলেছিল বলে, ভিতরটা একটু দেখা যাচ্ছিল, অতি-আধুনিক বিলাসী স্নানের ঘরের পরিপাটি ছবি ওই টবে।

লাফিয়ে পড়ে মাথার উপর সাওয়ার খুলে দিয়ে বসলে, মাথাধরা পালাতে পথ পাবার কথা নয়, অথচ অসিতের প্রতিদিন মাথা ধরছে; রগের শিরা দপদপ করছে, ঘাড়টা ছিঁড়ে পড়বার মতো হচ্ছে।

ওই জন্যেই বোধহয় অসিত ভুলে ভুলে ওই বাহুল্য প্রশ্নটা করলো, 'কোথায় যাব? ওঃ, ওই ওখানে! আজ আর পারা যাবে না। অসহ্য মাথা ধরেছে।'

'ওঃ, একেবারে অসহ্য! তা ওদের কী বলা হবে?'

'যা সত্যি, তাই বলবে।'

'আ-চ্ছা! কিন্তু তোমার কোন্‌টা সত্যি?' করবীর মুখটা আরো কালো দেখায়।

অসিত হাসির মতো করে বলে আমার সবটাই সত্যি।'

'তার মানে অন্যের সব কিছু মিথ্যে? যাক তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না, স্টকে আরো যদি কিছু থাকে বলে নিতে পারো। তবে এটা খেয়াল থাকা দরকার, রোজ রোজ শরীর খারাপের অজুহাতও হাস্যকর। লোকে অবশ্যই প্রশ্ন করবে,' শরীর খারপ তো ডাক্তার দেখাও না কেন? পয়সা নেই চিকিৎসা করাবার?' অসিত বাথরুমে ঢুকে পড়েছে, দরজাটায় হাত দিয়েছে, তবু করবী চাপা তীব্র গলায় প্রশ্ন করে, 'একথার উত্তরটা দিয়ে দাও।'

'উত্তর নেই। যা ইচ্ছে বানিয়ে বলতে পারো। জলের নিচে মাথাটা না পাতা পর্যন্ত দাঁড়াতে পারছি না।'

দরজাটা বন্ধ করে দিল। করবীর মুখের উপর। উল্লাস বোধ করলো।

কারো মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিতে পারার একটা উল্লাস আছে। হয়তো বর্বর উল্লাস, তবু সে উল্লাসের স্পৃহা আছে মানুষের রক্তে। কিন্তু দিতে পারাটা দুষ্কর। একমাত্র বাথরুমের দরজাটি ছাড়া। ওটাই বন্ধ করে দেওয়া যায়, যে কারোর মুখের ওপর।

বন্ধ দরজার এপার থেকে শুনতে পেল করবীর তীক্ষ্ণ মন্তব্য, 'রোজ রোজ মাথাই যে কেন ধরে!'

সাওয়ার খুলে দিয়ে মাথা পেতে বসে অসিত অনেকক্ষণ ভাবতে থাকে, কেন ধরে তার জবাবটা নিজেই জানি না, তো তোমায় দেব কী!... তোমাকে না জানালেও ডাক্তারকে দেখিয়েছি বৈকি। ডাক্তার বলেছে ব্লাডপ্রেসার নয়। চশমার বার্ধক্যের জন্য নয। বলেছে, কারণটা আপনার নিজের মধ্যে।'

সেই কারণটা খুঁজতে থাকে অসিত, খুঁজে পায় না।

জলের নিচে বসে থাকতে থাকতে প্রায় সর্দি ধরে যাচ্ছিল, উঠে পড়লো। দু প্রস্থ তোয়ালে গায়ে মাথায় ঘসে বেরিয়ে এলো, জামা-টামা গায়ে দিয়ে

এ বারান্দার ওদিক দিয়ে পিছনের বারান্দায় চলে গেল। যাবার সময় দেখতে পেল ডাইনিং টেবিলের উপর চাইনিজ চেকারের ছকটা পেতে মুখোমুখি খুব ঝুঁকে পড়ে বসে খেলছে ওরা।

তুতান আর রাও। দুজনের কপালে কপালে প্রায় ঠোক্কর লাগছে। অসিতকে ওরা দেখতেই পেল না। দুজনের একজনও না।

খেলায় একেবারে নিমগ্ন।

তবু অসিতের মনে হলো, ওরা ইচ্ছে করেই দেখলো না। দেখলেই উঠতে হবে, কথা বলতে হবে, দেরি হয়ে যাবে, কী দরকার তবে দেখার?

অসিতও তবে দেখতে পেল না।

অতএব একথা বলারও দায়িত্ব রইলো না অসিতের 'ডাইনিং টেবিলে খেলতে বসেছ কেন?কতদিন বারণ করেছি আর জায়গা নেই?'

বলতে হলো না বলে বাঁচলো যেন।

পিছনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

এদিকটা বাড়ির পিছন, তাই শোভা সৌন্দর্যের ব্যবস্থা নেই। বারান্দার নিচে দুটো পুরোনা ড্রাম গড়াগড়ি যাচ্ছে। একটা বেসিন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, এখানে ওখানে আগাছা গজিয়ে জঙ্গল করেছে।

অথচ এই দিকটাই দক্ষিণ।

সামনের দৃশ্যটা অপ্রীতিকর হলেও দক্ষিণের হাওয়াটা খুব ভালো লাগলো। হঠাৎ মনে হলো, মাথাধরা নেই। ঘাড়ের ওপরটা হাল্কা হাল্কা।... সমস্ত শোভা সৌন্দর্যের দৃশ্য ত্যাগ করে এই দিকটাতেই বসে থাকবে নাকি এবার অসিত একটা আরাম চেয়ার পেতে? মন্দ নয়, দুটো পুরনো ড্রাম কি একটা ভাঙা বেসিনের দৃশ্য কতই আর ফুটবে চোখে?

কোন্ চেয়ারটা এখানে এনে ফেলে রাখা যায়? যেটা করবী আবার টেনে নিয়ে যাবে না?

হঠাৎ অসিতের দাঁড়ানো পিঠের সঙ্গে একটা ভারী ভারী নরম শরীর একেবারে লেপটে দিয়ে কে পিছন থেকে দু'হাতে চোখ টিপে ধরে মিহি গলায়

বলে উঠলো, 'কে বল তো?

অসিতের সারা শরীরটা যেন একটা বিতৃষ্ণার শক্ খেলো, অসিতের পিঠটা যেন কুঁকড়ে গেল।

পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে এসে যে পড়ল, তার শরীরটা রীতিমতো পুষ্ট, তাই একেবারে পিঠে লেপটে যেতে পারে নি, তাই আচমকা একটা অস্বস্তির ঝাঁপট মারল যেন।

ঝট করে ফিরে দাঁড়ালো অসিত, চোখ টেপা হাত দুটো চোখ থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে গেল, পারলো না, চোখ ছেড়ে যেতেই গলাটা ধরে ঝুলে পড়ল সেই নিটোল নিরাভরণ হাত দুটো।

গড়নটা বেজায় বাড়ন্ত, ঊরুর উপর তোলা, আর কাঁধে শুধ্ টেপ দেওয়া মিনি ফ্রক পরে বেড়ায় তাই বাচ্চা, শাড়ি পরলে ষোলো আঠারো দেখাতো।...

অসিতের হঠাৎ ওর পা দুটোর ওপর চোখ পড়লো, অসিতের চোখটা বুজে ফেলতে ইচ্ছে করলো, অসিত গলায় ঝোলা হাত দুটো গলা থেকে নামাতে চেষ্টা করলো, একবারের চেষ্টায় পারলো না।

সারা শরীরের ভারটা দিয়ে ঝুলে পড়েছে আহ্লাদী মেয়েটা।

'বা-পী তুমি খুব রেগে গেছ বুঝি? কার ওপর? আমার ওপর, না মায়ের ওপর?' কোথায় যেন চড়াৎ করে একটা শব্দ হলো।

কোথায়? ঘাড়ে? মাথায়? মেরুদণ্ডে?

আরো একদিন এই রকম শব্দ হয়েছিল, মনে পড়ছে। কবে তা মনে নেই, শুধু করবীর সরু গলার ধিক্কারটা মনে আছে, 'কোন যুগে আছ'? অষ্টাদশ শতাব্দীতে? বাচ্চারা বাচ্চার মতো করবে না তো কি বুড়োর মতো বিজ্ঞ হবে? 'আংকেল' বলে ডাকে, আবদার করে একটা জিনিস চেয়েছে বলে, তুমি বাইরের লোকের সামনে ওই ভাবে ধমক দিলে? দুটো কেডবেরি চকোলেট, এই তো ব্যাপার, ত্রিবিক্রম মারা যাবে ওটা কিনতে? নিজের নীচতাটা এভাবে প্রকাশ করতে লজ্জা করলো না? ত্রিবিক্রম বা কী ভাবলো? লজ্জিতও হলো কম নয়। ছি ছি তুতান একটা আস্ত মানুষ? ওর এক্ষুণি জ্ঞানবুদ্ধি পাকামি সব হয়ে

যাবে? যে যুগে আছ, সেই যুগকে দেখতে শেখো। তোমার বাপ জ্যাঠার চশমা চোখে দিয়ে পৃথিবীকে দেখতে বসলে হাস্যাস্পদই হবে।'

মাথাধরার শুরু কি সেই থেকেই?

হাত দুটো সাবধানে নামিয়ে দিয়ে অতি সহজ গলায় বললো, 'শুধু শুধু রাগ করবো কেন?

'তবে তুমি এখানে বোকার মতো একা একা দাঁড়িয়ে আছ কেন? ও বাপী।'

অসিত শান্ত গলায় বললো, 'মাথাটা ভীষণ ধরেছে তাই —'

হ্যাঁ, এই মুহূর্তে অনুভব করলো অসিত মাথাটা আবার ভীষণ ধরে উঠেছে, ঘাড়ে যেন বিশ মণ বোঝা। এবং অনুভব করলো এ মাথাধরা জীবনেও আর ছাড়বে না, তার ঘাড়ের উপর এই ভারটাও থেকেই যাবে। থেকে যাবে না কেন? কলসীর মধ্যে থেকে দৈত্যটাকে তো অসিত নিজেই বার করেছে। কিন্তু তখন কি অসিত বুঝতে পেরেছিল ওই দৈত্যটাকে ঘাড়ে নিয়ে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ একদিন দম ফুরিয়ে যাবে তার?

তখন পারে নি, এখন বুঝতে পারছে, কোন্ ফাঁকে হঠাৎ দম হারিয়ে গাছতলায় বসে পড়েছে সে, আর সত্যিই বাবা-জেঠামশাইয়ের ফেলে যাওয়া পুরনো চশমাখানা চোখের' পরে পরেছে।

অতএব সেরে ওঠবার আশা আর নেই অসিতের। কী করে থাকবে? ঘষা পুরনো চশমার মধ্যে দিয়ে পৃথিবী দেখতে বসলে মাথা ধরবে না?

দর ও দস্তুর

জ্যোতির্ময়ী দেবী

পর, পর মা, গয়না পর।

ওরা কনে দেখে ফিরে গেল, গহনা কাপড় সব ছেড়ে ছাতের কোণে এসে ব'সে নিভার চোখ দিয়ে টপটপ ক'রে জল পড়ছিল।

সূর্যাস্তের সময়। রাঙা হয়ে উঠেছে পশ্চিম দিগন্ত। কালো কালো মেঘ, একদিকে গোটা কতক সোনালি পাড় কাপড়ের মতন প'ড়ে আছে। অন্য সময় ঐ শোভা দেখাতে সে ছোট বোনকে মেজ বোনকে ডাকে, আজকে তার চোখে ওসব শোভা হিসেবে পড়ছিল না আর। এমনিই চেয়েছিল।

আজকে ওরা আবার — বড়রা কেউ ছিল না — সব নাকি ছেলেটিব বন্ধুরা, — ওকে ইংরিজি বাংলা লেখালে।

ওরা কি জানে না, ও লিখতে জানে? কেন, ছোটকা তো বললেন ওর সামনেই যে, ওকে সেকেণ্ড ক্লাস অবধি পড়িয়ে আমরা স্কুল ছাড়িয়ে নিয়েছি, বড় বড় মেয়ের স্কুলে যাওয়ার প্রথা আমাদের বাড়িতে নেই কিনা। তারপর বললে গান জানে?

কাকা বললেন, জানে; কিন্তু ওর লজ্জা করবে মশাই, ছেলেমানুষ কিনা। একটা ছেলে একটু মুখ টিপে হেসে বললে, ছেলেমানুষই মেয়ে হয় মশাই।

গান গাইতে গলা কেঁপে গেল, ছাই হ'ল গান। অত ছাই ও কোনদিন গায় না, এমন কি বিচ্ছিরি করে চেষ্টা করলেও ওরকম হয় না। কাকা কেন বললেন না, গান ও জানে না!

ওর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। ওরা নাকি সভ্য, ওরা নাকি সব বিদ্বান! ওদের বোনকে এদের কেউ অমনই ক'রে দেখে!

মেজদি এল কাপড় কেচে, ছাতে কাপড় শুকুতে দিতে।

ওমা, তুই বুঝি এখানে ব'সে, আর মা সারা পৃথিবী খুঁজছেন! খাবার খাস নি যে? কাঁদছিস কেন?

ও রাগ ক'রে বললে, কই কেঁদেছি? চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে জলে ভরে এল।

ওরে, এ দুঃখ সবারই করতে হয় রে, তোর একার নয়। আমাকে আবার মামাশ্বশুর সমস্ত দালানটা হাঁটিয়ে নিয়েছিলেন। আর একটা কে ছিল, সে বললে, চুলটা খুলে দেখান নি কেন মশাই? বড় খোঁপা দেখে ভাবলে বোধ হয়, গুছি দিয়ে চুল বাঁধা। ও তো ভাল। সেই প্রতিমার — আমার ননদের মেয়ে রে, খুব সুন্দর দেখতে, মনে আছে তো? তাকে আবার সব বলে, মশাই, হাতে মনে হচ্ছে কড়া পড়েছে। নন্দাইয়ের রাগে মুখ লাল হয়ে গেল, তবু বললেন, টিপে দেখুন হাত। ছেলেটি এম, এ পাশ করেছেন, বাড়ি আছে নিজের, বাপ-মা আছে, কি করা যায় সবই সহ্য করলেন। কিন্তু এখন যদি হাত দুটো দেখিস তার! শাশুড়ী ঝি-চাকরের জল-বাটনা নেয় না। রোজ তাল তাল বাটনা বাটে, জল তোলে। মুখখানি কচি টুলটুল করছে, হাত দুখানা যেন কার! তা হ'লে কড়া তখন কেন যে বলেছিল, কে জানে!

কথাগুলো খুব আশাপ্রদ নয়। নিভা অবাক হয়ে শুনছিল। সে বললে, দিদি, তোমাকে তারাই পছন্দ করলে যাঁরা হাঁটালে?

মেজদিদি বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই হাসলে, হাঁটালেন তো বাড়ির কেউ নয়, মামাশ্বশুর।

নিভা আরও অবাক হয়ে বললে, জামাইবাবুর মামা তো! তা তুমি সেখানে গিয়ে রাগ করনি, কিছু বলনি কারুকে? জামাইবাবুকেও না?

ওঁর দোষ কি? আর এ যে রেওয়াজ, সবাই এই করে।

নিভার রাগে গা জলে যায়। কিন্তু মেজদির যেন সবই খুব সহজ মনে হচ্ছে। পাশের বাড়ির ছাতে কে উঠলেন, বললেন, তোমাদের নিভাকে আজ দেখে গেল? কি বললে?

মেজদির উপদেশ - স্রোত থামল। কথার গন্ধ পেয়ে পুলকিত হয়ে আলসের ধারে গিয়ে দাঁড়াল, হ্যাঁ, দেখে তো গেল, এখনি কি বলবে, কিছুই বলে নি। (ঈষৎ মৃদু কণ্ঠে) আর শ্যামবর্ণ কিনা তাই, সহজে কি পছন্দ করে? বাবা এই

দুটি ছোট বোনের বিয়ে দিতে জেরবার হয়ে যাবেন ভাই। যে দেখেছে সেই বলে, সব ভাল মশাই, কিন্তু রঙটি যদি একটু ফরসা হ'ত। গান গাওয়ালে, লেখা দেখলে, কত কি।

প্রতিবেশিনী একটু মুখভঙ্গি ক'রে বললেন, লেখা নিয়েই বা কি করবেন? সেই সুনীরার কথা মনে আছে তোর? সেই যে আমার ছোটপিসীমার মেয়ে? কি চমৎকার গলা, পাড়ার লোক দাঁড়িয়ে যেত গানের সুরে তার। রঙ তেমন ছিল না,ঐ গানের আর বাপের টাকার জোরে, বিয়ে তো হ'ল, এখন শুনি নাকি বর কারুর কাছে কোন জায়গায় গান গাওয়া পছন্দ করে না। বড্ড খপিশ! বলে, মেয়েদের আবার বিয়ের পরে গান কি! কোনখানে পাঠায় না। মেয়ে-যজ্ঞিতেও গাইতেও বারণ, কাজের বাড়িতে পাঁচটা পুরুষ আসে তাই।

মেজদি বললে, অথচ মরবে সব বিয়ের সময় সব জিজ্ঞেস ক'রে। যার হাতে পড়বে সেই যদি ওসব না চায়-ছাই দরকারেও লাগে না।

তা দরকার লাগে না বটে, কিন্তু সুনীরার মেয়েটি যে কি চমৎকার গায়!

মা এলেম, কথায় বাধা পড়ল।

হ্যাঁরে, নিভা কই? কি সব ঢং বল তো, খাবার খেলে না অবধি! চিরকালকার জিনিস, তারা নিয়ে যাবে — দেখবে না? দেখেছে তো মেয়ে অমনি গ'লে গেলেন!

মার পেছন দিয়ে নিভা নেমে গেল।

ভাল লাগে না জানি, তা কি করব ছাই! — একসঙ্গে এত কথা এবং রাগ গলার কাছে জড়ো হ'ল যে মার আর কথা বেরুলো না মুখে।

অনেক রাত্রি।

ছোট ছেলেরা সকলে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়েছে। পুরুষদেরও খাওয়া চুকেছে, মার কাজ সারা হ'ল।

পাশের ঘরে মেয়েছেলেরা ঘুমোচ্ছে, নিভাদের বাবা এ ঘরে চুপচাপ শুয়ে আছেন।

নিভার জননী জলের ঘটি, দুধের বাটি, পানের ডিবে, মিছরি, বিস্কুট

নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। একে একে সবগুলি যথাস্থানে নাবিয়ে স্বামীর বিছানার পাশে এসে বসলেন।

তারপর?

স্বামী বললেন, কিসের?

এই যে গো, নিভাকে দেখে কি বললে? পছন্দ করেছে ছেলে?

স্বামী বললেন, কাল ওর বোনেরা মা আর ঠাকুমা আসবে দেখতে। ছেলের ছোট ভাই ছিল ব'লে গেল।

মাতা পিতা দুজনেই জানালার পথে রাস্তায় গ্যাসের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন।

অবশেষে মৃদু নিশ্বাস ফেলে মা বললেন, মেয়েটার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, কতবার যে সব দেখলে!

বাপ চুপ ক'রে রইলেন।

মা বললেন, দেখ না, সেবার নরেশবাবুরা, হাঁটালে, বিষ্টুবাবুরা কি সব ব'লে গেল। তারপর জগন্নাথবাবুরা মুখের উপর কালো বললে।

মা আবার বললেন, ওরা নাকি বলে, আমাদের চেয়ে বাজারে মাছের দর আছে।

নিভার পিতা অন্যমনে শুনছিলেন, শেষ কথাটায় একটু হাসলেন;বললেন, মিছে বলে না।

খনিক চুপ ক'রে বাপ জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা ঘুমোচ্ছে?

মা বললেন, হ্যাঁ।

রাত্রি গভীর হয়ে এল, ক্লান্ত স্বামী ঘুমোলেন।

নিভার মার চোখে আর ঘুম এল না। মনে হয়, বারে বারে নব অভিজ্ঞতায় এই একই অভিনয় দেখছেন। অসম্মান, সম্মান, অবমাননা অত বোঝে না মন, শুধু একে একে মনে পড়ে কত বিয়ের কথা, জানাশোনা, স্বজন আত্মীয়—কত কথা।

কারও বা গহনা, কারও বা গহনার ওজন, কারও বা গহনার রঙ, কারও

বা নিজেরই রঙ; কারও বা তুচ্ছ কথা, কারও দরিদ্র পিতা-মাতা, যা হোক অমনিই তো হয়ে থাকে। বলে, লক্ষ কথা না হ'লে বিয়ে হয়না।

ছোট বোন সুধারই তো বিয়ের পরদিন কুশণ্ডিকার আগে গহনা ওজন ক'রে দেখেছিল তারা। যাট ভরিতে দেড় ভড়ি কম ছিল। কাঁটা হয়ে ওঠে নি। তাঁদের বাপ গিয়ে তাড়াতাড়ি কাঁটার ত্রুটি সেরে নিলেন কাঁটা দিয়ে।

হয়তো তখন সুধার মনে একটু কাঁটা ফুটেছিল।

তা হোক। আজ সুধার ঐশ্বর্য দেখে কে? ছেলে মেয়ে সুখ ঐশ্বর্য ঘর বাড়ি হীরে মুক্তা!

আহা, তা বেঁচে থাক। আহা, বাবা দেখে যান নি। কিন্তু—

তা কি হবে, এই রকমই তো সব ঘরে!

রাত্রি গভীর হয়ে আসে। ছেলেমেয়েরা সব ঘুমোচ্ছে। মা তাঁর কালো মেয়েটির মুখের দিকে একবার চান। গ্যাসের আলো ঘরে পড়েছে, তারই সামান্য আলোয় দেখা যায়, খোকার গায়ে চাদব নেই, নিভার মাথার বালিশটা কোথায় স'রে গেছে। ঠিক ক'রে দিয়ে মা শুয়ে পড়েন।

আকাশে নিঃস্তব্ধ শান্তি। এক আকাশে তারা ঝিকমিক ক'রে ঘুমের রাজত্বে চেয়ে আছে।

পরদিন বৈকালে ছেলের মা আর অন্য পরিজনরা দেখতে এলেন ভেতরে, আর বাইরে এলেন বাপ, মাতুল কাকা।

পূর্বদিনের চেয়ে বেশি ক'রে সাবান স্নো ঘষে রংটা অনেকটা খসখসে ক'রে মাথা ঘ'ষে চুল খুলে মাথাটা মাথার তেলের বিজ্ঞাপনের মতন ক'রে শাড়ির সঙ্গে জামার রঙে মিল করিয়ে, ভেবে চিন্তে অনেক পরিশ্রমে সবাই সাজাল।

অবাধ্য অপমানবোধ কেবলই নিভার চোখর কোলে উপছে জল পাঠায়। আর দিদিরা ধমক দেয়।

কাকে আবার না দেখেছে, কে আবার না দেখে! তোর রকম দেখে বাঁচি না-চোখ-মুখের কি ছিরি হবে!

মেজদি বললে, বেশ দেখাচ্ছে এবার। নিভার মুখখানি যে বেশ।

যথারীতি প্রণামাদি ও শিষ্টাচারের কথা সমাপ্ত ক'রে মেয়ে দেখা। মেয়ে অন্দরে প্রেরণ করাও হ'ল।

খোশগল্পে আসর জমকে ওঠে। যথারীতি দেশের কি অবস্থা, বেকার সমস্যা, ঘি-দুধের দুর্মূল্যতা, পাস করার নিষ্ফলতা এবং না পাশ করা কেঁইয়াদের উপার্জনে কৃতিত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গে এসে ছেলের মাতুল পৌঁছলেন।

বলবেন না মশাই, রাম বাম, কি যে সব হয়ে দাঁড়াচ্ছে ব্যাপার, আমরা তবু রোজগার করছি, ছেলে ব্যাটারা আর খেতে পাবে না।

পাত্রীর পিতা 'আজ্ঞে হ্যাঁ' ব'লে সমর্থন করলেন। তারপর কন্যাদায় ও তারপর পাত্রপক্ষের নানা রকম অভ্রদতার কথাও ওঠে।

এবার পাত্রীর পিতা কিছু বলেত পারেন না। কে জানে, যদি কারও গায়ে বাজে!

কিন্তু মশাই, আসল ব্যাপার হচ্ছে এই কালোকে ফরসা করতে জানা। মাতুল ডাক্তার, বেশ নাম-করাও। উৎসুক হয়ে শ্রোতারা মুখের দিকে চেয়ে রইল, ভদ্রলোক কিছু ঔষধ বলবেন না কি ?

অট্টহাস্যে মাতুল বললেন, তা হচ্ছে মশাই এই - রঙ অনুপাতে রৌপ্য, ওষুধ-বিষুধ নয়; এই আমাদের পাড়ায় সম্প্রতি একটি যক্ষ্ম কালো মেয়ের বিয়ে হ'ল। বাপ বেশ বড় কাজ করে। মেয়ের মুখ তাকিয়ে দিলে মশাই। বলব কি, আট হাজাব নগদ দিলে। ছেলেটি সোনার চাঁদ— যেমন রূপ, তেমনই গুণ। খরচ করলে যেমন, পেলেও তেমনই। বুঝলেন কিনা? মাতুল আবার উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়ে দিলেন। অবশ্য আমরা অর্থাৎ আমার ভগ্নীপতিদের টাকা নগদ নেওয়ার প্রথা নেই; তবে —

বিমূঢ় অপমানিত বেদনায়-অনুজ্জ্বলবর্ণা মেয়ের পরিজনরা হাসবার চেষ্টা করলে তার সঙ্গে,পাছে ভদ্রতার লাঘব হয় আর তাতে মেয়ে পছন্দতে ত্রুটি ঘটে।

নিভা ওপরে উঠে এল। এবার মা জলটল খাওয়াবেন ওদের। আর

চোখে জল এল না। যা হোক একটা নিষ্পত্তি — এস্পার কি ওস্পার হয়ে চুকে গেলে ও বাঁচে।

এ বাড়ির ও বাড়ির চিনু বিনু রুনা রেবা আশা সব বারান্দায় ছাতে দাঁড়িয়েছে।

নিভা উদাসীনভাবে ছাতের অন্য এক কোনে দাঁড়ায়। গল্পের কথা কানে টুকরো টুকরো ভেসে আসে।

জান ভাই, আমার বে'তে পাঁচবার দশবার দেখাদেখি কিছু হয় নি। যেমন শাশুড়ী দেখলেন, অমনিই সব কথা ঠিক হওয়া।

তা ভাই, তোমার বাবা যে তেমনই ছ'হাজার ক'রে খরচ করেছিলেন। তোমাদের ঐ সুধার কেন অত নাকাল?

দেখতে তো সুধা ভাল নয়। আর কাকা তেমন খরচ করলেন কই?

এইবার একটি মুখরা মেয়ের গলা শোনা গেল বেশ জোরে, তা ব'লে তোরা যারা রূপসী তাদেরই সব ভাল হবে? তা হ'লে তোদের লীলার কেন ভাল ঘর বর হ'ল?

সে যে তার বাপের একটি মাত্র মেয়ে, অত বিষয় সেই পাবে। আর কালো, তা মুখখানি কি সুন্দর! স্বামী খুব আদর-যত্ন করে।

মুখরা মেয়েটি শ্যামা, বিদ্রূপ-হাস্যে সে বললে, তাই বল আসল কথা টাকা, তাই মুখখানি ভাল, তাই তার শ্বশুরবাড়ির যত্ন।

যে তর্ক করছিল সে বললে রাগ ক'রে, তা টাকা তো কি? যার বাবার আছে, তিনি দেবেন না?

কেউ হারে না, নানামুখী তর্ক চলে।

রাত্রি হ'ল। অন্ধকারে নিভা একলা ছাতে শুয়ে ভাবে। মনের একপাশে দাঁড়ায় আকাশভরা তারা, অন্যধারে পৃথিবী জোড়া অন্ধকার।

সেদিন দিদি এসেছিল। ওপরে এল তারা।

হ্যাঁরে, ওপরে একলা?

নিভা উঠে বসে।

সেই একই কথা। দিদি বেশ ক'রে বসে সান্ত্বনা দেবে ভাবে, বলে, এমনিই হয়েছে ভাই। সে তাদের পাড়ার কার কন্যাদায়ের নিদারুণ মর্ম্মস্পর্শী ব্যখ্যা দেয়। আর উপসংহারে বলে, কি করবি এমনিই ঘরে ঘরে।

তারপর মেজদি তার মামাশ্বশুরবাড়ির কার এক কন্যাদায়ের ভয়াবহ অথচ উজ্জ্বল ব্যাখ্যা দেয়; অর্থাৎ কৃষ্ণা মেয়েটি বিয়ের পরে নাকি আত্মহত্যা করে। তার উপসংহারে সে বলে, তার চেয়ে আমাদের নিভা দিবা ঢের ফরসা—

রাত্রিও বাড়ে গল্পও বাড়ে। আসর জমে ভূতের গল্পের মত। নিজ নিজ নিতান্ত নিরীহ নিরপরাধ হৃদয়বান অথচ পিতৃমাতৃভক্ত স্বামীদের বাদ দিয়ে- অন্য সকলের ভদ্রতাহীন বিয়ের কথা বলে। শ্বশুরালয়ে খোঁটার কথা বলে।

নিভা আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে থাকে। বর এবং বরপক্ষীয়দের সম্বন্ধে তার ধারণা তো খুব ভাল হয়ই না, বরং বেশ ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে।

অনেক রাত্রে দিদি গেল ছেলে শোয়াতে।

চুপ ক'রে থেকে থেকে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে বসল,আচ্ছা ভাই মেজদি, মেজ জামাইবাবুরাও তো অমনিই করেছিলেন?

মেজদি সোজাসুজিই বললে, দেনা-পাওনার কথা আবার কোন্ বিয়েতে না হয়? হয়েছিল বৈকি। তা সে তো আমার দিদিশাশুড়ি আর শ্বশুর করেছিলেন। উনি তার কি জানেন?

মেজদির স্বামীকে ভাল বলবার সরল প্রচেষ্টায় নিভার হাসি পেল। সে একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, তা হ'লেও ভাই উনি তো মা-বাপের ছেলে, বলতে পারতেন না কি?

মেজদি বললে, তা কি ক'রে বলবেন? মাথার ওপর গুরুজন বাপ মা, তাঁরা যা করবেন ভালর জন্যেই তো? আর এ তো সবাই করে।

নিভা অপ্রস্তুতভাবে বললে, তা হ'লেও অত বিদ্বান জামাইবাবু —

মেজদি বললে, তাতে কি?

নিভার অন্তরে বিদ্বান পুরুষসমাজের ওপর ঈষৎ শ্রদ্ধা ছিল তখনও। সে ভাবত, বোধহয় তারা পৌরুষে দীপ্ত, আকাশের মত উদার, অচলের মত

দৃঢ়, সমুদ্রের মত গভীর। নিত্যকার ছোট ছোট দৈন্য, ক্ষুদ্রতা, লোভ তাদের স্পর্শ করে না।

আবার সে বলে, আচ্ছা ভাই, তোমার শাশুড়ি নাকি বড় খোঁটা দিয়েছিলেন বাবাকে, তাতেও জামাইবাবু চুপ ক'রে রইলেন?

তা কি ক'রে বলবেন? - তুই এক পাগলী। মা-বাপকে বলা যায়? হ'লই বা শোনালেন আমার শাশুড়ি। তাঁদের হ'ল গিয়ে ছেলে, আমার বাবার মেয়ে! লোকে কত কথা বলে, তাঁরা আর এমন কি বলেছেন? বিয়েতে লক্ষ কথা হবে, আর ছেলের পক্ষ মেয়ের পক্ষকে বলবে, এই হ'ল ধারা।

যুক্তিসঙ্গত জবাব পেয়ে নিভা চুপ ক'রে গেল।

আকাশের এক প্রান্ত থেকে কৃষ্ণা তৃতীয়ার বাকা সোনার থালার মত চাঁদ উঠল। মা ডাকলেন, ওরে ও মেয়েরা, কত বাত্তির হল, ছেলে-মেয়েকে খাইয়ে নে না? নিভাকেও খেতে ডাক।

নিভা উঠল।

এবারে সে কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা দিদি ভাই,তোমাদের জামাইবাবুদের ভাল লেগেছিল?

তার ষোল বছর পার হয়ে গেছে, গল্পেব বই পড়ারও প্রচুর সময় ছিল, কাব্যজাগতিক আদর্শ স্বামী সমন্ধে কল্পনার যথেষ্ট অবকাশ ছিল।

মেজদিদি উঠছিল, হেসে গড়িয়ে পড়ল, স্বামীকে ভাল লাগবে না? কেন? শোন একবার মেয়ের কথা। হাসিয়ে পাগল করতে পারে ও। মাগো, ওদেরও বিয়ে হয়েছিল সব, কই এসব কথা তো ভাবেও নি। মেজদিদি, দিদি আর মার কাছে এত হাসির কথা বলতে নেমে গেল।

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে নিভা দিদিদের ছোট ছেলেদের ঘুম পাড়াতে মার কাছ থেকে নিয়ে এল।

আদর কাড়াতে নিভা পায় না, আদরই পায় নি। দর থাকলে আদর থাকে। বোনেদের প্রথম নয় শেষ নয় সে, আদর কাড়াতে অপ্রস্তুত মনে হয়।

তবু অনেক রাত্রে যখন দিদিরা ঘুমোল, ছেলেরা ভাইয়েরা ঘুমোল, মার

পায়ের শব্দে নিভা উঠে বসল। সবাই ঘুমোচ্ছে।

জননীর চোখ পড়ল, কি রে?

একটু জল খাব। — উঠে এসে কুঁজো থেকে জল খায়।

কলকাতার আকাশ ঝাপসা জ্যোৎস্নায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে মহানগরীর দিকে চেয়ে আছে। পাড়ার প্রায় সব বাড়িই অন্ধকার!

মা তখন ভাবছিলেন, স্বামীর কাছে গিয়ে কিছু পরামর্শ করবেন, জিজ্ঞাসা করবেন।

নিভা এসে দাঁড়াল কাছে।

কি রে?

আমার ও রকম ক'রে বিয়ে দিও না মা।

কি রকম ক'রে? -- মা ভ্রূকুঞ্চিত করলেন।

ঐ কেবলই টাকা আর গয়না দিয়ে। আমি ওদের ভালবাসতে পারব না। তার চোখ ছলছল ক'রে এল।

শোন কথা! ওরা টাকা নিয়ে বিয়ে করবে, তার সঙ্গে তোর সম্বন্ধ কি? পাগল আর কি! এঁরাও তো টাকা নিয়েছিলেন—

তাঁর নিজের ভালবাসার কথা মা আর বললেন না।

রাত হয়েছে, যা শুগে।

বাপ জেগেই প্রায় ছিলেন; জিজ্ঞাসা করলেন, নিভা কি বলছিল?

মা বললেন। নিভার বাপ একটু চুপ ক'রে থেকে একটু হেসে বললেন, তা ভালবাসার ব্যাঘাত হয় না। দৃষ্টান্ত যা দিয়েছ, তার জবাব দেবার উপায় ওর আর নেই, আমারও নেই।

স্ত্রী অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

কথা উল্টে বললেন, ওরা কি বললে? জবাব কবে দেবে? পছন্দ হয়েছে? স্বামী বললেন, ওরা ব'লে গেল, মেয়ে পছন্দ হয়েছে ওদের, রঙ ফরসা করার উপায়ও একটা বাতলে দিয়েছে, সেটা হ'লেই ওরা সামনের বৈশাখে দেবে।

উৎসুক নিভার মা জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি উপায়?

কিছু বেশি টাকা। নগদ ওরা নেয় না, কিন্তু রকম নেয়।

খানিক চুপ ক'রে থেকে পত্নী বললেন, তা কি করবে?

তাই দোব আর কি। ছেলেটি ভাল, স্বাস্থ্য ভাল, বাপের অবস্থা ভাল, বাজারে দর আছে। তা ছাড়া মেয়েকে গয়নাগাঁটি দেবে, আদরও করবে। তারপর একটু থেমে ঈষৎ হেসে বললেন, আর তুমি তো বলেছ ঠিকই — ভালবাসতে কোনই বাধা হয় না।

সংসার

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃদ্ধ বয়সে দাম্পত্য কলহ কৌতুক এবং হাসির কথা। কিন্তু প্রেমের দেবতা চিরদিনই অবুঝ কিশোর, স্থান-কাল পাত্র লইয়া কোন বিবেচনা বা বিচার করা তাহার প্রকৃতির বহির্ভূত। পঞ্চান্ন বৎসরের সরকার-গৃহিণী ষাট বৎসরের বৃদ্ধ স্বামীর উপর দুর্জয় অভিমান করিয়া বসিলেন গোপনে নয়, একেবারে প্রকাশ্যে, উপযুক্ত ছেলে-বউ এবং একঘর নাতি-নাতনীর সমক্ষেই অভিমান ঘোষণা করিয়া গাড়ি আনাইয়া বাপের বাড়ি চলিয়া গেলেন।

ছেলে-বউয়েরা কেউ কিছু বলিতে পারিল না। বড় নাতনী সদ্য বিবাহিতা কমলা কিন্তু থাকিতে পারিল না, সে মুখে কাপড় দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সরকার-গিন্নি গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিলেন, হাসছিস যে বড়?

কমলা হাসিতে হাসিতেই বলিল,একটা ছড়া মনে পড়ল ঠাকুমা।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গিন্নি বলিলেন, ছড়া;

হ্যাঁ। শিবদুর্গার সেই ছড়া, সেই যে —

'‘মর মর ভাঙর বুড়ো তোর চক্ষে পড়ুক ছানি

বাপের বাড়ি চললুম আমি-বলেন দুগ্‌গা রানী —

কোলে লয়ে কার্তিক, হাঁটায়ে গণপতি —
রাগ করে চলিলেন অম্বিকে পার্বতী।"

তা বাবাকে কাকাকে নিয়ে যাও!

নাতনির এ রহস্য সহাস্যমুখে তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন না, বুকে বরং আঘাতই লাগিল। রহস্যের উত্তর পর্যন্ত তিনি দিতে পারিলেন না, শুধু কমলার মুখের দিকেই নীরবে চাহিয়া রহিলেন। সে-দৃষ্টির ভাষাতেই কমলা নিজের ভুল বুঝিতে পারিল, সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া একান্ত অনুতপ্ত মিনতিপূর্ণ কণ্ঠেই বলিল, রাগ করলে ঠাকুমা?

ম্লান হাসি হাসিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া গিন্নি বলিলেন, তোর ওপর কি রাগ করতে পারি ভাই?

কমলি আবার রসিকতা করিয়া ফেলিল, চুপি চুপি বলিল, বর অদল বদল কর ঠাকুমা, আমার সে ভারী অনুগত-বর। তুমি খুশি হবে। আমি একবার বুড়োকে দেখি তা হলে!

এবার ঠাকুমা হাসিয়া ফেলিলেন, তারপর বলিলেন, তার চেয়ে তুই দুটোই নে ভাই। আমার আর চাইনে, আমার অরুচি ধরেছে।

কমলি বলিল, কিন্তু তুমি এমন ক'রে বাপের বাড়ি যেয়ো না ঠাকুমা, লোকে হাসবে।

ঠাকুমা এবার জ্বলিয়া উঠিলেন- তবে তো আমার গায়ে ফোস্কা পড়বে লো হারামজাদী। কেন আমি আমার বাপের বাড়ি যেতে পাব না, ভাই-ভাজ কি সংসারে পর নাকি? আয় রে খেঁদি, আয়। বলিয়া ছোট নাতনি খেঁদির হাত ধরিয়া তিনি গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। ছোট ছেলে অমৃত গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের শেষ পর্যন্ত আসিয়া বলিল, বেশী দিন থেকো না মা, দিন দশেকের মধ্যেই চলে এস!

গিন্নি বলিলেন, আমি আর আসব না বাবা। তোমার বাপের ও হতচ্ছেদার ভাত আমি খেতে পারব না!

নাতনি খেঁদিও বলিয়া উঠিল, আমিও বাবা, আমিও আর আসব না।

তাহার কথা শেষ না হইতেহ শিহরিয়া উঠিয়া গিন্নি তাহার পিঠে একটা চড় বসাইয়া দিলেন - কি,কি বল্‌লি হারামজাদী! কি বল্‌লি?

খেঁদি অপ্রত্যাশিতভাবে চড় খাইয়া হতভম্বের মত কিছুক্ষণ ঠাকুমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তার পর ক্রুদ্ধ বিড়ালীর মত গর্জন করিয়া উঠিল, তুই বল্‌লি কেন, তুই?

সে-কথার কোন উত্তর না দিয়া গিন্নি বলিলেন, বল, শিগগির আসব বাবা! বল্‌।

অমৃত হাসিতে হাসিতেই সেখান হইতে ফিরিল। বলিল, ঐ হয়েছে মা, তুমি বললেই ও এখুনি বলবে।

কারণটা নিতান্তই তুচ্ছ। উত্তরায়ণ-সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নানে যাওয়া লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে বিরোধ। কর্তা সংকল্প করিয়াছিলেন, উত্তরায়ণ-সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নানে যাইবেন। কথাটা মনে মনেই রাখিয়াছিলেন, প্রকাশ করিলেন যাত্রার পূর্বদিন। শুনিবামাত্র গিন্নি নিজের মোটঘাট বাঁধিতে বসিলেন, কর্তা সবিস্ময়ে বলিলেন, ও কি, তুমি কোথা যাবে?

একটা কৌটায় দোক্তাপাতা পুরিয়া পোঁটলায় বাঁধিতে বাঁধিতে গিন্নি বলিলেন, আমিও যাব। সঙ্গে সঙ্গে মেলার পিতল কাঁসা ও পাথরের বাসনের দোকানগুলি সারি সারি কর্তার মনশ্চক্ষের সামনে ভাসিয়া উঠিল। বাসা আর দোকান, দোকান আর বাসা! অন্তত কুড়ি-পঁচিশ টাকা। কর্তা শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি ঘাড় নাড়িয়া প্রতিবাদ জানাইয়া বলিলেন উহুঁ!

উহুঁ কি? তোমার হুকুমে নাকি?

তুমি তো এই কার্তিক মাসে গঙ্গাস্নান করে এলে!

কার্তিক মাসে করেছি তো পোষ মাসে কি? আমি যাবোই। তুমি সঙ্গে করে আমাকে কোথাও নিয়ে যাও না। ছেলেদের সঙ্গে দাও, আর তারা গিয়েই ধুয়ো ধরবে, টাকা নেই, বাবা বকবে! ও-সব হবে না। এবার আমিও এই চাটুজ্জেদের মত একখানা বড় গামলা আর বাঁড়ুজ্জেদের মত একটা ডেকচি কিনব।

কর্তা আর থাকিতে পারিলেন না। বলিয়া উঠিলেন, তার চেয়ে বল না যে আমাকে অর্ন্তজলী করে দিতে যাবে!

মুহূর্তে গিন্নির সর্ব অবয়ব যেন অসাড় পঙ্গু হইয়া গেল, গ্রন্থিবন্ধন-নিরত হাত দুইখানি পোঁটলার উপর আড়ষ্ট হইয়া এলাইয়া পড়িল, মুখের চেহারায় নিমেষে সে এক অদ্ভুত রূপান্তর।

কর্তা নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, চট্ করিয়া সংশোধনের একটা উপায় ঠাওরাইয়া তিনি হাহা করিয়া খানিকটা হাসিয়া লইলেন, নিতান্ত প্রাণহীন কাষ্ঠ হাসি! হাসিতে হাসিতে বলিলেন, সে পারব না বাপু, এই বুড়ো বয়সে আমি তোমাকে অন্তর্জলী করতে পারব না!

তার পর আবার খানিকটা সেই হাসি, হে-হে হেহে!

গিন্নি কোন উত্তর দিলেন না, শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাটির মেঝের উপরেই শুইয়া পড়িলেন। কর্তা পরম উৎসাহের সহিত বলিলেন, তাই চল; গাঁটছড়া বেঁধে গঙ্গাস্নান করতে হবে কিন্তু! তখন কিন্তু লজ্জা করলে শুনব না! কত বাসনই কেনো তাই আমি একবার দেখব!

তবুও কোন উত্তর নাই। কর্তার বুকের ভিতরটাএকটা দারুণ অস্বস্তির উদ্বেগে হাঁপাইয়া উঠিতেছিল, পা দুইটা যেন মুহূর্তে মুহূর্তে দুর্বল হইয়া আসিতেছে।- যাই দেখি, তাহলে দু'খানা গাড়িই সাজাতে বলি। একখানা গাড়িতে জিনিষপত্র আসবে। বড় গামলা-ও দু'খানা কেনাই ভাল, একখানাতে ডাল, একখানাতে ঝোল! তা বটে, বাসন কতকগুলো সত্যিই দরকার! হ্যাঁ! হ্যাঁ,- বলিতে বলিতেই তিনি পলাইয়া আসিলেন। খানিকটা পাড়ার চাটুজ্জের সঙ্গে গল্পগুজব করিয়া ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, গিন্নি পণ করিয়াছেন, এ- বাড়ির অন্ন আর তিনি গ্রহণ করিবেন না, বাপের বাড়ি যাইবেন। এ-বাড়িতে থাকিবার দিন তাহার নাকি শেষ হইয়াছে।

দাম্পত্য প্রেম মানুষকে যেমন কাণ্ডজ্ঞানহীন করে এমন আর কিছুতে পারে না। সরকার-কর্তা গম্ভীর প্রকৃতির লোক, গ্রামের মধ্যে মাননীয় ব্যক্তি, সেই কর্তা দাম্পত্য কলহে দিশা হারাইয়া সেই রাত্রে শয়ন কক্ষে মুখ ঢাকিয়া

একখানি গামছা বাঁধিয়া বসিয়া রহিলেন; মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, গিন্নী দেখিয়া নাক বাঁকাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি গানে ধরিয়া দিবেন, এ পোড়ারমুখ হেরবে না ব'লে হে, আমি বিদেশিনী সেজেছি!

হঠাৎ পৌত্রী কমলা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল, তাঁহার এই মূর্তি দেখিয়া সে একটু চকিত হইয়া বলিল, ও মা গো, ও কি?

. কর্তা আজ যেন একেবারে ছেলেমানুষ হইয়া গিয়াছেন, কমলার এই আতঙ্ক দেখিয়া কৌতুকে খিল খিল করিয়া হাসিয়া তিনি বলিলেন, আমি ভূত!

কমলি সেয়ানা মেয়ে, সে ব্যাপারটা সঠিক না বুঝিলেও আভাসে খানিকটা অনুমান করিয়া লইল; সেও খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, তা ভূত মশায় আপনি খিল দিয়ে শুয়ে পড়ুন, আপনার পেত্নি আসবেন না, আমার কাছে শুয়েছেন।

কর্তা মুখের গামছাখানা টানিয়া খুলিয়া ফেলিয়া দিশাহারার মতন চাহিয়া রহিলেন। তঁহার মনের মধ্যেও দারুণ অস্বস্তি, বুকের ভিতরটা এক অসহনীয় উদ্বেগে অহরহ পীড়িত হইতেছে। সহসা তাঁহার ইচ্ছা হইল, নিজের গালেই তিনি ঠাস ঠাস করিয়া কয়েকটা চড় বসাইয়া দেন। তারপর রাগ হইল গিন্নির উপর। কি এমন তিনি বলিয়াছেন যে কচিখুকির মত এমনধারা রাগ করিয়া বসিল বুড়ি! তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, নির্জন ঘরের সুবিধা পাইয়াই বোধ হয় অকস্মাৎ গিন্নির উদ্দ্যেশ্যে দুই হাত নাড়াইয়া মুখ ভেঙাইয়া উঠিলেন, এ্যাই, এ্যাই! এ্যাঃ, কচি খুকি আমার! গলায় দিক গে একগাছা, লজ্জাও নেই! এ্যাঃ!

পরদিনই গিন্নি বাপের বাড়ি রওনা হইয়া গেলেন; ছেলে-বউ নাতি-নাতনি কাহারও কথা শুনিলেন না। কেবল ছোটছেলের মেয়ে খেঁদি কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িল না, গিন্নীও তাহাকে ছাড়া থাকিতে পারেন না, সেই - সঙ্গে গেল।

বহির্বাটীতে কর্তা তখন বাড়ির কৃষাণদের সঙ্গে এক তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া তুলিয়াছেন। রাগে তিনি যেন আগুনের মত জ্বলিতেছিলেন।

দিন পাঁচেক পরেই বৃদ্ধ সরকার-কর্তা শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,

সঙ্গে গাড়ীতে এক গাড়ি বোঝাই করা বাসন।

গিন্নি চলিয়া যাওয়ার পর তিনিও রাগ করিলেন। মনে মনে ঠিক করিলেন গঙ্গাস্নানে যাইবেন এবং আর তিনি ফিরিবেনই না, গঙ্গাতীরেই একখানা কুটির বাঁধিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ কাটাইয়া দিবেন। পরদিনই তিনি গঙ্গাস্নানে রওনা হইলেন, সঙ্গে গোপনে টাকাও লইলেন অকেগুলি। একখানা বাড়ি ছোটখাটো যেমনই হউক, কিনিয়া তিনি ফেলিবেনই! কিন্তু সেখানে গিয়া বাড়ির পরিবর্তে এক গাড়ি বাসন কিনিয়া তিনি স্বগৃহের পরিবর্তে শ্বশুরগৃহে আসিয়া উঠিলেন। শ্যালকেরা পরম আদরের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার পরিচর্যার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। পা-হাত ধুইবার জল, তামাক, জেলে ডাকিবার বন্দোবস্ত, সে অনেক কিছু। হুঁকাতে কয়েকটা নামমাত্র টান দিয়াই সরকার-কর্তা উঠিয়া বলিলেন, চল তোমাদের গিন্নিদের একবার দেখে আসি। শ্বশুরবাড়ির আনন্দই হল শালি আর শালাজ। চল। বলিয়া নিজেই তিনি অন্দরের পথ ধরিলেন।

একখানা কার্পেটের আসনে মহা সমাদর করিয়া তাঁহাকে বসিয়া বড় শ্যালক - পত্নী প্রণাম করিয়া উঠিয়াই ফিক্ করিয়া হাসিলেন! বলিলেন, তার পর? এলেন?

কর্তাও ঐ হাসিই একটু হাসিয়া বলিলেন, এলাম।

হুঁ। বলিয়া শ্যালক-পত্নী আবার হাসিলেন।

মাথা চুলকাইয়া কর্তা বলিলেন, খেঁদি কই?

পাখী উড়েছে, দিদি এখানে নেই সরকারমশাই!

তোমার দিদির কথা আমি জানতে তো চাই নি, খেঁদি কই?

ঐ হ'ল গো। দিদি তাকে নিয়ে বুড়ো বয়সে গেলেন মামারবাড়ি! এই কাল গিয়েছেন।

মামার বাড়ি? সরকার-কর্তার সর্বাঙ্গ এই মাঘের শীতে যেন জলসিঞ্চিত হইয়া গেল। শ্যালক-পত্নীও বৃদ্ধ বয়সেও খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, তার পর ডাকিলেন, ওগো ও দিদি, নেমে এসো না ভাই, কর্তার বুকে যে তোমার খিল ধরে গেল গো!

সরকার-গিন্নী সত্যই নামিয়া আসিলেন, কিন্তু কর্তাকে একটি কথাও না বলিয়া ভাজকে বলিলেন, তোমার কি কোন আক্কেল নেই বউ? ছি, উপযুক্ত ছেলে-বউ কি সব ভাবছে বল তো?

ঠিক এই মুহূর্তটিতেই খোঁদি একেবারে লাফ দিতে দিতে আসিয়া বাড়ি ঢুকিল — ওরে বাবা রে! দাদু এক গাড়ি বাসন এনেছে। এই বড় বড় গামলা, এত বড় ডেকচি, গেলাস, বাটি, কত-কত। সে দাদুর গলা জড়াইয়া পিঠের উপর ঝুলিয়া পড়িল।

শ্যালক-পত্নী বলিলেন, সব তোমার ঠাকুরমায়ের! তোমার জন্য খট খট লবডঙ্কা!

খোঁদি এবার পিঠ হইতে কোলে আসিয়া বসিয়া বলিল, এ্যাঁ, আমার জন্যে কি এনেছ, এ্যাঁ!

সরকার-কর্তা গিন্নির দিকে একবার চাহিয়া লইয়া মৃদুস্বরে গান করিয়া বলিলেন, তোমার জন্যে একখানা নয়না এনেছি হে! আর একখানি কিরুনি এনেছি! বলিয়া পকেট হইতে ছোট্ট একখানি আয়না ও চিরুনি বাহির করিয়া দিলেন।

খোঁদি বলিল, যাঃ এ যে আয়না চিরুনি — নয়না কিরুনি কেন হবে?

ইয়া বড় বড় হলেই বুঝি আয়না চিরুনি, আর এ হ'ল নয়না আর কিরুনি।

আর আর! না এ ছাই! এ আমি নেব না। ঠাকুরমায়ের জন্যে তুমি কত এনেছ তুমি, হ্যাঁ।

এবার ঠাকুরমা লজ্জিত হইয়া বলিলেন, এনেছে এনেছে, তোর জন্যে অনেক এনেছে। একটু থাম মানুষকে একটু জিরোতে দে!

কর্তা পুলকিত হইয়া বলিলেন, বাক্সটা নামিয়ে আনতে বল। কথা শেষ না হইতেই খোঁদি ছুটিল — বাক্স বাক্স!

কর্তা আবার বলিলেন, বাসনগুলো নামাতে বল; গামলা কিনেছি চারখানা, ডেকচি বড় বড় দুটো-

বাধা দিয়া গিন্নি বলিলেন, নামিয়ে আর কি হবে বাড়িতেই নামাবে

একেবারে। খাওয়া দাওয়া করেই চলে যাও।

বলিয়াই তিনি উপরে চলিয়া গেলেন। অকূল সমুদ্রে কর্তার হাত হইতে যেন অকস্মাৎলব্ধ কাষ্ঠখণ্ডটি আবার ভাসিয়া গেল। শ্যালক-পত্নী হাসিয়া বলিলেন, কঠিন ব্যাপার সরকারমশাই!

সরকার কাতর স্বরেই বলিলেন, কি করি বল দেখি ভাই?

উপর হইতে প্রশ্ন হইল, বলি, নন্দাইকে জলটল খেতে দাও, না আমোদই করবে?

ও-মা! বলিয়া জিভ কাটিয়া শ্যালক-পত্নী ব্যস্ত হইয়া ডাকিলেন, বৌমা, বৌমা, কি আক্কেল তোমাদের বাপু, ছি!

বৌমার অপরাধ ছিল না, সে প্রস্তুত হইয়াই ছিল, জলখাবারের থালা হাতে সে বাহির হইয়া আসিল। কথাটা চাপা পড়িয়া গেল।

তখনকার মত চাপা পড়িলেও শেষ পর্যন্ত শ্যালক-পত্নীই মধ্যস্থ হইয়া স্বামী-স্ত্রীর একটা আপোষ করিয়া দিলেন। সরকার-মহাশয়কে তিনি প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন, দেখুন কথার খেলাপ করবেন না তো? তিন সত্যি করুন আপনি।

তিন সত্যিই করছি গো আমি। আনব আনব- এক বছরের মধ্যেই আমি হরিদ্বার পর্যন্ত তীর্থ করিয়ে আনব।

সরকার গিন্নী বলিলেন, যে-কথা তুমি বলেছ আমাকে, তার জন্য আমাকে একশো আটটি সধবা ভোজন করাতে হবে এক মাসের মধ্যে।

বেশ তাই হবে। নতুন বাসনে একটা কাজ হয়ে যাক।

শ্যালক-পত্নী বিনা বাক্যব্যয়ে এবার হাসিতে হাসিতে সরিয়া পড়িলেন। সরকার-গিন্নি বলিলেন, তুমি সাক্ষী থাক ভাই বউ, কই বউ

হাসিয়া সরকার বলিলেন, চলে গিয়েছেন তিনি।

বাহির পর্যন্ত দেখিয়া আসিয়া সরকার-গিন্নি বলিলেন, বলি, তোমার আক্কেলটা কি রকম শুনি? রাজ্যের বাসন নিয়ে যে একেবারে এখানে চলে এলে?এখানে সমস্ত ছেলের হাতে আমাকে একটি করে বাটি নয় গেলাস দিতে হবে। মেটের কোলে পনর-ষোলটি ছেলে! কোন আক্কেল নেই তোমার।

সরকার বলিলেন, বেশ তো গো, আবার তোমাকে কিনে দিলেই তো হ'ল?

পরদিনই সরকার-মহাশয় গৃহিণীকে লইয়া বাড়ি ফিরিলেন। গাড়িতে উঠিবার সময় গিন্নি আবার বলিলেন, দেখ, একবছরের মধ্যে তুমি নিজে সঙ্গে ক'রে হরিদ্বার পর্যন্ত তীর্থ করিয়ে আনবে তো?

আবার সরকার প্রতিশ্রুতি দিলেন, আনব, আনব, আনব।

কিন্তু আপত্তি তুলিল ছেলেরা। প্রবল আপত্তি করিয়া বড় ছেলে বলিল, বেশ তো যাবেন আর কয়েক বছর পরে। আমরা সব বুঝে-সুঝে নিই।

সরকার-কর্তা গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, শোন, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের উপযুক্ত ছেলের কথা শোন একবার।

তার পর ছেলেকেই বলিলেন, এই দেখ, আমার তখন পঁচিশ বছর বয়স। পঁচিশ নয়, পুরো চব্বিশ - নামে পঁচিশ, সেই বয়সে আমি বাপ-মাকে কাশীবাস করিয়েছিলাম। দেখলাম বাবার শরীর খারাপ, চিঠি লিখে কাশীতে বাড়ি ভাড়া করলাম। বাবা কিছুতেই যাবেন না, আমি জোর ক'রে নিয়ে গেলাম। ভাল স্থান, ভাল খাবেন, ভাল থাকবেন, বিশ্বনাথ দর্শন করবেন! কোথায় এই সংসারে পঙ্কে ডুবে এই গোষ্পদে পড়ে থাকবেন! শেষ সময়ে বাবা দু'হাত তুলে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। আর তোরা এই বলছিস? তাও আমরা চিরদিনের মত যাই নি, এই মাস-দুয়েক পরেই ফিরব!

ছেলে বলিল, ব্যবসার বাজার যা মন্দা পড়েছে তাতে ঝক্কি ঘাড়ে নিতে আমার সাহস হচ্ছে না, তার উপর চাষ, জমিদারি, হাইকোর্টে মোকদ্দমা, এ সামলাতে আমরা পারব না।

এবার বিরক্ত হইয়া সরকার-কর্তা বলিলেন, না পারলে হবে কেন? আমরা কি চিরজীবী? আমি এই সংসারের ভার নিয়েছি পঁচিশ বছর বয়সে। তখন ছিল কি? বাবার পৈতৃক পাঁচ-শ'টাকা জমিদারির আয় আর শ'খানেক বিঘে জমি। বাবা কাশী যাবার পর ব্যবসার আরম্ভ করে এইসব আমি করেছি। বাবা কিছুতেই ব্যবসা করতে দেবেন না, আমিও ছাড়ব না। তাঁকে কাশীতে রেখে

এসেই আমি ব্যবসা করছিলাম। তোদের মত ভয় করলে হ'ত এইসব? না, বাপের আঁচল ধরে বসে থাকলে হ'ত?

ছেলে এবার বাধ্য হইয়া বলিল, তবে যান। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই আবার সে বলিয়া উঠিল, কিন্তু—

আবার কিন্তু তুলিস কেন! কিন্তু কিসের?

টাকাকড়ির বড় টানাটানি চলছে, কোথা তেকে যে টাকা আপনাদের দেব তাই ভাবছি। মাস তিনেক পরে—

বাধা দিয়া সরকার-কর্তা বলিলেন, টাকাকড়ি কিছু লাগবে না বাবা, তোমাদের টাকা আমি নেব না, তীর্থের টাকা, সে আমার কাছে আছে।

হাসিয়া ছেলে বলিল; আমাদের টাকা? বিষয় সম্পত্তি সংবার আমাদের না আপনার?

এবার সরকার-গিন্নি বলিলেন, সংসার তোমাদের বই কি বাবা, ছেলেমেয়ে ঘরের সবই এখন তোমাদের। আমারও এখন তোমাদের ছেলেমেয়ে সামিল।

কর্তা বরং বলিলেন, না না তা বললে হবে কেন? যত দিন আমরা আছি তত দিন ঝড়ঝাপ্টা আমাদেরই মাথায় নিতে হবে বই কি। বাপমায়ের আড়াল হ'ল পাহাড়ের আড়াল!

যাক। ইহার পর আর কোন বাধাই হইল না, উদ্যোগ-আয়োজন করিয়া সরকার-কর্তা শুভদিনে গৃহিণীকে লইয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। ট্রেনে উঠিয়া মনটা কেমন করিযা উঠিল ছেলেরা, ছোট ছোট নতি-নাতনিরা প্লাটফর্মের উপর কেমন বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাদের দিকে চাহিয়ো দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঘর-দ্বার দেখা যায় না। কিন্তু গ্রামপ্রান্তের গাছপালাগুলির শ্যামলতার উপরেও কেমন যেন উদাসীনতার ছাপ পড়িয়াছে।

সরকার-গিন্নি জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন, বোধ করি সকলকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন, এই তো ক'টা দিন, দুমাসে ষাট দিন।

কর্তা গম্ভীর ভাবে বলিলেন, খুব হুশিয়ার বাবা। যে কাজ করবে বেশ ক'রে ভেবে চিন্ত, বরং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে চিঠি লিখে দেবে। আমি যেখানে

যাব ঠিকঠিকানা আগে থেকে জানাব।

ট্রেনটা ইতিমধ্যেই চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল কর্তা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, না না, এমন করে ট্রেনে সঙ্গে —

ট্রেনে গতি সঞ্চায় করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

বড় ছেলে বলিল, একটা কথা, জিজ্ঞেস করতেও পারলাম না ছাই।

কনিষ্ঠ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল -- কি?

এই কোথায় কি রইল! মানে —

সবই তোমার বাবার খাতায় আছে। বাবার কাজে বড় পরিষ্কার।

ঠোঁট মচকাইয়া বড় ভাই কহিল, খাতায় সে নেই, তা হলে আমি জানতাম। বাবা মা, দুজনের কাছেই টাকা আছে, সে সব হিসেবের বাইরের পুঁজি। সে দিন বললেন মনে নেই?

ছোট ভাই ভ্রু তুলিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, হ্যাঁ বটে! কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আবার সে বলিল, মানুষের শরীর!

প্রথমেই সরকার - দম্পতি কাশীতে নামিলেন। বাসায় উঠিয়া কর্তা হাসিয়া বলিলেন, যাক, তিন সত্যির দায় থেকে মুক্ত হলাম। বাপ, মুখ-ফস্‌কে একটা কথা বলে কি তার প্রাশ্চিত্তির!

গিন্নি বেশ বড় বড় পেয়ারা কিনিয়াছিলেন, ছোট বঁটি পাতিয়া একটা পেয়ারা কাটিতে কাটিতে বলিলেন, প্রাশ্চিত্তি! তীর্থ করার নাম প্রাশ্চিত্তি? আর তোমরা বল মেয়েদের মত সংসারের মায়া আর কোন জাতের নেই! টাকা টাকা আর বিষয়, পুরুষের মত নরুকে জাত আবার আছে না কি? আমি মলে ঠিক আবার তুমি বিয়ে করবে।

কর্তা বলিলেন, উত্তর দিতাম, কিন্তু কে ফেসাদে পড়ে সে কথা বলে! হয়তো এবার সশরীরে স্বর্গ ঘুরিয়ে আনতে সত্যি করাতে হবে।

গিন্নি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, আর তো কিছু জন না, শুধু কুট্‌ কুট্‌ করে কথা কইতেই জান! নাও, এখন মুখে দাও কিছু বলিয়া শ্বেতপাতরের একখানি রেকাবিতে কিছু ফল ও মিষ্ট সাজাইয়া নামাইয়া দিলেন।

কর্তা বলিলেন, এটা? রেকাবিখানার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, বাড়ি থেকে এনেছ বুঝি? পথে ঘাটে এসব জিনিস ভেঙে যায়।

বিরক্ত হইয়া গিন্নি বলিলেন, বাড়ি থেকে আনে নাকি? কিনলাম এখুনি, বিক্রি করতে এসেছিল। তুমি বাজারে গিয়েছিলে তখনই এসেছিল।

কর্তা এক টুকরা ফল মুখে তুলয়া বলিলেন, হুঁ।

কিছুক্ষণ পর সহসা তিনি বলিলেন, দেখ, একটা কথা তোমায় বলি। একখানা বাড়ি এখানে ভাড়া করে ফেলি। আর শেষ ক'টা দিন এইখানেই কাটিয়ে দেওয়া যাক। বহুদিন থেকেই এ আমায় সঙ্কল্প। তবে যদি বল, কই কখনও তো বল নি — সে বলি নি নানা কারণে, সংসারটা একটু গুছিয়ে ছেলেদের হাতে দিয়ে তার পর যার এই মনে ছিল। কিন্তু এসেছি যখন, তখন আর নয়, কি বল তুমি?

একদৃষ্টে শূন্যের দেখে যেন ভবিষ্যতের গর্ভের মধ্যে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া গৃহিণী বলিলেন, কথা তো ভালই। কিন্তু ছেলেরা এখনও তেমন সক্ষম হ'ল কই? দেখলে তো আসবার সময় কি কাকুতি বেচারাদের। তার পর সহস্য প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া হুড় হুড় করিয়া বলিয়া উঠিলেন, না বাপু, খেঁদিব বিয়ে আর বড় নাতির বিয়ে, এ না দেখে সে হবে না।

অতঃপর তর্কবিতর্ক করিয়া স্থির হইল, দুই মাসের স্থলে ছয় মাস অন্তত থাকিতে হইবে। ছয় মাস পরে আগামি মাঘ মাসে প্রয়াগে কুম্ভযোগ, কুম্ভযোগে ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করিয়া বাড়ি ফেরা হইবে। আপাতত তীর্থগুলি ফিরিয়া কাশীতে আসিয়াই বাস করাই স্থির হইল। কর্তা একখানা ছোটখাট বাড়িও কয়েক মাসের জন্য ভাড়া করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সাবিত্রী-তীর্থে গিয়া পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে গিন্নি বিদ্রোহ করিয়া উঠিলেন, না বাপু, আমাকে তুমি দেশে রেখে এসে। বাতের যন্ত্রণায় মরে গেলাম, বেলের ধর্মরাজতলা আমাকে যেতেই হবে। আর ছেলেদের মুখ মনে পড়ছে আমার।

কর্তা হাসিলেন, বলিলেন, আজই লিখে দিচ্ছি ধর্মরাজের তেল আর ওষুধের কথা। কাশী গিয়েই পাবে, বসে বসে মালিস যত পার কয় না।

গিন্নি বলিলেন, তুমি আমাকে আর ঘরে ফিরতে দেবে না দেখছি।

কর্তা হাসিয়া বলিলেন, বেশ তো, 'পুত্র পৌত্র স্বামীর কো-লে একেবারে কা-শীর গঙ্গা-জলে সে তো ভালই হবে।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গিন্নি বলিলেন, হ্যাঁঃ তেমনি ভাগ্যি কি আমার হবে! তেমন পুণ্যি কি-এমন করেছি বল; কখনও তুমি মনের সাধ মিটিয়ে ব্রত-পার্বণ করতে দিয়েছে? আমার আবার ঐ ভাগ্যের মরণ না কি হয়!

কিন্তু আপনার অজ্ঞাতসারে গিন্নি সে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন! মহাকুম্ভযোগে ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নানান্তে গিন্নি কলেরায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

কর্তা বলিলেন, গিন্নি, কাকে দেখতে ইচ্ছে হয় বল, আসতে টেলিগ্রাম ক'রে দিই।

দেখতে? একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গিন্নি স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, পারলে না নিয়ে যেতে?

তার পর আবার বলিলেন, নাঃ থাক! কাউকেই আসতে হবে না। বড় খারাপ রোগ। তুমিই সদ্‌গতি করবে আমার! সাবধানে থেকো।

টপ টপ করিয়া কয় ফোঁটা জল কর্তার চোখ দিয়ো গড়াইয়া পড়িল। এবার গিন্নি হাসিলেন, বহিলনে, বুড়ো বয়সে কেঁদো না ছি! আমার লজ্জা করছে!

কর্তা কিন্তু গিন্নির কথা শুনিলেন না, বড় ছেলেকে তার করিলেন. 'শীঘ্র এস, তোমার মায়ের কলেরা।'

তার পাইয়া সমস্ত সংসারটা চমকিয়া উঠিল। বড় ছেলে বলিল, এমন যে হবে, এ আমি জানতাম!

ছোট ঠেলে বলিল, কি বিপদ বল দেখি?

তিক্ত-হাসি হাসিয়া বড় ছেলে বলিল, এখন বিপদের হয়েছে কি? এই তো সবে প্রথম সন্ধ্যে! এখনও কত হবে, সেখানকার রোগ এখানে অসবে। তার পর অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, বার বার তখন আমি বারণ করেছিলাম!

কিন্তু বাপ হয়ে ছেলের কথা তো শুনতে নেই, অপমান হয় যে!

সেই দিনই দুই ভাই আরও একজন সঙ্গী সহ রওনা হইয়া গেল। কিন্তু যখন তাহারা সেখানে পৌঁছিল তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে! বাসার যে ঘরে সরকার-দম্পতি ছিলেন সে ঘরখানা শূন্য পাড়িয়া রহিয়াছে। বাসার প্রায় সকলেই সরিয়া পড়িয়াছে। যে কয়জন ছিল তাহারা বলিল, বুড়ি মেয়েটি মরেছে কাল সকালে। বুড়ো ভদ্ররলোকটি চেষ্টাচরিত্র করে তাঁর গতি করে এলেন দুপুর বেলায়, সেই দুপুর বেলা থেকেই তাঁরও আরম্ভ হল। তার পর মশায়, অপরে কে কার মুখে জল দেয় বলুন; তবু সেবা সমিতিতে খবর একটা দেওয়া হয়েছিল। তাও কেউ এলে না! তার পর রাত্রে দেখলাম ভলেন্টিয়ার এসে কাঁধে করে নিয়ে গেল।

কোন সমিতিব ভলেন্টিয়াব বলতে পারেন?

কে জানে মশাই দবজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম ভলেন্টিয়ার, ঐ পর্যন্ত। আমবাও আজ মোটঘাট বেঁধেছি, এই দুপুর ট্রেনেই ফিরব। তাহারা যাত্রাব আয়োজনে ব্যস্ত হইযা উঠিল। অশ্রুসজল নেত্রে দুই ভাই ত্রিবেণীসঙ্গমে পিতামাতা উভয়ের তর্পণ সাবিয়া গলায় কাছা পরিয়া বাড়ি ফিরিল, সঙ্গে রাজ্যের জিনিসপত্র, এলাহাবাদ, ও কাশীর বাসার গিন্নি বিহঙ্গিনীর মত একটি একটি করিয়া সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

সমারোহ-সহকাবেই শ্রাদ্ধসান্তি হইল, ছেলেরা ত্রুটি কিছু করিল না। কিন্তু নিন্দুকে বলিল, করবে না তো কি, এক খরচে দুটো! একটা খরচ তো বেঁচে গেল।

কথাটা শুনিয়া বড় ছেলে বলিল, দুটোই করব আমবা, বৎসরকৃত্যতে এই খরচই আমরা করব! বাবা মা তো আমাদের অভাব রেখে যান নি কিছুর!

সত্য কথা, সরকার-কর্তা রাখিয়া গিয়াছেন প্রচুর। এই সেদিনও কর্তা-গিন্নির ঘরের মেঝে খুঁড়িরা চার হাজার টাকা ছেলেরা পাইয়াছে! দুই ভাই পরামর্শ করিয়া ব্যবসায়টা বেড়াইবার সঙ্কল্প করিল। তিন দিন ধরিয়া গভীর আলোচনার পলে ব্যবসায়ের পরিধি-পরিবর্ধনের একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া

বড় ভাই বলিল, বেশ হয়েছে, বুঝলি, আমার তো মনে হয় এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না!

ছোট ভাই বলিল, বাবা কিন্তু এতে মত দিতেন না। ঐ চেয়ার-টেবিল নিয়ে শহরে আপিস করা —

তার মানে ইংরাজী জানতেন না তিনি, বড় বড় বিজনেস সার্কলে মেশবার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। তার ওপর —

তাহার মুখের কথা মুখেই থাকিয়া গেল, সর্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; রাত্রি ও দিনের মধ্যবর্তী যবনিকাটা ছিঁড়িয়া গিয়া যেন একটা অকল্পিত আলোকে পৃথিবীর রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। ছোট ভাই একটা অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল। বাড়ির সম্মুখের রাস্তার উপর একখানা গরুর গাড়ি হইতে ধীরে ধীরে সন্তর্পণে নামিতেছেন, কর্তার কঙ্কাল, তার প্রেতমূর্তি! দুই ভাইকে দেখিয়াই দুরন্ত ক্রোধে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সে মূর্তি অস্বাভাবিক হইয়া উঠিল, পাষণ্ড, কুলাঙ্গার, আমি, আমি —

কথা শেষ, হইল না প্রেতমূর্তি পথের ধুলোর উপরেই সশব্দে লুটাইয়া পড়িল।

গাড়োয়ানটা তাড়াতাড়ি সে দেহখানি তুলিয়া বলিল, জল আনেন গো, জল! ভিরমি গেইছেন গো, জল — জল!

এতক্ষণে বড় ছেলের সংজ্ঞা ফিরিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া চীৎকার করিল, জল, জল। শিগগির জল আর পাখা — পাখা!

প্রেত নয়, রক্তমাংসের দেহধারী মানুষই। সরকার-কর্তাই দুরন্ত কলেরার আক্রমণ হইতে বাঁচিয়া সশরীরে ফিরিয়া অসিয়াছেন। বলিবার ভুল এবং বুঝবার ভুলে এমনটা হইয়া গিয়াছে। ভলেন্টিয়ারে তাঁহার শবদেহ লইয়া যায় নাই, রোগাক্রান্ত অবস্থাতেই তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া গিয়াছিল। কয়েক দিন অচেতন থাকিয়া চৈতন্য লাভ করিবার পর তিনি সংবাদ লইয়াছিলেন, কেহ আসিয়াছে কি না! কিন্তু কেহ আসে নাই শুনিয়া তিনি আর কোন কথা বলেন নাই, পরিচয় দেন নাই, জিনিস-পত্রের খোঁজ করেন নাই, এমন কি আপনার রোগের

যন্ত্রণার কথা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিলেও বলেন নাই। তবু তিনি বাঁচিলেন। হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া মাটির পৃথিবীর সংস্পর্শে আসিয়া কিন্তু তাঁহার অন্তর গর্জন করিয়া উঠিল। তিনি ত্যাজ্যপুত্র কবিবার সংকল্প লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

চেতনা লাভ করিয়া ছেলেদের এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের কথা শুনিযা কর্তা নির্বাক হইয়া রহিলেন। গ্রামের পাঁচজনে আসিয়া জমিয়াছিল। কর্তার সমবয়সী বৃদ্ধ চাট্যুজ্জে বলিলেন, যাক, যা হয়েছে তা হয়েছে, এখন ধরাধরি করে বাড়ির ভিতর নিয়ে যাও! ভাল করে সেবা যত্ন কর, ডাক্তার-টাক্তার ডাকাও!

কর্তা বলিলেন, নাঃ বাড়ির মধ্যে আর আমি যাব না। আমি কাশী যাব। যতক্ষণ আছি এইখানেই বেশ আছি আমি।

বেশ তো, এই বাইরের ঘবেই বিছানা করে দাও! সে বরং ভালই হবে, ছেলেপিলের গোলমাল কচকচি কিছু থাকবে না। বল, বিছানা করে দিতে বল।

বিছানায় শুইয়া কর্তার চোখে জল আসিল। পাশেই পৌত্রী কমলা তাঁহাকে বাতাস করিতেছিল। কম্পিত কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক করিয়া কর্তা তাহাকে বলিলেন, জানিস কমলা, তোর ঠাকুরমায়ের বাড়ি ফিরে আসতে বড় সাধ ছিল। আমিই —

আর তিনি পারিলেন না শুধু ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপতে লাগিল! কমলা পাকা গিন্নির মত আপনার আঁচল দিয়া কর্তার চোখের জল মুছিয়া দিযা বলিল, সে আর আপনি কি করবেন বলুন। আপনি তো ভালই করতে গিয়েছিলেন। নিয়তির ওপর তো কারুর হাত নেই!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কর্তা বলিলেন, তা নইলে আমি ফিরে আসি! শ্রাদ্ধ হয়ে গেল, কি লজ্জা বল দেখি ভাই। আমার লজ্জা, ছেলেদের লজ্জা — অথচ ছেলেরা তো আমার সেরকম নয়! কিন্তু লোকে তো বলতে ছাড়বে না!'

এ-কথার উত্তর কমলা দিতে পারিল না; কর্তাও নীরব হইয়া ঐ কথাই বোধ করি করি ভাবিতে আরম্ভ করিলেন। সহসা তাঁহার চোখে পড়িল, ছোট একটি দামাল ছেলে বহির্বাটী ও অন্দরের মধ্যবর্তী দরজাটার উপরে বসিয়া

পরম গম্ভীরভাবে একটুকরা মাটি লইয়া ভক্ষণ করিতেছে। লালাসিক্ত মৃত্তিকা-চিত্রিত মুখখানি দেখিয়া তিন না হাসিয়া পারিলেন না কিন্তু কে এটি!

কমলাও মুখে ফিরাইয়া দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল, ও মা গো! কি খাচ্ছ গাঁট্টরাম, এ্যাঁ? সন্দেশ খাচ্ছ? কেমন লাগছে বাবু, ঝাল?

সঙ্গে সঙ্গে খোকা মাটিটা ফেলিয়া হু হু করিতে আরম্ভ করিল।

কমলা হাসিতে হাসিতে বলিল, পাকামো দেখলেন?

এটি কার ছেলে?

ওমা? চিনতে পারছেন না আমাদের গাঁট্টারামকে? ছোটকাকার ছোট খোকা!

এ্যাঁ, ওটা এত বিজ্ঞ হয়েছে এর মধ্যে? আন্—আন্ একে দেখি। আমরা যখন যাই তখন এইটুকু ছিল রে!

কর্তা এবার উঠিয়া বসিলেন, সব ছেলেদের ডাক্ তো! দেখি সব মশায়রা কে কত বড় হয়েছেন।

নাতিরা ভিড় করিয়া জমিয়া বসিল, তাহাদের পিছন পিছন এতক্ষণে বধূরা আসিতে সাহস পাইল, তার পর আসিল ছেলেরা। অপরাহ্নে কর্তা লাঠি ধরিয়া ঘর-দোর সব ঘুরিয়া দেখিলেন। তাঁহার নিজের শয়ন-ঘরে ঢুকিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। এ কি? তাঁহার ঘরের মাটির মেঝে তুলিয়া ইঁট চূর্ণ সিমেন্ট দিয়া বাঁধানো? তাঁহার টাকা?

বড় ছেলে স্বীকার করিয়া বলিল, হ্যাঁ — চার হাজার টাকা ছিল।

সেটা আমাকে দাও।

আপনি টাকা নিয়ে কি করবেন? যখন যা দরকার হবে আপনি নেবেন! অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কর্তা বলিলেন, এ ঘরে শুচ্ছে কে?

কমলাকে দিয়েছি ঘরখানা। জামাই আসেন প্রায়ই, ওর নির্দিষ্ট একখানা সাজানোগোছানো ঘর না থাকলে অসুবিধে হয়।

কর্তা সেই সাজানো-গোছানোই দেখিতেছিলেন, কায়দা-করণ জিনিসপত্র সব নূতন! বেশ ভালই লাগিল। ধীরে ধীরে তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। পা দুইটা কাঁপিতেছিল, তিনি বলিলেন, আমায় ধর তো কমলা!

দিন কয়েক পর।

ক্ষোভে উত্তেজনায় কর্তা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। বেলা দশটা হইয়া গেল, প্রাতঃকাল হইতে এখনও পর্যন্ত ঔষধ কি পথ্য কিছুই তিনি পান নাই। আরও চটিয়াছিলেন তিনি কমলার ব্যবহারে। ফিরিঙ্গী মেয়ের মত সে তাহার স্বামীর সহিত হাত ধরা-ধরি করিয়া বেড়াইয়া ফিরিল। এ বাড়ির হইল কি? বধূরা তাঁহার সম্মুখেই স্বামীদের সহিত কথাবার্তা কয়। তিনি চীৎকার করিয়া বাড়ি মাথায় তুলিয়া ফেলিলেন।

বড় ছেলে একটা একটা জরুরি বিষয়কর্মে লিপ্ত ছিল, সে আসিয়া একটু কঠিন স্বরেই বলিল, আপনি কি পাগল হলেন না কি? একটু ধৈর্য ধরুন, বাড়িতেই জামাই রয়েছে, কমলা সেই জন্য আসতে পারে নি। মেয়েরাও সব ঐ জন্যে ব্যস্ত।

ছেলের কথার সুরে কর্তা রক্তচক্ষু হইয়া বলিলেন, কি — কি? বলছে তুমি? আমার মুখের ওপর তুমি কথা কও!

কমলা লজ্জিতমুখে ঔষধ ও পথ্য লইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া হাসিমুখে বলিল, আমায় বকুন দাদু, আমারই তো দোষ! যান বাবা, আপনি কাজে যান।

কমলার পিতা চলিয়া গেল। কমলা আবার বলিল, রাগ করেছেন দাদু? কর্তা বলিলেন, কতটা বেলা হল হিসেব আছে?

তারপর ঔষধ ও পথ্য সেবন করিয়া অকস্মাৎ তিনি লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, ক্ষিদে পেয়েছিল রে!

কমলা একটু হাসিল। বৃদ্ধ এবার রসিকতা করিয়া বলিলেন, কর্তা বুঝি ছাড়ে নি নতুন-গিন্নি। বলিতে ভুলিয়াছি, পিতামহ পৌত্রীর নামকরণ করিয়াছেন 'নতুন-গিন্নি'। কমলা লজ্জিত হইয়া বলিল, কি যে বলেন আপনি! সে প্রস্থানের উদ্যোগ করিল।

কর্তা বলিলেন, কাউকে একটু ডেকে দিয়ে যাস, তো ভাই, এই খেঁদি পটল কি যে কেউ হোক। বসে একটু গল্প-টল্প করি।

কমলা চলিয়া গেল। কর্তা দুয়ারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন, বহুক্ষণ

কাটিয়া গেল কিন্তু কেই আসিল না। ক্লান্ত হইয়া কর্তা শুইয়া পড়িলেন। নানা কল্পনা ও চিন্তার মধ্যে সহসা তাঁহার মনে হইল, ব্যবসায়ের অবস্থাটা একবার নিজে তাঁহার দেখা দরকার।

বড় ছেলেটির মতিগতি বড় ভাল নয়। শহরে আপিস করিবে! তাহার উপর অজিকার কথাবর্তা তাঁহার ভাল লাগে নাই। একখানা ঘর তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন, বেশ ছোটখাটো ঘর একখানি অবিলম্বেই আরম্ভ করাইতে হইবে। একখানা উইল, কমলাকে কিছু তিনি দিবেনই। ছেলেদের নামে 'পাওযার অব এটর্ণী' দেওয়া আছে, সেখানা অবিলম্বে বাতিল করিয়া দেওয়া উচিত। ছেলেদের ডাকিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়া লইবার সঙ্কল্প লইয়া উৎসাহের সহিত তিনি আবার উঠিয়া বসিলেন। শরীর? অনেকটা বল তিনি ইহার মধ্যেই পাইয়াছেন। ইহার পর একবার কোন স্থানে চেঞ্জে গেলেই তিনি পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবেন।

অপরাহ্নে ছেলেরা নিজেরাই আসিয়া উপস্থিত হইল। গম্ভীর হইয়া দৃঢ়স্বরে তিনি বলিলেন, এস, বস এইখানে।

বড় ছেলে বলিল, আমরা বলছিলাম, কি যে — মানে, আপনার শরীরের অবস্থা —

বাধা দিয়া কর্তা বলিলেন, ও চেঞ্জ গেলেই সেরে যাবে।

হ্যাঁ। আমরাও সেই কথা বলছিলাম! গঙ্গাতীরে অথবা কোন তীর্থে গেলে — ধরুন আপনার বয়সও হয়েছে —

তার মানে? কর্তার ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল, সমস্ত দিনের সঞ্চিত মনের শক্তি এক মূহূর্তের যেন বৈদ্যুতিক শক্তি স্পর্শে বিলুপ্ত নিঃশেষিত হইয়া গেল।

বড় ছেলে বলিল, দেখুন ভুল যখন হয়েছেই তখন তো আর উপায় নেই। কিন্তু শ্রাদ্ধশান্তির যখন হয়েই গেছে, তখন মানে প্রবীণ লোক বলছে সব, আর আপনার বাড়িতে থাকা ঠিক নয়। কাটোয়ার গঙ্গাতীরে আমারা একখানা ঘরও ঠিক করেছি। কাটোয়া এই কাছেই, সপ্তাহে সপ্তাহে আমরা একজন যাব, বামুন একজন থাকবে —

ছেলে বলিয়াই চলিয়াছিল, কর্তা বিহ্বলের মত চারিদিকে একবার চাহিয়া ছেলের কথার মধ্যেই বলিলেন, বেশ।

কথা বলিতে ঠোঁট দুইটি তাঁহার থর থর্ কাঁপিয়া উঠিল; কথা শেষ, হইবার পরও সে কম্পন শান্ত হইল না।

কিন্তু তাহা কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িল না, ঠিক এই সময়টিতেই কমলা সর্বাঙ্গে মসীলিপ্ত চিত্রিত-বদন গাঁট্টারামকে দুই হাতে ঝুলাইয়া লইয়া প্রবেশ করিল — দেখুন, ভূত দেখুন।

দুই ভাই সেই মূর্তি দেখিয়া হাসিয়া আকুল হইয়া গড়াইয়া পড়িল।

বেহিসাবী

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

বলরাম ভদ্র পূজার ফর্দ করিতেছিল। পূজার এখনও মাসখানেক দেরি আছে। আরও একটা মাসের মাহিনা পাওয়া যাইবে। কিন্তু এক মাসের মাহিনাতে সমস্ত জিনিস কেনা সম্ভব নয় বলিয়া এই মাসের মাহিনা হইতেও সে কিছু কিছু কিনিয়া রাখিতে চায়। খরচটা দুই মাসের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলে পূজার মাসের উপর চাপ কম পড়িবে। পূজার সময় জিনিসপত্রের দামও কিছু চড়িয়া যাইবে। আগে হইতে কিনিতে পারিলে সেদিক দিয়াও কিছু সস্তা হইবে।

শনিবারের সন্ধ্যায় মেসে লোক থাকে না বলিলেই হয়। সকলেই প্রায় বাড়ি যায়। বলরামের ঘরের অপর দুইটি বিছানা গুটানো। তাহারা বাড়ি গিয়াছে। দুই নম্বর ঘরে বুড়োদের পাশার আড্ডা এবং ছয় নম্বর ঘরের ছোকরাদের তাসের আড্ডাও নীরব। বলরামও প্রতি শনিবারে বাড়ি যায়। রবিবারে বাজার করিবে বলিয়াই এ শনিবারে বাড়ি যায় নাই।

গত সপ্তাহে বাড়ি হইতে একটা ফর্দ সে লইয়া আসিয়াছে — মায়ের

দেওয়া ফর্দ। তাহাতে ছোট খোকার ভেলভেটের সুট হইতে আরম্ভ করিয়া বধূমাতার জর্জেট শাড়ি' পর্যন্ত সমস্তই আছে। কেবল নিজেরই জন্য বিশেষ কিছুর উল্লেখ ছিল না। বলরাম কলিকাতা পৌঁছিতে না পৌঁছিতে মায়ের ত্রুটি সংশোধন করিয়া গৃহিণী পত্র লিখিয়া জানাইয়াছে, মায়ের জন্য রাঙ্গাপাড় গরদের শাড়ি একখানি নিতান্তই চাই। অন্য সকল খরচ কমাইয়াও তাহা যেন আনা হয়।

বলরাম মায়ের ফর্দখানি সামনে রাখিয়া নূতন একখানি ফর্দ করিতেছিল:

মায়ের গরদের শাড়ি .	১২ টাকা
গৃহিণীর জর্জেট শাড়ি	১২ "
বাবার লংক্লথের পাঞ্জাবি	১ "
ছোট খোকার সুট	৬ "

বলরাম মনে -মনে একবার টাকার অঙ্কটা যোগ দিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, ,বাবা!

চট করিয়া আর একখানা চিরকুট লইয়া বলরাম এদিকের হিসাবটা করিতে লাগিল:

সিটভাড়া	৩।।০
খাওয়া	১১।।০
ধোপা, নাপিত ইত্যাদি	২।।০
তিনবার বাড়ি যাতায়াতের ট্রেন ভাড়া	৭।।০
জলখাবার	৩।।০
ট্রাম	২
সিগারেট, পান	২

বলরাম এই হিসাবটা মনে-মনে যোগ দিয়া আর একবার বলিল, বাবাঃ! বেচারা ষাট টাকা মাহিনা পায়। মহা মুস্কিলে পড়িল। নিজের একজোড়া জুতা না কিনিলেই নয়। বর্ষার নাম করিয়া অচল ছেঁড়া জুতাজোড়া দুইমাস চালাইয়াছে।

এখন তাহা যে-কোনো মুহূর্তেই সত্যাগ্রহ করিতে পারে। বলরাম হিসাব দুইটা আবার পর্যবেক্ষণ করিতে বসিল:

মায়ের গরদের শাড়ি ফাটা চলিতেই পারে না। জীবনে কখনও তাঁহাকে একটা ভাল জিনিস দেন নাই। পূজা-আহ্নিকেরও তাঁহার অসুবিধে হইতেছে। গৃহিণীর জর্জেট শাড়ি? সর্বনাশ! অত আশা দিয়া এখন জর্জেট না কিনিলে তাহার কাছে মুখ দেখানো যাইবে না। অত আগে হইতে তাহাকে আশা দেওয়া ঠিক হয় নাই। একটা দুর্বল মুহূর্তে নিজের শক্তি সামর্থ্য বিবেচনা না করিয়াই দিয়া বসিয়াছে। বলরাম এখন তাহার জন্য অনুতপ্ত। কিন্তু অনুতাপ করিয়া তো ফল হইবে না। শাড়ি তাহাকে কিনিতেই হইবে।

বাকি ছোটখোকার সুট। ছোট খোকার কথা ভাবিতেই বলরামের চিত্ত কোমল হইয়া আসিল। বৎসরে এই একটিবার দেওয়া। বাপ হইয়া সে তাহার জিনিস বাদ দিবে কি করিয়া? মা এবং গৃহিণীই বা কি বলিবেন? সে হয় না। বরং সে নিজের মেসের খরচ কমাইবে।

কিন্তু কোন্‌টা? বলরাম স্বচ্ছন্দে তাহার বাড়ি যাতায়াতের খরচের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ ছাঁটিয়া দিতে পারে। আর পারে তাহার জলখাবারের খরচের কিয়দংশ ছাঁটিয়া দিতে। কোন্‌টা বাদ দেওয়া অপেক্ষাকৃত কম ক্লেশকর বলরাম তাহাই ভাবিতে বসিল।

সাড়ে নয়টায় নাকে-মুখে দুটি গুঁজিয়া আপিসে যায়। দুইটা বাজিতে না বাজিতেই জঠরগুহায় মূষিকের নৃত্য আরম্ভ হয়। সে সময় যাহা সে খায় তাহার পরিমাণ কোনদিনই দুই আনার অধিক নয়। তাহাও বাদ দিলে সে টিকিবে কি করিয়া? ওদিকেও মাসে চারিটি তো মাত্র রবিবার। এই চারিটি দিনও যদি গৃহসুখ ভোগ করিতে না পায় তাহা হইলে জীবনে আনন্দ বলিতে থাকে কি?

বলরাম অনেক চিন্তা করিয়া এবং অনেক অঙ্ক কষিয়া স্থির করিল, এই দুইটি মাস জলখাবারের পরিমাণ দুই আনা হইতে এক আনায় নামাইবে এবং গৃহসুখ চারদিনের জায়গায় দুইদিন করিবে। তাহাতে মাসিক প্রায় সাত টাকা

বাঁচিবে। এই ব্যবস্থা করিয়া সে রাত্রে সে অনেকটা সুস্থ হইয়া আহারাদি সমাপন করিল।

আহারান্তে বলরাম কেবল বিছানায় গা গড়াইয়াছে এমন সময় মশ্ মশ্ করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে দীনবন্ধু প্রবেশ করিল।

— ঘুমিয়ে গেলেন নাকি?

— না — বলরাম চোখ মেলিয়া চাহিল।

— এঁরা সব শনিবার করতে গেছেন বোধ হয়। আপনি যাননি যে বড়?

বলরাম হাসিল।

— হুঁ। এসব ভালো কথা নয়, ভালো কথা নয়। মাইনে তো কাটা যাবেই, তা ছাড়াও বোধহয় শাস্তি আছে। কি বলেন?

— আছেই তো।

— তবে আপনি গেলেন না কেন?

— পুজোর বাজার কিছু করতে হবে।

— পুজোর বাজার! — দীনবন্ধু চমকিয়া উঠিল, পুজো তো অনেক দেরি।

— দেরি মানে একটা মাস। কিন্তু আমাদের মতো মাছি - মারা কেরানি দু'মাসে নইলে কুলিয়ে উঠতে পারে?

— পারে না? এত কি কিনবেন শুনি? খানকয়েক শাড়ি, আর খানকয়েক ধুতি, আর কি?

দীনবন্ধু হাসিল। তারপর গম্ভীরভাবে বলিল, পুজোর দিন একটি একটি করে এগিয়ে আসছে, আর বুকের রক্ত জল হচ্ছে। এ মাসেও ত্রিশ টাকা ধার হয়েছে, তার উপর মেসের টাকা দিতে পারিনি।

— কিন্তু মাইনে তো পান দুশো টাকা। একটা বিয়ে পর্যন্ত করেননি। কি হয় টাকাগুলোর?

— শ্রাদ্ধ মানে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ। খেতাম সিগারেট, বিড়ি ধরেছি। বোধ করি কৌপীনবন্ত না হ'লে আর ভাগ্যবন্ত হতে পারছি না।

— কি করেন?

— কি করি? শুনুন বলি: দুটি বোনের বিয়ে দিয়েছি। সেই যে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে ধার করেছিলাম তার জের এখনও মেটে নি। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর ঋণের টাকা নিয়ে আফিস থেকে দেয় একশো কুড়ি টাকা তিন আনা। তার মধ্যে বাড়িতে পাঠাতে হয়, একটি ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে তাকে পাঠাতে হয়। বোনেদের ছোটোখাটো দাবি লেগেই আছে। এর ওপর একান্নবর্তী পরিবার- খুড়তুতো, জাঠতুতো ভাই বোনও আছে। মাইনে পাওয়া মাত্রই নেই।

বলরাম বিরক্তভাবে বলিল, কিন্তু আপনি যা পারবেন, তাই তো করবেন। তার বেশী ...

দীনবন্ধু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, একান্নবর্তী পরিবার সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা নেই, তাই বলছেন। এর মধ্যে আর পারা-পারি নেই, পারতেই হবে। শুনুন তবে: আমার জ্যাঠামশাই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। গোটা পরিবার বাসুকীর মতো তিনিই ঘাড়ে ক'রে ছিলেন। অনেক বয়সে তাঁর ছেলে হয়। আমিই থাকতাম তাঁর কাছে কাছে।

— তিনি নিশ্চয় অনেক টাকা রেখে গেছেন?

— টাকা? কি ক'রে রাখবেন? যেমনভাবে তিনি নিজে থাকতেন, দেশে যারা থাকতেন, তাদেরও ঠিক তেমনিভাবে রেখেছিলেন। যদি জ্যাঠাইমার জন্যে একখানা গহনা গড়িয়ে দিয়েছেন তো সব বৌ-এর জন্যেই সেই গহনা গড়িয়েছেন।

— তাঁর আর ভাইরা কিছু করতেন না?

— কি করতে করবেন? ব'সে খেতে পেলে কে পরের দোরে খাটতে চায় বলুন।

— এ ভারি অন্যায়!

— অন্যায়। জ্যাঠাই-মা এ নিয়ে কান্নাকাটি করতেন। কিন্তু আমার জ্যাঠামশায়ের মুখে কোনা দিন হাসি ছাড়া কিছু দেখিনি। এই পুজোয় তাঁর যে কত খরচ হ'ত আমি ভাবতেও পারি না। তখন তিনি দেশে যেতেন। বড় দালানে আমরা খেতে বসতাম। তিনি বসতেন দুই সারের মাথায়, মধ্যেখানে, যেখান থেকে দুই সারের প্রত্যেককে দেখা যায়। অত বড় দালানের এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত লম্বা সার। আমাদের ছেলেদের প্রত্যেকের গায়ে এক রঙের জামা, এক পাড়ের কাপড়। মেয়েরা যাঁরা পরিবেশন করতেন তাঁদেরও তাই। জ্যাঠামশাই চেয়ে চেয়ে দেখতেন, আর আনন্দে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। তাঁর সে মুখ আমি এখনও কল্পনা করতে পারি।

দীনবন্ধু চোখ বন্ধ করিয়া বোধ করি তাহাই কল্পনা করিতে লাগিল।

বলরাম একটু থামিয়া বলিল, কিন্তু তাঁর পক্ষে যা আনন্দ ছিল আপনার পক্ষে তা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

— দাঁড়িয়েছেই তো। গেল বারে হ'ল কি জানেন? — দীনবন্ধু একটা ঢোক গিলিল, — হিসেব ক'রে দেখলাম, সকলের একখানা করে ন্যাকড়া কিনে দিতে গেলেও দুশো টাকা লাগে। আমি একশো টাকা ইন্সিওরে পাঠিয়ে দিয়ে এইখানেই ব'সে রইলাম। যা খুশি কর তোমরা।

বলিয়া এমন এক আশ্চর্য ভঙ্গিতে হাসিল যে, বলরামের বুকের ভিতর পর্যন্ত হাহাকার করিয়া উঠিল।

হাসি থামাইয়া দীনবন্ধু বলিল, আপনি বলবেন কাপুরুষতা। কিন্তু বাড়ির সবাই কাপড় পেল না এ কি চোখ দেখা যায়?

বলরাম কিছুই বলিল না। দীনবন্ধু চলিয়া গেলেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাহার চোখে ঘুম নামিল না। থাকিয়া থাকিয়া তাহার সেই আশ্চর্য হাসি মনে পড়ে আর পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ বিস্বাদ হইয়া যায়।

কাপড় চোপড় কিনিতে এ মেসে হরিহরের জোড়া নাই। কোন্ মিলের কত নম্বরের কাপড় কোথায় এক পয়সায় সস্তায় পাওয়া যায়, তাহা পর্যন্ত

সে বলিয়া দিতে পারে। দোকানে গিয়া যখন সে কাপড়ের ফরমাস করে, দোকানদার বুঝিতে পারে ইহার কাছে চালাকি চলিবে না। তাহাকে না লইয়া এ মেসের কেহ কাপড় কিনিতে যায় না।

বলরামের ইচ্ছা ছিল, কাপড় কেনার হাঙ্গামাটা সকাল বেলাতেই চুকাইয়া লইবে। কিন্তু কি একটা কারণে সকালে হরিহরের সময় হইল না স্থির হইল, খাওয়া-দাওয়ার পরে দুপুরে দুজনে বাহির হইবে। ক'খানাই বা কাপড়! ঘন্টাখানেকের মধ্যেই হইয়া যাইবে।

স্নান করিবার সময় হরিহর উঁকি দিয়া দেখিল, বলরাম কি একখানা পত্র মনোযোগের সঙ্গে দেখিতেছে।

হরিহর বলিল, স্নান করতে যাবেন না?

বলরাম প্রথমটা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। তারপর যেন চমক ভাঙ্গিয়া বলিল, হ্যাঁ চলুন।

হরিহর দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল, কিছু দুঃসংবাদ আছে নাকি?

বলরাম হাসিয়া বলিল, দুঃসংবাদ? সে তো থাকবেই।

— অসুখ-বিসুখ?

— না। পূজোর ফর্দের ক্রোড়পত্র।

মুখে একটা ফুৎকার দিয়া হরিহর বলিল, ও! ও অনেক আসবে মশাই। চাপা দিয়ে রাখুন।

— চাপা দিয়ে রাখব কি মশাই! ছোট বোনের ফর্দ! বছর দুই হ'ল বিয়ে হয়েছে।

— কি লিখছে?

— লিখছে, এবারে যেন পূজার তত্ত্ব গেলবারের চেয়ে ভালো হয়। ধুতিটা আরও দামি হওয়া উচিত। গেল বারে মটকার পাঞ্জাবি দেওয়া হয়নি। সেটা যেন এবারে দেওয়া হয়। সে শুনেছে, তার বৌদির জন্যে জর্জেট কেনা হচ্ছে। সেজন্যে নিজের দাবি আর চড়ায়নি। শুধু লিখেছে যে, তার বৌদির

জন্যে যে রকম শাড়ি কেনা হবে, তাকেও তাই দিলেই হবে।

— তাহ'লেই তো গেছেন!

— হ্যাঁ। মুস্কিল হয়েছে কি জানেন। এই বোনটি সবচেয়ে ছোট, কাজেই মায়ের আদরের। তার উপর এর বিয়েতে পাত্র পক্ষ নগদ একটি পয়সাও নেয়নি। তাদের অবস্থাও ভালো। গেল বারের তত্ত্বে যে খুব বেশী খরচ করতে পারিনি তাও সত্যি। জানেনই তো ছোটখোকার আমাশয়ে কি ভোগালে। তাই ভাবছি ...

— কই দেখি আপনার 'ফর্দ?

বলরাম পকেট থেকে ফর্দটা বাহির করিয়া দিল।

হরিহর ফর্দ দেখিয়া চমকিয়া উঠিল: করেছেন কি মশাই! এ তো পোষাকী। এর পরে আটপৌরেও আছে নিশ্চয়!

— আছে বই কি।

— আর বোন নেই?

বলরাম হাসিল। বলিল, একটি দিদি আছেন। তাঁর আবার দুঃখ শুনুন। জামাইবাবু ভালো চাকরি করতেন, রিট্রেঞ্চমেন্টে সেটি গেছে। এখন গ্রামের ইস্কুলে মাস্টারি করেন। যখন চাকরি ছিল, আমাদের জন্যে যথেষ্ট করেছেন এবং যথেষ্ট দিয়েছেন। অত্যন্ত স্বল্পভাষী মানুষ। এবং অতবড় আত্মমর্যাদাজ্ঞান আর কখনও দেখিনি। আজকে তাঁর দুঃখের শেষ নেই। কিন্তু কোনদিন একটি ছুঁচের ফরমাসও করেননি। না তিনি, না দিদি।

— গেল বারে ওঁদের কিছু দেননি?

কুণ্ঠিতভাবে বলরাম বলিল, সে না দেওয়ারই মধ্যে। শুধু দিদির জন্যে একখানা আটপৌরে শাড়ি পাঠিয়েছিলাম। তাতেই কত আশীর্বাদ যে করেছিলেন, তার ইয়ত্তা নেই।

হরিহর চিন্তিতভাবে বলিল, হুঁ।

— কোত্থেকে দোব? এই ক'টি টাকা তো মাইনে। দিতে কি আর ইচ্ছে

হয় না?

হরিহর আবার বলিল, হুঁ।

কি ভাবছেন?

— ভাবছি, বাজার করা আজ থাক বলরামবাবু। খেয়ে-দেয়ে এসে দু'জনে মিলে একটা ফর্দ করা যাবে। তারপবে ধীরে সুস্থে কিনলেই হবে। কি বলেন?

বলরাম শশব্যস্তে বলিল, না না, টাকা রাখা চলবে না। কিনতে এখন থেকেই হবে। নইলে হাতে টাকা থাকবে না। সে আব একটা বিপদ হবে।

হরিহর হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, খেয়ে-দেয়ে আসি তো। তারপরে দেখা যাবে।

হরিহর যে ফর্দ করিয়া দিল তাহা দেখিয়া বলরামের বাজার করিবার আনন্দ আর রহিল না। ফর্দের মধ্যে সিল্কের একটা টুকরো পর্যন্ত নাই। সমস্ত মিলের ধুতি ও শাড়ি, ধোলাই করিলে তাহা নাকি রূপার পাতের মতো ঝক ঝক করিবে। ছেলেমেয়েদের জামাও সমস্ত আটপৌরে। ওদের গায়ে নাকি আবার সিল্ক দেয়! দুই দিনে ধুলায় বালিতে আর জলে ন্যাকড়া বানাইয়া তুলিবে। তার চেয়ে মোটা পুরু কাপড়ের জামা দিলে ঠাসিয়া - মারিয়া পরিলেও রাজার হালে একটা বৎসর চলিয়া যাইবে। ষাট টাকার মধ্যে সমস্ত পরিবারের মায় দিদি - জামাইবাবু এবং তাঁহাদের ছেলেমেয়ে গুলির পর্যন্ত ব্যবস্থা করিয়া হরিহর দিগ্বিজয়ীব মতো সোজা হইয়া বসিল।

বলিল, ষাট টাকার মাহিনার কেরানির এর চেয়ে বেশী বাজার করা উচিত. নয়। করা ক্রিমিনাল, বুঝলেন?

বলরাম বুঝিল, কিন্তু তাহার মনটা প্রসন্ন হইল না। হরিহর ছা-পোষা গৃহস্থ ; পাকা লোক। তাঁহার — দুর্ভেদ্য। বলরামের পক্ষে পূজার বাজারে ষাট টাকার বেশি খরচ করা অন্যায়, হয়তো ক্রিমিনালই। কিন্তু সংসারে হিসাব করিয়া চলাটাই কি একমাত্র সত্য পদার্থ? বেহিসাবী হবার আনন্দও কি একেবারে উপেক্ষার বস্তু?

দুই বৎসর ধরিয়া বলরাম তাহার স্ত্রীকে রীতিমতো —– দিয়া আসিতেছে, একখানা জর্জেট দিবে। কিন্তু --- মনে মনে জানে, তাহা ভোগা নয়, তাহার —— বিন্দুমাত্রও ছিল না। দিতে পারলে তাহার নিজের —বেশী কৃতার্থ আর কেহই বোধ করিত না। এই অক্ষমতার গ্লানি আর একজনের না - পাওয়ার দুঃখের চেয়ে যে কত বেশী, তাহাও একমাত্র তাহার অন্তর্যামীই জানেন।

বলরাম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

হরিহর চমকিয়া বলিল, কি হ'ল?

— কিছুই না। ভাবছি,' মানুষ কত অসহায় যত বড় তার সাধ, সাধ্য এবং আয়ু তার তুলনায় কতটুকু?

বলরাম হরিহরের তৈরী ফর্দটার উপর চোখ বুলাইতে লাগিল। নিখুঁত ফর্দ। অভিজ্ঞ হরিহর কোথাও ত্রুটি রাখে নাই। মূল্য যাহা ফেলিয়াছে, বলরাম জানে, তাহারও একচুল এদিক-ওদিক হইবে না। কিন্তু মায়ের গরদের শাড়ি? ছোট খোকার ভেলভেটের সুট? গৃহিনীর জর্জেট? হরিহর ফর্দের মধ্যে এমন অনেক নূতন জিনিস ফেলিয়াছে, যেমন লাল-নীল দেশলাই, তারাকাঠি, তাহা বলরামের মাথায় আসিতই না। কিন্তু ছোট বোনটি যে মুখ ফুটিয়া আবদার করিয়াছে, তাহার ব্যবস্থা কোথায়?

হরিহর পাটোয়ারী মানুষ। এত কথা বুঝিল না। কেবল ইহাই বুঝিল যে, এত কষ্ট এবং এত হিসাব করিয়া যে ফর্দ সে তৈরি করিল তাহাতে বলরাম প্রসন্ন হয় নাই। সে বলরামকে তাহার ভাগ্যের উপর ফেলিয়া দিয়া বিরক্তভাবেই চলিয়া আসিল। যে মানুষ নিজের ভালো বুঝিবে না, তাহাকে সে কথা বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। সে বিড়ম্বনা সহ্য করিবার পাত্র হরিহর নয়।

দিন যেন পাখায় ভর দিয়া উড়িতে উড়িতে মহালযায় আসিয়া পৌঁছিল। হরিহর বলরামকে সাহায্য করে নাই। সেও চাহে নাই। নিজের চেষ্টাতেই সে একটি-দুটি করিয়া অনেকগুলি প্যাকেট জড় করিয়াছে। কাপড় সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তাহার নাই। কিন্তু জ্ঞান সে সঞ্চয় করিল কিছু শো-কেসের সাজান

কাপড়-জামা দেখিয়া, কিছু সঞ্চরণশীল নর-নারী দেখিয়া।

সে মাসাধিক কাল হইতেই জলখাবার খাওয়া বন্ধ করিয়াছে। সিগারেট ছাড়িয়া বিড়ি ধরিয়াছে। ক্রমাগত ঘুবিয়া ঘুরিয়া জুতাজোড়ার আর কিছু নাই। কেহ সেদিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বলে, পূজায় জুতার দাম যা বাড়িয়াছে, পূজা কাটিয়া না গেলে উহার আর অবসর মিলিবে না। সময়াভাবে দাড়ি পর্যন্ত নিয়মিত কামাইতে পারে না।

গত দুই বৎসর তাহাদের আপিস বোনাস দেয় নাই। এবারে শোনা যাইতেছে, এক মাসের মাহিনা বোনাস দিবে। সংবাদটা শোনামাত্র বলরাম দুইহাত তুলিয়া বড় সাহেবকে এবং সেই সঙ্গে ভগবানকেও অজস্র আশীর্বাদ করিয়াছে। যেটুকু দুশ্চিন্তা ছিল এ সংবাদের পব তাহাও আর অবশিষ্ট রহিল না। দুইবেলা সে জনস্রোতের ঢেউএ-ঢেউএ ঘুবিয়া বেড়ায় আর টুকিটাকি যাহা পারে কেনে। ছোট-ছোট প্যাকেটে এবং বড়-বড় বান্ডিলে তাহাব জীর্ণ মলিন কক্ষের একটি কোণ বোঝাই হইয়া উঠিল।

চতুর্থীর দিন মেসের প্রাপ্যের তাগাদা আসিল। বলরামের মন তখন সোনালি আলোর, সানাই এর মিঠা সুরে পালকেব মতো উড়িতেছিল। যেন একটা ধাক্কা খাইয়া মাটিতে নামিল। যে কয়টা টাকা তাহার কাছে অবশিষ্ট আছে, তাহাতে তাহার যাতায়াতের ট্রেন ভাড়া আর পূজার কয়দিনের বাড়ির খরচ কোনো রকমে চলিতে পারে।

বলরাম ম্যানেজারকে বহু অনুরোধ করিল, টাকাটা সে পূজার পরে দিবে। কিন্তু ম্যানেজার কোনো অনুরোধই শুনিল না। ঠাকুর-চাকরকে মাহিনা দিতে হইবে, একখানা করিয়া কাপড়ও দিতে হইবে। যাহারা ছুটি পাইবে না, মেসেই থাকিবে, তাহাদের জন্যও ব্যবস্থা করিয়া যাইতে হইবে। অন্য সময়ে তাহাকে অনুরোধ করিবার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু এখন অনুরোধ শুনিবার উপায় নাই।

বলরাম রাগ করিয়াই তাহাকে টাকাটা দিয়া দিল। দুই - একটা প্রসাধনের দ্রব্য তখনও তাহার কিনিবার ছিল। সে চুলায় যাক, কয়েক বাক্স লাল-নীল কাঠির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাহা আর হইবার নয়। বলরাম হিসাব করিয়া দেখিল ট্রেন ভাড়া বাদ দিয়া তাহার হাতে আর একটি টাকা মাত্র রহিল। তাহাতে পূজার কয়দিনের সংসার-খরচের কি হইবে, তাহাই এক চিন্তার বিষয়।

বলরাম যখন বাড়ি পৌঁছিল তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে।

এক মাসের উর্ধ্বকাল সে বাড়ী আসে নাই। কলিকাতার প্রশস্ত রাজপথ হইতে পল্লীর এই সঙ্কীর্ণ অন্ধকার পথে পা দিয়া তাহার মনে হইল, নীচু নীচু খড়ের ঘরগুলি বুঝি এখনই তাহার উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িবে। স্যাকরার দোকানে তখনও ঠুকঠুক করিয়া কাজ চলিতেছিল। গুড়ের ভিয়ানের গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। বাঁশবনে জোনাকির মেলা বসিয়াছে। চৌধুরিদের পূজার দালানের সামনে একদল ছেলে হৈ হৈ করিয়া খেলা করিতেছিল। ভিতরে মালাকার নিবিষ্ট মনে ঠাকুর সাজাইতেছিল। গোটা চার-পাঁচ কুলির মাথায় মোট চাপাইয়া বলরাম নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা কলরব উঠিল, বাবা আসিলেন, মা আসিলেন, ছেলেরা আসিল, পাড়া-প্রতিবেশী একটি - দুইটি করিয়া জুটিতে লাগিল, নিতান্ত নিস্পৃহভাবে গৃহিণীও একবার মোট-ঘাট স্তূপের পাশ দিয়া চলিবার সময় গুণ্ঠনের ফাঁক দিয়া অপাঙ্গে সেদিকে চাহিয়া গেল। কেবল বলরামের মুখে হাসি নাই।

— আহা! ট্রেনে বড় কষ্ট হয়েছে। যা পূজোর ভিড়! বলরাম কথা কহিল না, শুধু কপালের ঘাম মুছিল।

— কত কাপড় এনেছিস? অত আনতে হ'ত না।

বলরাম বুঝিল, মা ভিতরে ভিতরে গৌরবে ও আনন্দে কতখানি পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। গৃহিণীর চোখে এক সময় চোখ পড়িতেই দেখিল, কাপড়ের আনন্দে তাহারও চোখ ঝকমক করিতেছে।

— কই গো, ছেলে কি কাপড় আনলে দেখাও।

বলরামের বুক পকেটে মানিব্যাগের মধ্যে বেতন ও বোনাসের ধ্বংসের শেষ একটিমাত্র রজতমুদ্রা থাকিয়া থাকিয়া কাঁটার মত খচ্ খচ্ করিতেছে। পূজার কয়দিন কি করিয়া চলিবে সেই দুশ্চিন্তা কালো ধোঁয়ার মতো মাথার মধ্যে তাল পাকাইতেছে।

তবু তাহাকে উঠিতে হইল। সকলের সসম্ভ্রম ও সপ্রশংস দৃষ্টির সম্মুখে এক একটি করিয়া পোঁটলা খুলিয়া দেখাইতে হইল, মায়ের টকটকে লাল পাড় গরদের শাড়ী, গৃহিণী ও ছোট বোনের জর্জেট, ছোট খোকার ভেলভেটের সুট, দিদির চমৎকার দেশী শাড়ি, তাহার ছেলেমেয়েদের বিচিত্র বর্ণে জামা-কাপড়, শান্তিপুরের ধুতি, আরও কত কি ...

বলরাম উপস্থিত সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার মনে হইল, সমস্ত মুখ লেপিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

সাতাশে শ্রাবণ

বিমল মিত্র

শেষ পর্যন্ত বৈকুণ্ঠ ঠাকুরের পাত্তা পাওয়া গেল। বৈকুণ্ঠ আর বাড়ির ঠাকুর দুজনে মিলে রাঁধলে কোন অসুবিধে হবে না। ভাঁড়ার বার করে দেবে সুরুচি। সমস্ত দিকের তদারক করবে সুরুচি। সুরুচি থাকতে আবার ভাবনা! সমস্ত আয়োজনই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

নিবারুণবাবুই প্রথম দুঃসংবাদটা শোনালেন কোর্ট থেকে এসে।

— কাল শুনলাম 'মিটলেস্-ডে' নাকি, মাংসই শুনছি পাওয়া যাবে না কাল। এখন যা ভাল বোঝ কর।

হতাশার ভঙ্গিতে কোটের গলার বোতামটা খুলে ফেললেন নিবারণবাবু।

সুরবালা যেন নিদারুণ দুঃসংবাদ শুনেছেন এমনি সুরে বললেন — তাহলে আর বৈকুণ্ঠ ঠাকুরপোকে ডাকা কেন! মাছের কালিয়া, মাছের পোলাও ওসব আমাদের বাড়ির ঠাকুরই তো পারবে।

নিবারুণবাবু তখন খালি গা হয়ে পাখার তলায় আরাম করছেন। বললেন — তাহলে বারণ করে দি বৈকুণ্ঠকে আসতে, বটু যাক তাহলে আজ রাত্রে বারণ করে আসুক। দু'টাকা বায়না নিয়েছিল, সেই টাকা দুটোই গচ্চা গেল।

সুরবালা ঝংকার দিয়ে উঠলেন — ওমনি রাগ হয়ে গেল, রাগের কথা কি বলেছি, মাংস যদি না পাওয়া যায় তো মাছই চার-পাঁচ রকমের করতে হবে। কমলার ছেলেরা মাংস খেতে ভালবাসে তাই মাংস মাংস করছিলাম।

সুরুচি ঘরে এল। বললে - বাবা মিষ্টির দোকান থেকে লোক এসেছে, বলেছি বসতে।

— বসুক; বলে নিবারণবাবু উঠলেন। তারপর কলঘরে যেতে যেতে থেমে বললেন — ক্ষীরকদম্ব বলে একরকম নতুন খাবার উঠেছে শুনছিলাম। কী জানি খেতে কেমন, দেব অর্ডার? — জিজ্ঞেস করলেন সুরবালাকে।

সুরবালা বললেন, — তাহলে যে ন'রকম মিষ্টি হয়ে যায়, একটা ক্ষীরের

খাবার ক্ষীরকান্তি তো রয়েছেই, আবার ক্ষীরকদম্ব! তা হোক, বছরে তো একটা দিন।

বছরে একটা দিন: সাতাশে শ্রাবণ!

এই সাতাশে শ্রাবণই সুরবালার মন্ত্র-দীক্ষা নেবার দিন। তিন বছর আগে হিমালয় থেকে গুরুদেব এসে সুরবালাকে দীক্ষা দিয়ে শিষ্যা করে আবার হিমালয়ে চলে গিয়েছিলেন। প্রতি বছর সেই তারিখটি স্মরণ করার উপলক্ষ করে তাঁর গুরুদেবকে ভক্তিশ্রদ্ধা দেখানোই সুরবালার উদ্দেশ্য। গুরুদেবের একটি ছবি টাঙানো আছে লক্ষ্মীর ঘবে। রোজ সেখানে ধুপ ধুনো দিয়ে প্রদীপ জ্বেলে সন্ধ্যাবেলা জপ কবেন সুবরালা। প্রতি সন্ধ্যাবেলা আধঘণ্টা সময় ওখানেই কাটে সুরবালার। আব সাতাশে শ্রাবণ হয় উৎসব — সেদিন গুরুদেবের ভোগ হয় — নিমন্ত্রিত অভ্যাগত আত্মীয়স্বজনরা প্রসাদ পায়। সেই দিন বিভিন্ন তিনটি দেশ থেকে সুরবালার তিনটি মেয়ে — ছেলেমেয়ে জামাইদের সঙ্গে নিয়ে সুরবালার বাড়িতে আসে। দুবার ভালো করে উৎসব সম্পন্ন হয়ে গেছে। এবার তৃতীয় বার্ষিকী!

সুরবালাব আগেই ঘুম থেকে উঠে সুরুচি কাজে হাত লাগিয়েছে। ঝি চাকর ঠাকুরকে তুলে দিয়েছে। উনুনে আগুন দিইয়েছে। বাবার দাড়ি কামাবার গরম জল, চায়েব জল, মায়ের চোখের ওষুধ, ছোট ঘড়িটাতে দম দেওয়া, স্নান সব কিছু সেরে কাপড় বদলে কালকের উৎসবের আয়োজন করতে লেগে গেছে!

অতগুলো লোক আসবে, থালা গেলাস বাটি গুনে গুনে সিন্দুক থেকে বার করলে। করে কলতলায় ফেলে দিলে। বললে — এগুলো মেজে ফেলো তো লক্ষ্মীর মা, কাজের ভিড়ে কাল আর হয়ে উঠবে না।

তারপব কত কাজ সুরুচির। তিন দিদির তিনটি ঘর সাজানো কি সোজা কথা! দরজায় পর্দা টাঙানো থেকে শুরু করে বালিশ বিছানা মশারি খাটানো। বড় জামাইবাবু শৌখিন লোক। দেয়ালে দু'চারখানা ছবি টাঙালে। জানালায় সবচেয়ে বাহারি পর্দা ঝুলিয়ে দিলে। দরজার চৌকাঠে একটা ভালো কার্পেট পেতে দিলে। বড়দি সুরুচিকে খুব ভালবাসে। সেবারে যখন এসেছিল তখন

তার জন্যে একটা বেনারসী সিল্কের থান এনেছিল।

সুরবালা ঘরে ঢুকে বললেন — হ্যাঁ মা কত খাটছিস তুই, কিছু মুখে দিসনি তো?

সুরুচি বললে — চা তো খেয়েছি মা।

— আমি গুরুদেবকে রোজ তোর জন্যে বলি, উনি তো সবই দেখতে পান, দেখবি তোর ভালো করবেন উনি। এই যে তাঁকে সেবা করছিস এতে তিনি তোর মঙ্গল কববেন!

সুরুচি বললে — তা'হলে দক্ষিণের দু'টো ঘরই মেজদি আর ছোড়দিদের দিই?

— ওমা, তুই তাহলে কোথায় শুবি? উত্তরের ঘরে? ওঘরে পাখা নেই যে মা, গরম হবে না?

— তা হোক, ওরা দুদিনের জন্যে এসে কেন কষ্ট করতে যাবে ... মেজদির চাদরটা একটু ময়লা হলো, তা হোক গে, কী বল মা?

সুরবালা বল্লেন — কাল এক স্বপ্ন দেখলুম মা, যেন গুরুদেব এসেছেন, এসে আমার চোখ দু'টো চেপে ধরলেন, চেপে ধরতেই — কী বলবো মা, যেন চারিদিক আলোয় আলো হয়ে গেল, দেখলুম গুরুদেব নেই, তাঁর বদলে শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্ম নিয়ে স্বয়ং নারায়ণ আমার দিকে চেয়ে আছেন, আমি তো মা আনন্দে প্রণাম করতেই ভুলে গেলুম। মূর্ছাই যাচ্ছিলুম, হঠাৎ গুরুদেব ছেড়ে দিলেন, দেখি আমার গুরুদেব আবার আমার সামনে বসে হাসছেন। বললেন — চিনলি আমাকে?

সুরুচি বললে — মেজদিদির একটা বালিশ কম পড়ছে কিন্তু, আমার বালিশটাতেই মেজদি শোবে'খন। আর ঘরে লোক না থাকলে কি ঘরের শ্রী থাকে, কী বলো মা? কতদিন এ সব ঘরে ঢোকা হয়নি, ভূতের রাজ্য হয়ে আছে — বলে সুরুচি ঝাঁটা নিয়ে ঝুল ঝাড়তে লাগলো।

কমলার বর লখ্নৌর উকিল। তাদের গাড়ি আসবে সকাল ছ'টায়। বিমলার বর থাকে পাটনায় — সে ডাক্তার। তাদের গাড়ি আসবে ন'টার সময়। তারপর

অমলার বর থাকে মালদ'য় — জমিদার। তারা আসবে বেলা এগারোটায়।

সুরবালার সকালের জপ শেষ হয়েছে। এবার জলযোগ করে পাঠ আরম্ভ হবে। মোহন কথক রোজ এসে ভাগবত গীতা পাঠ করেন। কোনও কোনও দিন পাড়ার দু'একজন বুড়ি এসে জড়ো হয়। কথা শুনতে শুনতে সুরবালার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ে। যতবার একটা একটা অধ্যায় শেষ হয়, আর সুরবালা ততবার গলায় আঁচলটা দিয়ে গুরুদেবের ছবির তলায় মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করেন।

সুরুচি এসে বলে — মা, বাজারে রুই মাছ পায়নি, ইলিশ মাছ এনেছে। কি করবো?

সুরবালা যেন বিরক্ত হন, বলেন — ওসব লক্ষ্মীর মা যা ভালো বোঝে করবে'খন। তুই একটু আয় না মা, বসে দু'টো কথা শোন না, তোর কেবল সংসার আর সংসার!

সুরুচি ততক্ষণে রান্নাঘরে ঢুকে ঠাকুরকে বকতে শুরু করেছে — তোমার আক্কেলখানা কি ঠাকুর, আঁশের উনুনে তুমি নিরামিষ কড়াটা কি বলে চাপালে? তুমি কি আজ নতুন মানুষ এলে এ-বাড়িতে?

তারপর উঠোনের দিকে চেয়ে লক্ষ্মীর মাকে বলে — তুমি বাপু ওই কাচা কাপড়ে নর্দমা পরিষ্কার করছো, আমি কিন্তু ও-কাপড়ে তোমাকে শিল ছুঁতে দেব না। মা'র না হয় এসব দিকে নজর নেই, কিন্তু আমি তো কানা হইনি।

সমস্ত দিকে নজর না রাখলে কি চলে? বাবাকে খাইয়ে দাইয়ে কোর্টে পাঠিয়ে সুরুচি বাবার ঘরটা পরিষ্কার করতে গেল।

বিছানা, টেবিল, আলনা গুছোতে গুছোতে সুরুচি পুরনো চিঠি-পত্রের বাক্সটাও গুছোতে বসলো। অনেকদিনের অনেক বাজে চিঠি জমে অকারণে ভারি হয়ে উঠেছে। হঠাৎ মনে হলো কে যেন ঘরের মধ্যে ঢুকলো। ঢুকে লুকলো কোথাও। পেছন ফিরে দেখে — না, তারই প্রতিবিম্ব পড়েছে আয়নাতে। সুরুচির বহুদিনের আগের কথা মনে পড়াতে ঠোঁটের কোণে একটু হাসির আভাস

উঠে আবার মিলিয়ে গেল।

চেয়ারের ওপরে উঠে আলমারির মাথাটা পরিষ্কার করলে। কয়েকটা লাল রঙএর চিঠি বেরুল, সুরুচির বিয়ের চিঠি। কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেললো সেগুলো। যত সব বাজে জঞ্জাল!

তারপর মতিলালকে ডাকলে। বললে — বালতি করে জল নিয়ে আয়, আর ঝাঁটা নিয়ে আয়, ঘর ধুতে হবে।

দু'জনে মিলে তারপর সমস্ত ধোয়া মোছা ঝাড়া, সে এক কাণ্ড।

সুরবালা দেখে বলেন — একী কাণ্ড মা তোর? আমি গুরুদেবকে কাল তাই বলছিলাম — আমার রুচির কষ্ট আর আমি দেখতে পারিনে বাবা। গুরুদেব বললেন — ওকেও দেব দীক্ষা। সেবার আমার সঙ্গে একসঙ্গে দীক্ষা নিলে কেমন হতো বল দিকিনি। মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে - আহা মা আমার।

সুরুচি বলে — তুমি সরো দিকি এখান থেকে, আমি এত কষ্ট করে ধুচ্ছি আর তুমি কাদা পা দিয়ে সব নোংরা করে দিচ্ছ।

সমস্ত দিন ধরে আয়োজন করেও মনে হয় কোথায় যেন কি ভুল হয়ে গেল। গুরুদেব ফুল ভালবাসেন, দশ টাকার ফুলের মালার অর্ডার দেওয়া হয়েছে। পাঠককে বলা হয়েছে তিনবার গাড়ি নিয়ে স্টেশনে যেতে হবে — একবার সকাল ছ'টায় আর একবার ন'টায়, আর শেষবার এগারোটার সময়।

প্রথম দুবার হাওড়ায়, শেষবার শিয়ালদ'য়।

অনেক রাতে সমস্ত কাজ সেরে বিছানায় শুয়েও শান্তি নেই সুরুচির। কত ভাবনা! ভাঁড়ার ঘরের তালাটা বন্ধ করে একবার টেনে দেখেছে তো? পেছন দিকে বারান্দার আলোটা নিবিয়েছে তো? ছাদের সিঁড়ির দরজা বন্ধ করা হয়েছে তো? তারপর ভোরবেলা মতিলালকে পাঠাতে হবে একঘড়া গঙ্গাজল আনতে, পাঠক হাওড়া স্টেশন থেকে ফেরবার পথে কলাপাতা আর ফুলের মালাগুলো নিয়ে আসবে, সুখলালের দোকানে মিঠে পানের অর্ডার দেওয়া হয়েছে — সে কি আর সকালবেলা পাওয়া যাবে! কত ভাবনা সুরুচির!

সুরুচির ডাকাডাকিতে সুরবালার ঘুম ভেঙ্গে গেল ভোরবেলা।

আজ সত্যিই অনেক কাজ সুরবালার। এখনি স্নান করতে হবে, করে গরদের শাড়ি পরতে হবে। পরে নিজের হাতে গুরুদেবের জন্যে ভোগ রাঁধতে হবে। নিজের হাতে ভোগ রেঁধে তিনি পুজোর ঘরে ঢুকবেন, ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেবেন। সকাল থেকে শুরু করে গুরুদেবকে ভোগ দেওয়া পর্যন্ত কোনও পুরুষের মুখ দেখা নিষিদ্ধ। এমন কি নিবারণবাবুও নাকি সামনে থাকতে পারবেন না।

সুরবালার আজ কেবলই ভয় — কখন বুঝি ত্রুটি হয়ে যায়! বর্ষাকাল — ঝম্ ঝম্ করে দিনরাতই বৃষ্টি লেগে আছে। তবু মুখে বলছেন — তাঁর কাজ তিনিই দেখছেন, আমি তো উপলক্ষ মাত্র।

সুরুচি ঘুরে ঘুরে একবার মাকে সাহায্য করছে, একবার ভাঁড়ার দেখছে আর একবার সমস্ত বাড়িটার কোথায় কি হচ্ছে দেখে বেড়াচ্ছে।

বৈকুণ্ঠ ঠাকুর পাকা লোক। এসেই শুনেছিল মাংস পাওয়া যাবে না। তারপর নিজেই বেরিয়ে কোথা থেকে পাঁচ টাকা সের দরে মাংস নিয়ে এসেছে।

ভাঁড়ার ঘরে এসে বলে — খুকিদিদি এক সের আদা চাই।

দুটো বড় বড় মাটির উনুনে রান্না হচ্ছে। বৈকুণ্ঠ ঠাকুর আরো দু'জন সহকারী নিয়ে সেখানে আগুনের তাতে বসে ঘামছে।

পাঠক স্টেশন থেকে খালি গাড়ি নিয়ে ফেরত এল। বললে — খুকিদিদি ছ'টার গাড়িতে বড় দিদিমণিরা আসেননি।

সুরবালা রাঁধছিলেন। শুনে বললেন — তখনই জানি, ওরা আসবে না, কমলাই যদি না আসবে তাহলে কার জন্যেই বা এত আয়োজন, কার জন্যেই বা কী? ... যাক, আমি কে — তাঁর কাজ তিনিই দেখবেন।

সুরুচি বলে দিলে — ন'টার গাড়িতে মেজদি'মণিদের আনতে যেও আবার। দেখ, আসবার সময় সুখলালের দোকান থেকে মিঠে পান আর বাজার থেকে ফুলের মালা আনতে ভুলো না।

বড় বড় রুই মাছ এসে উঠোনে পড়েছে। দু'জন জেলে বউ বড় বড় বঁটি নিয়ে মাছ কুটছে। সুরুচিকে দেখে একজন বলে — ও খুকিদিদি, এই মাছের দাগাটুকু

নিচ্ছি আমার মেয়ের জন্যে — বলে একটুকরো মাছ নিয়ে হাত বাড়িয়ে দেখালে।

মাংস রান্নার তীব্র গন্ধ এসে সুরুচির নাকে লাগলো। সেই গন্ধে সমস্ত শিরা উপশিরা তার শিথিল হয়ে এল। পেঁয়াজ, রসুন বাটা হচ্ছে তাল তাল। এক একটা তরকারি রান্না হচ্ছে আর পাত্র করে তুলে এনে রাখছে ভাঁড়ারের ভেতর। একটা নিরামিষ ভাঁড়ার, একটা আঁশের একটা মিষ্টির। মিষ্টির ভাঁড়ারে কলাপাতা, মাটির গেলাস, কুশাসন জড়ো হয়েছে। তিনটে ভাঁড়াবেব চাবি নিয়েছে সুরুচি নিজের কোমরে।

— ওমা, সুরুচি পূজোর ঘরের দরজাটা খুলে দে মা।

একটা ভোগ রান্না হয়েছে। সুরুচি পূজোর ঘরের শেকলটা খুলে দিলে। গঙ্গাজল দিয়ে সমস্ত ঘরটা সুরবালা নিজের হাতে ধুয়েছেন। এক একটা ভোগ রান্না হবে আর এই ঘবে এনে তুলতে হবে। ঘরের ভেতর একটা পেতলের প্রদীপে ঘিয়ের বাতি জ্বলছে। ফুলের মালা এলে গুরুদেবের ছবিটা একেবাবে ফুলে ফুলে ঢেকে যাবে। ধূপ-ধুনো গন্ধ ছড়াচ্ছে চারিদিকে। একটা চন্দন কাঠের বাক্সের ভেতরে ভগবদ্‌গীতা সাজানো আছে। কড়িকাঠে একটা ইলেকট্রিক পাখা ঝুলছে। চার দেওয়ালে চারটে বড় বড় আয়না. একটা তাকে একটা লক্ষ্মীর সিঁদুর-চুবড়ি। মাথার ওপর ধানের শুকনো শিষ ঝুলছে। একপাশে জলচৌকির ওপর আল্পনা দেওয়া। তাতে রূপোর পঞ্চপ্রদীপ, ধূপদানি আর দুটো রূপোর হ্যাণ্ডেল দেওয়া সাদা চামর আর তারই একপাশে পঞ্চমুখী শাঁখ একটা। ফল কেটে নৈবেদ্য সাজিয়ে আগেই রাখা হয়েছে জলচৌকির সামনে। একটা পেতলের কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল।

বৈকুণ্ঠ এসে বলে ... ও খুকিদি, পোলাও এর চাল বার করে দাও, আর আখনির জলের মশলা আর নতুন কাপড় এক টুকরো।

লোকজন এখনও এসে জড়ো হয়নি। এরি মধ্যে জলে-কাদায় প্যাচ প্যাচ হয়ে গেল সারা বাড়ি। লক্ষ্মীর মাকে ডেকে বললে — নতুন ঝিকে দিয়ে একবার জায়গাটা মুছিয়ে নাও না লক্ষ্মীর মা, পিছলে পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভাঙবে।

তারপর নতুন 'ঠিকে' লোকদের বললে — তোরা এবার চা-জলখাবার খেয়ে নে। চা চিনি দুধ দিচ্ছি, বৈকুণ্ঠ ঠাকুরের কাছে চা তৈরি করে নে; আর এক এক টুকরো কলাপাতা নিয়ে সব বোস দিকিনি, মিষ্টি দিচ্ছি।

বাইরে মোটরের শব্দ হলো। মেজ মেয়ে বিমলা, মেজ জামাই, নাতি -নাতনি এসে হাজির।

নিবারণবাবু খবর পেয়ে নিচে এলেন। সুরুচি এগিয়ে গিয়ে জামাইবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। প্রণাম করা-করির পালা শেষ হলে নিবারণবাবু বললেন — চল চল সব ওপরে চল।

বিমলা বললে — কি রে রুচি, তুই এত রোগা হয়ে গেছিস কেন!

সুরুচি বলে — তা বলে তোমার মত মোটা হবো নাকি কেবল?

বিমলা বলে — সত্যি ভাই কী মোটাই হচ্ছি! তোর জামাইবাবু ডাক্তার হলে কী হবে। হ্যাঁ রে তোদের এখানে আজকাল কী সিনেমা হচ্ছে রে?

— কী জানি বাপু, সিনেমার খবর রাখিনে। তা, এসেই একেবারে বায়স্কোপ যাওয়া! এতদিন পরে এলে, একটু গল্প-টল্প কর।

বিমলা বলে — না বাপু, গল্প-টল্প পরে অনেক হবে'খন। চান করে ভাত খেয়ে নিয়েই বেরুব — কতদিন বেরুতে পাইনি।

খানিক পরে ট্যাক্সি করে বড় মেয়ে কমলারা এলো।

বলে — ট্রেন ফেল করে এই দুর্গতি। কোথায় রে, বাবা কোথায়, মা কোথায়, ওমা কী রোগা হচ্ছিস তুই দিন দিন ... বিমলা অমলা ওরা এসেছে?

তারপর বলে — উঃ ট্রেনে কী ভিড় ভাই, কোমর ফেটে গেছে বসে বসে। আমি বাপু আজ কোনও কাজই করতে পারবো না। আমি কেবল বসে বসে তরকারি কুটবো।

বিমলা খবর পেয়ে এল — ওমা বড়দি কখন এলে? আমরাও এই এলুম। রুচিকে এসেই তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম, কানের এটা কবে করালে দিদি, বেশ হয়েছে, একটা কঙ্কণ গড়াতে দিয়েছিলুম, আসবার সময় সেকরা বেটা দিতেই পারলে না, ছ'গাছি করে এই বৌকি গড়িয়েছি এবার;

মেড়োর দেশে এই-ই নতুন ডিজাইন।

পাঠক ফুলের মালা আর খিলি পান নিয়ে এসেছে। ফুলগুলো মাকে দিয়ে এল।

সুরুচি দেখলে মার কোনও দিকে নজর নেই। ভোগ সব রান্না হয়ে গেছে। পুজোর ঘরে থরে থরে সাজিয়েছে। সুরবালা ফুলের মালা নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন; খুলবেন দুপুর বারোটার পর।

ছোড়দিরা এসে গেল সাড়ে এগারোটায়, এসেই বললে — হ্যাঁ রে বড়দি সেজদি ওরা এসেছে? — বলেই উঠে গেল ওপরে।

দোতলায় দিদিদের ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি চালিয়েছে - দুপদাপ শব্দ সুরুচির কানে এল। সমস্ত ব্যবস্থাই ওদের ঠিক করে রেখেছে সুরুচি। বাথরুমে তোয়ালে, গামছা, সাবান, তেল, দাঁতমাজা, সব-সব! কতদিন পরে বাপের বাড়িতে এসেছে। ওদের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সুরুচিরই তো দেখা উচিত।

তিন বোনের কত কাপ চা লাগবে হিসেব করে চা তৈরি করে দিয়ে এল।

কমলা বললে — তোর জন্যে কী এনেছি দেখলি না রুচি?

— আসছি বড়দি, ওদের ঘরে চা দিয়ে আসি। বলে সুরুচি নিজের ঘরে এল। মেজদিরা স্নান সেরে কাপড় বদলেছে। মস্ত বড় একটা ট্রাঙ্ক খুলে কাপড়চোপড় জিনিসপত্তর গুছোচ্ছে। সুরুচিকে দেখে মেজদি বললে — দেখতো রুচি, কোন্ কাপড়টা পরি। তোরা বাপু শহরে থাকিস, কোন্‌টা ফ্যাশন কোন্‌টা ফ্যাশন নয় তোরাই ঠিক বলতে পারিস।

মেজদিরা সিনেমায় যাবে, তারই আয়োজন হচ্ছে। ট্রাঙ্ক ঝেড়ে একগাদা পোষাকী কাপড় বার করে দিলে মেজদি। বললে — দে ভাই, তুই একটা বেছে দে।

তারপর বললে — আর ভাই সেবারে এসে যতগুলো ব্লাউজ তৈরী করে নিয়ে গেলাম সব ছোট হয়ে গেল, একেবারে নতুন রয়েছে, কিন্তু একটাও গায়ে হয় না।

— হ্যাঁরে এ শাড়িখানা কেমন বলতো? আশি টাকা দিয়ে কিনেছি এবার!

মেজদির শাড়ি, ব্লাউজ, গয়না, সব সুরুচিকে দেখতে হলো। তারপর এলো ছোড়দির ঘরে।

ছোড়দি বললে — হ্যাঁরে রুচি, গাড়িটা এখন একবার দিতে পারবি ভাই, আমার এক ননদ থাকে শ্যামবাজারে, একবার দেখতে যাবো ভাবছি।

তারপর সুরুচির সঙ্গে একান্তে অনেক কথা হলো ছোড়দির — আসবার সময় শাশুড়ি বললে — বৌমা যাচ্ছো, আমার তো শরীরের এই অবস্থা, কাজ হয়ে গেলেই চলে আসবে। আমি ভাই বছরের মধ্যে এই একবার বেরুতে পাই,তা-ও বেরুতে দেবে না শাশুড়ি মাগী। তুই ভাই বেশ আছিস রুচি...

তারপর আবার বললে — পর পর তিনটে মেয়ে হয়েছে, উঠতে বসতে শাশুড়ির কথা শুনতে হয়। বলেন - পাড়ার কত বৌ-ই দেখছি, তা তোমার মতন মেয়ে-বিউনি দেখিনি আমার জন্মে, স্বর্গ থেকে একফোঁটা জল পাবে না পূর্বপুরুষরা, আমি বেঁচে থাকতে এ-ও দেখতে হবে চোখ মেলে। তুই বেশ আছিস ভাই রুচি, বেশ আছিস।

সুরুচি আবার বড়দির ঘরে এলো।

বড়দি বললে — আসবার সময় তোর জন্যে কী নিয়ে আসি ভেবে ভেবে অস্থির আমরা।

সুরুচি বলে — বারে আমার জন্যে আনতেই হবে তার কী মানে আছে? আমার তো সবই আছে।

— তা সে কত দোকানই ঘুরলাম, কেবল এনামেল করা পানের কৌটো, জর্দার কৌটো, গয়নার বাক্স, নয়তো সিঁদুর কৌটো — আর আছে সব খেলনা আতরদান, সুর্মাদান। তোর জামাইবাবু আর আমি বাজারে ঘুরে ঘুরে হয়রান।

সুরুচি হাসলো।

শেষকালে এই গরদের থানটা নিলুম। একটা চাদর হবে, একটা কাপড় করবি। তোর তো আবার শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচার আছে! কেমন হয়েছে রে, পছন্দ হয়েছে তো?

সুরুচি থানটাকে বুকে তুলে নিয়ে বড়দির পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছিল।

বড়দি ডান হাতে সুরুচির গলা জড়িয়ে ধরে নিজের কোলে টেনে নিলে — ছি ভাই পায়ে হাত দিতে নেই। তোর কথা সেখানে কত যে ভাবি, তুই তার কী বুঝবি। আমরা চার বোন, চার বোন চারদিকেই তো চলে গিয়েছিলাম, বাবা মা'র কাছে থাকবার কেউ ছিল না, হঠাৎ তুই ফিরে এলি। বাবা মা'কে দেখবার তবু একজন লোক হোল। কিন্তু যেদিন খবরটা শুনলুম, সারাদিন কেবল হা হা করে বুকের মধ্যে হাহাকার উঠেছে।

সুরুচি বললে — আমি উঠি বড়দি।

— কেন, কী এত কাজ, একটু বোস না, সকাল থেকে তো আজ কিছুই খাসনি, আজ সারাদিন তো তোর উপোস। মা'র উৎসব, তা তোর এ উপোস কেন বলতো রুচি?

— আমি উঠি বড়দি, ... ওদিকে কী যে হচ্ছে কে জানে। — ধড়ফড় করে উঠলো সুরুচি।

যা ভেবেছে তাই। কলাপাতাগুলো আধোয়া পড়ে রয়েছে, কাক উড়ে এসে রান্নার জলে' মুখ দিয়েছে, বাসন মেজে এনে জলশুদ্ধ বাসন রেখে দিয়েছে ঝি, বলবার কেউ নেই বলে মোছা হয়নি। নিজে না করলে কোন কাজটা যদি হয়! পরের ওপর আবার ভরসা।

এখনি মা বেরুবে পুজোর ঘর থেকে। দিদিদের ছেলেমেয়েরা খেতে বসবে। বৈকুণ্ঠ ঠাকুর রান্না মোটামুটি সব শেষ করে এনেছে।

বড়দি এল নিচে, বললে — কিছু কাজ থাকে তো দে, বসে বসে করি।

সুরুচি বললে — তুমি কেন কাজ করতে যাবে বড়দি, এসেছ একদিনের জন্যে।

— একদিনের জন্যে এসেছি বলেই তো কাজ করবো। ওরা কোথায় রে, বিমলা, অমলা —

— মেজদি সিনেমায় যাচ্ছে আর ছোড়দি শ্যামবাজারে যাবে ওর ননদের বাড়ি। বড়দি তুমি ওঠ, এখানে আমি ছেলেমেয়েদের খাবার ব্যবস্থা করি।

— ও খুকি, খুকি রে — ওপর থেকে নিবারণবাবু ডাকলেন সুরুচিকে।

ওপরে গিয়ে সুরুচি দেখে — বাবা একেবারে অসহায়, কলমে কালি ফুরিয়ে গেছে। প্রকাণ্ড একটা ঘরের মধ্যে বই কাগজ খুলে নিবিষ্ট মনে লিখতে লিখতে হঠাৎ কলমের কালি ফুরিয়ে গিয়েছিল। সুরুচি না থাকলে নিবারণবাবুর কলমে কালি যে কে ভরে দিত সে একটা ভাবনার বিষয়!

— রুচি, রুচি — মা ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়েছেন।

— যাই মা — বলে নিচে নেমে এল এক দৌড়ে।

— এই সব প্রসাদ ঘরে তোল মা, বাইরে কোন অসুবিধে হয়নি তো ... বিমলা, কমলা, অমলা এসে পড়েছে সব? কেমন আছে সব ভাল? কর্তা ডাকছিলেন কেন? বছরে একটা কাজের দিন, তা-ও একটু ফুরসৎ নেই; কলমে বুঝি কালি ফুরিয়েছিল?

সুরুচি সব প্রসাদ ভাঁড়ারে তুলে চাবি তালা দিয়ে দিলে।

বিমলা এল! বললে — মা আমরা এসে পড়েছি —

নিচু হয়ে তারা পায়ের ধুলো নিলে।

মা চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেয়ে বললেন — এই কচিকে এখনি তোমাদের কতা জিজ্ঞেস করছিলুম। এই দেখ মা, গুরুদেবের আশীর্বাদে সবকাজই তো নির্বিঘ্নে হয়েছে, এখন কী জানি কী তাঁর মনে আছে। সবই তো তাঁর ইচ্ছে।

তারপর আবার বললেন — গুরুদেবকে তাই বলেছিলাম আমার কোন সাধই তো অপূর্ণ রাখনি বাবা, একটা শুধু কষ্ট আছে মনে, আমাব মা রুচির মনে সুখ দিও। জানিস বিমলা, গুরুদেব রাজি হয়েছেন, বলেছেন ওকেও দীক্ষা দিয়ে আসবো। এখন ওর কপাল।

সুরুচি বললে — মা এবার তুমি জল খেয়ে নাও।

সমস্ত কাজই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো। সুরুচির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রত্যেকটির দিকে। কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা হবার উপায় নেই। কিন্তু বিকেল শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ যেন সমস্ত পণ্ড করে দেবার জন্যে মেঘ এলো। তারপর ঝড় এলো — তারপর এলো বৃষ্টি।

সে এক প্রলয় কাণ্ড! এমন বৃষ্টি বোধহয় কত বছর হয়নি, আর দিন

বুঝে কিনা আজই হলো!

সুরবালা বললেন — কি হবে মা রুচি?

আকাশ বাতাস ভেঙ্গে যেন বৃষ্টি নামছে। বৈকুণ্ঠ ঠাকুরের উনুনের ওপর ত্রিপল ছিঁড়ে হুড়হুড় করে জল পড়তে শুরু হলো। রান্না বন্ধ। বর্ষাকালের উৎসব, যথাবিহিত. চারিদিকে ঢাকা হয়েছিল মজবুত করে। কিন্তু হাওয়ার যা প্রবল ঝাপটা, বৃষ্টির যা ভীষণ বেগ, সমস্ত কোথায় ওলটপালট হয়ে গেল। বৈকুণ্ঠ ঠাকুরের দলবল আটা, ময়দা, তেল নিয়ে একেবারে ঘরের মধ্যে এসে আশ্রয় নিলে। বৈকুণ্ঠ বললে — কাজের বাড়িতে অনেক বৃষ্টি দেখেছি খুকিদিদি কিন্তু এমন বৃষ্টি কখনও দেখিনি।

সামনের রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেল।

আটটা বাজলো। এখনি তো সব লোক আসবার সময় হয়েছে — কিন্তু বুঝি সব পণ্ড হলো।

সুরবালাই সবসচয়ে চিন্তিত হলেন। এ কি করলে গুরুদেব! আমি কী অপরাধ করেছি যে এমন করে সব পণ্ড করে দিলে।

বৃষ্টি যে ছাড়বে কখনও, আকাশ দেখে এমন আভাস পাওয়া গেল না। মেজদি'রা দুপুরবেলাই বায়স্কোপ দেখে এসেছে। ছোড়দিরা শ্যামবাজার থেকে বৃষ্টির জন্যে আসতে পারে নি।

বাড়ির সামনের রাস্তায় এমন জল জমেছে যে গাড়ি চলতে পারছে না।

নিবারণবাবুর কোর্টের কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, তাঁদের জন্যে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

বৈকুণ্ঠ ঠাকুর এসে বললে — যে রকম বৃষ্টি, তাতে আজ ছাড়বে বলে তো মনে হচ্ছে না! রান্নাঘরের মধ্যে নতুন উনুন পাতি, কী বল খুকিদিদি?

ভাঁড়ার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সুরুচি চুপ করে দেখছিল সব! সকাল থেকে এত পরিশ্রম করে, এত তদারক করে, শেষকালে কি এখন সমস্ত নষ্ট হবে? প্রায় আড়াই শ' লোকের আয়োজন হয়েছে; মা, দিদিরা, বাবা সবাই সুরুচির মুখের দিকে চেয়ে আছে। সমস্ত ভাবনা ও দায়িত্ব তার ওপর ফেলে

দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত তারা।

হঠাৎ কিন্তু এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটলো।

বৃষ্টি থেমে গেল। আর এক সময় সমস্ত নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আকাশে তারা উঠলো, যেন সমস্ত এক জাদুকরের ইঙ্গিতে সুপ্রসন্ন হয়ে উঠলো। রাস্তায় জল কমে গেছে। নিবারণবাবুর বন্ধুরা এসে গেলেন। বৈকুণ্ঠ ঠাকুর আবার রান্না চাপালে। একে একে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতরা এসে হাজির হলেন।

সুরুচি ভাঁড়ার ঘরের দরজায় দাঁড়িযে সমস্ত তদারক করছিল; কার ড্রাইভারের খাবার দিতে হবে, কে শুধু মিষ্টি খাবে, কে নিরামিষ, আর ময়দা মাখতে হবে কি না, কত লোকের খাওয়া হলো, এখনও কতো লোক বাকি —

— খুকিদিদি ময়দা আরো দু'সের দিতে হবে আর পাঁপড় সেরটাক।

— ও খুকিদিদি, বাগবাজার থেকে সতীশবাবুর বাড়ির মেয়েরা এসেছে. ওদের গাড়িভাড়াটা —

— বড় মাসিমার ছেলের জন্যে একটা মিষ্টি দাও তো খুকিদিদি, বড় কাঁদছে ...

ছোড়দি'র মেয়ের দুধ গরম করা, অনেকদিন পরে ছোট পিসিমা এসেছেন, একবার ডাকছেন সুরুচিকে, তাঁকে প্রণাম কার আসা —

রাত্রি দশটা বাজলো, একটু যেন পা'তলা হলো ভিড়। একে একে সব বিদায় নিচ্ছে। সুরুচি এবার সকলকে তাড়া দিতে লাগলো। রাত কি বারোটা করবে নাকি সবাই?

সুরবালা এলেন, বললেন — দেখলি মা, গুরুদেবের আশীর্বাদে কিছুই তো আটকাল না. সবই তাঁর ইচ্ছে ... হ্যাঁ মা তুই কিছু খাসনি? যা এবার শুগে যা, আমরা দেখছি সব।

কিন্তু তবু যাব বললেই যাওয়া হয় না সুরুচির। ঠাকুরদের খাবার দিয়ে চাকরদের বসিয়ে বাড়ির সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ করে সুরুচি উঠলো। এবার এই প্রথমে সে নিজের ঘরে ঢুকবে। কত তার কাজ এখন। সুরুচির

সমস্ত শরীরটা ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে লাগলো। ঘরে ঢুকে সুরুচি দরজায় খিল দিয়ে দিলে।

অনেক রাত্রে বিছানায় শুয়ে আবার উঠে পড়লেন সুরবালা। চোখে ওষুধ দেওয়া হয়নি।

সুরবালার চোখের ওষুধ থাকে আলমারির ড্রয়ারে, তার চাবি থাকে সুরুচির আঁচলে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর উঠতে আর ইচ্ছে করে না। তবু উঠতে হলো সুরবালাকে। উঠে আলো জ্বালালেন না, নিবারণবাবুর ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে। বারান্দায় এসে প্রথমে পড়ে কমলার ঘর। আলো নিবে গিয়েছে সে ঘরে। তারপর মেজমেয়ে বিমলার ঘর। ওদের ঘরেও আলো নিবেছে। কিন্তু তখনও মেজমেয়ের গলা শোনা যাচ্ছে, ওরা জেগে আছে এখনও। তারপর সেজমেয়ে অমলার ঘর। সে ঘরেও আলো জ্বলছে এখনও, কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে। তিন মেয়ের ঘর পেরিয়ে তিনি এলেন উত্তর দিকের ছোট মেয়ে সুরুচির ঘরে। সুরুচির ঘরের দরজা বন্ধ। আস্তে আস্তে দরজা ঠেললেন সুরবালা। সাড়া পেলেন না। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে।

পশ্চিমের বারান্দা দিয়ে সুরবালা জানালার কাছে এলেন। জানালা ঠেলতেই খুলে গেল।

সুরবালা দেখলেন আলো জ্বলছে! তারপর ভেতরে চেয়ে যা দেখলেন তাতে সুরবালা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চমকে উঠেছেন।

সুরুচি একখানা বেনারসী শাড়ি পরেছে। সারা গায়ে পরেছে গয়না, মাথায় সিঁথি, হাতে চুড়ি, কঙ্কণ, কানে দুল আর সিঁথিতে দিয়েছে আগুনের মত উজ্জ্বল সিঁদুর। বিয়ের সময়কার সমস্ত অঙ্গাবরণ তার গায়ে। সুরুচি যেন নববধূ সেজেছে — যেন নতুন করে তার বিয়ে হচ্ছে আজ!

সুরবালা নির্বাক বিস্ময়ে দেখতে লাগলেন।

সুরুচি তার মেয়ে। তাকে যেন এতদিন চিনতেই পারেননি সুরবালা। আজ নতুন দৃষ্টি নিয়ে দেখছেন নতুন এক সুরুচিকে। সুরুচি যেন আজ তার নতুন করে দৃষ্টি ফুটিয়ে দিয়েছে!

স্বামীর ছবিটা সুরুচি নিয়েছে বুকে। বুকে নিয়ে সুরুচি তার বিছানায় শুয়ে আছে। সুরবালার দু'চোখ জ্বালা করতে লাগলো। তাঁরই পেটের মেয়ে সুরুচি ... সমস্ত দিনের বেলার সুরুচির সঙ্গে এ সুরুচির কত প্রভেদ।

ছবিটাকে বুকে রাখলে সুরুচি, মুখের ওপর রাখলে, তারপর বিছানা ছেড়ে উঠলো। একে একে সমস্ত গয়না খুললে। কানের দুল, হাতের চুড়ি — বেনারসী বদলে পরনে সাদা থান একটা, সিঁথির সিঁদুর ঘষে ঘষে মুছে ফেললে।

সুরবালা দেখলেন, সুরুচি সেই নিরাভরণ শরীরে স্বামীর ছবিটি সাজিয়ে রাখলে মেঝের এককোণে একটা জলচৌকির ওপর। সেখানে আলপনা দিয়েছে বিচিত্র করে, ফুল দিয়ে সাজিয়েছে, ধুপ জ্বাললে। সুরুচি উঠে বসে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল সেই দিকে, গভীর ধ্যানমৌন মূর্তি তার ... সে যেন এ জগতের সমস্ত মায়া সমস্ত আকর্ষণ থেকে দূরে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে।

তারপর হঠাৎ একসময়ে যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়লো। সুরবালার মনে হলো যেন সুরুচি মূর্চ্ছা গেছে, আর উঠবে না।

জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন সুরবালা — ও রুচি, মা আমার।

দরজা খুলল।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুরবালা আর সুরুচি — আর মাঝখানে একটি দোদুল্যমান মুহূর্ত! একটি মুহূর্তের ব্যবধান! মার মুখের দিকে চেয়ে সুরুচি হঠাৎএকটা অস্ফুট আর্তনাদ করে সুরবালার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সুরবালা দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন তাকে।

— মা আমার, সোনা আমার — সুরবালার মুখ দিয়ে সান্ত্বনার ভাষা আর বেরুল না ... সুরবালার চোখ দু'টো জ্বালা করতে লাগলো।

সুরবালার মনে ছিল না — সুরুচির হাতের নোয়া আর সিঁথির সিঁদুর ঘুচেছিল সাতাশে শ্রাবণ। তাঁর গুরুদেবের উৎসব আর সুরুচির সর্বনাশ — সে যে একই তারিখে, সে কথা সুরবালার কেমন করে মনে থাকবে।

ফুলশয্যার ইতিহাস

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

একে-একে সকলে বাহির হইয়া গেলে রমেন দোরে খিল দিয়া আলোটা কমাইয়া বিছানার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। দীপ্তি তখন মাথার বালিশের নিচে মুখ গুঁজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু সে যে ঘুম নয়, তা তাহার দ্রুত নিশ্বাসের শব্দেই বোঝা যায়।

শুভ্র শয্যার সর্বত্র গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো, তাহার মধ্যে ফুটন্ত গোলাপের মতই দীপ্তির দেহখানি পড়িয়া আছে। 'পড়িয়া আছে' বলিলে ঠিক বোঝানো যায় না, অত্যন্ত নবম সিল্কের কাপড়ের মত তাহা এলাইয়া আছে।

দীপ্তির দেহখানি ক্ষীণ, সুগোল, সুডৌল এবং সুকুমার। সেদিকে চাহিবামাত্র মনে হয় এ-দেহ এতই নরম যে বোধ হয় কাহারও হাতেব ভার সহিবে না।... এত সুকুমার দেহ ইতিপূর্বে কাহারও দেখিয়াছে বলিয়া রমেনের মনে পড়িল না। ট্রেনে আসিবার পথে আগের দিন দু-একবার চুরি করিয়া রমেন তাহাব মুখটা দেখিয়া লইয়াছিল, উপবাসক্লিষ্ট মলিন মুখের মধ্যে আয়ত দুটি চক্ষুর লজ্জাবিজড়িত চাহনির কথা মনে করিয়া তাহার বুকের ভিতরটা যেন মোচড়াইয়া উঠিল, আজ সারাদিন সে কাজের ভিতর একবারও ভাল করিয়া দীপ্তিকে দেখিতে পায় নাই সত্য কথা, কিন্তু গতকল্যকার কটাক্ষের স্মৃতিতেই সে মশগুল হইয়া আছে — সমস্ত কাজের মধ্যে সেই দুটি চোখের কথা বারবার তাহাকে উন্মনা করিয়া দিয়াছে।

রমেন পকেট হইতে টর্চটা বাহির করিয়া একবার দীপ্তির মুখখানি তুলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। দীপ্তি মুখ তুলিল বটে কিন্তু সে মুহূর্ত কয়েকের জন্য, তাও চোখ মেলিয়া চাহিতে পারিল না।

রমেন একটা ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিছানার তলার দিকে আসিয়া বসিল। তাহার বয়স একটু বেশী হইয়াছে — একথা আজ আর কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না; সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির ঘরে যে বয়সে বিবাহ হয়,

সে বয়সকেও সে বহুদিন পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে। আজ এই প্রায় যৌবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছিয়া, ঐ পনেরো বছরের মেয়েটিকে বিবাহ করিয়া কি সে ভুল করিল না? দীপ্তির বয়স যে পনেবোর বেশী নয় তাহার প্রমাণ সে আগেই পাইয়াছিল, আজ আরও নিঃসংশয় হইল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, একেবারে ছেলেমানুষের মুখ।

রমেনের মনে পড়িল বন্ধু-বান্ধবরা এই অসমান বিবাহে বাধা দিয়াছিল, কিন্তু এই মেয়েটিকে সে নিজে দেখিয়া পছন্দ করিয়াছিল বলিয়া কাহারও কথা শোনে নাই। আজ তাহার মনে মনে কেমন একটু ভয় হইতে লাগিল, সে কি পারিবে দীপ্তির মনের মতন হইতে? কিশোরীর প্রণয়লীলার মধ্যে তাহাকে কি নিতান্ত বেমানান দেখাইবে না?

সে একবার চকিতের মধ্যে তাহার এই চৌত্রিশ বৎসরের জীবনযাত্রার দিকে চাহিয়া লইল। অতি শৈশবে তাহার মাথায় সংসারের ভার পড়িয়াছিল; অর্থ উপার্জন এবং ভাই-বোনদের মানুষ করার চিন্তার মধ্যে সে আর কোন দিকে নজর দিতে পারে নাই; মা এবং বোন ছাড়া অন্য কোন রমণীর সঙ্গ বা সাহচর্য তাহার অদৃষ্টে মিলে নাই। কোনও অভিজ্ঞতা, কোনও জ্ঞানই নাই তাহার এ বিষয়ে!... যদি দীপ্তি তাহাকে ভালবাসিতে না পারে? যদি সে তাহাকে ভয় করে? তাহার সঙ্গ যদি পীড়াদায়ক মনে করে?

রমেনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। সে জোর করিয়া মনকে দৃঢ় করিবার চেষ্টায় দীপ্তির তনুলতার দিকে চাহিল। সুশ্রী, সুগঠিত চরণ দুটির কাছেই সে বসিয়াছিল — একবার তাহার পায়ে হাত বুলাইবার লোভ সে সামলাইতে পারিল না। মাখনের মত নরম একখানি পা সে দুই মুঠোর মধ্যে ধরিয়া ধীরে ধীরে চাপ দিল। মুহূর্ত খানেক স্থির হইয়া থাকিয়াই দীপ্তি পা সরাইয়া লইল। বোধ হইল যেন চাপা হাসিতে তাহার পিঠটা বার দুই বেশি করিয়া ফুলিয়াও উঠিল, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ দিল না। ...

রমেন জামাটা খুলিয়া নিজের বিছানায় উঠিয়া বসিল, তারপর দীপ্তির কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি ডাকিল, দীপু, দীপ্তি!

দীপ্তি তেমনই চুপ করিয়া রহিল।

হাওড়া জেলার এক দুর্গম পল্লীর অতি গরীবের ঘরে তাহার জন্ম। তাহার জন্মের পরেই তাহার মা মারা যান এবং তাহার বাবার চাকরী যায়। সে চাকরী তিনি আর পান নাই। কোনও রকমে ছোট ভাইয়েদের মন জোগাইয়া এবং ভাদ্রবৌদের সংসারে খাটিয়া তিনি আজও বাঁচিয়া আছেন বটে, কিন্তু সে থাকা যে মরার অধিক, একথা সে এই বয়সেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। সুতরাং সে ছেলেবেলা হইতেই সর্বত্র শুনিয়াছে যে তাহার মতন দুর্ভাগা আর নাই, নিজেও সেকথা বিশ্বাস করিয়াছে। তাহার চেয়ে যে সব মেয়েদের ভাল অবস্থা, যাহাদের সমস্ত শৈশব ও কৈশোর অবিরত লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়া কাটে নাই, তাহারাও উপযুক্ত অর্থের অভাবে কেহ মদ্যপের হাতে , কেহ বৃদ্ধের হাতে, কেহ অত্যাচারী লম্পটের হাতে পড়িয়াছে; তাহাদের দুর্দশা সে নিজের চোখেই দেখিয়াছে এবং শিহরিয়া উঠিয়া ভাবিয়াছে নিজের অদৃষ্টের কথা। কখনও ভাবিয়াছে যে তাড়াতাড়ি যাহা-হোক একটা হইয়া যাওয়া ভাল, বিবাহিত জীবনে তবু একটা স্বাধীনতা আছে; আবার ভাবিয়াছে যে বাপের বাড়িতে লাঞ্ছনার মধ্যে দুঃখ আছে বটে-অপমান নাই, কিন্তু স্বামীর কাছে গিয়াও অদৃষ্টে যদি নির্যাতনই জোটে তো তাহার অপমান সে সহিবে কেমন করিয়া? তা-ছাড়া বাপের বাড়ির দুঃখ একদিন শেষ হইবেই, এই আশায় সে প্রাণ ধরিয়া আছে, কিন্তু শ্বশুরবাড়ির সম্পর্ক যে আজীবন!

এমন সময় একদিন কার্তিকের মত রূপ এবং অগাধ ঐশ্বর্য লইয়া রমেন নিজে আসিল তাহাকে দেখিতে। সেদিনের কথা তাহার আজও মনে আছে। আগেই তাহার রূপ ও ঐশ্বর্যের কথা সে শুনিয়াছিল, মনে আছে, যে লোকটি মধ্যস্থ হইয়া এ সম্বন্ধ করে, জ্যাঠাইমা তাহাকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছিলেন, কেন ও-চেষ্টা করছ মিছিমিছি? ও বাঁদরির কী আছে যে পছন্দ করবে? শুধু শুধু এ ধাস্টামো কেন?

তাহার উপর সেদিন তাহাকে সাজাইয়া দিবারও কেহ ছিল না, এমনকি কেহ তাহাকে একটা ভাল কাপড়ও পরাইয়া দেয় নাই। কী দুর্নিবার লজ্জার

সহিত লড়াই করিতে করিতে যে সেই পুরাতন দেশী কাপড়টিতে দেহ ঢাকিয়া রমেনের সামনে তাহাকে যাইতে হইয়াছে, তাহা একমাত্র তাহার অন্তর্যামীই জানেন। তাহার পর সে কেমন করিয়া দূরে জামরুল গাছের আড়াল হইতে রমেনকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল এবং কী গভীর বেদনায় সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় মাথা খুঁড়িয়াছিল, তাহা সে আজও ভোলে নাই। সে চোখের জলে তুলসীমঞ্চের মাটি ভিজাইয়া বারবাব জানাইয়াছিল, হে ঠাকুর, যেন আমায় পছন্দ করে!

কিন্তু তবুও, ভগবান যে সত্যই তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিবেন তাহা সে কোনও দিনই আশা করে নাই। তাই যেদিন খবর আসিল যে রমেন তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হইয়াছে, তখন বাড়ির অন্যান্য লোকের মত সে-ও সে-কথা বিশ্বাস করে নাই। জ্যাঠাইমা এই সেদিন পর্যন্ত যখন বলিয়াছেন, 'ও তোকে ঠাট্টা করছে' তখন সে না মুখে, না মনে, কোন প্রতিবাদই করতে পারে নাই, শুধু গভীর রাত্রি পর্যন্ত, অন্যের অজ্ঞাতসারে মুখে কাপড় গুঁজিয়া কঁাদিয়াছে।

তাহার পরে শেষ পর্যন্ত সেই দিনটিও আসিয়া পড়িল, যেদিন আর কাহারও কোন সংশয় রহিল না। কাকি ও জ্যাঠাইয়ের দলের হইল ঈর্ষা, কারণ তাহাদেরও বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে; সুতরাং লাঞ্ছনার মাত্রা সেদিক দিয়া বাড়িয়া গেল। কিন্তু তা বাড়ুক, সে লাঞ্ছনা তখন আর তাহাকে বেদনা দিতে পারে নাই; সে মনে মনে গৌরব অনুভব করিয়াছে। রূপকথার রাজপুত্রের মত পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া তাহার স্বামী আসিতেছেন, নিমেষে এই সব বেদনা সোনা হইয়া যাইবে। আজ যত দুঃখই আসুক, তাহাকে সে গ্রাহ্য করে না।

কিন্তু কোথাও কোথাও তাহার আদরও বাড়িল। তাহার কাকার দুই মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছিল, তাহারা এতদিন ভাল করিয়া দীপ্তির সহিত কথা পর্যন্ত কহিত না; এইবার তাহারা দীপ্তিকে ঘিরিয়া ধরিল। নিজেদের বিবাহিত জীবনের নানা গল্প তাহার কাছে করিয়া, নানা উপদেশ দিয়া তাহাকে তৈরি করিতে লাগিল। মনে আছে, বিবাহের ঠিক আগের দিনই অনিলা তাহাকে বলিয়াছিল, দেখিস ছুঁড়ি, চট করে যেন সোয়ামির হাঁতে ধরা দিসনি! তাহলে দাম কমে যাবে। অন্তত তিন চারদিন খেলিয়ে তবে তার সঙ্গে কথা কইবি!

তাহার জবাবে অনুপমা বলিয়াছিল, হাঁ, ধরা না দিয়ে পার পাবে কিনা! আজকালকার ছেলেরা পায়ে ধরে কেঁদে যেমন করে হোক কথা কওয়াবেই। বাব্বা, আমাদের মানুষটি যা কাণ্ড করলে-সব প্রতিজ্ঞাই ভেসে গেল।

অনিলাও হাসিয়া বলিয়াছিল,তা-যা বলেছিস, যা বেহায়াগিরি করে —! মকর বলছিল যে ফুলশয্যার রাত্রিতে সে তার বরের সঙ্গে কথা কয়নি ব'লে শেষ পর্যন্ত বেচারা মাথা খুঁড়তে শুরু করেছিল, একেবারে রক্ত-গঙ্গা!

কথাটা শুনিয়া তাহার সারা দেহ আবেশে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল, সারা রাত ঘুমাইতে পারে নাই। তাহার কথা, শুধু দুটি মুখের কথা শুনিবার জন্য একটা পুরুষমানুষ পায়ে ধরিতে পারে! এও কি সম্ভব! ঐ সুন্দর পুরুষটি, যাহার জন্য সবাই তাহাকে ইতিমধ্যেই ঈর্ষা করিতে শুরু করিয়াছে, যাহার বংশ এবং ঐশ্বর্যের খ্যাতি আজ এ-গ্রামের সকলের মুখে মুখে, সে-ও তাহার পায়ে ধরিবে, তাহার কাছে মিনতি জানাইবে, শুধু তাহার মুখের কথা শুনিবাব জন্য? তাহার সহিত কথা কহিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইবে?...

সে কিছুতেই এ সম্ভাবনাটা মনের মধ্যে ধারণা করিতে পারিল না, অথচ অবিশ্বাস করিতে গেলেও মনের ভিতরটা বেদনায় টনটন করিয়া ওঠে। এমনি করিয়া আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল, ভোর-রাত্রে তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখিল যে, সে অভিমান করিয়া একটা ঘরে বসিয়া আছে এবং তাহার স্বামী রুদ্ধদ্বারে মাথা কুটিতেছে।

বিবাহের দিনই বা কী লাঞ্ছনা তাহার! গায়ে হলুদের তত্ত্বের বেনারসী কাপড়খানার মূল্য যখন তাহার বিশ্বনিন্দুক ন'কাকিমা পর্যন্ত অন্তত একশ' টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন, তখন আর কাহারও ঈর্ষা বাধা মানিল না। যত কিছু বাহ্য মুখোশ খুলিয়া ফেলিয়া সকলে একেবারে নিজমূর্তি ধারণ করিল। কিন্তু সে-সব কোনও দিকে তাহার তখন চিন্তা ছিল না, তাহার মনে সে এক অপরূপ সুর বাজিয়া চলিয়াছে, তাহাতেই সে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। ঐ অসংখ্য দামী শাড়ি, ঐ রকমারী জামা, এবং বহুমূল্য সোনার হার আসিয়াছে শুধু তাহারই জন্য,

একান্তভাবে ঐগুলি তাহারই!

শুভদৃষ্টির সময় সে তাই সকল লজ্জা ভুলিয়া চোখ মেলিয়া তাহার স্বামী, তাহার দয়িতের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। রমেনের সৌম্যসুন্দর মুখের দিকে, তাহার সঙ্কোচ-ভরা কুণ্ঠিত দৃষ্টির দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল। ছোটবেলায় শুনিয়াছিল, গৌরী মহাদেবকে পাইবার জন্য সহস্র বৎসর অনাহারে তপস্যা করিয়াছিলেন; তাহার মনে হইল যে সেও এই মাত্র পনেরো বছরের কৃচ্ছ্র সাধনেই মহাদেবকে পাইয়াছে। সে মনে মনে বারবার ভগবানকে বলিতে লাগিল, হে ঠাকুর, যেন ভোগে হয়!

তারপর তাহার শ্বশুরবাড়িতে আসা! শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর, ননদ সকলের যত্নে ও স্নেহে গত চব্বিশ ঘণ্টা সময় যেন তাহার এক মধুর স্বপ্নের মধ্য দিয়া কাটিয়াছে। মনে হইল যেন সে সত্য সত্যই রূপকথার রাজপুত্রের সঙ্গে কোন এক রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আজ আর সে সংসারের সকলের অনাদৃতা, লাঞ্ছিতা, অনাবশ্যক ভার মাত্র নয়- আজ সে রাজেন্দ্রাণী! বহুলোকের সুখ-সৌভাগ্যের নিয়ন্ত্রী সে!

দীপ্তির সব কথাগুলি মনে পড়িয়া একবার সারা দেহ আনন্দে, আশায়, আবেশে শিহরিয়া উঠিল। কোন এক সুখানুভূতি তাহার বুকের মধ্য হইতে বাহির হইয়া দেহের প্রতি অণু-পরমাণুতে ছড়াইয়া ক্রমে দেহের অতীত যেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া পড়িল। সে সুখ বেদনার মতই টন টন করিতে থাকে,সারা বিশ্বের বীণায় বেহাগ সুরে আঘাত করে।

রমেন অনেকক্ষণ পিছনে নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া তাহার গায়ে আস্তে আস্তে একবার হাতখানা রাখিল। দেখিল সে কাঁপিতেছে; তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া লইয়া মুখের কাছে মুখ আনিয়া আবার ডাকিল, দীপু, তোমার শীত করছে? শালখানা গায়ে দিয়ে দেব?

দীপ্তি মুখ টিপিয়া হাসিল, সাড়া দিল না।

সে-হাসি রমেন দেখিতে পাইল না। সে বিব্রত হইয়া উঠিল। আর একবার পিঠে হাত দিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দেখিল ভীরু পাখির মত তাহার বুক ধ্বক ধ্বক

করিতেছে! তাহার মন মমতায় ভরিয়া উঠিল। ভাবিল, ছেলেমানুষ! ভয় পেয়েছে!

সে শালখানা খুলিয়া দীপ্তির গায়ে ঢাকা দিয়া দিল।

কিন্তু এত ভয়ই বা কেন? সে আজ পর্যন্ত যত বন্ধুবান্ধবদের ফুলশয্যার কথা শুনিয়াছে কোথাও তো এরূপ ভয়ের কথা শোনে নাই। অধিকাংশ স্থলেই বরং শুনিয়াছে বধূরাই স্বামীর ভয় ভাঙায়। এই তো কালই ইন্দু বলিতেছিল যে, তাহার বউ ঘরে খিল দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে নাই, নিজেই আলাপ করিতে শুরু করিয়াছিল। তিন ঘন্টায় এত কথা বলিয়াছিল যে, বর্ধমানের রাজার মহাভারতের মত একখানা সহস্র পৃষ্ঠার বই হয়!

তবে কি দীপ্তি তাহাকে পছন্দ করে নাই? না, তাহার বয়সের কথাটা কাহারও মুখে শুনিয়াছে? তাহার নামে কেহ নিন্দা করে নাই তো? রমেন রীতিমত নার্ভাস হইয়া উঠিল, আর একবার হেঁট হইয়া জোর করিয়া দীপ্তির মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া কহিল, দীপু, একবার চোখ চেয়ে দেখ, আমাকে কি তোমার পছন্দ হয়নি?

দীপ্তি চোখ খুলিল না। কিন্তু মুখও ফিরাইল না। তখন রমেন মনে মনে অনেকখানি বল আনিয়া তাহাকে একটি চুম্বন করিল — বিবাহিত জীবনের প্রথম চুম্বন!

দীপ্তি এইবার মুখটা ফিরাইয়া লইয়া পুনরায় বালিশের তলায় মুখ গুঁজিল। বিবাহের পূর্বেকার যত কিছু আশঙ্কা তাহার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে; মাত্র দুইদিন পূর্বে যে আশা সে কল্পনাতেও মনে স্থান দিতে পারে নাই, আজ সে ধরিয়া লইয়াছে যে, সে তাহার শুধু ন্যায্য প্রাপ্য মাত্র। সে অসহিষ্ণুভাবে মনে মনে বলিল, এ আবার কি ঢং! এত ভয় কিসের?

আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। পাশের ঘরের বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিল। আর মাত্র ঘণ্টা দুই তিন এ-ঘরে থাকা চলিবে। রমেনও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। কিন্তু এই চুপ করিয়া শুইয়া থাকার রহস্য সে কিছুতেই ভেদ করিতে পারিল না। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে নিজের কোন অভিজ্ঞতাই তাহার নাই, বন্ধুবান্ধবরা যতটুকু বলিয়া দিয়াছে সেই পর্যন্তই তাহার দৌড়; কিন্তু এরকম

সম্ভাবনা তো কেহ তাহাকে বলিয়া দেয় নাই ... সে কি সত্যই এই ছোট মেয়েটিকে বিবাহ করিয়া ভুল করিল?

আরও কিছুক্ষণ —

তারপর সে ভয়ে ভয়ে দীপ্তির পায়ে আর একবার হাত দিল, মিনিট দুই নিঃশব্দে তাহার পা টিপিতে লাগিল। দীপ্তি বাধা দিল না, মনে মনে শুধু হাসিতে লাগিল, ভাবিল যে, এইবার ঔষধ ধরিয়াছে —

রমেন তাহাকে এইবার জোর করিয়া নিজের দিকে ফিরাইল। দীপ্তির মুখখানিকে নিজের মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া অনেকক্ষর ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিল, কিন্তু সে চুম্বন মরা মানুষকে চুমা খাওয়ার মতই নিরর্থক বলিয়া মনে হইল। আর একটা মানুষ যদি নিতান্ত পাষাণের মতই পড়িয়া থাকে তো কেমন করিয়া তাহার কাছে প্রেম নিবেদন করা যায়!

সে ডাকিল, দীপু!

সাড়া নাই। পুনশ্চ কহিল, দীপু আমার সঙ্গে কথা কইবে না? আমাকে কি তোমার ভয় করে?

দীপ্তি তাহার জবাবে আবারও পিছন ফিরিয়া শুইল। আসল কথা, তাহার হাসি পাইতেছিল। এই বুদ্ধি লইয়া লোকটা বিবাহ করিয়াছে? সে ধরা কিছুতেই দিবে না তাহা স্থির, কিন্তু এ লোকটা কি কোন দিন জোর করিয়া তাহাকে কথা কহাইতে পারিবে? মনে তো হয় না!

রমেন একটু থামিয়া কহিল, আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে,সত্যি ক'রে বলো?

তবু ও-পক্ষ হইতে সাড়া আসে না। রমেনের দেহে ঘাম দেখা দিল। কী বিপদ! এ কি বোবা নাকি?

সে-রাগ করিয়া শুইয়া পড়িল। অর্ধস্ফুট স্বরে স্বগতোক্তি করিল, আমি ঘুমোই বাবা, কথা না কইলে তো বয়েই গেল!

কিন্তু সেটা কথার কথা। শুইয়া শুইয়া যেন শয্যাকণ্টকী বোধ হইতে লাগিল। তাহার ষোল সতেরটি বন্ধুর আজ পর্যন্ত বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু কই

কাহারও অদৃষ্টে এ-রকমটি ঘটিয়াছে বলিয়া তো শোনা যায় নাই! তাহারই দুর্ভাগ্যক্রমে কি এই মেয়েটির যত কিছু বিপরীত আচরণ?

ওধারে দীপ্তিরও চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছিল। পাশের ঘরের ঘড়িটা ক্রমাগত টিক টিক শব্দে মিনিটের পর মিনিট যেন দুই হাতে করিয়া সরাইয়া দিতেছে। তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় রাত্রিটি কি এমনি করিয়া নীরবে কাটিয়া যাইবে? রাত্রি প্রভাত হইতে আর দেরিই বা কি? কিন্তু অনিলা, অনুপমা তাহাদের স্বামীরা পর্যন্ত পায়ে ধরিয়া সাধিয়া কথা কওয়াইয়াছে, আর সে-ই বিনা আয়াসে ধরা দিবে, অথচ তাহার মত স্বামী-সৌভাগ্য আর কাহারও কি হইয়াছে?

রমেন ভাবিতেছিল, বড় মেয়ে হইলেও না হয় রাগারাগি করা চলিত, কিন্তু এ যে একেবারে বালিকা, ইহাকে লইয়া কী করা যায়? সে নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু এই কঠিন নীরবতার কোনও কারণই সে খুঁজিয়া পাইল না। কারণ না জানিলে উপায় হয় কি করিয়া?

অনেকক্ষণ পরে সে শুইয়া শুইয়াই দীপ্তিকে নিজের কাছে জোর করিয়া আনিল, অকস্মাৎ তাহার মুখ, বুক, কণ্ঠ অজস্র চুম্বনে ভরাইয়া তুলিল। দীপ্তি বাধা দিল না, সরিয়াও গেল না। অভিমানে তাহার চোখ দুইটি জ্বালা করিতেছিল, মনে মনে সে বলিল, আমার দেহটার ওপরেই শুধু যদি তোমার লোভ হয়, তাই তুমি নাও, আমি চাই না কথা বলতে, চাই না তোমায় ভালবাসতে।

রমেনের সারা দেহ একাগ্র উত্তেজনায় তখন কাঁপিতেছে। সে দীপ্তির প্রতিটি অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিল, অকারণে তাহার হাতটা কঠিন মুঠার মধ্যে ধরিয়া নিপীড়িত করিতে লাগিল। কিন্তু একটু পরেই নিজের আচরণে লজ্জিত হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। এ কী করিতেছে সে, কাণ্ডজ্ঞান কি তাহার লোপ পাইল!

তাহার লজ্জাটা ক্রমে ক্রোধের আকার ধারণ করিল, — ঐটুকু মেয়েরই বা এত কিসের জেদ? এত অহঙ্কার কেন? দীপ্তি কি ভাবে রমেনকে বিবাহ করিয়া মাথা কিনিয়াছে? সে পাশ ফিরিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়া শুইল,

থাক দীপ্তি তাহার অহঙ্কার লইয়া-রমেন আর সাধিবে না।

দীপ্তিও বুঝিতে পারিল না, কোথা দিয়া কি করিয়া এমনটা হইল। সে চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। ধারায় ধারায় তাহার চোখের জল ঝরিয়া ফুলশয্যার নূতন বালিশ ভিজিতে লাগিল। এমনি করিয়া দুটি নববিবাহিত নরনারী অন্তরের অগাধ আশা আকাঙ্খা কামনা বুকে করিয়া নীরবে পাশাপাশি শুইয়া রহিল। এবং তাহাদের সেই বেদনাকে উপহাস করিয়াই যেন ঘড়িটা অন্ধকারের মধ্যে টিক টিক শব্দ করিতে লাগিল।

ভোরের আলো শার্সির গায়ে লাগিতেই রমেন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। সেই ম্লান আলোতে প্রথমেই তাহার চোখে পড়িল — দীপ্তি কাঁদিতেছে। মুহূর্তমধ্যে সমস্ত রাগ মন হইতে চলিয়া গিয়া সে জায়গায় পূর্বেকার আনন্দ আসিযা জুড়িয়া বসিল। সে ব্যাকুলভাবে তাহার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া কহিল, দিপু , কি হয়েছে আমায় বলো, লক্ষ্মীটি। বাপের বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে? না, আমারই কোন কাজে ব্যথা পেয়েছ? বল, লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে পড়ি!

দীপ্তির চোখের জল দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। এই কথাগুলি এতক্ষণ কোথায় ছিল? এমন করিয়া আগে বলিলে তো তাহার ফুলশয্যার রাত্রি ব্যর্থ হইয়া যাইত না!

রমেন তাহাকে খানিকটা তুলিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, আমাকে এমন করে কষ্ট দিয়ে তোমার লাভ কি হচ্ছে দীপু?

এই তো! দীপ্তির বুক জ্বলিয়া উঠিল। অনিলা অনুপমার দল যাহা বলিয়া দিযাছে, এতক্ষণ পরে বুঝি তাহা মিলিতে চলিল। সে অধীর আগ্রহে অধিকতর মিনতির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু রমেন আবারও ভুল বুঝিল। সে রাগ করিয়া তাহাকে নামাইয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দীপ্তি কিছুক্ষণ কাঠ হইয়া শুইয়া রহিল। কিছুতেই সে তাহার দুর্ভাগ্যের কারণ বুঝিতে পারিল না। এমনি করিয়াই কি সারা জীবন অমৃতের পাত্র তাহার মুখের কাছে আসিয়া ফিরিয়া যাইবে? এ কি তাহারই সূচনা?

সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া শুষ্ক মুখে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাহিরের পাণ্ডুর আকাশের দিকে চাহিয়া মনে মনে কহিল, ঠাকুর, একটিবার সে ফিরে আসুক, এবার নিজেই পায়ে ধরে তার কাছে মাফ চাইব।

নিচের ঘরে বসিয়া তখন রমেনও ভাবিতেছে, অত রাগ না করলেও চলত। ছেলেমানুষ, আমারই উচিত ছিল, হাতে পায়ে ধরে তার ভয় ভাঙানো।

বিশ্বদেবতা পূর্বাকাশে বসিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

চিরন্তন ভ্রান্তি

আশালতা সিংহ

১

চপলার আজ পাঁচ বৎসর বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু ছেলে হয় নাই।

বাঙালি মেয়েরা সাধারণত যে বয়সে মা হয়, সে বয়স তাহার যায় যায়। যদি শ্বশুরবাড়িতে শাশুড়ি ননদ প্রভৃতি পাঁচটা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে থাকিত, তাহা হইলে এতদিন তাঁহারা নিশ্চয়ই তাহাকে মাদুলি, তাবিজ, তাগা পরাইয়া এবং মন্ত্রসিদ্ধ ঔষধ ও গাছগাছড়ার দৈবশক্তিসম্পন্ন শিকড় গলাধঃকরণ করাইয়া ছাড়িতেন। কিন্তু চপলা থাকে সাঁওতাল পরগণার একটি ছোট শহরে। সেখানে সে একেবারে একা। স্বামী সরকারী বড় চাকরী করেন। গভর্মেন্ট কোয়ার্টার্স পেয়েছেন থাকিবার জন্য- একেবারে ফাঁকা জায়গায়, পাহাড়ে ঘেরা নির্জন বনময় আবেষ্টনের মাঝে। চারিদিকে ফুলের বাগান, বাগানের মাঝখান দিয়া লাল কাঁকড়ের রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি যায় বনরাজিলীলা উন্মুক্ত প্রান্তর। তাহার পরে বন্ধুর রুক্ষ পাহাড়ের শ্রেণী। চপলার স্বামী হরকুমারকে প্রায়ই টুরে যাইতে হয়। দৈবাৎ যে দু-একদিন টুর না থাকে, সে দিনেও আপিসের কাজ থাকে বিস্তর। স্বামী বাহির হইয়া গেলে চপলার অসীম অবসর, অপার নির্জনতা। বাড়িতে কোন শিশুর কলঝঙ্কার নাই, শত উপদ্রব নাই। যেখানে যে জিনিস সাজানো আছে সেখানে তাহা চিরকাল তেমনই নিখুঁতভাবেই সাজানো থাকে। কেহ দৌরাত্ম্য করিয়া একটি জিনিষও স্থানচ্যুত করে না। কিন্তু চপলা

কল্পনা করে। কল্পনায় সে অদূর ভবিষ্যতে একটি তরুণ মানবশিশুর আবির্ভাব যেন দিব্যচক্ষে দেখিতে পায়। বিশ্বাস তাহার অটল, একদিন সে আসিবেই। কিন্তু নিজেকে সেই আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখা চাই। চপলার মন্তেসরির শিক্ষাপ্রণালী বার্টরাণ্ড রাসেলের আধুনিক শিশুশিক্ষাপদ্ধতি এবং যেখানে যাহা কিছু শিশুবিষয়ক বই আছে, সমস্ত কিনিয়াছে এবং সযত্নে পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শিশু ভোলানাথ, ক্রিসেন্ট মুন এবং আরও অনেক কবিতার বইয়ের প্রত্যেকটি কবিতা তাহার মুখস্থ। শুধু তাই নয়, শিশুর শরীরবিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধেও যত কিছু জানিবার আছে, সমস্তই বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে আয়ত্ত করিয়াছে। এমনিই করিয়া একটা দৃঢ় বিশ্বাসকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সে জ্ঞানে নিষ্ঠায় সাধনায় আপনাকে সব দিক দিয়া তাহার ভাবী সন্তানের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল। যদি আরও অনেক দিন তাহার ছেলে না হইত, তবে হয়তো একদিন তাহার আশা ম্লান এবং সাধনার জ্যোতি নিস্তেজ হইয়া আসিত। কিন্তু বিধাতা দয়া করিলেন, সেই বছরই চপলার একটি মেয়ে হইল। এতদিন চপলা বইয়ের পাতায় যাহা কিছু পড়িয়াছে, সে সমস্তই তাহার মাথায় একসঙ্গে ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষুদ্র শিশু যদি ঘুমাইতে ঘুমাইতে আপন মনে হাসে, অমনই তাহার মা তাড়াতাড়ি আলমারি হইতে মনস্তত্ত্বের একটা মোটা বই টানিয়া আনিয়া শিশুর স্বপ্ন দেখা অধ্যায় খুলিয়া পড়িতে বসে। যদি কিছুক্ষণ না কাঁদে, তখনই আবার বইয়ের পাতা উল্টাইয়া দেখে, শিশুর গলার পেশীসঞ্চালনের জন্য দৈনন্দিন ঠিক কতখানি কাঁদা তার প্রয়োজন। সকল সময়ে আবার নিজের উপরেও ভরসা হয় না। একদিন বাদলা করায় খুকি নরম লেপের তলায় সারাদিন ঘুমাইয়া ছিল, কেবল দুধ খাওয়ার সময় ছাড়া তাহার সুখনিদ্রার ব্যাঘাত হয় নাই। চপলা নিতান্ত ভীত হইয়া খুকির নাকের কাছে তুলা লইয়া গিয়া দেখিল, নিশ্বাস প্রশ্বাস ঠিকমত বহিতেছে কি না। তাহা যদি ঠিকই বহিতেছে, তবে এত ঘুম কেন? তখনই ডাক্তারের কাছে 'কল' গেল। ডাক্তার যখন তাহার ঠান্ডা স্টেথোস্কোপ খুকীর বুকে বসাইলেন, তখন খুকি কাঁদিতে লাগিল, তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চপলার মন আশ্বস্ত হইল। এমনই করিয়াই দিন কাটিতেছিল। নানা বাধাবিঘ্ন

অতিক্রম করিয়া খুকি পাঁচ বছরে পড়িল। এখন আর শুধু তাহার শরীরের প্রতি নয়, শরীর এবং মন দুইয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার সময় আসিল। চপলাও আপনার কর্তব্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ হইয়া উঠিল। খুকি যদি জিজ্ঞাসা করে, মা দেখ দেখ, পাখিগুলো কিরকম ডাকছে! কাকগুলো ভারী দুষ্টু মা, আমার খাবার খেয়ে নেয় কেন?

চপলা তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে পক্ষীকুলের ইতিবৃত্তের কাহিনী সুরু করে। কাক এবং চড়ুই পাখির মধ্যে তফাৎ কোথায় ও কতটুকু-প্রাঞ্জল ভাষায় তাহা বুঝইয়া দেয়। কোন একটা প্রশ্ন করিলেই চপলা সাধ্যমত গোড়া হইতে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করে। কিছু বাদ দেয় না। ফলে খুকি তাহার মাকে দেখিলেই ভয় পায়, তাহার বাবার কাছে আশ্রয় লয়। কাজকর্মের ফাঁকে বাবাকে যখনই কাছে পায়, মহা উৎসাহে তাহার সহিত আগড়ম-বাগড়ম বকে। কারণ শ্রোতা হিসাবে মায়ের চেয়ে সে বাবাকে ঢের বেশী পছন্দ করে। মা যে সকল বক্তৃতা দেন, সে সব শুনিলে হয় খুকির ঘুম পায়, নয়তো পলাইয়া যাইতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বাবা খুকির কথা ঠিক বুঝিতে পারেন। তাই তো তাঁহাকে এত ভালো লাগে। খুকি যদি বলে, বাবা, ঐ মস্ত বড় তালগাছটায় কি থাকে?

বাবা বলেন, ও খুকু, ও গাছটার তলা দিয়ে যেও না যেন। ওতে মস্ত বড় এক একানড়ে রয়েছে। তার কুলোর মত কান, মুলোর মত দাঁত, আর—। খুকু তখন তাহার বাবার লেপের তলায় আরও সরিয়া আসিয়া রহস্যে শঙ্কায় দুরু দুরু হৃদস্পন্দনে অধীর প্রতীক্ষায় বাকিটা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু চপলা তখনই কাছে আসিয়া ভৎসনার সুরে স্বামীকে বলে, ও কি গো, মেয়েটাকে ভয় দেখাচ্ছো কেন? তুমি জানো, রাসেল কি বলেছেন? ছেলেদেব কচি মনে এই সমস্ত কুসংস্কার ঢুকিয়ে দেওয়া কত অন্যায়? রাসেলের নাম শুনিয়াই আপিস — ফেরত ক্লান্ত স্বামী বেচারা নিঃশব্দে লেপটা মুখের উপর আরও টানিয়া দেন।

খুকির যদি আরও দুই একটা ভাই বোন থাকিত, তাহা হইলে হয়তো তাহার জীবনটা এমন দুর্বহ হইয়া উঠিত না। কিন্তু সে ছাড়া তাহার মায়ের ভাবনা সাধনা বেদনার আর কোন অবলম্বন ছিল না।

২

এতদিন বেশ ছিল নির্জনতার মাঝে। চপলা সেই নির্জনে বসিয়া নিজের জীবনের গভীর দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যের দুরূহ সাধনায় আপনাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু এবার যেখানে তাহার স্বামী বদলি হইলেন, সেটা বড় শহর, সাঁওতাল নিভৃত পার্বত্য উপত্যকার প্রশান্তি তথায় নাই, এবং যে পাড়ায় কোয়ার্টার্স পাইলেন, সেখানে চর্তুদিকে প্রতিবেশীদের বাড়ি। চাহিলেই সম্মুখে আর নীল বনানী চোখে পড়ে না, তাহার বদলে দেখা যায়, ছাদে প্রতিবেশিনীদের কাপড় শুকাইতেছে কিংবা বাড়ির টিন রৌদ্রে দেওয়া আছে।

সে দিনটা ছিল রবিবার। সারা সপ্তাহের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে চপলার স্বামী হরকুমার রৌদ্রে পিঠ দিয়া আলস্যভরে খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। নিকটে চপলা বসিয়া সেলাইয়ের কলে খুকির জন্য জামা সেলাই করিতেছিল। ঠিক পাশের বাড়িতেই উচ্চকণ্ঠের কলরব শোনা যাইতেছিল। একটা কলহ উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, এবং যাহারা ঝগড়া করিতেছে, তাহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া এত চিৎকার করিতেছে যে , প্রতিবেশীদের বাড়ি হইতেও ব্যাপারটার আভাস পাওয়া যাইতেছিল। হরকুমার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, সকালবেলাতেই এরা এত চেঁচায় কেন? ব্যাপাব কি?

চপলা ঘৃণার সহিত কহিল, ছি ছি, ভদ্রলোকের বাড়ির মেয়ে হয়ে অত চেঁচাতে ওদের লজ্জাও করে না। ঐ যে, তারাপদবাবু সাব-রেজিস্টারের মা গো, তিনি প্রতিদিন ঐ একই বিষয় নিয়ে ঝগড়া করেন। রোজ শুনে শুনে আজ তার ছেলেরও ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে, তাই তিনিও সমানে চিৎকার করছেন।

হরকুমার উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিষয়টা কি?

সুচে সুতা পরাইতে পরাইতে চপলা কহিল, বিষয়টা হচ্ছে চিরন্তন ঈর্ষা। তারাপদবাবুর স্ত্রীর প্রথম ছেলেটি মারা যাওয়ার পর থেকেই সে বেচারীর শরীর ভেঙে গেছে। অসুখের জন্যেও খানিকটা, শোকের জন্যেও খানিকটা। কিন্তু তারাপদবাবু স্ত্রীর চিকিৎসার কোন চেষ্টা করলে বা তাঁর প্রতি একটু মনোযোগ দেখালেই মা হয়ে ওঠেন খাপ্পা। এত কেন? একটা মেয়েমানুষ, তায় আবার

বউ মানুষ, তার জন্যে এত কেন? আজ রবিবার, আপিসের তাড়া নেই, তাই বুঝি তারাপদবাবু একজন ভাল ডাক্তার আর একজন লেডি ডাক্তার আনিয়েছিলেন স্ত্রীকে দেখাবার জন্যে। ডাক্তারদের গাড়ি বিদায় হলে দরজা পার হতে না হতেই মায়ের ঘুম ছুটেছে।

হরকুমার মৃদু হাস্য সহকারে প্রশ্ন করিলেন, তারাপদবাবু তাঁর মায়ের এক ছেলে নাকি? আর ওঁর মা বুঝি বিধবা?

চপলা বলিল, তোমার দুটো অনুমানই ঠিক। তারাপদবাবু এক ছেলেও বটে, আর তাঁর মা বিধবা, সেও ঠিক। কিন্তু এদুটো কি তাঁর অসংযত এবং নিষ্ঠুর ব্যবহারের স্বপক্ষে যুক্তি হ'ল? যাই বল, আমার ভারী রাগ হয় ওঁর মায়ের ওপর। ঐ একটি ছেলে, তারই জীবন যদি অশান্তিময় করে তুললেন, তা হ'লে তো খুব মায়ের কর্তব্য করা হ'ল।

হরকুমার কহিলেন, ওঁর মা, ঠিক কষ্ট দোব বা ছেলের জীবন অশান্তিময় ক'রে তুলব, সে ধারণায় কিছু করেন না। কিন্তু একটা চিরন্তন ভুল তাঁর হয়েছে, সে ভুল আর তিনি এ জীবনে সংশোধন ক'রে উঠতে পারবেন না। আমার মনে হয় —। এই পর্যন্ত বলিয়া হরকুমার স্ত্রীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া আবেগভরে আবার বলিলেন, আমার মনে হয়, কোন না কোন প্রকারে অধিকাংশ স্ত্রীলোকেই এই ভুল করে। তাতে তারা নিজেরাও যথেষ্ট ক্ষতবিক্ষত হয় এবং তাদের প্রিয়জনদেরও বড় কষ্ট দেয়।

চপলা সেলাইয়ের কল চালাইতে চালাইতে বলিল, কি ভুল?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া হরকুমার বলিলেন, জায়গা চিরকাল জুড়ে থাকা যায় না — এই ভুল। যখন যার অধিকার, তখন তাকে স্থান ছেড়ে দিতেই হয় — ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক। বিশ্ববিধানের এই নিয়ম। তারাপদবাবুর বাল্যে তাঁর মা তাঁর জীবনের যতখানি জুড়ে ছিলেন, সে জায়গা এখন তাঁকে ছেড়ে দিতেই হবে। কিন্তু এই অত্যন্ত বেদনাদায়ক সত্য তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না।

চপলা সংক্ষেপে কহিল, তুমি যতই দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা কর, আমি

জোর গলায় বলব, তারাপদবাবুর মায়ের দোষই বেশী।

হরকুমার স্ত্রীর সহিত তর্কালাপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ জানিয়া নিঃশব্দে খবরের কাগজে মন দিলেন, আর কিছু বলিলেন না।

হঠাৎ চপলা ব্যস্ত হইয়া কহিল, ওমা কথায় কথায় খেয়াল নেই, নটা যে বাজে! মেয়েটার দুধ খাবার সময় হয়েছে, কিন্তু সে কোথা?

বিশুয়া চাকরকে খুকিকে ডাকিয়া আনিবার আদেশ দিয়া সে পুনরায় অনুযোগের সুরে কহিল, এখানে এসে অবধি খুকি যেন কিরকম হয়ে গেছে। এক দণ্ড ওর বাড়িতে মন বসে না। কোথা থেকে কতকগুলো সঙ্গী জুটিয়েছে। ঐ তারাপদবাবুর ভাগ্নী চাঁপা, তার সঙ্গে তো চব্বিশ ঘণ্টাই খেলছে। আমার এক এক সময় এত ভাবনা হয়। নাঃ এ বাড়িটা আমাকে বদলাতেই হবে। আমি আজই রমেনকে ডাকিয়ে বলছি, শহরের বাইরে বেশ খোলা জায়গায় একটা ছোটখাট বাড়ি দেখতে। তোমার কাছারি একটু দূর পড়বে বটে, কিন্তু মোটর আছে, বিশেষ অসুবিধে হবে না। ও বিশুয়া খুকিকে ডাকলি?

বিশুয়া আসিয়া নিবেদন করিল, খুকির খেলিবার ঘরে, খুকির পড়িবার ঘরে, তেতলার ছাদে, রান্নাঘরে, স্নানের টবে- সমস্ত সম্ভব এবং অসম্ভব স্থানে সে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তাহাকে পায় নাই।

চপলা উত্তেজিত হইয়া বলিল, বাড়িতে কি সে আছে, যে পাওয়া যাবে! যা, ঐ তারাপদবাবুদের বাড়িতে দেখে আয়, সে আছে নিশ্চয়ই। আমার নাম ক'রে এখনই তাকে ডেকে নিয়ে আয়। নাঃ, কালই আমি এ বাড়ি ছেড়ে দোব। আর নয়।

হরকুমার প্রশান্ত স্বরে বলিলেন, পাগলামি করছো কেন চপলা? ছেলেমানুষ, সঙ্গী-সাথীদের সাথে একটু খেলবে না? নইলে যে তার শিক্ষাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

চপলা আরও উত্তেজিত হইয়া বলিল তাই বলে ঐ রকম সঙ্গী-সাথী? জান, ঐ চাঁপা মেয়েটা কিরকম পাঁকা মেয়ে? এই তো বয়েস, এরই মধ্যে বুড়ির মত কথা শিখেছে! না, না, ওসব সঙ্গে মিশলে মেয়ে আমার চোখের

সামনে উচ্ছন্নে যাবে। সে আমি কিছুতেই সইতে পারব না। কি বলছ তুমি?

এমন সময় বিশুয়ার সঙ্গে খুকি আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার চোখে মুখে ব্যগ্রতার ভাব। দুয়ারের বাহিরে একটু আড়ালে তাহার বন্ধু চাঁপা দাঁড়াইয়া আছে। সেই দিকে চাহিয়া মিনতির সুরে বলিল, দাঁড়া ভাই চাঁপা, চ'লে যাস নি। আমি এই দুধ খেয়ে নিয়েই আবার তোর সঙ্গে খেলতে যাব। কিচ্ছু দেরী হবে না — পাঁচ মিনিট।

বিশুয়াকে দুধ আনিতে বলিয়া চপলা সস্নেহ স্বরে বলিল, ছি, খুকুরানি, রাতদিন কি খেলা করে? জান, কখন তোমার দুধ খাবার সময় হয়ে গেছে? মনে থাকে না কিছু?

খুকি বলিল, দুধ খেতে যে আমার বিচ্ছিরি লাগে মা। আর খেলতে এত ভাল লাগে। আমি আবার যাব। বিশুয়া জোর ক'রে আমাকে ধ'রে আনলে তাই। চপলা সুরু করিল, জান খুকি, দুধে কি থাকে? এ বি সি যত রকম ভাইটামিন আছে, সমস্তই দুধে আছে। তাইত পণ্ডিতরা বলেন—। ভীত হইয়া খুকি তখন তাড়াতাড়ি পলাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। একটা হাত তাহার চাপিয়া ধরিয়া চপলা বলিতে লাগিল, গত যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের ছেলেরা ভাল ক'রে দুধ খেতে পায়নি, জান, তার ফল কি হয়েছিল? কত ছেলে যে রিকেটি হয়েছিল, আর কত ছেলের যে চোখ—। খুকি দুয়ারের দিকে চাহিয়া বলিল, মা, বিশুয়া এখনও দুধ আনছে না কেন? চাঁপা ভাই যাস নি। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। আর দু মিনিট। চপলা বলিল, না খুকু এখন আর তোমার যাওয়া হবে না। এতক্ষণ কি খেলছিলে শুনি যে, বাড়িতে পা দিতে না দিতেই যাই যাই?

আমরা পুতুল খেলছিলাম মা। জান, আমার মেয়ে আর চাঁপার ছেলে। আমি যেন পুজোর তত্ত্ব পাঠিয়েছি মেয়ে-জামাইকে। বেয়ান কিন্তু নাক তুলে বললে, ওরকম জিনিসপত্র ছোটলোকের ঘর থেকে আসে। ভদ্দরলোকে অমন জিনিস দেয় না। মেয়ের শাড়িটা অন্তত বেনারসী হওয়া উচিত ছিল। আমার মেয়েকে তাই আটকেছে। মা, মা, তোমার সেই সিল্কের কাপড়টা ছিঁড়ে গেছে, আমাকে একটা পুতুলের কাপড় করতে দেবে?

হরকুমার কাগজ ফেলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। চপলার স্তম্ভিত চোখের সামনে ঘরবাড়ি দুলিতে লাগিল। নিজেকে কোনক্রমে সংবরণ করিয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া সে বলিল, খুকি, তুমি কি তোমার মাকে ভালবাস না? তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, তোমার জন্যে তোমার মা দিনরাত্রি ভাবে? কি ক'রে তোমাকে ভাল ক'রে মানুষ ক'রে তুলবে, এই ভেবে রাতদিন কত বই পড়ে? কত জিনিস তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে? তুমি —

খুকি মায়ের হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, ভালবাসি, কিন্তু খেলতে আমার আরও ভাল লাগে মা। চাঁপাকে আমি আরও ভালবাসি। ও ভাই চাঁপা, চ'লে যাস নি। চল, আমরা যাই, আমি একটু পরে এসে দুধ খাব মা।

অভিভূত আহত মাতার হাত ছাড়াইয়া এঞ্জিনের বেগে ছুটিয়া খুকি তাহাব প্রিয়তমা বন্ধু চাঁপার সহিত চলিয়া গেল।

সেই দিকে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া চপলার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। এত বই পড়িয়া, এত কিছু জানিয়া শুনিয়া, এত তপস্যা করিয়া ,এত ভালবাসিয়া, সে তাহার মেয়ের কোমল হৃদয়টুকুতে যতখানি স্থান করিয়া লইয়াছিল, কোথা হইতে অজ্ঞাতকুলশীলা এক ক্ষুদ্রসঙ্গিনী আসিয়া বিনা চেষ্টায় বিনা যুদ্ধে তাহার চেয়ে অনেক বেশি স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। হায় অকৃতজ্ঞ সংসার, এবং তাহার চেয়েও অকৃতজ্ঞ মানুষের বিচিত্র মন!

হরকুমার এতক্ষণ নিঃশব্দে সস্নেহ কৌতুকে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। বলিলেন, চপল, তুমি যে কি ভাবছ, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তারাপদবাবুর মায়ের মত একজন সাধারণ স্ত্রীলোক যে ভুল করেছেন, তুমি শিক্ষিতা এবং অসাধারণ হয়েও ঠিক সেই একই ভুল করছ। মেয়েমানুষের কি এ চিরন্তন ভুল? কেন তোমরা আর কাউকে সূচ্যগ্র স্থান ছেড়ে দিতে চাও না? তোমার সমস্ত শুভকামনা, তোমার সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার এবং তোমাব সমস্ত স্নেহ দিয়েও তুমি মেয়ের যে অভাবটুকু মেটাতে পার নি, ওদের বাড়ির সাত বছরের মেয়ে চাঁপা এক নিমেষে তা মিটিয়েছে। এতে তুমি ব্যথাই পাও, বা এ বাড়ি ছেড়ে চলেই যাও, কিংবা তোমার মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে আকুলই হও, সে আসন আর চাঁপার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। কিন্তু কাড়াকাড়ি করবার

দরকারই বা কি ? শুধু বার্টরাণ্ড রাসেল প'ড়ে ছেলেমেয়ে মানুষ করা যায় না চপল, আরও কিছু দরকার হয়। এবার সেই দিকে চোখ মেলে দেখ।

চপলা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, তোমার ওসব দার্শনিক ব্যাখ্যা রেখে দাও। আপিসের কাগজ দেখে দেখে বুদ্ধি তোমার দিন দিন বাড়ছে! আমি রমেনকে ফোন ক'রে দিই। কালই আমি এ বাড়ি বদলাব।

বিবাহবার্ষিকী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে জল্পনা কল্পনা অনেকদিন ধরেই চলছিল। বিকাশ আর নন্দা তাদের বিয়ের দশম বার্ষিকী উৎসব এবার ঘটা করে যাপন করবে। গরজটা বিকাশের চেয়ে নন্দারই বেশি। নন্দার দাদা বউদি, দিদি জামাইবাবু সহপাঠিনী বান্ধবীরা সবাই কত নতুন ভাবে তাদের বিয়ের দিনটিকে স্মরণ করে। কেউ কেউ স্ত্রীর জন্যে শাড়ি গয়না কিনে নিয়ে আসে, কেউ স্ত্রীকে নিয়ে শহরের বাইরে গিয়ে দিনটি কাটিয়ে আসে, গাড়ি থাকলে গাড়িতে যায়, না হলে ট্রেনে যায়, কেউ বাগানবাড়িতে টাগানবাড়িতে গিয়ে পিকনিক করে, কেউ বা আত্মীয় স্বজনকে নিজের বাড়িতে ডেকে খাওয়ায়। কতভাবে আমোদ-আহ্লাদ করে। ওসব দূরে থাকুক, নন্দা এমন কপাল করে এসেছে যে এ্যানিভারসারির দিনে ভাল একখানা শাড়িও তার জোটে না। প্রথম দু'চার বছর বিকাশ কবিতার বই আর ফুল নিয়ে আসত। ক বছর ধরে তাও গেছে। গতবার ছিল বিচ্ছুর অসুখ, তার আগের বার নন্দা নিজেই টাইফয়েডে পড়েছিল। বিবাহ বার্ষিকীর দিনে বন্ধু-বান্ধব ফুল কি ধূপকাঠি কিচ্ছু আসেনি, ডাক্তার আর ওষুধ পথ্যই এসেছে। তার আগের বার নন্দা ওই সময়টাই বাবার কাছে কৃষ্ণনগরে ছিল। তার ফলে বিকাশের আর কোন খরচই হয়নি। খামে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েই স্মরণোৎসব শেষ করেছে।

বিকাশ হেসে বলে, 'দেখ ওসব বড়লোকের উৎসব বড়লোককেই মানায়।

গরিবের কি ঘোড়া-রোগ সাজে। সর্বসাকুল্যে পাই তো আড়াই শো। তার মধ্যে বাড়িভাড়া দোকানপাঠ মাসকাবারি দুটি ছেলেমেয়ের খোরাক-পোশাক স্কুলের মাইনে, ডিসপেনসারির ওষুধের বিল মিটিয়ে এ্যানিভারসারি ট্যানিভারসারির কথা কি আর মনে থাকে? যদি বেঁচে বর্তে থাকি, আর অবস্থাটা ততদিনে ভালো হয়ে যায় আমরা এক সেনটিনারি করব। বিবাহ শতবার্ষিকী। নামটা যেমন গালভরা হবে, উৎসবটাও তেমনি বেশ জমকালো করে করব।'

নন্দা রাগ করে জবাব দেয়, 'কষ্ট করে তোমাকে এতদিন অপেক্ষা করতে হবে না। আমার যা স্বাস্থ্য তাতে দু'চার বছরের মধ্যেই আমি তোমাকে রেহাই দিয়ে যেতে পারব। তখন ঘটা করে দ্বিতীয় পক্ষ কোরো।'

বিকাশ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গম্ভীরভাবে জবাব দেয়, 'অত তাড়াতাড়িই কি আর সে ব্যবস্থা করতে পারব? তার আগে একটা তাজমহল তৈরির ব্যয় আছে না?'

নন্দা রাগ করতে করতেও স্বামীর কথার ভঙ্গীতে হেসে ফেলে বলে, 'ঈস আমার কী একজন শাজাহান রে'।

তারপর যথারীতি স্বামী স্ত্রীতে সন্ধি হয়ে গেল। বিকাশ বলল, 'আচ্ছা, তোমাকে এবার একখানা দামি শাড়ি কিনে দেব।'

নন্দা বলল, কী শাড়ি দেবে, বেনারসী?'

বিকাশকে হঠাৎ থেমে যেতে দেখে নন্দা ফের হেসে ফেলল। 'ভয় নেই গো, ভয় নেই। তোমার কাছে সত্যি সত্যিই বেনারসীও চাইব না, সিল্ক জর্জেটও চাইব না। তাঁত দাও মিল দাও — যা তুমি হাত তুলে দেবে তাই আমার ঢের। তবে হাসিমুখে দিতে হবে কিন্তু। সব টাকা একখানা শাড়িতে ব্যয় করে বসব এমন বে-আক্কেল আমি নই।'

তারপর মাস ভরে নন্দার জল্পনা-কল্পনা চলে বিবাহবার্ষিকীর জন্যে বরাদ্দ করা টাকাটা তারা আর কত সার্থক ভাবে ব্যয় করতে পারে। নন্দার একবার ইচ্ছা হয় শাড়ি ফুল বই টই কেনা ছাড়াও দু'চারজন বন্ধু-বান্ধবকে ডেকে খাওয়ায়। গতবার ফাল্গুন মাসে বীথিকা ভবানীপুর থেকে তাদের ম্যারেজ এ্যানিভারসারিতে

নিমন্ত্রণ করেছিল। বিকাশ যায়নি, কিন্তু নন্দা না গিয়ে পারেনি। কবিতার বই আর রজনীগন্ধায় টাকা আড়াই খরচ করেছিল। বীথিকা খাইয়েছিল খুব। পোলাও মুরগির মাংস দই মিষ্টি। অত না খাওয়াতে পারলেও বীথি আর পরেশবাবুকে একবার না বললে কি ভাল দেখায়? আর কিছু না হোক বন্ধুকে ডেকে যদি ডাল ভাত মাছের ঝোল খাওয়ানো যায় তাতেও শান্তি।

কিন্তু এমন স্বামীর হাতেই পড়েছে নন্দা — যার মনে কবিত্ব কল্পনা বলে কোন পদার্থ নেই। তার কেবল হিসাব আর হিসাব। মার্চেন্ট অফিসের একাউন্টস ডিপার্টমেন্টে আর যেন কেউ দুনিয়ায় কাজ করে না। তারা কি সবাই হিসাবের খাতাটা মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে আসে?

প্রীতিভোজের প্রস্তাবে বিকাশ বলে, 'খেতে বললে শুধু তো আর পরেশবাবু আর স্ত্রীকে বললেই চলে না? আরও দু'চারজনকে বলতে হয়। সে এক বিয়ের খরচ। তোমার বাবা কি দ্বিতীয়বার সে খরচ বইতে রাজী হবেন?'

নন্দা রাগ করে বলে, দায় পড়েছে আমার বাবার। দরকার নেই তোমার কিচ্ছু করে, ফের যদি আমি এসব নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলি তাহলে আমার ফিরিয়ে নাম রেখ।'

কিন্তু নতুন নামে ডাকবার সুযোগ স্বামীকে নিজেই করে দেয় নন্দা। পরদিনই আবার নতুন প্ল্যান করে। ছেলে মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে স্বামীর মশারির মধ্যে এসে বসে, 'আচ্ছা যাক, দরকার নেই এবার আর কাউকে বলে। আসছে বছর বলব। এবার আমরা দুজনে ফটো তুলব, সিনেমা দেখব। সকাল বেলাটা বিচ্ছু আর বিবলুকে কোন জায়গা থেকে বেড়িয়ে আনব। তারপর দোতলার মাসিমার কাছে ওদের রেখে আমরা কোথাও বেরিয়ে পড়ব। দু'জনে এক সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ফুল কিনব, কী বল?'

বিকাশ বলে,'আচ্ছা।'

নন্দা বলে, 'তারপর রাত্রে ফিরে এসে কী করব বল দেখি।' বিকাশ বলে, 'খাওয়া দাওয়াটা সেদিন বেশ ভালো হবে আশা করি। ভুরি ভোজের পর সহজেই ঘুম পাবে। দশটা বাজতে না বাজতেই দুজনেরই নাক ডাকতে

থাকবে। বিয়ের দিন একটা সানাই বেজেছিল, এ্যানিভারসারির দিন দুটো সানাই বাজবে।'

নন্দা বলে, 'দেখ ফের যদি ওসব কথা বল, আমি তোমার মুখ দেখব না। সেদিন রাত জেগে জেগে আমরা আমাদের সেই পুরনো চিঠিগুলি পড়ব। তখন কী সুন্দর সুন্দর চিঠিই না তুমি লিখতে। বারবার পড়লেও তা যেন আর ফুরোতে চাইত না। মাঝে মাঝে আবার কবিতা থাকত। কিছু রবীন্দ্রনাথের, কিছু নিজের। তখনকার দিনের তোমার অনেক চিঠিই আমি যত্ন করে তুলে রেখেছি। আমার লেখা জবাবগুলির একটাও তোমার বাক্স সুটকেসে কোথাও খুঁজে পাইনি। আমার চিঠি তুমি রাখবে কেন। আমি তো আর ভাল লিখতে পারিনে। যারা পারত-তোমার সেই বান্ধবীদের চিঠি কিন্তু এখনও দু'চারখানা আছে।'

বিকাশ বলে,'কী যে বল, আমার বান্ধবী টান্ধবী কেউ নেই। গৃহিণী বলতেও তুমি, সচিব বলতেও তুমি, সখি বলতেও তুমি।'

কথাটা একেবারে অসত্য নয়, ছেলেমেয়ে হয়ে যাওয়ার পর স্ত্রীজাতিরা অন্য কারও মুখ দেখা একেবারে বন্ধ না করলেও মন দেয়ানেয়ার পালা পুরোপুরিই শেষ করে ফেলেছে বিকাশ। বিশ্বাসহন্তার খড়্গ নন্দার ওপর যে পড়েনি সে জন্যে কৃতজ্ঞ। তার পরিচিত অনেককে এ দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে।

বাদ প্রতিবাদের মধ্যে না গিয়ে নন্দা বলে, 'আমরা তাহলে রাত জেগে চিঠিগুলি পড়ব, কী বল।'

বিকাশ আর আপত্তি করে না। বিয়ের দশ বছর পরে দুটি ছেলের মা হওয়া সত্ত্বেও নন্দা যে এতখানি রোমান্টিক থেকে গেছে সে কথা জেনে বিকাশের বরং আনন্দই হয়, বিস্ময়ও নিতান্ত কম হয় না। মনের এতখানি সজীবতা ও রাখতে পারল কী করে? নিশ্চই সচ্ছল অবস্থার বান্ধবীদের কাছে সব গল্প শুনেছে, কি সৌখিন সমাজ নিয়ে লেখা নবেল টবেল পড়ে হাতের কাছে অন্য কোন পুরুষকে না পেয়ে বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে স্বামীর সঙ্গেই আর একবার প্রেমে পড়বার, কি পড়িপড়ি ভাব করবার সাধ হয়েছে নন্দার। যাই হোক এ

সাধ এবার আর বিকাশ আর অপূর্ণ রাখবে না। পরিকল্পনা যে মঞ্জুর তা নন্দাকে সে জানিয়ে দিল।

ভোরবেলার চায়ের আসরেও এসব আলাপ আলোচনা হয়। ষোলই জ্যৈষ্ঠের আর বেশি দেরি নেই। আগে থেকেই তৈরি হতে হবে। নন্দা স্বামীকে অনুরোধ করে লাইফ-ইনসিওরেন্সের কোয়ার্টারলি প্রিমিয়ামটা যেন এ মাসে না দেয় বিকাশ। সামনের মাসে না হয় কিছু ফাইন দিয়েই তা দেওয়া যাবে।

বিকাশ বলে,'আচ্ছা আচ্ছা সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। ষোলই জ্যৈষ্ঠের অনুষ্ঠান ঠিক মতোই হবে।'

বিচ্ছু আর বিবলু গম্ভীর হঁয়ে বাপমার আলোচনা শোনে।

আট বছরের ছেলে বিচ্ছু বলে, 'মা, ষোলই জ্যৈষ্ঠ কার জন্মদিন? তোমার?'

নন্দা বলে, 'দূর বোকা।'

'বাবার?'

নন্দা হেসে বলে, 'দূর তা নয়।'

বিচ্ছুর ছোট বোন ছ'বছরের বিবলু বলে, 'দাদাটা বোকা। কিচ্ছু জানে না।'

বিকাশ হেসে বলে, 'তুই জানিস?'

বিবলু বলে, 'জানি। বিয়ের জন্মদিন। তোমাদের বিয়ের।'

বিকাশ হেসে উঠে স্ত্রীকে বলে, 'দেখেছ নন্দা — তোমার মেয়ে এখনই কি রকম সেয়ানা হয়েছে দেখেছ? ওকে যদি আট বছরে গৌরী দান না করতে পারি নবম বছর থেকে পাড়ার ছোকরাদের ও মাথা খেতে শুরু করবে তোমাকে বলে রাখলাম।'

কলের কাছে কাজ করে নন্দার ঠিকে ঝি সুখলতা। বয়স পয়ঁত্রিশ ছত্রিশ। হাতে শাঁখা, সিঁথিতে সিঁদুর। কপালের সীমন্ত পর্যন্ত ঘোমটা টানা থাকলেও সে কর্তা গিন্নি দুজনের সঙ্গেই কথা বলে। হাসি তামাসায় যোগ দেয়। বিকাশ আর নন্দা দুজনেই ওকে প্রশ্রয় দিয়েছে। কাজ করতে এসে সুখলতা চা খায়, দু চারটে সুখদুঃখের কথার বিনিময়ও যে না হয় তা নয়। সুখলতা বাসন মাজে,

বাটনা বাটে, কয়লা ভাঙে, উনুনে আঁচ দিয়ে দেয়। মাসে আট টাকা করে নেয়। বাইরের কাজ করলেও বিকাশ আর নন্দার ঘরের খবর সে রাখে। কত টাকা মাইনের চাকরি করে বিকাশ, ক'টাকার কাঁচা বাজার করে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোন দিন কোন ব্যাপার নিয়ে মনোমালিন্য হয় তা পর্যন্ত সে আন্দাজ করে।

বিকাশের কথা শুনে সেদিন বাসন মাজতে মাজতে সুখলতা বলল,'ষোলই জ্যৈষ্ঠ খুব ভাল দিন না দাদাবাবু?'

বিকাশ বলল,'কেন বল তো? ভাল দিন নিশ্চয়ই। ক্যালেণ্ডারের লাল তারিখ না হলে কি হবে, আমাদের পক্ষে রাঙা শুক্কুরবার।'

সুখলতা বিকাশের কথার ব্যঞ্জনা সবখানি বুঝতে না পারলেও হাসল, 'আমাদের বস্তির চক্কোত্তি মশাইও তাই বললেন। তিনটে লগ্ন আছে ওইদিন। তারার বিয়ে ওইদিনই ঠিক করে ফেললাম বউদি।'

তারা সুখলতার বড় মেয়ে। পনের ষোল বছর বয়স হয়েছে। মাথায় এক গোছ কোঁকড়ানো চুল। রঙটা ফর্সা। মুখখানা একটি পানের মতো। কথাবার্তা তত বলে না। কিন্তু ভাববঙ্গি দেখলে বোঝা যায় মার মতই বুদ্ধিসুদ্ধি রাখে।

এর আগে তারাকে মাঝে মাঝে সঙ্গে নিয়ে এসেছে সুখলতা। মেয়েকে দিয়ে নন্দার পান সাজিয়েছে, কি ময়দা মাখতে বসিয়েছে। তার বদলে চেয়েছে পুরনো শাড়ি ব্লাউজ। সময় সময় না চাইতেও দিয়েছে নন্দা। আহা বেচারা। না দিলে পাবে কোথায়?

নন্দা সুখলতার কথার জবাবে বলল, 'একেবারে ষোলই জ্যৈষ্ঠই ঠিক করে ফেললে? আমাদের কাছে একবার জিজ্ঞাসাও করলে না?

বিকাশ পরিহাসের সুরে বলল, 'কেন ভালই তো হয়েছে নন্দা। আমাদের ফাংশানটা না হয় সুখলতার বাড়ি গিয়েই করা যাবে। তোমার মেয়ের বিয়েতে আমাদের নিমন্ত্রণ করবে তো সুখলতা?'

সুখলতা বলল, 'কী যে বলেন দাদাবাবু। আপনারাই তো মেয়ের বিয়ে দেবেন। আপনারা না দিলে আমার কি সাধ্য আছে ঐ মেয়েকে নামানো? আমারও

সাধ্য নেই, তারার বাপেরও সাধ্য নেই। বুড়ো নিত্যরোগা ঘর-ধরা হাঁপানির রোগী। আজ পাঁচ বছরের মধ্যে একটি পয়সা উপায় করেনি। সব আমাকে দেখতে হচ্ছে। আপনারা না দিলে আমি কোথায় পাব দাদাবাবু।'

বিকাশ কিছু বলবার আগে নন্দা বলে উঠল,'তাইতো তোমাকে বলছিলাম সুখলতা। আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই মেয়ের বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেললে, এদিকে ওইদিন যে আমাদের একটা বাড়তি খরচ আছে।'

সুখলতা বলল, 'তা জানি বউদি। সেই বাড়তি খরচের মধ্যে দয়া করে একটু হাত ঝাড়বেন তাহালেই আমার হয়ে যাবে। পুরুত ঠাকুর বললেন দিনটা খুব ভাল। এদিকে পাত্রপক্ষেরও বেশ গরজ। মেয়ে খুব পছন্দ হয়ে গেছে। তাই আর দেরি করলাম না বউদি;'

সুখলতার মেয়ের বিয়ে আর নন্দার বিবাহবার্ষিকীর দিন একই সঙ্গে এগিয়ে আসতে লাগল। তোড়জোড় কোন পক্ষেরই কম নয়। নন্দা মনে মনে ঠিক করল, এদিনের সব খরচটা স্বামীর ঘাড়ে ফেলবে না। কাগজ বিক্রী করা টাকা যা সঞ্চয় করেছে তা তো নন্দার নিজেরই সম্পত্তি। তা এই উপলক্ষে ব্যয় করবে। গোপনে গোপনে আরও পাঁচ সাত টাকা যা জমিয়েছে তাও এই দিনের কল্যাণে ভাঙলে দোষ নেই।

কিন্তু সুখলতা ভারী অবুঝ মেয়েমানুষ। তার দাবিদাওয়ার যেন আর শেষ নেই। সে বাটনা বাটতে বাটতে এক মুখ হেসে বলল, 'বউদি', তারাকে কী দেবেন বলুন।'

নন্দা চুপ করে রইল।

সুখলতা বলল, 'তারাকে কিন্তু একখানা জিনিস দিতে হবে। হাতের হোক কানের হোক একখানা জিনিস আপনারা দেবেন। সারাজীবন আপনাদের দয়া মনে করে রাখব বৌদি।'

নন্দা বলল, 'অসম্ভব। এমাসে আমি কিছুই খরচ করতে পারব না তা তোমাকে আগেই বলে দিয়েছি। এ মাসে আমার নিজেরই খরচের সীমা নেই।'

সুখলতা তখন বলতে আরম্ভ করল, 'ঘোষালরা কিন্তু কানের দুল দিয়েছে

বউদি।'

নন্দা বিরক্ত হয়ে বলল, 'তা দিক গিয়ে। যার যা সাধ্য সে তাই দেবে। আমার নেই কোত্থেকে দেব।'

শুধু ঘোষালরা নয়, দত্তরা, মুখুয্যেরা, চৌধুরীরা সবাই দামি দামি জিনিস দিয়েছে কি দিতে চেয়েছে সুখলতাকে। কেউ চুড়ি, কেউ দুল, কেউ সিল্কের শাড়ি, কেউ বা বাসন-কোসন। এদের কোন কোন বাড়িতে নতুন কাজ নিয়েছে সুখলতা। কোন বাড়িতে কাজ খুবই সামান্য। শুধু স্বামী স্ত্রীর দুখানা বাসন মেজে দেওয়া, তা সত্ত্বেও সুখলতার কন্যাদায়ে তারা যথেষ্ট সাহায্য করছেন। নন্দারা পুরনো মনিব হয়ে যদি এমন বিমুখ হয় তাহলে সুখলতার মতো গরিবরা দাঁড়ায় কোথায়।

কিন্তু নন্দা কিছুতেই বেশি প্রতিশ্রুতি দিল না। সে বলল, 'পুরনো শাড়ি ব্লাউজ তুমি কম নাওনি আমার কাছ থেকে। তারপর ধার বলেই হোক, আর বকশিস বলেই হোক — ফি বছরে বিশ পঁচিশ টাকা করে বেশি নিচ্ছ। তোমার মেয়ের বিয়েতে আলতা আর তেল সাবানের খরচ বাবদ পাঁচটা টাকা আমি ধরে দিতে পারি, তার বেশি এ মাসে কিছুতেই দিতে পারব না।'

সুখলতা বলল, তাহলে আপনি ধানদূর্বা দিয়েই তারাকে আশীর্বাদ করবেন বউদি। আর কিছু আপনার কাছে চাইব না।'

স্পর্ধা দেখ ঝি চাকরের! নন্দা ভাবল তখনই ওকে বিদায় করে দেয়। কিন্তু ঠিকে ঝি সুলভ নয়। তাই মনের রাগ মনেই চেপে রাখতে হল।

বিকাশ স্ত্রীকে আড়ালে ডেকে বলল,'এক কাজ করো না। ভাঙাচোরা সোনা যদি কোথাও থাকে ওকে বের করে দাও, যা হোক কিছু একটা তৈরি করিয়ে নেবে।'

নন্দা বলল, 'থাকলে তো দেব। বিয়ের পর কত গয়না-গাঁটি তুমি আমাকে গড়িয়ে দিয়েছ। জানা আছে মুরোদ। বলে একখানা শাড়ি কিনে দিতে বললে প্রাণ ফেটে যায়।'

বিকাশ আর কথা না বাড়িয়ে অফিসে চলে গেল।

সুখলতা অবশ্য ধানদূর্বার ভরসায় রইল না। নন্দার কাছ থেকে পাঁচ টাকাই হাত পেতে নিল। বিকাশ নিজের পকেট খরচ থেকে গুনে আরও পাঁচ টাকা দিল সুখলতাকে। কিন্তু তাতেও কি ওর মন ওঠে? মুখে কিন্তু খুবই ভদ্রতা করলো সুখলতা। মিষ্টি হেসে বলল, 'যাবেন কিন্তু দাদাবাবু। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একবার গিয়ে পায়ের ধুলো দিয়ে আসবেন বউদি। আশীর্বাদ করে আসবেন তারাকে। দেশে থাকলে আরও কত আমোদ-আহ্লাদ ব্যয়ভূষণ করে বিয়ে দিতাম বউদি। কিন্তু সে কপাল তো ওর নয়।'

নন্দা বলল, 'যাক গিয়ে জামাইটি তো ভালই পেয়েছ।'

সুখলতা বলল, 'হ্যাঁ বউদি, আপনাদের আশীর্বাদে ছেলেটি ভাল, বেলেঘাটায় নিজেরই সেলুন আছে। দু-তিনজন লোক তাতে খাটে। ভাল অবস্থা। মেয়েটাকে দেখেশুনে পছন্দ করেছে তাই। নইলে ও সম্বন্ধ কি আমরা করতে পারি?'

নন্দা ভাবল বিয়ের দিন একবার গিয়ে আশীর্বাদ করে আসবে। অত করে বলছে যখন। পাড়ার মধ্যেই ওদের বস্তি। তাদের সিমলাইপাড়া লেন থেকে মাত্র মিনিট কয়েকের পথ।

তবু যাই যাই করে যাওয়া হল না। সময়ই করে উঠতে পারল না নন্দা। সকাল থেকেই কাজ। কাল রাত্রে গিয়ে দোতলার মাসিমা মেসোমশাইকে খেতে বলে এসেছে। এই প্রৌঢ় দম্পতি তাদের দেখাশোনা করেন, খোঁজখবর নেন, ছেলেমেয়ে দু'টিকে ওদের কাছে রেখে নন্দা কোনদিন মার্কেটিং-এ যায়, কোনদিন বা সিনেমায়। পুরনো বান্ধবীদেব সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাতের ইচ্ছা হয় কোন কোন সময়। কোন একটা উপলক্ষে ওদের না বললে কি চলে?'

আর দুজন বাইরের লোককে খেতে বললেই তার জন্যে আলাদা বাজার করতে হয়, রান্না-বান্নার একটু বিশেষ ব্যবস্থা না করলে ভাল দেখায় না। ওদের আবার বেলায় খাওয়ার অভ্যাস। সব কাজ সারতে সারতে দুটো আড়াইটে বেজে গেল।

এদিকে বিচ্ছু আর বিবলু ভারি দুষ্টু হয়েছে। তারা বলে বেড়াচ্ছে, 'জানিস, আজ আমাদের বাবা মার বিয়ে।'

মাসিমা বলছেন, 'তাই নাকি বিচ্ছু? সম্প্রদান করবে তুমি বুঝি? তুমি তোমার মায়ের বাবা — না বাবার বাবা?'

বিচ্ছুও কম চালাক নয়, সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিচ্ছে, 'আমি মারও বাবা, বাবারও বাবা। আমাকে মাও বাবা বলে, বাবাও বাবা বলে।'

কী দুষ্টুই হয়েছে ছেলে!

বেলা গেলেও এইটুকু ভেবে নন্দার তৃপ্তি যে এমন দিনে অন্তত একটি সুখী দম্পতিকে এই উপলক্ষে আপ্যায়ন করে আজ তঁদের আশীর্বাদ নিতে পেরেছে। বাপ-মা দূরে থাকেন। তাঁদর তো বলতে পারল না। কিন্তু তাঁদের বয়সী দুজনকে বলল।

অনেক বলা-কওয়ার পর বিকাশ সত্যিই সেদিন অফিস থেকে ছুটি নিয়েছে। বাজার করেছে, ছেলে-দুটিকে নিয়ে প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে এসেছে। ওদের টফি আর চকোলেট কিনে দিয়েছে। সবই নন্দার বুদ্ধি, তারই পরামর্শ। বিকেলে বাপ-মাকে একসঙ্গে বেরোতে দেখে ওদের যাতে হিংসা না হয় সেই জন্যেই এই সব ব্যবস্থা।

তবু গোলমাল যেটুকু হবার তা হলই। নন্দাকে সেজে-গুজে বিকাশের সঙ্গে বোরোতে দেখে বিচ্ছু আর বিবলু দুজনেই বায়না ধরল তারাও যাবে।

বিকাশ পরিহাস করে বলল, 'ক্ষতি কি, ওরা বরযাত্রী হিসেবে আসুক না সঙ্গে।'

নন্দা বলল,'তোমার কেবল ঠাট্টা। ব্যাপারটাকে তুমি মোটেই সিরিয়াসলি নিচ্ছ না'।

ভুলিয়ে টুলিয়ে বিচ্ছু ও বিবলুকে মাসিমার কাছেই গছিয়ে রেখে গেল নন্দা। আজ তার ওদের নিয়ে বেরোবার মোটেই ইচ্ছা নেই। আজ কয়েক ঘণ্টার জন্যে সে শুধু প্রিয়া। জননীও নয়, গৃহিণীও নয়। কিন্তু বেশি দূর বেড়ানো হল না। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, বিকাশের দৌড় শ্যামবাজার। নড়তে চড়তে তার ভাল লাগে না। ছুটির দিনে আয়েস করে শুয়ে বসে ঘুমিয়েই সে তৃপ্তি পায়। আলস্যের চেয়ে সংসারে বড় উপভোগ্য তার কাছে যেন আর

কিছু নেই।

তবু অনেক আশ্চর্য কাণ্ড করল বিকাশ। রেস্টুরেন্টের পর্দা ঢাকা কেবিনে বসে স্ত্রীকে নিয়ে চা আর ফাউল কাটলেট খেল। ছোট একটা স্টুডিওতে ঢুকে যুগল ফটো তুলল — যাতে বিকাশের চিরদিনের আপত্তি। নাইটশোয়ের সিনেমার টিকিট কিনল দ'খানা। কাপড়ের দোকানে ঢুকে পঁয়ত্রিশ টাকা দামের সিল্কের শাড়ি কিনে বসল। অবাক কাণ্ড।

নন্দা লজ্জিত হয়ে বলল, 'এ কী করলে বল তো। শাড়ির জন্যে আঠেরো টাকার বেশি বরাদ্দ ছিল না।'

বিকাশ বলল, 'বরাদ্দ কথাটা বড় বেশি গদ্য ঘেঁসা। আধুনিক কবিতাতেও ওর ব্যবহার নেই। শাড়িটা তোমার পছন্দ হয়েছে কিনা তাই বল। পাড় জমিন — '

নন্দা খুশি হয়ে বলল, 'দুইই চমৎকার! আমার পছন্দের চেয়ে ঢের বেশি ভাল। কিন্তু খরচে কুলোবে কি করে। এত টাকা পেলেই বা কোথায়?'

বিকাশ 'বলল, সেজন্যে ভেবো না। কারও তবিল তছরুপ করিনি, সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

নন্দা বলল, 'কিন্তু আমি তো তোমাকে কিছু দিলাম না।'

বিকাশ আবৃত্তির সুরে বলল, 'গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়। তোমরা তো নেওয়ার ভিতর দিয়েই দাও।'

তবু চার আনা দিয়ে একটি বেল ফুলের মালা কিনে নিল নন্দা। তারপর ওরা বাড়ি ফিরল। ছেলেমেয়েদের খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে মাসিমাকে পাহারায় রেখে ওরা নটার শোয়ে সিনেমা দেখতে যাবে। টিকিট তো কাটাই আছে। দশ বারো মিনিট দেরি হলেও কিছু এসে যাবে না।

বাসায় পৌঁছে নিজের শোবার ঘরে এসে মালা গাছটি স্বামীর গলায় পরিয়ে দিতে যাচ্ছিল নন্দা, বিকাশ বাধা দিয়ে বলল, 'এখন না পরে। আজ তো একই সঙ্গে বিয়ে বাসি বিয়ে আর ফুলশয্যা। ফিরে এসে ধীরে সুস্থে সব সারব। এবার ছেলেমেয়েদের ভোজনপর্বটা আগে সেরে ফেল।

তাই সারল নন্দা। খাওয়াবার পর ওদের ঘুমোবার ব্যবস্থা করল। মাসিমাকে আর একবার অনুরোধ করল ওদের দিকে চোখ রাখতে। তারপর সিনেমায় যাওয়ার জন্যে নতুন শাড়িটি পড়তে যাচ্ছে দরজার কড়া নড়ে উঠল।

'কে?'

'আমি মনোমোহন।'

সুখলতার সেই বুড়ো স্বামী হাঁপানির রোগী মনোমোহন হাঁপাতে হাঁপাতে এসেছে।

এর আগেও দু একবার টাকা চাইতে, কি স্ত্রীর কাজ কামাইয়ের কৈফিয়ৎ দিতে এ বাড়ীতে এসেছে মনোমোহন। বিকাশ ওকে চেনে। কুঁজো, কুদর্শন চেহারা। একবার দেখলে আর ভোলা যায় না।

বিকাশ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে বলল,'কী ব্যাপার। তোমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে?'

'না বাবু।'

'কেন বর আসেনি?'

মনোমোহন সব খুলে বলল। বর এসেছে। তবু সমস্যা মেটেনি। কারণ বিভ্রাট বর নিয়ে নয়, শাড়ি নিয়ে। লাল রঙের যে দামি শাড়িখানা সুখলতার পিসতুতো ভাই অমূল্যধনের দেওয়ার কথা তার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। সে পালিয়েছে। এই রাত্রে চেতলা থেকে তাকে আর খুঁজে আনা সম্ভব নয়। এদিকে দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। বাড়তি টাকাই বা কোথায়। ভাল শাড়ির অভাবে বিয়েই বন্ধ হতে বসেছে।'

বিকাশ বলল, 'নতুন লালপেড়ে যেকোন একটা শাড়ি পরিয়ে বিয়ে দিয়ে দাও।'

মনোমোহন কাতরভাবে বলল, 'তা দেওয়ার উপায় নেই বাবু। বরের কাকা বড় সেয়ানা। সে ঘটিবাটি শুদ্দু সব জিনিস মিলিয়ে নিচ্ছে। একচুল এদিক ওদিক হলেও ভাইপোর বিয়ে দেবে না। আমার জান যাবে বাবু। একখানা নতুন কাপড় আমাকে দিতেই হবে।'

বিকাশ ফিরে এল ঘরে। স্ত্রীর কাছে এসে বলল, 'কী ব্যবস্থাকরা যায় বল দেখি। শুনেছ তো সবই।'

নন্দা বলল, 'শুনেছি। কিন্তু এক বর্ণও বিশ্বাস করিনি। সুখলতা জানে আজ আমার শাড়ি আসবে। তাই ছলেবলে সেখানা আদায় করে নিতে এসেছে। ওরা ঠগ-জোচ্চোর বদমাস। আমি ওদের কথা একবিন্দুও বিশ্বাস করি না।'

বিকাশ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'ছিঃ নন্দা। মানুষকে অত ছোট ভেব না। তাতে নিজেই ছোট হয়ে যাবে। শাড়ির অভাবে একটি গরিবের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, আর তুমি বুড়ো বয়সে জমকালো শাড়ি পরে সোহাগ করছ, আর ওদের গালাগাল দিচ্ছ, মজা মন্দ নয়।'

নন্দা চিৎকার করে উঠল, 'চুপ, চুপ কর। তোমার দরদ যে কী জন্যে তা আর আমার টের পেতে বাকি নেই। আমি বুড়ি? তুমি তো চিরযৌবনের দখলী স্বত্ব নিয়ে এসেছ, যাও তাই ভোগ কর গিয়ে। আমার কাছে আর তোমায় আসতে হবে না।'

স্বামীর পাশ কাটিয়ে হাত এড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল নন্দা। তারপর মনোমোহনের হাতে নতুন কেনা সিল্কের শাড়িখানি নিঃশব্দে তুলে দিল। বিস্মিত মনোমোহন কী যেন বলতে যাচ্ছিল। নন্দা তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'যাও এক্ষুনি চলে যাও। আর কথা নয়।'

প্রায় শেষ রাত অবধি ঝগড়াঝাটি কান্নাকাটি পালা চলল। নন্দা বারবার বলতে লাগল, বিকাশের মতো স্বামীর হাতে পড়ে জীবনে একদিনের জন্যেও সে সুখী হয়নি। চিরকাল তার দুঃখে দুঃখে গেল। যতদিন যত রকমের দুর্ব্যবহার তার সঙ্গে করেছে বিকাশ, নন্দা তার ফিরিস্তি দিতে লাগল।

বিকাশ বিদ্রূপ করে বলল,'তোমার যেমন স্মৃতিশক্তি তেমনি কল্পনাশক্তি।'

শেষরাত্রে প্রায় ভোর ভোর সময় স্ত্রীর ঘুমন্ত বিষণ্ণ মুখখানির দিকে চেয়ে বিকাশের বড় মায়া হল। ভিজে চোখদুটিতে চুম্বন করল। ঠোঁট দুটি ভিজিয়ে দিল চুম্বনে চুম্বনে।

নন্দা চমকে জেগে উঠল। তারপর গভীর অভিমানে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও। আমি ছোট, আমি

হীন, আমি তোমার যোগ্য নই।'

কিন্তু বিকাশ কিছুতেই স্ত্রীকে ছেড়ে দিল না। জোর করে ধরে রাখল। তারপর এ ধরনের দাম্পত্য কলহের যা ফল হয় সেই বাঞ্ছিত পরিণতি হল। মিল হয়ে গেল দুজনের।

নন্দা স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ গুজে বলল, 'একটা কথা বলব, বল রাখবে?'

বিকাশ বলল, 'বল!'

নন্দা বলল, 'কাউকে যেন বল না, আমি শাড়িখানা ওদের রাগ করে দিয়েছি।'

বিকাশ স্ত্রীকে আরও টেনে নিয়ে অতি অনায়াসে একটি মধুর মিথ্যা উচ্চারণ করল, 'বাঃ রাগ করে দিতে যাবে কেন? তুমি ইচ্ছা করে দিয়েছ। নাহলে কি আর দিতে?'

অসমাপ্ত স্বামী-স্ত্রী সংলাপ

বাণী রায়

তুমি ভাবছো ঐজন্যেই আমি তোমার কাছে এসেছি। তুমি খালি ঐরকম ভাবো।

ঐরকম ভাবায় দোষ কী?

আমি যখন একেবারে বুড়ি হয়ে যাব- এখনই হয়ে গেছি- তখন কী হবে? তখন আমার দিকে তুমি ফিরেও তাকাবে না।

এখন তোমার দিকে আগের চেয়েও বেশি তাকাই। তাই না?

তার কারণ আগে তোমার প্রেমাস্পদাদের ধ্যান করতে, অন্য কিছু ভাববার সময় ছিল না।

প্রত্যেক স্ত্রীই ভাবেন তাঁর স্বামী এক — একটা নাগর।

মিথ্যে কথা বোলো না। ঐ একটা জিনিস বাদে আমি সব কিছু সহ্য করতে পারি।

বিয়ের পনেরো বছর পরেও জবাবদিহি করতে হবে?

জবাবদিহি নয়। সত্যিই তুমি আর একবার প্রেম করো। তুমি আজকাল বড্ড বুড়িয়ে যাচ্ছো। আর পাঁচটা লোকের মতো। তুমি ভাই বুড়িয়ে গেলে চলবে না।

মানুষের বয়স বাড়লেই বুড়ো হয়।

তোমাকে আজ রাত্তিরে ঘুমোতে দেব না। সেই বিয়ের পর থেকে বলে আসছি, একদিন আমরা দুজনে সারারাত জাগব। কিন্তু একদিনও পারিনি। তোমার জন্যে। তুমি খালি নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে।

এখন তো নাক ডাকি না।

সেটা আবার এক মুশকিল। তোমার নাক ডাকার শব্দটা যখন আমার অভ্যেস হয়ে গেল তখন তুমি তা ছেড়ে দিলে। এখন তুমি এমন চুপচাপ শুয়ে রাত কাটিয়ে দাও যে ভালো লাগে না।

আচ্ছা, আমি আবার প্রেমে পড়লে সহ্য করতে পারবে?

তুমি যেন 'করছো না। আমি সব খবর রাখি!

বিনু বলেছে বুঝি?

এইতো ধরা পড়ে গেলে!

আমি তো ধরা দিতেই চাই।

সেদিন ঝিরঝিরে বষ্টিতে বিনু আর তুমি এক ছাতার নিচে ফিরছিলে, ঠিক ছবির মতো লাগছিল।

সিগারেটের বিজ্ঞাপনের মতো?

খুব মানিয়েছিল।

দ্যাখো, তোমাকে বলতে কোনো আপত্তি নেই, কারণ তুমিও জানো। কিছু খুচরো চুমু, কিছু খুচরো জড়াজড়ি বিনুর সঙ্গে যে করিনি তা নয়।

আমি জানি। কিন্তু আমি তো তা ধরছি না, আমি বলছি মানে সত্যিকারের প্রেম, যাতে তুমি যাকে বলে মেতে উঠবে, যেমন একবার উঠেছিলে।

সত্যি কথা তোমার ভালো লাগে, না? তাহলে কেন এরকম বলছো?

আমি জানি, যদি আমি সেইরকম মেতে উঠি, তুমি তাহলে সেখান থেকে পালিয়ে যাবে না। তুমি নখ দিয়ে সেই মেয়েটির গাল ছিঁড়ে দেবে। আর তা যদি না দাও তাহলে বুঝবো তুমি আমাকে ভালবাস না।

তুমি একটা জন্তু ভাবো।

এই দ্যাখো! এইজন্যে আমি এসব প্রসঙ্গ আলোচনা করতে চাই না। মিথ্যে কথার জাল বুনতে ভীষণ আলসেমি লাগে। মানুষের মনের ভাবটা যদি সে পরিষ্কার ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকাশ করে তাহলেই সে জন্তু হয়ে যাবে? তাহলে আমি জন্তুকে ভালবাসি, মানুষের চেয়ে।

সেইজন্যেই লোকে বলে তুমি প্রেমের গল্প লিখতে পারো না, খালি রাজনীতির গল্প লেখো।

কাল সকালে বাজার আছে।

আমি হয়তো বাজে কতা বললাম। তুমি তো এককালে সাংঘাতিক প্রেমের উপন্যাস লিখেছিলে। এখন কেন লেখো না। আমার খালি এই বক্তব্য। আগে যা বলেছি, সেটা ঠিক বলতে পারিনি।

ইস্ বারোটা দশ! দশ বছর আগেও ভাবতাম ঘড়িকে হাড়িয়ে দিচ্ছি, আর এখন মনে হয় সময় বেরিয়ে যাচ্ছে।

তুমি আসল কথাটার জবাব দিচ্ছো না।

কোনটা আসল কোনটা নকল জানি না যে।

ভূমিকা কোরো না।

মাধব বলে যে ছোকরাটা আমাদের বাড়ি আসতো — মনে আছে তো — সে এক মাড়োয়াড়ির বাড়ির ড্রাইভারি করত। বদলির চাকরি — তিনমাসের জন্যে। আমার ভীষণ সাধ যায় এইসব মাড়োয়ারি পুরুষসিংহের ছবি আঁকি।

তোমার সব উদ্ভট সাধ যায়। সেইজন্যে তোমার বই জনপ্রিয় হয় না।

জনপ্রিয়তার কথা আলাদা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার বলেছিলেন, ওঁর তিনশো পাঠক আছে।

তোমার কতো?

আমার বোধহয় তিরিশ।

এইসব কথা আর বাইরে বোলো না। যা বই বিক্রি হচ্ছে তাও যাবে। তাছাড়া তোমার ধারণাটা একেবারে বাজে। তোমার বইয়ের যথেষ্ট দাম আছে।

প্রত্যেক লেখকের স্ত্রীই ভাবেন তাঁর স্বামী এক একটি উইলিয়ম শেক্সপিয়র।

আবার ভণিতা! তুমি আজকাল কিরকম হয়েছো, নিজের খোলস ছেড়ে কিছুতেই বেরিয়ে আসবে না। এইরকম আজেবাজে কথার খোলস না পরলে কি ভালো লেখক হওয়া যায় না?

নিজেকে তো বাঁচাতে হবে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লোকটা মরে গেল কেন? কেউ বলে বেশি মদ খেত বলে, কেউ বলে কমিউনিস্ট হয়ে গেল বলে। আমার মনে হল, লোকটা নিজেকে বাঁচাবার সামান্য চেষ্টা করলো না বলে। নিজেকে না বাঁচালে জগৎকে বাঁচানো যায় না। বাঁচতে হবে নিজের টার্মসে, নিজের কষ্টে তৈরি করা জগৎটা বছরের পর বছবের চেষ্টায় আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দিতে হবে সব জায়গায়। সেইজন্যে মনের কথাটা লালন করতে হবে অগ্নিশিখার মতো।

অনেকদিন পর তুমি কথা বলছো।

আমাকে কথা বলিও না, কাজ করতে দাও। তুমি তো জানো, আশেপাশের অনেক ব্রিলিয়ান্ট লোক কথার মারফত জীবনটা ফুঁকে দিয়েছে।

সেই ড্রাইভারের কথা কি বলছিলে?

হ্যাঁ, যে বাড়িতে কাজ করত, বোধহয় গতবছর, সেই তিনমাসে চিনির ওপর প্রফিট করে চোদ্দতলা বাড়ি হাঁকিয়েছে ক্যামাক্ স্ট্রিটে। এই বিশাল বিক্রম আমাকে টানে। এটাকে শুধু ঠাট্টার পর্যায়ে আমি ভাবতে পারি না। ভারতবর্ষের এই নতুন ধনিক সম্প্রদায়ের জয়যাত্রা উপন্যাসের দারুণ সাবজেক্ট।

কেন বলছো?

তার কারণ তার পেছনে প্রেমের মতো রাজনীতির মতো একটা ট্রিমেন্ডাস প্যাশন আছে। সবকিছু ওলটপালট করে দেবার মতো এনার্জি আছে। আর যা ওলটপালট করে না দেয় তা আমার সাবজেক্ট নয়। পাঠক বোধহয় সেইরকম কিছু চায় না।

এইটা তোমার একেবারে ভুল ধারণা। অথবা এটা তোমার কথার খোলস। তুমি এই চিনির ক্রোড়পতিদের নিয়ে লেখো না কেন?

তাদের জানি না বলে। তাদের কেবল আউটলাইনেই জানি, কিংবা যাকে বলে সাংবাদিকভাবে জানি। কিন্তু তাদের প্যাশনের আগাগোড়া কিছুই জানি না।

তোমাকে যে তোমার এক পাঠক বলেছিল তোমার অনেক চরিত্র খুব জোরালো, কিন্তু তুমি যে প্রেমের উপন্যাসটা লিখেছো তার নায়িকা একটা কীর্তি। আমিও তাই বলি।

ভুল বলো। ওরকম কোনো কীর্তি হয় না। লেখক হাতড়ে হাতড়ে তার জগৎ তৈরি করে, তার কোথাও খানিকটা আলো বেশি, কোথাও আঁধার বেশি। কিন্তু এই সবটা নিয়েই তার জগৎ। তার জগৎ শুধু একটা-দুটো মাস্টারপিস রচনার জন্যে নয়।

কিন্তু কি করে তুমি একটা জায়গায় এত আলো ঢাললে?

তুমি ঠিক প্রেস কনফারেন্সে যেরকম প্রশ্ন করা হয় তেমনি প্রশ্ন করছো। আমার কাছে প্রেমের ব্যাপারটা চমৎকার নাটকীয় সিচ্যুয়েশন নয়, চোখা ডায়ালগ নয়। তার একমাত্র মাপকাঠি তা কি আমাদের জীবনকে ওলোটপালোট করে দেয়? এ উপন্যাসটা লিখতে লিখতে আমার তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু প্রেমের মতো আমার দেশও তো আমাকে ওলোটপালট করে। এই যে কিছু তরুণ তাদের সর্বস্ব ফুঁকে দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় গুলি খেয়ে মারা গেল তাদের প্যাশান আমাকে নাড়ায়, আমার হাতে কলম তুলে দেয়। আমি সাহিত্যের পাঠক হিসেবে এমনি কিছু আশা করি।

এ দুটো একেবারে আলাদা জগৎ বলে তোমার কখনও মনে হয় না- এই তোমার প্রেমের জগৎ আর দেশের জগৎ?

ওটা একেবারে ভুল কথা। দেশাত্মবোধক গান কিংবা প্রেমের গান, এইরকমভাবে রিয়ালিটি হয়ে আমার কাছে আসে না। রিয়ালিটি আসে একেবারে একাকার হয়ে। এবং তা একাকার হয়ে আসে বলেই তা এত টানে।

আচ্ছা তুমি যে সেই প্রেমের উপন্যাস লিখলে যাকে নিয়ে তার কথা আর মনে হয় না? এটা অবশ্য ঠিক সাহিত্যের প্রশ্ন নয় কিন্তু এ-কথাটা তোমার সম্পর্কে আমাকে ভাবায়। এই যে এত উঁচুতে উড়ে যাওয়া আবার ভুলে যাওয়া, আমার কাছে কিরকম লাগে।

যা যায় তা পেছনে তাকায় না, মাউন্ট এভারেস্ট থাকলেও তাকায় না। — আজ আর ঘুমোতে দেবে না। একটা সিগারেট খাই।

মঞ্জরীর বেহায়াপনা

আশা দেবী

সেদিন মহিলা-সমিতিতে সমিতির কাজ বড় বেশী দূর অগ্রসর হইতেছিল না। কারণ সেদিকে বড় কাহারও মনোযোগ ছিল না। মেয়েরা যে কথাটা লইয়া এতক্ষণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা ও অশেষবিধ মন্তব্য করিতেছিলেন, তাহা সমিতির আয়ব্যয়ের হিসাবও নয়, বন্যাপীড়িতদের জন্য সাহায্য, চরকা স্কুলের জন্য দান বা দুঃস্থ বিধবাদের মাসোহারার বন্দোবস্তও নয়। তাঁহাদের আজিকার আলোচনার বিষয় মঞ্জরীর বেহায়াপনা। সম্পাদিকার সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাঠ অনেকক্ষণ হইয়া গেছে। গুটি তিন চার ছোট ছোট মেয়ে অর্গ্যানের কাছে দাঁড়াইয়া "জনগণমনঅধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা" গানটি গাহিতেছে। কিন্তু গানের দিকে কাহারও মনোযোগ নাই। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। চাকরে ল্যাম্প জ্বালাইয়া টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। অন্য দিন সন্ধ্যা লাগিতে না লাগিতে সমিতির মেয়েরা বাড়ি ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। আজ সেদিকেও বিশেষ কাহারও লক্ষ্য নাই। তাঁহাদের এত ঔৎসুক্যময় আলোচনার কারণটা যাহা ঘটিয়াছিল, সে কথাটা খুলিয়া বলিতে গেলে, তাহার পূর্ব-ইতিহাসও কিছু বলিতে হয়।

এখানকার দেওয়ানি কোর্টের বড় উকিল সুরসুন্দর, স্ত্রী বাঁচিয়া থাকিতে বরাবর উগ্র রকম সাহেবিভাবাপন্ন ছিলেন। এই লইয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত কত

দিন হইয়াছে কত মনোমালিন্য, কত রাগারাগি। স্ত্রী ছিলেন খাঁটি পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে। অবশেষে রফা হইয়াছিল। তিনি থাকিতেন আপন অন্তঃপুরে আপন নিয়ম আচারের গণ্ডীর মধ্যে। আর সুরসুন্দর বর্হিবাটিতে তাঁহার নিজস্ব বন্ধুবান্ধবমণ্ডলী থানা পার্টি ইত্যাদি লইয়া। কিন্তু অকস্মাৎ সেই শুদ্ধান্তঃপুরিকা শুচিবায়ুগ্রস্তা স্ত্রী যখন ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতে ডবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়া সাত দিনের মধ্যে মারা গেলেন, তখন সকলেই আশা করিয়াছিল সুরসুন্দরের অতি-আধুনিক চালচলনের নৌকাখানায় অন্দর হইতে এতদিন যেটুকু বাধা-বাঁধনের নোঙর ছিল, এইবারে সেটুকু নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। এখন তাঁর স্বাধীনতার আর অদি অন্ত থাকিবে না।

কিন্তু এই সুনিশ্চিত সম্ভাবনার পরিবর্তে সকলে অবাক হইয়া দেখিল, অন্তরের কোন নিগূঢ় প্রতিক্রিয়াবশত সুরসুন্দরের সাহেবি ধরণ-ধারণের সমস্তই বদলাইয়া আসিতেছে। ঠিক যাহা আশা করা গিয়াছিল, তাহার উলটা দাঁড়াইয়াছে। সুরসুন্দব এখন প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করেন, শিখা রাখিয়াছেন। আতপ চাউলের অন্ন এবং নিরামিষ আহার করেন। সন্তানের মধ্যে তাহার দুইটি মাত্র মেয়ে। বড় মেয়ের মা বাঁচিয়া থাকিতেই বিবাহ দিয়াছিলেন কলিকাতার এক বিলাত ফেরত ব্যারিস্টারের সহিত। যে অবিবাহিতা বারো বছরের মেয়েটি এখন বাড়িতে আছে তাহার নাম মঞ্জরী।

সুরসুন্দর মঞ্জরীকে আরও কাছে টানিয়া লইলেন। নিজের সহিত আচারে বিচারে, আতপ চালের অন্ন গ্রহণে মেয়েকে করিতে চাহিলেন সাথী। কিন্তু গোল বাধাইল মঞ্জরী।

মা বাঁচিয়া থাকিতে সে মায়ের দিক ঘেঁষিত না,-বাবার কাছেই মানুয হইয়াছে। তাহার সেই পূর্বতন কালের বাবা তাহাকে নিজে ইংরাজি শিখাইয়াছেন, গান শিখিতে উৎসাহ দিয়াছেন। বারো বছরেও বেণী দুলাইয়া, ফ্রক পরিয়া সে স্কুলে গিয়াছে। আজই হঠাৎ তাহার বাবা তাহাকে স্কুল ছাড়াইয়া লইতে চান। হালফ্যাশানের ফ্রকের বদলে আসিয়াছে শাড়ি এবং মাসিকপত্র ও গল্পের বইয়ের পরিবর্তে শ্রীমদ্ভগবতা ও চণ্ডীর বাংলা অনুবাদ বাড়িতে আসিতেছে।

মঞ্জরী বিদ্রোহ করিল। বেণী দুলাইয়া কহিল, বাঃ রে, আমি বুঝি এখন থেকেই স্কুলে নাম কাটাব। এই সেদিনও হেড মিস্ট্রেস আমাকে বলছিলেন, মঞ্জরী তোমার যেমন বুদ্ধি, ম্যাট্রিকে স্কলারসিপ তুমি নিশ্চয়ই পাবে। সে তো এখনও তিন বছর, বাঃ রে, এরই মধ্যে বুঝি ... না না ... নাম আমি কিছুতেই কাটাব না ...''

সুরসুন্দর স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, ''মঞ্জরি! আমার শোয়ার ঘরে তোমার মায়ের বড় অয়েল পেন্টিং আছে, সেইখানে খানিকক্ষণ চুপ করে বসো গে। আপনি মন স্থির হবে।''

মঞ্জরী শয়নঘরে যাইবার পরিবর্তে ড্রেসিং আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া মাথায় পরিপাটি করিয়া ফিতা বাঁধিয়া স্কুলের বাসে চড়িল। কিন্তু ক্রমশ এত শাসন বাঁধনের মধ্যে থাকা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল। তাহার বড় দিদি কলিকাতা হইতে একদিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। কেবল চিঠিতে নিমন্ত্রণ নয়, দিন কয়েক পরে জামাইবাবু নিজে তাহাকে লইতে আসিলেন।

বাবার পুরোপুরি সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই মঞ্জরী তাহার জামাইবাবুর সহিত কলিকাতাগামী এক্সপ্রেসের একখানা সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে উঠিয়া পড়িল।

ইহার পর হইতে সুরসুন্দর তাঁহার শূন্য গৃহে কোর্টে যাওয়া, মক্কেলের কাগজপত্র দেখা এবং জপ তপ আহ্নিক লইয়া নিমগ্ন রহিলেন।

মঞ্জরী কলিকাতার ডায়োসেসন্ স্কুলে ভর্ত্তি হইল। তাহার পরে সে ম্যাট্রিক পাশ করিল, আই-এ পড়িতে শুরু করিল। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে একবারও দিদির বাড়ি ছাড়িয়া বাবার কাছে গেল না। দিদিরও ছিল না ছেলেপুলে। তিনি তাহার গৃহসংসারের কেন্দ্রটিতে মঞ্জরীকে প্রতিষ্ঠা করিলেন। মঞ্জরীর কৌতুক কলহাস্যে, তাহার দ্রুতধাবনে, তাহার সঙ্গীতে সে বাড়ি মুখরিত হইয়া থাকিত।

এত দিন অবধি একরকম কাটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মঞ্জরীর বয়স যখন সতের বৎসর, দিদি ও জামাইবাবুর সহিত শিমুলতলায় বেড়াইতে গিয়া একদিন প্রভাতবেলায় একজনের সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনি বাড়িওয়ালা নরেশ

বাবু। বাড়িওয়ালা বলিতেই যে চিত্র চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, নরেশের সহিত তাহার কোনখানে মিল নাই। তাহার বয়স বছর ছাব্বিশ সাতাশ। পায়ে কটকি কাজ-করা শুঁড়তোলা নাগরা জুতা, গায়ে আলোয়ান এবং চোখে চশমা। সে বাড়ি ভাড়ার জন্য তাগাদা করিতে আসে নাই, আসিয়াছিল মঞ্জরীর জামাইবাবু সীতেশবাবুদের কোন প্রকার অসুবিধা হইতেছে কি না, জানিতে। হাতে তাহার ছিল একটি গোলাপ ফুলের তোড়া। শিমুলতলায় নরেশবাবুদের যত বাড়ি আছে সে সমস্তই গোলাপ বাগানের সংলগ্ন।

দেখা করিতে আসিয়া সবচেয়ে প্রথমে দেখা হইয়া গেল যাহার সঙ্গে; — নরেশ অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল এত দীর্ঘ দিন রাত্রি তাহাকে না দেখিয়া কাটিয়াছে কেমন করিয়া।

মঞ্জরী বাগানে বেড়াইতেছিল, বারান্দার সিঁড়িতে এক পা এবং ঘাসের উপর এক পা রাখিয়া প্রশ্ন করিল, "কাকে খুঁজচেন? ... জামাইবাবু? ও, তিনি বুঝি এখনও ঘুম ভেঙ্গে ওঠেন নি। ততক্ষণ আপনি আমাদের ব'সবার ঘরটায় একটু ব'সতে পারেন।"

নরেশ নির্ব্বিবাদে আসিয়া ব'সিল। হাতের তোড়াটা টেবিলের উপর রাখিল।

মঞ্জরী বলিল, "চমৎকার ফুল!"

তা, যত বড় এবং যত উচ্চ প্রেমের কাহিনীই হো'ক, প্রথম আলাপে কি কথা হইয়াছিল, তাহার পর্যালোচনা করিতে গেলে ইহার চেয়ে বেশী পুঁজিও বুঝি আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কিন্তু প্রথম আলাপের বাঁধুনি যত সামান্য কথা দিয়াই হোক, তাহা ক্রমশ দ্রুতগতিতে এমন স্থানে আসিয়া পৌঁছিল যে, দু'জনেই অবাক হইয়া নিঃশব্দে নিজের অন্তস্থলের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, এ কে? ইহাকে কিছুদিন আগে তো চিনিতামও না। ইহারই মধ্যে এমন করিয়া এ জীবনের সহিত জড়াইয়া গেল কি করিয়া!

শিমুলতলার নির্জন পার্বত্য প্রকৃতি, বনময় আবেষ্টন, ফাল্গুনের ঈষদুষ্ণ বাতাস, আকাশের ঘন নীল — এ সমস্তই একযোগে মঞ্জরী ও নরেশের চিত্তকে

পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া তুলিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন নরেশ বেড়াইতে বাহির হইয়া মঞ্জরীর জামাইবাবুর কাছে একটা কথা পাড়িল।

বাড়ী ফিরিয়া সীতেশ স্ত্রীকে কথাটা বলিল।

মঞ্জরীর দিদি উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, 'বেশ তো, ভালোই তো। নরেশের মতো এমন পাত্র সহজে চোখে পড়ে না। সে যদি নিজে থেকে মঞ্জরীকে বিয়ে করার প্রস্তাব করে থাকে, সে তো ভাগ্যের কথা। বড়লোক, মাথার উপর তেমন অভিভাবকও কেউ নেই ...... ' কিন্তু অতিমাত্রায় উৎসাহিত হইয়া উঠিতে উঠিতে, হঠাৎ কি ভাবিয়া একটু চিন্তান্বিতা হইয়া মঞ্জরীর দিদি কহিলেন, "কিন্তু নরেশরা মৈত্র নয়? বারেন্দ্র শ্রেণী। আমরা তো রাঢ়ী। এ বিয়েতে বাবার মত হ'লে হয়।"

সীতেশ একটু গম্ভীর হইয়া কহিল, "অমন বিয়ে আজকাল হামেশাই হচ্ছে। এই তো আমার বন্ধুদের মধ্যে —"

বাধা দিয়া তাহার স্ত্রী বলিলেন, "সে তো আমিও জানি। আমার বাবাও এককালে এই ধরণের বিবাহের পক্ষ নিয়ে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করেছিলেন, কাগজে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কিন্তু আজকালকার ধরন-ধারন তো জান।"

সীতেশ বলিল, "তোমার বাবা যদি অত সেকেলে, তাহলে মঞ্জরীকে আমাদের কাছে এনে রেখে এমনভাবে মানুষ করা আমাদের অন্যায় হয়েচে। তোমার বাবার আপত্তির ফলে নরেশের সঙ্গে যদি ওর বিয়ে না হয়, আর সে অসুখী হয় তবে —"

মঞ্জরীর দিদি মাথা নাড়িয়া, কর্ণভূষা দোলাইয়া কহিলেন, — "ইস তাই হতে দিলে তো!"

কার্যকালে ঠিক তাহাই হইল। মঞ্জরীর পিতা কিছুতেই রাজি হইতে চাইলেন না প্রথমটায়। সীতেশের কলিকাতার বাড়িতেই বিবাহের সমস্ত উদ্‌যোগ আয়োজন হইতে লাগিল।

মঞ্জরী আনন্দ এবং বিষাদের মধ্যবর্তী অবস্থায় দুলিতে লাগিল। আনন্দ

যে জন্য তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আর ক্ষণে ক্ষণে বিষণ্ণ হইয়া যাইতে লাগিল এই মনে করিয়া যে তাহার মা নাই, বাবা আছেন কিন্তু তাহার জীবনের সর্বপ্রধান শুভদিনে তিনিও তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন।

কিন্তু বেশীক্ষণ মন ভার করিয়া বসিয়া থাকিবার যো ছিল না। দিদি তাহাকে টানিয়া তুলিয়া ট্যাক্সিতে পুরিয়া নিউমার্কেট, চাঁদনি এমনতরো হাজারটা দোকানে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছিলেন।

সেদিনও সন্ধ্যার সময় এমনি সমস্তদিনব্যাপী ঘোরাঘুরি ও পরিশ্রমের পর মঞ্জরী শ্রান্ত হইয়া তাহার বসিবার ঘরে আসিয়া বসিয়াছে, মাথার উপর পাখা ঘুরিতেছে, এমন সময় নীচের গাড়িবারান্দায় একটা পরিচিত স্বর শোনা গেল।

মঞ্জরী চমকিয়া উঠিল।

এ যে তাহার বাবার গলার আওয়াজ। হয় তো ভুল হইয়াছে মনে করিয়া সে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া নীচে নামিবার উপক্রম করিল। কিন্তু পরক্ষণেই সুরসুন্দর ঘবে ঢুকিলেন। মঞ্জরী অনেকদিন তাঁহাকে দেখে নাই। এখন চাহিয়া দেখিল তাঁহার মুখে বেদনার ছায়া। তাঁহার পাযের কাছে প্রণতা মঞ্জরীকে তিনি যখন ধরিয়া তুলিলেন, তখন তাঁহার চোখে জলের আভাস।

দুয়ারটা ভেজাইয়া দিয়া সুরসুন্দর বলিলেন,"হ্যাঁ বোসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

দু'জনেই কিছুকাল নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। তাহার পর সুরসুন্দর বলিলেন, "আমার উপর রাগ করেছ মা? কিন্তু আমার কথা সমস্ত না শুনে আমার উপর রাগ করতে পাবে না তা বলে দিচ্চি। তোমার মা মারা যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বুঝতে পারিনি তাঁকে কত ভালবাসতুম। যখন বুঝতে পারলুম, তখন বোঝাটা একতরফাই হো'ল। আর কাউকে বোঝাতে পারছি না। তিনি তখন সমস্ত বোঝা না বোঝার বাইরে চলে গেছেন। কিন্তু আমার কেমন মনে হো'ল আমার জীবনে সমস্ত খুঁটিনাটি তিনি যেন দূর থেকে দেখছেন। এর পর থেকে তাঁর অপ্রিয় কাজ কিছুতেই করতে পারতুম না। বন্ধুরা অনেক ঠাট্টা

করেছে আমার জপ তপ আহ্নিকের কৃচ্ছ্র সাধনা দেখে। আত্মীয়েরা করেছে বিদ্রূপ, পরিচিত অনেক বলেচে, খামাখেয়ালী। খুব যে ভালো লাগত তা'ও নয়। কিন্তু কে যেন আমাকে দিয়ে জোর করে করিয়ে নিত।'

মঞ্জরী মুখ তুলিয়া চাহিল, — এতক্ষণ সে মাথা নীচু করিয়া ছিল। চাহিয়া দেখিল, যে বাবার সহিত সে এতদিন ভালো করিয়া একটাও কথা বলে নাই, — সঙ্কীর্ণ খামখেয়ালী বলিয়া যৎপরোনাস্তি অবজ্ঞা করিয়াছে, — আজ তাঁহারই সজল চক্ষুপ্রান্তে এবং সমস্ত মুখশ্রীতে এমন একটি দীপ্যমান আভা যে, আপনা হতেই মাথা নত হইয়া আসে। .

সুরসুন্দর কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু মা, একটা ভুল আমি বরাবরই করে এসেচি। তোমার মা প্রাণহীন যে আচার-নিয়ম — তাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকতেন, সেইগুলোকে তাঁর জীবিতকালে যারপরনাই ঠাট্টা করে তাঁকে যে বেদনা দিয়েচি, তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে সেই সব আচার নিজে পালন করে মনে করতুম তাঁকে খুব সন্তুষ্ট করা হয়েচে। কিন্তু প্রাণবান স্নেহের ধনগুলিকে তেমন করে মনের সঙ্গে মেনে নিই নি কেন? এই প্রশ্ন আজ ক'দিন ধরেই আমার মনে জাগছে। মঞ্জরী, তুমি যাকে ভালোবেসেচ, তার ঘর আলো করে থাক। আমি কোন বাধা দেব না।"

"বাবা তা'হলে তুমিই আমাকে সম্প্রদান করবে, বলো?"

"আচ্ছা তা'ও করব মা।"

তাহার পরে মঞ্জরীর বিবাহ হইয়া গেলে, স্বামীর সহিত শিমুলতলায় চলিয়া যাইবার আগে তাহাদের দুইজনকে নিজের কাছে লইয়া বসিলেন। অনেক দিন পর নির্জন নিরানন্দ তাঁহার বাড়ি তরুণ-তরুণীর আনন্দ কলোচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিল। বাড়ির মোটরটা এখন ঘন্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে যত্র তত্র ঘুরিতে লাগিল। গম্য স্থান যে কোথায়, সে বিষয়েও কোন ঠিক ঠিকানা রহিল না। এই নিরুদ্দেশ যাত্রার পার্টিতে যে দুইটিমাত্র আরোহী, তাহাদেরও মনের দিশা পাওয়া ভার। স্নানের জল বারংবার ঠাণ্ডা হইয়া যায়, পুরাতন ভৃত্য গোকুল দিদিমণি ও জামাইবাবুর কোন হদিশ পায় না। ধুলি উড়াইয়া ঊনপঞ্চাশ বায়ুর

বেগে কখন যে মোটরখানা গেটের সামনে আসিয়া দাঁড়াইবে, আর কখনই বা দরজাটা খুলিয়া মঞ্জরী সহাস্য মুখে নামিয়া আসিতে আসিতে বলিবে, "তাই তো গোকুল, তুমি সেই থেকে আমাদের জন্যে ব'সে রয়েচ? এ কিন্তু তোমার ভারী অন্যায়!" — গোকুল তাহা আজও ঠাহর করিতে পারে নাই।

কিন্তু সুরসুন্দরের বহুকাল হইতে নির্জন বাড়ি ঠিক যে পরিমাণে আনন্দমুখর হইয়া উঠিল, — সহরের সর্বত্র সেই অনুপাতে একটা নিন্দার গুঞ্জন উঠিল। সুরসুন্দরের বার লাইব্রেরির বন্ধুরা কহিলেন, "তুমি শেষে এমন দুর্বল চিত্ত হলে কেমন করে হে? এককোঁটা একরত্তি মেয়ে, সেই শেষে ভাসিয়ে দিলে তোমার এতদিনের নিষ্ঠা, এতদিনের মতামত, সংকল্প!"

আজ মহিলা-সমিতিতেও সেই গুঞ্জনেরই আভাস শোনা যাইতেছিল। বিশেষ করিয়া সেই দু'জনের নির্লজ্জ যৌবনের বেহিসেবী আনন্দের তরঙ্গ এ কয় দিন ধরিয়া ইঁহারা সর্বত্রই কোনখানে না কোনখানে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কখনও তাহাদেরই কাহারো বাড়ির সুমুখ দিয়া মিনার্ভা কারটা হুস্ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পিছন দিকের আসন শূন্য; আর সামনের দিকের আসনে যে দুইজন বসিয়া আছে, তাহাদের উদ্ভাসিত মুখের ছবিটা ক্ষণকালের জন্য তাহাদের নয়ন মনকে চকিত, উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে।

কখনো কোম্পানির বাগানে, কোনদিন টিলাকুঠিতে, কোনদিন জলের কলে এই দুইটি প্রাণীকে কেহ না কেহ নিত্যই কোন স্থানে না কোন স্থানে দেখিয়াছেন।

সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাবের খাতাটা মুড়িয়া রাখিয়া একটু টিপিয়া হাসিয়া সরমা কহিল, "কাল আমরা মোটরে করে সুলতানগঞ্জের ওদিকে গিয়েছিলুম, সেখানেও একটা টিলার উপর ব'সে সেই দুই মূর্তি।"

সম্পাদিকার বয়স অনেকটা হইয়াছে, — রাশভারী মানুষ! তিনি গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "মঞ্জরীর বাপকে আমরা বরাবর ধীর স্থির বিবেচক বলে জানতুম। তিনি যে হঠাৎ এমন অসামাজিক একটা বিবাহ দেবেন, রাঢ়ী বারেন্দ্র সমাজে একাকার হয়ে চলৎ হয়ে যাবার পক্ষে সাহায্য করবেন, তা কে মনে করেছিল?"

ওপাশ হইতে যোগেশ বাবুর স্ত্রী কল্যাণী কহিলেন, "ঠিক বলেছেন মাসিমা,

এমনটা যে হবে তা কে ভাবতে পেরেছিল? কিন্তু তা'ও বলি, আজকাল ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা আদৌ হচ্ছে না। মা বাপের কথামত আজকাল কে চলে বলুন? ধরুন সুরসুন্দর বাবু সম্মত না হয়েই বা কি করবেন? তা'হলেও কি মঞ্জরী শুনত? যেমন করে হোক জোর করে, পালিয়ে যেয়ে লাভ-ম্যারেজ ও করতই। মাঝখান থেকে হয়ত লোক-জানাজানি গোলমাল হোত। সুরসুন্দর বাবুকে বোধহয় অনেকটা দায়ে পড়েই এমন ধারা করতে হয়েচে।"

"তা বই কি।"

ইত্যাকার নানা আলোচনা এবং মন্তব্যের মাঝে সেদিনকার মত সভা ভাঙ্গিয়া এইবারে একে একে সকলে উঠিলেন।

সম্পাদিকার মোটর গেটের কাছে দাঁড়াইয়া অধীর ভাবে ঘন ঘন হর্ন দিতেছিল। তিনিও গাত্রোত্থান করিলেন।

তাঁহার পুত্র সুবিমল ড্রাইভারের পরিবর্তে সেদিন নিজেই মোটর চালাইয়া আনিয়াছিল। তিনি গাড়িতে উঠিবামাত্র সে কহিল, "মা, সোজা বাড়ি যাব না। রেস কোর্স দিয়ে একটু ঘুরে চল।"

"চল।"

তখন শীতের শুক্ল পক্ষের জ্যোৎস্না শুভ্র উত্তরীয়ের মত পৃথিবীর সর্বত্র একটি সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ আবরণ বিস্তার করিয়াছিল। আকাশের তারা পাণ্ডুর। সুমিত্রা দেবী এইবারে ফার্‌কোটটা গায়ে দিলেন এবং শালের ভাঁজ খুলিয়া পায়ের উপর পর্যন্ত টানিয়া দিলেন।

রেসকোর্সের ছায়াময় পথে আসিয়া গাড়িটা দাঁড়াইল। সুমিত্রা নামিলেন। বিমল মোটর লইয়া চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল।

সুমিত্রা ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্নায় একটা বন পল্লববিশিষ্ট অসত্থ গাছের তলায় আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। অদূরে পাথরের উপর দুইজনে বসিয়া। তাহারা পরস্পরের মাঝে এত আবিষ্ট, এত তন্ময় যে তাহাদের সামনে দিয়া কেহ চলিয়া গেলেও হয়ত তাহারা টের পাইবে না।

মেয়েটির পিছনের দিকের চুল বাঁধিবার ধরন ও কাপড় পরিবার ভ়ি

হইতে তাহাকে মঞ্জরীর মতই মনে হইল। সুমিত্রা তাহাকে অবশ্য অনেকদিন ভালো করিয়া দেখেন নাই। এই সেদিন রায় সাহেবের পার্টিতে মিনিট কয়েকের জন্য একবার দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সে অত্যন্ত অল্পক্ষণের জন্য। তিনি আসিয়া পৌঁছিবার পরেই সে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভালো করিয়া দেখুন বা না দেখুন, সেই অনতিস্ফুট চাঁদের আলোয় যে ছেলেটি ও মেয়েটি পরস্পরের মাঝে এমন নিবিড় অতলস্পর্শী তন্ময়তায় ডুবিয়া ছিল, — সেই দু'জন কে? তাহাদেরই নিন্দার খ্যাতিতে আজিকার সভা অত্যন্ত মুখর হইয়াছিল।

কিন্তু সভা ভাঙ্গিবার পরে এই নির্জন প্রান্তরে জ্যোৎস্না-প্লাবিত প্রকৃতির মাঝে এই নিন্দিত দুইটি নর-নারীর নিকটে দাঁড়াইয়া সুমিত্রার মনের গতি হঠাৎ অন্যদিকে বহিতে লাগিল। সম্পাদিকার উপযুক্ত গাম্ভীর্য এবং বিবেচনা শক্তি তিনি হাতের কাছে খুঁজিয়া পাইলেন না। একটু দূরে সরিয়া আসিয়া একটা গাছের গুড়িতে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইতেই আজ অনেকদিন পরে বিস্মৃত কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

অনেক কাল আগে শীতপাণ্ডুর এমনি এক শুক্ল জ্যোৎস্না রাত্রিতে একজনের কাছে নির্জনে বলিয়াছিলেন, ... "সেই ছোট থেকে নিজের মনের মত করে গড়ে তুলে শেষকালে আমাকে নিলে না।"

তাহার উত্তরে আর একজন বহুক্ষণ নিঃশব্দ থাকিয়া বলিয়াছিল, "এ কথার উত্তর যে কি দেব আমি তা জানিনে সুমিত্রা। কিন্তু আকাশের তারার নীচে আজ এই কথা যে আমাকে বললে, সংসারে আর সমস্ত লোক আর সবই ভুলবে, কিন্তু এ কথা কখনও ভুলতে পারব না।"

"কিন্তু তাতে আমার দুঃখ পড়বে না চাপা।"

— "সুমিত্রা তুমি তো সবই জান। বাবা মার একেবারে মত নেই!"

"— থাক আর বলতে হবে না।" —

বহুদূর অতীতের যবনিকার অন্তরাল ছিন্ন করিয়া কত টুকরো টুকরো কথা, কত স্মৃতি, কত কাহিনী আবার ঠিক সেইদিনের মত করিয়া তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। যেদিনে সুমিত্রা আজিকার মত স্থূলাঙ্গী সৌভাগ্যগর্বিতা বিখ্যাত

ব্যারিস্টার-পত্নী ছিলেন না, যেদিনে তন্বী কিশোরী এমনি প্রথম ফাল্গুনের ঈষৎ শীতজড়িত জ্যোৎস্নাময় সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া বিমনা হইয়া যাইতেন।

কিন্তু বেশীক্ষণ এমন করিয়া স্মৃতির সমুদ্র আমন্থন করিবার সময় হইল না। অদূরে মোটরের তীব্র হেড্‌লাইট্ দেখা দিল। সুবিমল তড়াক করিয়া লাফাইয়া নামিয়া আসিয়া কহিল, "খোলা মাঠে যত খুশি স্পিড্ দাও কিছু পরোয়া নেই। মা চল।"

সুমিত্রা উঠিয়া আসিয়া মোটরে বসিলেন। মোটরের সেই সুখস্পর্শ, আশে-পাশে সিল্কের কুশন, পায়ের নীচে বহুমূল্য কার্পেট, আরাম করিয়া হেলান দিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতেই থাকিতেই সে সমস্ত এলোমেলো চিন্তা সুমিত্রার মন হইতে নিঃশেষে মুছিয়া গেল। বরঞ্চ মনে পড়িয়া গেল আগামি শনিবারে কমিশনারের স্ত্রীকে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হইবে বলিয়া যে সমস্ত অভিনয়, সঙ্গীত, পার্টি ইত্যাদির বন্দোবস্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ করিতে মিসেস রায় ও মিসেস চ্যাটার্জির আজ সন্ধ্যায় তাঁহার ওখানে আসিবার কথা আছে। কে জানে হয়ত তাঁহারা আসিয়া এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আছেন।

তাঁহার অনুমানই ঠিক। মোটর হইতে নামিয়া তিনি দেখিলেন একখানা ব্রুহাম ও আর একখানা মোটর তাঁহার গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে। মিসেস রায় ও চ্যাটার্জি তো আসিয়াইছেন, আর তাঁহারা ছাড়াও তাঁহার স্বামীর জুনিয়রী করেন, মিস্টার মিত্রের স্ত্রী আসিয়াছেন।

ড্রইংরুমে ঢুকিতে ঢুকিতে তিনি তাঁহার বড় বধূকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, "বেয়ারাকে বলে দাও তো বৌমা, কাপ তিন চার চা এখানে দিয়ে যাবে।"

রেসকোর্সের মাঠে দাঁড়াইয়া সুমিত্রা যখন স্মৃতিভারাক্রান্ত চিত্তে অতীতের মাঝে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তাহারই হয় তো ঠিক মিনিট কুড়ি পরে ড্রইংরুমের সোফায় বসিয়া চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে তিনি জুনিয়রের স্ত্রীর কথার উত্তরে বলিতেছিলেন, "ঠিকই বলেচেন, মঞ্জরীর বেহায়াপনা আমাদের মেয়েদের আদর্শ হয়ে না দাঁড়ায়। ওর দৃষ্টান্ত চোখের সুমুখ থেকে যত সরে যায় ততই মঙ্গল। কাল সন্ধ্যের এক্সপ্রেসে ওরা শিমূলতলা যাচ্ছে, ভালোই।"

স্রেফ তেল দিয়ে

অখিল নিয়োগী

তেলের বোতলটা ঠকাস করে মেঝেতে রাখতে গেল পঞ্চানন পাকড়াশি।

গিন্নি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলে, ও কি? তেল না নিয়েই ফিরে এলে যে বড়? আমি এদিকে উনুনে কড়াই চাপিয়ে বসে আছি!

পঞ্চানন পাকড়াশি গোঁফ বেঁকিয়ে বল্লে, ওই কড়াইয়ের আগুনের আঁচে ফেঁসে যাবে, তবু এককোঁটা তেল মিলবে না।

গিন্নির মেজাজ ততক্ষণে সপ্তমে চড়ে গেছে। তাই ফোঁড়ন কাটলে, এই কি তোমার রসিকতা করবার সময় হল? সেই সকাল থেকে আমি শুধু উনুনে কয়লা ঠাসছি। ছেলেরা ওদিকে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে। আর তুমি কিনা এতক্ষণ বাদে খালি বোতল নিয়ে ফিরে এলে?

পঞ্চানন পাকড়াশি ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে উত্তর দিলে, ফিরে এলাম কি আর সাধে? যত সরষের তেলের দোকান ছিল — প্রত্যেক দরজায় গিয়ে জনে জনে খোসামুদ করেছি। বলে, এককোঁটা তেল নেই। আবার এক মোটা দোকানদার খ্যাক্-খ্যাক্ করে হেসে রসিকতা করলে, সরষে নিয়ে আসুন, পিষে তেল তৈরি করে দিচ্ছি! শোনো কথা ব্যাটাদের! না হয় তেলই বিক্রি করিস। তাই বলে এত তেলাতে হবে তোদের। এতক্ষণ ওদের পেছনে না ঘুবে যদি ইলেকট্রিক ট্রেনে চেপে তারকেশ্বরে বাবার দোরে হত্যা দিতেম — তা হলে বাবা তুষ্ট হয়ে নিশ্চয়ই একটিন তেলের বরদান করত!

আসল ব্যাপারটার সূচনা হয় — সেইদিন রোববার খুব সকালবেলা।

পঞ্চানন পাকড়াশির একপাল ছেলেমেয়ে। প্রতিবেশীরা বলে, হাত গুনে শেষ করতে পারবেন না মশাই। পরিসংখ্যানতত্ত্ব অফিসে ছুটতে হবে।

সেই বালখিল্য দলে আজ খুব ভোরেই আনন্দ-কোলাহল জেগে উঠেছিল।

বহুদিন বাদে দেশ থেকে দাদু এসেছেন। সঙ্গে চিঁড়ের মোয়া, নারকেল নাড়ু আর আমসত্ত্বের টিন — দিদিমা পাঠিয়েছেন — নাতি-নাত্নীদের জন্যে।

যাদুকরের ইন্দ্রজালের মতো তা কয়েক মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গেছে!

তারপর নাতিরা দাদুকে বলেছে, দাদু, তুমি দিদিমার হাতের এত সব মজার জিনিস খাওয়ালে, — আমরা এইবার তোমাকে কলকাতার এক আজব চিজ খাওয়াবো। তার স্বাদ তুমি জীবনে ভুলতে পারবে না।

দাদুর মুখে-চোখে তখন কৌতুক। তিনি নাতি-নাতিনীদের শুধোলেন, সে আবার কি খাবার? খুলে বল —

বড় নাতি বল্লে, হুঁ-হুঁ। বাগবাজারের তেলেভাজা! একবার চাখলে — চিতেয় উঠেও লোকে ভুলতে পারে না।

দাদু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, অ্যাঁ। এখন আবাব তোদের বাগবাজারে ছুটতে হবে নাকি?

আর একটা নাতি বুদ্ধি বাতলে দিলে, না-না দাদু, সে সব তোমায় কিছু করতে হবে না। বাজার থেকে টাটকা তাজা বেগুন, পটল আর কুমড়ো নিয়ে এসো, — আর।

ভয় পেয়ে দাদু জিজ্ঞেস করেন, — আর?

নাতি জবাব দেয়, আর, একটিন সরষের তেলের দাম দাও। বাবাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি বাজারে। একটু বাদেই দেখবে — মার ল্যাবরেটরিতে কেমন — বেগুনি, পটলি আর কুম্‌ড়ি ছ্যাঁক্-ছ্যাঁক্ করে বেরিয়ে আসে —।

নাতনি বল্লে. হ্যাঁ দাদু, মুখে দিয়েই মানস-সবোবরে উধাও হয়ে উড়ে যাবে —

সঙ্গে সঙ্গে আর এক নাতি দার্শনিকের মতো মন্তব্য করলে. তখন তুমি নিজেই বলে উঠবে দাদু, — পৃথিবীতে যদি কোথায়ও স্বর্গ থাকে ত — তা — এইখানে — এইখানে — এইখানে!!!

শুনে দাদুর টেকো মাথায় যে কটি পাকা চুল ছিল — তা একেবারে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বল্লে, অ্যাঁ এমন পদার্থ বাগবাজারেরর বেগুনি — পটলি — আর কুম্‌ড়ি? তা হলে ত' আমায় চেখে দেখতে হচ্ছে। নইলে তোর দিদিমার কাছে গিয়ে কি গল্প করবো?

নাতি-নাতনীদের নিয়ে দাদু ওই ভোরেই বাজার ঢুঁড়ে কচি কচি বেগুন-পটল আর কুমড়ো নিয়ে এলেন। আর ঝাঁজওয়ালা সরষের 'তেলের টিন আনতে কড়কড়ে একটা নোট বের করে দিলেন নাতির হাতে।

তার পরবর্তী যে নাটকীয় ঘটনা ঘটল — সে কথা গল্পের গোড়াতেই বিবৃত হয়েছে।

নাতি-নাত্‌নিরা যখন জানতে পারল যে, বাজারে একফোঁটা সরষের তেল মিললো না — তখন ঝাঁঝের অভাবে তাদের লোচনগুলি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল।

নাতি-নাতনিরা আক্ষেপ করে উক্তি করলে, দাদু, তোমাকে আমরা বেগুনি, পট্‌লি আব কুম্‌ড়ি খাওয়াতে পারলাম না, তবে দিদিমার জন্যে চকোলেট পাঠিয়ে দেবো। দাঁত নেই বলে তাঁর কোনো অসুবিধে হবে না। ক্ষুণ্ণ মনে দাদু জবাব দিলেন, তাই দিস তোরা। আমিও হয় ত' খানিকটা ভাগ পাবো। কিন্তু মনে দুঃখ রয়ে গেল — তোর মার ল্যাবরেটরির বেগ্‌নি, পটলি, কুমড়ির স্বোয়াদ না পেয়েই বোধ করি দেশে ফিরতে হল। যা বয়স হয়েছে — আর কি কখনো কলকাতায় ফিরতে পারবো? মনে অতৃপ্ত আশা নিয়েই চলে যেতে হবে। হয়ত আবার এই বাগবাজারের তেলেভাজার জন্যেই নতুন করে জন্ম নিতে হবে।

বড় নাতি সান্ত্বনা দিয়ে বল্লে, তুমি কিচ্ছু ভেবো না দাদু। আমার এক বন্ধুর বোনের শ্বশুরের তেলের কল আছে। আমি সেইখান থেকে ঝাঁঝালো সরষের তেল জোগাড় করে নিয়ে আসবো। আগে থেকেই তোমায় খবর দেওয়া থাকবে। তুমি মায়ের ল্যাবরেটরির হাতে গরম বেগ্‌নি, পটলি, কুম্‌ড়ি খেতে কল্‌কাতায় আস্‌বে! তোমার নাতি-নাতনির দল সব তোমায় স্টেশনে 'রিসিভ' করতে যাবে। চিয়ার আপ দাদু —

বশম্বদবাবু বড় মাতৃ-ভক্ত ব্যক্তি। প্রতিদিন মায়ের পাদোদক পান না করে বাড়ির বাইরে পা বাড়ান না।

মা বিশ্বম্ভরী দেবীও ছেলে বলতে অজ্ঞান। যখন দিনে একবার অন্ন গ্রহণ করবেন — ছেলের জন্যে একটু প্রসাদ না রেখে উঠবেন না। ছেলেও তেমনি। অফিস থেকে ফিরেই সেই মায়ের প্রসাদ মুখে দিয়ে তবে তার অন্য কাজ।

তবে বিশ্বম্ভরী দেবীর কি একটা মানত আছে। তাই তিনি প্রতি হপ্তায় 'শনিবার' করেন।

বাজারে যত রকম আনাজ-তরকারি পাওয়া যায় সব একসঙ্গে আতপ চালের সঙ্গে তুলে দিয়ে মুখ ঢেকে সেদ্ধ করেন। দিনের শেষে তাই নামিয়ে নিয়ে 'এক ঢালা' করেন। এক সঙ্গে সব সেদ্ধ হবে। একবারে ঢেলে নিয়ে-তাই সারা দিনের মতো খাওয়া। এর সঙ্গে শুধু চাই ঝাঁজালো সরষের তেল আর কাঁচা লঙ্কা।

মায়ের পাতের এই 'এক ঢালা' খেতে বশম্বদবাবুও খুব ভালোবাসেন। তাই প্রতি শনিবার অফিস ছুটি হলেই তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে আসেন, — মায়ের পাতের একঢালা খেতে হবে।

বশম্বদবাবুর স্ত্রী বসুন্ধরা দেবী এমনি খুব ঠাণ্ডা মানুষ। সাত চড়ে রা বেরোয় না।

কিন্তু যখন শাশুড়ি বউতে লাগে — তখন কাক-চিল বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে পারে না।

সেই শনিবারের কাহিনী বলি।

বশম্বদবাবু সারা কলকাতা চষে ফেলে — নতুন বাজারের আলু, কলেজ স্ট্রিটের সরেস পটল, মানিকতলার মান কচু, বউবাজারের পেঁপে, শেয়ালদার কুম্‌ড়ো আর চেত্‌লার বড় বেগুন কিনে দিয়ে গেছেন।

সেদিন মা-জননী বিশ্বম্ভরী দেবী 'এক ঢালা' করবেন। বশম্বদবাবু বার বার করে বলে দিয়ে গেছেন, — ন্যাকড়ায় বেঁধে ভাজা মুগের ডালও যেন সেদ্ধ দেওয়া হয়। কেন না এই বস্তুটি মা-ব্যাটার অতি প্রিয় খাদ্য।

ছেলেকে টাকা দিয়ে গেছেন, — সে যেন মানিকতলা থেকে ঘানির খাঁটি সরষের তেল এনে মাকে দেয়। শ্রীমানী মার্কেটের লঙ্কায় খুব ঝাঁজ। সেখান থেকেও ও বস্তুটি সংগ্রহ করতে হবে। সৈন্ধব লবণ ত' ঘরেই আছে।

নিশ্চিন্ত মনে মায়ের পদোদক পান করে বশম্বদবাবু অফিসে চলে গেছেন। মা জননী বিশ্বম্ভরী দেবী ঠাকুর পুজো সমাপন করে একঢালা চাপিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু নাতি আর সরষের তেল নিয়ে ফেরে না। বশম্বদবাবুর স্ত্রী বসুন্ধরা দেবী উদ্বেগের সঙ্গে ঘর-বার করতে থাকেন।

কলকাতার রাস্তায় এতটুকু বিশ্বাস নেই। যে দানবের মতো লরিগুলো ছুটে চলে। ঘরের মানুষগুলো ঘরে ফিরে না এলে প্রাণে শান্তি আসে কি করে!

ওদিকে "এক ঢালা" ও ফুটে উঠেছে।

বিশ্বম্ভরী দেবীও বড় অস্বস্তি বোধ করছেন। সারা দিন খাটা-খাটনি গেছে। বয়েস হয়েছে। উদরের আগুনটাও বোধ করি একটু বেশী জ্বলে উঠেছিল, — এমন সময় ভগ্নদূতের মতো নাতি খালি হাতে ফিরে এলো।

ঠাকুরমাকে ডেকে বল্লে, কোনো দোকানে সরষের তেল পাওয়া গেল না। সারা কলকাতা শহর থেকে তেল উধাও হয়েছে।

বসুন্ধরা দেবী এই খবর শুনে প্রমাদ গন্‌লেন। বল্লেন, তাহলে উপায়? তোর ঠাকুরমার এক ঢালা যে ফুটে গেছে!

নাতি চীৎকার করে জবাব দিলে, ফুটে গেছে তার আমি কি করবো? সারা কলকাতা শহর টহল দিয়ে এলাম। সরষের তেলের পাখা গজিয়েছে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারবো না। আজ আবার মোহনবাগানের খেলা আছে। দেরি হয়ে গেলে জায়গা পাবো না! আমি চল্লাম —

— কিন্তু সরষের তেল?

— চুলোয় যাক সরষের তেল। ভি, আই, পি-দের পায়ে মালিশ করে সরষের তেল ফুরিয়ে গেছে! যা হয় করো তুমি, আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই। ফর্ ফর্ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল নাতি।

আগ্নেয়গিরি বোধকরি এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল। এই বার ধীরে ধীরে তার ঘুম ভাঙছে বলে মনে হল।

বিশ্বম্ভরী দেবী এগিয়ে এলেন — বসুন্ধরা দেবীর কাছে। — বলি হ্যাঁ বৌমা, আমি বুড়ী বিধবা, — সংসারের এক কোণে জঞ্জালের মতো পড়ে আছি, — তা বুঝি আর সইছে না! ঝাঁটার মুখে বাড়ীর বার করে দিলেই হয়।

বসুন্ধরা দেবী লজ্জিত হয়ে বল্লেন, এ সব কথা আপনি কি বলছেন মা? আপনার ছেলে হল বাড়ির কর্তা। আপনি জঞ্জাল হতে যাবেন কোন্ দুঃখে।

বিশ্বম্ভরী দেবী উত্তর দিলেন, জঞ্জালই যদি না হবো তবে বিধবার জন্যে দিনান্তে এক ফোঁটা সরষের তেল জোটে না তোমার সংসারে? এই যে তোমরা মা-ব্যাটায় ইলিশ মাছের মুড়ো দিয়ে কচুঘণ্ট খেলে — আমি তা কিছু বলেছি?

বসুন্ধরা দেবীও এইবার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বল্লেন, আজ শনিবার, আপনি আমাকে আজ মাছ খাওয়ার খোঁটা দিলেন? আপনারা মা-ব্যাটায় যে এক ঢালা খাবেন — সেটাও কি আমার দোষ। আপনার ছেলে আজ মাছ খাবে না। কিন্তু স্বামীর কল্যাণের জন্যেই ত' শনিবার আমাকে মাছ খেতে হয়। না খেলে আপনিই আমাকে কত অকথা কুকথা শোনাবেন।

বিশ্বম্ভরী দেবীও গলা উঁচু করে বলেন, বেশ কথা, ভালো কথা। শনিবার বাড়ীর বৌএর এয়োতি রক্ষার জন্য মাছ মুখে দিতে হয়। কিন্তু এই যে বুড়ি বিধবা সারা দিনে গলায় এক ফোঁটা জল দেয়নি, তার জন্যে কি এতটুকু সরষের তেলও জোটে না? তুমি জানো, — সরষের তেল আর কাঁচা লঙ্কা না হলে ভাত আমার গলায় নামে না; — তবু ছেলের সঙ্গে ষড় করে তুমি সেই সরষের তেল আনালে না! আমি উপোস করে থাকি — এই কি তুমি চাও?

বসুন্ধরা দেবী চুল এলো করে হাত নেড়ে উত্তর দিলেন, আমার বাবার কি সরষের তেলের ঘানি আছে যে, ফরমাস করলেই আমি টিন ভর্তি করে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে আসবো? আর এতই যদি সরষের তেলের সক্‌সকানি-তাহলে একটি কলুর মেয়েকে বৌ করে ঘরে আনলেই পারতেন। আর কোন দুঃখ থাকত না।

বিশম্ভরী দেবী তখন সপ্তমে চড়ে গেছেন। কী? আমরা কলু? তাই কলুর মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবো? তোমার মুখে যা আসে তাই আমায় বলবে? আচ্ছা আজ আসুক বশম্বদ, তোমার সংসারের জলটুকু পর্যন্ত আমি মুখে তুলতে চাইনে! আজই আমায় কাশী পাঠিয়ে দিক। এ পাপ পুরীতে আমি আর থাকতে চাই নে। বিশ্বনাথের চরণে গিয়ে পড়ে থাকবো। তোমরা মা-ছেলেতে খুব করে

মাছ মাংস খাও। আমি উঁকি মেরে দেখতেও আসবো না। যে সরষের তেলের খোঁটা তুমি আমায় দিলে, জেনে রাখো, বিশ্বনাথের রাজত্বে তার অভাব ঘটবে না।

হেডমাস্টার মশাই মাথায় হাত দিয়ে তাঁর খাসকামরায় বসে পড়লেন।

এবার এত ছেলে বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল করল কি করে ? মাস্টার মশাইরা কি সারা বছর ছেলেদের কিচ্ছু পড়ান নি?

এখন স্কুল কমিটির কাছে তিনি কি কৈফিয়ৎ দেবেন? এমনিতেই ত' নানা কারণে স্কুলের আয় কমে গেছে। ছেলেরা সময় মত মাইনে দেবেনা। বেসরকারী স্কুল। চাঁদার উপব চলে। অধিকাংশ অভিভাবক চাঁদা দেবার নামও করেন না। স্কুলবোর্ড থেকে যে সাহায্য পাওয়া যায় — পরীক্ষার এই ফল দেখলে তাও বন্ধ হয়ে যাবে!

এখন উপায়!

অনেক উচ্চ-আদর্শের কথা ভেবে তিনি এই শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে পা বাড়িয়েছিলেন।

শ্বশুরমশাই নামকরা ব্যবসায়ী। তিনি বহুবার জামাইকে তাঁর সঙ্গে ব্যবসা করতে বলেছিলেন। কিন্তু আদর্শ-চ্যুত হবার ভয়ে হেডমাস্টার মশাই সম্মত হননি। এখন যে শিক্ষিতসমাজে মুখ দেখাবার যো রইল না।

গৃহিণী প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠে খোঁটা দেন যে, বারো বছর মাস্টারী করে বুদ্ধি সুদ্ধি যা কিছু ছিল সব গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিতে হবে। এখনো নাকি সময় আছে, এখনো তার বাবাকে হাতে-পায়ে ধরলে তিনি তাঁর ব্যবসার মধ্যে ঢুকিয়ে নেবেন!

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

হেডমাষ্টার মশাই নিজের পথে অচল-অটল আছেন। তাঁকে সেখান থেকে একচুলও নড়ানো যাবে না।

যাই হোক এইবার বুঝি হেডমাস্টার মশায়ের আদর্শের খুঁটি একটুখানি নড়ে উঠল।

ইস্কুলে একজন ছোকরা আছে — সে প্রতি ক্লাসের পর ঘণ্টা বাজায়। এই ছেলেটিকে তিনিই চাকরি দিয়েছিলেন। বেশ বুদ্ধিমান, বিশ্বাসী আর চটপটে। নামও তার চটপটি।

অনেক ভেবে-চিন্তে হেডমাস্টার মশাই চটপটিকে ডেকে পাঠালেন।

চটপটি স্কুলে হেড্‌মাষ্টার মশায়ের গুপ্তচরের কাজ করে। শিক্ষক মশাইরা তাঁর অবর্তমানে কি জাতীয় মন্তব্য করেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোথায় কি জাতীয় গলদ ঢুকেছে সব খবর চটপটি তাকে গিয়ে জানায়। এই জন্যেই চটপটিকে তাঁর সময়মতো হাতের কাছে চাই।

হেডমাস্টার মশাইয়ের খাস-কামরায় তখন আর কেউ উপস্থিত নেই।

চটপটি এসে প্রণাম করে কাছে দাঁড়ালো। হেডমাস্টার মশাই জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে ক্লাস ঠিক মত চলছে ত?

চটপটি মাথা নেড়ে জবাব দিলে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

— তবে এত ছেলে এ বছর ফেল করলে কেন? কেউ কি পড়াশোনা করেনি? সারা বছর ফাঁকি দিয়েছে?

চটপটি বিনয়ের অবতার।

উত্তর দিলে, আজ্ঞে ভেতরের রহস্য জানতে আমাকে একদিনের সময় দিতে হবে।

হেডমাস্টার মশাই বল্লেন, আচ্ছা তাই হবে। কাল কিন্তু খাঁটি খবর চাই।

চটপটি কম কথা বলে। মাথা নেড়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরদিন টিফিনের ঘণ্টায় চটপটির আবার ডাক পড়ল। চটপটি ঘরে ঢুকে গরুড় পক্ষীর মতো দুই হাত জড়ো করে মাথা নীচু করে নীরবে হেডমাস্টার মশায়ের সামনে দাঁড়ালো।

— কারণ কিছু জানতে পারলি?

— আজ্ঞে হ্যাঁ, জেনেছি।

— কি কারণ?

— আজ্ঞে কারণ তেল।

- তেল!!!

হেডমাস্টার মশাই যেন আকাশ থেকে পড়লেন। অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চট্‌পটির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

— অ্যাঁ! তেল কিরে?

— আজ্ঞে হ্যাঁ তেল। তেল ছাড়া আর কিছুই নয়।

— তা হলে সেই তেলের ভাঁড়টা খোল। আসল কারণটা বুঝিয়ে দে।

— আজ্ঞে কারণ অতি সোজা। বাজারে এক ফোঁটা সরষের তেল পাওয়া যাচ্ছে না! মাস্টার মশাইরা গিন্নিদের কাছ থেকে কেবলি তাড়া খাচ্ছেন। তাই মরিয়া হয়ে ছেলেদের ডেকে বলেছেন, যারা একটিন করে সরষের তেল নিয়ে আসতে পারবে — তারাই পাশ। নইলে সব ফেল।

হেডমাস্টার মশাই নিজের গৃহিণীর তাগিদের কথা মনে করলেন। নিজের হেঁসেলের খবরও তাঁর অজানা নয়। তাই নির্বাক হয়ে রইলেন। মাস্টার মশাইদের ডেকে আর ছেলেদের ফেল হবার কারণ জিজ্ঞেস করলেন না।

তেলের জন্যেই ইস্কুলটা তা হলে বন্ধ হবে!

সেদিন জোর ফুটবল ম্যাচ।

মোহনবাগানের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের সেমি-ফাইনাল খেলা।

সারা কলকাতা শহরের মানুষ খেলার মাঠে ভেঙে পড়ছে।

টিপি-টিপি করে বৃষ্টি পড়ছে।

তাতে লোকদের ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই।

কখনো সমুদ্রের জল-কল্লোলের মতো তাদের মনোবাসনা উদ্বেল হয়ে উঠছে,-আবার পর মুহূর্তেই নিভে যাওয়া দেশলাই কাঠির মতো হুস করে মিলিয়ে যাচ্ছে! কখনো অতি উল্লাসে ছাতা-জুতো নিক্ষিপ্ত হচ্ছে-উর্ধ্ব নীলাকাশে, -- আবার তার পরক্ষণেই মানুষের সমবেত ক্ষোভের তীব্র দীর্ঘশ্বাস বাতাসে হারিয়ে যাচ্ছে।

বিজয়লক্ষ্মী কার অঙ্ক-শায়িনী হবেন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

সেই বিরাট জন-সমুদ্রে ক্ষণে ক্ষণে উত্তাল তরঙ্গ জাগছে। শেষ মুহূর্তে

একটি পেনাল্টি সটে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল — 'বাঙাল' আর 'ঘটির' বাক্-যুদ্ধ। শেষকালে বাক্য বিনিময় ছেড়ে একেবারে হাতাহাতি। কত রসিকের হাত ভাঙল, কত উদ্যোগীর চরণ যুগল মচকে গেল, কত পেটুকের পেটে অবিরাম ঘুঁষি বর্ষিত হল।

কেনারাম যখন এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কৌশলে পশ্চাদপসরণ করে বাইরে বেরিয়ে এলো, তখন তার পাঞ্জাবির পিঠের অংশটি অপহৃত হয়েছে এবং আর দুটি পায়ের মধ্যে একটি জুতো অবশিষ্ট আছে!

কেনারাম খোঁড়াতে খোঁড়াতে গঙ্গার ধারে চলে গেল। সেখানে বহুক্ষণ শীতল সুরধুনী-সমীরণ সেবন করে সুস্থবোধ করল!

হঠাৎ তাকিয়ে দেখে নীচে গঙ্গার একেবারে কিনারায় জেলেরা একেবারে তাজা রুপোলি ইলিশ মাছ বিক্রি করছে।

'গতরের' সব গ্লানি গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে কেনারাম একজোড়া ইলিশ মাছ কিনে ফেলল, তারপর একটি রিক্সা ভাড়া করে সগৌরবে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল।

বাড়িতে ফিরেই সে সিংহ-গর্জন শুরু করে দিল।

দাদার চীৎকারে বই ফেলে বিনি ছুটে এলো। বল্লে, এমন করে পাড়া মাতিয়ে বিচ্ছিরি আওয়াজ বের করছো কেন দাদা?, পাড়ার লোক অন্য কিছু ভাবতে পারে।

কেনারাম হুঙ্কার দিয়ে বল্লে, হুঁ! বিচ্ছিরি আওয়াজ!

— এই নে একজোড়া ইলিশ! একটা এক্ষুনি ভেজে ফেল, আমরা সবাই মিলে চা দিয়ে খাবো। বাকিটা দিয়ে ইলিশ ভাতে হবে। বিনি তার বেণী দুলিয়ে বল্লে, মোহনবাগান খেলায় জিতেছে বুঝি দাদা? নইলে তুমি হঠাৎ জোড়া ইলিশ কিনে আনো?

কেনারাম এবার আনন্দের আস্ফালন করলে। বল্লে, যা-যা, আর বখামি করতে হবে না। যা বল্লাম, তাড়াতাড়ি তাই করে ফেল। চায়ের জলও চাপিয়ে দে —

বিনি জবাব দিলে, তা না হয় দিচ্ছি। কিন্তু তুমি খোঁড়াচ্ছ কেন দাদা? অতি আনন্দে নাকি?

কেনারাম সে কথার আর কোন জবাব দিলে না, হাত-পা ধুতে বাথরুমের দিকে চলে গেল।

একটু বাদেই বিনি বিচিত্র নাচ নাচতে নাচতে বেরিয়ে এলো। দাদার সামনে গিয়ে দুই হাত উঁচু করে ভগ্নদূতীর মতো বল্লে, ইলিশ মাছ ভাজা হবে না —

— কেন?

— বাড়িতে সরষের তেল একফোঁটা নেই।

— সে কি কথা? এই সে দিন একটিন তেল কিনে দিলাম।

বিনি ওরই ফাঁকে এক পাক ঘুরে নিলে। বল্লে, ঠাকুরমার বাতের ব্যথা বেড়েছে। কবরেজদাদু এসেছিলেন, তিনি বল্লেন, কি একটা কবরেজী তেল তৈরি করে দেবেন রসুন ফুটিয়ে। তাই বাড়ীতে যে সরষের তেল ছিল সব তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন রান্নার জন্যেও এক ফোঁটা তেল নেই। ধীরু খানিক আগে দোকানে গিয়েছিল — ফিরে এসে বল্লে, বাজারে এক ফোঁটা সরষের তেল পাওয়া যাচ্ছে না!

-- তাহলে এখন উপায়?

— চা আর মুড়ি দিচ্ছি খাও —

— হুঁ! মুড়ি খাবো। তুই খা মুখপুড়ি —। আমি ক্লাবে চল্লাম।

পায়ের ব্যথার কথা বেমালুম ভুলে কেনারাম ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

বিনি জোড়া ইলিশ হাতে নিয়ে সেই দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

জামাই ষষ্ঠী এসে গেছে!

তাই গণপতি গোস্বামীর চোখে ঘুম নেই!

কিছুদিন আগেই একমাত্র মেয়ে মাধুরীর বিয়ে দিয়েছেন। মেয়ে-জামাইকে জোড়ে আনবেন, জামাই-ষষ্ঠীতে একটু ঘটা করবেন-কর্তা-গিন্নির বড় সাধ।

কিন্তু সব সাধে বাদ সাধল সরষের তেল। মুখপোড়ারা বাজার থেকে তেল লুকোলো কোথায়? সবই কি মন্ত্রীদের পায়ে মালিশ করতে ফুরিয়ে গেছে?

ভেবে ভেবে গণপতি গোস্বামীর অনিদ্রা রোগ হল। এক পরিচিত বন্ধুর ভেড়ি আছে। তিনি মাছ দেবেন কথা দিয়েছেন। ফলের দোকানের সঙ্গে দীর্ঘকালের আলাপ। তারা ন্যাংড়া আম আর মর্তমান কলা পাঠিয়ে দেবে। বেহালায় এক বন্ধু পাঁঠার ব্যবসা করেন। তিনি জামায়ের জন্য কচি পাঁঠা পাঠিয়ে দেবেন। দৈ-সন্দেশেরও ভাবনা নেই। মানিকতলার এক ময়রা ছেলেবেলায় এক সঙ্গে ইস্কুলে পড়ত। তাকে সব কথা বলা আছে। ছেলেবেলার বন্ধু খাতির করেই বলেছে, তোমার জামাই কি আর আমার জামাই নয়? না হয় তোমার বাড়ি একদিন পাত পেতে খেয়ে আসবো। দৈ মিষ্টির জন্যে তুমি কিছু ভেবোনা। আমি সরেস মাল পাঠিয়ে দেবো।

সব ব্যাপারে নিশ্চিন্ত আছেন গণপতি গোস্বামী। কিন্তু ওই সরষের তেলই তার চোখে সরষে ফুল ফুটিয়েছে!

গণপতি গোস্বামী ভেবে ভেবে কুল-কিনারা পান না। বাড়ীর কর্তার অনিদ্রা, গিন্নির অরুচি, আর ছেলেমেয়েরা মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে...!

এমন সময় বেনারস থেকে একটি দেশোয়ালী লোক এসে হাজির। তার এক হাতে চিঠি , আর এক হাতে ইয়া বড় একটা টিন!

গণপতি গোস্বামী শুধোলেন, কাঁহাসে আয়া ভাই?

লোকটি জবাব দিলে, চিঠিমে সব কুছ লিখা হায়। আপ পড় লিজিয়ে।

হাত বাড়িয়ে চিঠি নিলেন গণপতি গোস্বামী। আরে! এ যে তার বড় ছেলে নিরঞ্জনের পত্র। ছেলে লিখেছে-বাবা কাগজে দেখলাম, কলকাতা থেকে সরষের তেল কালো বাজারে উধাও হয়ে গেছে। সামনে জামাই ষষ্ঠী। তোমরা নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছ। আমাদের বিরিজলাল তার দোকানের জিনিস-পত্র কেনাকাটা করতে কলকাতায় যাচ্ছে। তার সঙ্গে বড় এক টিন সরষের তেল পাঠালাম। কাশীর তেল খুব ভালো। এখানে ভেজাল দেওয়া হয়না। আশাকরি এই টিনেই তোমাদের জামাই ষষ্ঠীর ব্যাপার নির্বিঘ্নে সমাধা হবে। ততদিনে

বাজারের আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে।

আমি এখানে ভাল আছি। পত্রোত্তরে সকলের কুশল প্রার্থনা করি। টিনের প্রাপ্তি সংবাদ দিও।

ইতি-

প্রণতঃ নিরঞ্জন

কাশীর তেলের টিন পেয়ে বাড়ীর কর্তা-গিন্নির মুখ আবার খুশীতে ঝলমলিয়ে উঠল।

গিন্নি কর্তার কাছে এগিয়ে এসে ফিস্‌ফিস্‌ করে বল্লে, এইবার বাছাদের ভালো করে মাছের কালিয়া কোর্মা খাওয়াতে পারবো। সরষের তেল না হলে কি আর বাঙালির মনোমত রান্না হয়?

গিন্নি একটু চুপ করে থেকে কর্তার পিঠে হাত বুলিয়ে গদগদ কণ্ঠে কইলে, আচ্ছা তোমার মনে আছে, প্রথম যে বছর জামাই ষষ্ঠীতে তুমি আমাদের বাড়ি গিয়েছিলে, মা তোমায় কত মাছের রান্না করে খাইয়েছিল — রুই, ইলিশ, পাবদা, আড়মাছ, শিলং, চিতোল --

কর্তা নিজের টেকো মাথায় একটা চাপড় মেরে বল্লে, সে সব কথা আর মনে দাও কেন গিন্নি? তোমার চেহারাটার জৌলুষই বা তখন কেমন ছিল!

— মরণ আর কি!

বলে গিন্নি সরে গেল।

সেদিন অফিসে যেতেই গণপতি গোস্বামীকে বড়বাবু ডেকে পাঠালেন।

ঘরে ঢুকতেই বড়বাবু গণপতিবাবুর দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বল্লেন, ভাই, তোমরা অফিসের পুরনো মানুষ, আমাকে একটা বিপদ থেকে উদ্ধার করতেই হবে।

বড়বাবুর মুখে এই জাতীয় কথা শুনে গণপতি গোস্বামী হকচকিয়ে গেল!

আঁ! ব্যাপারটা কি? বড়বাবুর বিপদ?

বড়বাবু বল্লেন, শোন গণপতি, হঠাৎ মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। এই জামাই ষষ্ঠীর দিন তারিখ পড়েছে। সর্বব্যবস্থা করে ফেলেছি। একটিন সরষের তেল আমায় জোগাড় করে দিতেই হবে। নইলে আমার মান ইজ্জত যায়!

গণপতি গোস্বামীর চোখে তখন কাশীর সেই বড় টিন সবষের তেল ভেসে উঠল। আবার পরমুহূর্তেই গিন্নির মুখ ভেবে চুপ করে রইল।

বড়বাবু বল্লেন, চুপ করে থেকো না গণপতি। যে করে হোক, ব্যবস্থা করে দিতেই হবে। আমি কথা দিচ্ছি, আসছে মাসে তোমার পঞ্চাশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেবো।

লাফাতে লাফাতে গণপতি গোস্বামী ঘরে ঢুকলেন। গিন্নি বল্লেন, আজ এত খুশি কেন? জামায়ের চিঠি এসেছে বুঝি? কবে ওরা রওনা হচ্ছে?

কর্তা নিজের ছেঁড়া ছাতাটা-টেকো মাথার ওপর একবার ঘুরিয়ে নিয়ে বল্লেন, চুলোয় যাক ওই জামাই ষষ্ঠী, আসছে মাসে আমার পঞ্চাশ টাকা মাইনে বাড়ছে। শিগগির ওই কাশীর তেলের টিনটা বের কর ত! বড়বাবুর আবার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল সামনের জামাই ষষ্ঠীর দিনে! এক্ষুণি আমায় ওই টিনটা নিয়ে ছুটতে হবে বড়বাবুর বাড়ি। ফিরে এসে তোমায় সব বুঝিয়ে বলব'খন।

বৌরানী

রমাপদ চৌধুরী

বৌরানী একা ফিরলেন না।

সঙ্গে এলো দাসদাসী, বাজার সরকার অক্ষয়বাবু, কোলে এক বছরের বাচ্চা মেয়ে বেবি।

তবু আমার কেমন যেন মনে হলো বৌরানী বুঝিবা একাই ফিরলেন। সত্যি, মেয়েদের জীবনে একজনই শুধু একটি পৃথিবী, আর তাকে হারালেই নিঃসঙ্গ একাকীত্ব।

খবরটা শুনে অবধি আশা-ছোঁয়া অবিশ্বাস পুষে রেখেছিলাম: হয়তো টেলিগ্রাফের ভাষাটায় কোনো ভুল রয়ে গেছে, হয়তো দুর্জনের রসিকতা।

এদিকে মা-মণির অসুখ তখন বাড়াবাড়ি, ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব। একশোখানা দশ টাকার নোট বাজার-সরকার অক্ষয়বাবুর হাতে তুলে দিয়েছিলাম গুনে গুনে,

বলেছিলাম, এই ট্রেনেই চলে যাও; তবে আমার বাপু বিশ্বাস হচ্ছে না।

ছোটবাবু নেই... একথা ভাবতেও যেন কেমন লাগে।

ছোটবাবু! সেই এক ফোঁটা রাঙা টুকটুকে ছেলে মা-মণির। কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি। যে-বারে ইস্কুলের পড়া শেষ করে পরীক্ষায় পাশ দিলো ছোটবাবু, সেদিন কি আনন্দ এই বাড়িতে! কর্তা আমাকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন বাজার করতে, ছোটবাবুর জন্যে কি না কিনলেন সেদিন! মা-মণির জন্যে একজোড়া লালপেড়ে কড়িয়াল শাড়ি, আর নিজের জন্যে জরির কাজ করা চটি জুতো একজোড়া। বাড়ি বাড়ি গিয়ে নেমন্তন্ন করে পাঁচ শ' লোক খাওয়ানো হলো।

কলেজে ঢুকলেন ছোটবাবু, একটা পাশও দিলেন। তারপর একদিন শুনলাম, ছোটবাবুর বিয়ে।

সিঁদুরগোলা মাখনের টুলটুলে একখানি মুখ, পরীর মতো রূপযৌবন, লক্ষ্মীঠাকরুনের মতো লাজুক-লাজুক চোখ। বৌরানী এলেন, রোশনচৌকি বসলো, চিৎপুরের দোকান থেকে ফুলশয্যার সাজ এলো হাজার টাকার এক পাই কম নয়। দরিদ্রনারায়ণের সেবা হলো সামনের উঠোনে, এক হাজার কাপড় বিলি করলাম কাঙালিদের।

কর্তা হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন আমাকে, বললেন, ছেলে বৌকে আশীর্বাদ করে যান নায়েব মশাই।

বললাম, আজ্ঞে ছোটবাবু হলেন রাজপুত্তুর, দুদিন বাদে উনিই রাজা হবেন, আমি আজ্ঞে আশীর্বাদ করবো, সে কেমন কথা !

মা-মণি বললেন, ও কথা বলবেন না নায়েব মশাই, ছেলের মতো কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন আপনি।

তারপর ইশারা করতেই ঢিপ করে একটা প্রণাম করলেন ছোটবাবু আর বৌরানী। আর পাশাপাশি গিয়ে যখন বসলো দু-জনে ঠিক যেন হরগৌরী।

মনে মনে বললাম, দীর্ঘজীবী হও, সুখী হও।

কে জানতো আশীর্বাদের একটাও ফলবে না! কে জানতো মাস কয়েকের মধ্যেই কর্তা সব ভার এই বুড়োর ঘাড়ে চাপিয়ে বৈতরণী পার হবেন!

কর্তা সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বৌ পছন্দ হয়েছে তো নায়েব মশাই?

বলেছিলাম, দুধের সরটুকু তুলে এনেছেন হুজুর, পছন্দ হবে না কেমন কথা!

এতোদিন বাদে, বৌরানীর দিকে চোখ পড়তেই, সে কথাটা মনে পড়লো আবার।

দুধের সরই বটে।

দামি দামি রঙিন শাড়িতে সর্বদা ঝকমক ঝকমক করে ঘুরে বেড়াতো যে, নাকে হীরের নাকছাবি, কানে হীরের দুল, আর গায়ে এক-গা সোনা ঝলমল করতো যার, হঠাৎ যেন দুধের সঁরের মতোই সাদা ধবধবে মোটা একখানা থান উঠেছে তার শরীরে।

গাড়ি থেকে নামলেন বৌরানী। বৌরানী তো নয়, যেন শাপগ্রস্ত কোনো অপ্সরী নেমে এলেন স্বর্গ থেকে।

অন্দরমহলে মা-মণি তখন ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন। আর-আর লোকজন কে কি বলবে, কথা না খুঁজে পেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ঘাড় হেঁট করে, শুধু জ্ঞানদা ঝি চোখ মুছছে বার বার।

দুটি ফরসা ধবধবে হাত, একফালি চুড়িও নেই সে হাতে, নাক থেকে নাকছাবি, কানের দুল, গলার হার সব সরে গেছে ইতিমধ্যেই। শুধু একখানা সাদা থান বৌরানীর অপ্সরীর মতো সুন্দর চেহারায়।

বৌরানীর চোখে কিন্তু জল দেখলাম না, মুখে শক্ত সমর্থ ভাব। কোথাও এতটুকু ভেঙে পড়ার চিহ্ন নেই। তবু কারো দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারলেন না। মাথা হেঁট করে সটান অন্দরমহলে ঢুকে গেলেন।

বৌরানীর চোখে কি কান্না নেই? আমরা সবাই একটু বিস্মিত হলাম। বলাকওয়া করলাম আমি আর অক্ষয়বাবু।

বিধবা হলেই কি এমন কঠিন হতে হয়? মা-মণিকেও দেখেছি। কর্তা মারা যাওয়ার পরেও দু-চারমাস পাড়ওয়ালা শাড়ি পরতেন। কিন্তু কাঁদতেন দিনরাত।

আর বৌরানী ভরা যৌবনের বয়সে বিধবা হয়েই কিনা থান পরতে শুরু করলেন! আবার এদিকে এত কড়া নজর যদি তো কাঁদেন না কেন?

রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে নিজের মনে কাঁদেন কিনা বুঝতে পারতাম না আমরা, বুঝতাম শুধু এইটুকু যে বৌরানী আর হাসবেন না।

কাজে অকাজে দেখা করতে হতো বৌরানীর সঙ্গে।

মেঘ-থমথম মুখের সামনে বেশীক্ষণ দাঁড়ানো যেতো না, তাই দু-চার কথার পরেই সরে আসতাম।

মা-মণি মাঝে মাঝে সখেদে বলতেন, বৌমা বোধহয় বেশীদিন আর বাঁচবে না নায়েব মশাই।

দীর্ঘশ্বাসের সায় দিতাম একথায়। ভাবতাম এমন কিছু একটা ঘটে না, যাতে আবার মুখে হাসি ফুটে ওঠে বৌরানীর? হঠাৎ একদিন এসে হাজির হতে পারেন না ছোটবাবু? বলতে পারেন না, তোমরা কেন এমন মুখ ছমছম করে আছো, আমি তো বেঁচেই আছি।

না। ছোটবাবু যেখানে গেছেন সেখান থেকে মানুষ ফেরে না। ফিরিয়ে আনতেও পারে না কেউ। সে যতো বড়ো সতীসাধ্বীই হোক না কেন। আমি জানতাম। আমরা সবাই জানতাম।

তবে এও জানতাম বৌরানীর মুখেও হাসি ফিরে আসতে পারে। আসতে পারে এক অমিয়বাবু এলেই ।

কিন্তু ভুল ভেবেছিলাম। বুঝলাম, যেদিন অমিয়বাবু দেখা করতে এলেন বৌরানীর সঙ্গে। সেই অমিয়বাবু, যিনি বনেদি জমিদার ঘরের ছেলে ছোটবাবুকে পুরোদস্তুর সাহেব করে তুলেছিলেন।

অমিয়বাবুকে আমরা জানতাম বৌরানীর ভাই হিসেবেই। কি রকম ভাই তা খোঁজখবর নিয়েও বুঝে উঠতে পারি নি। তবে বৌরানীর বাপের বাড়িতে তার আদর আপ্যায়ন কম ছিলো না।

বিয়ের পর অমিয়বাবুর আনাগোনা এ-বাড়িতে একটু বেড়েই গিয়েছিলো। আর বৌরানী যে সমাজের মানুষ তাতে এটা এমন কিছু দৃষ্টিকটু ছিলো না।

আলিপুরের বেশ ফ্যাসানদুরস্ত বাগানওয়ালা বাড়িটা ছিলো বৌরানীর বাপের। বাপ ছিলেন ব্যারিস্টার, ষোলো আনা সাহেবী কায়দা কানুন তাঁর। মেয়েকে প্রথমে কনভেন্টে না কি বলে সেখানে পড়িয়েছিলেন। তারপর কোন একটা খ্রিস্টানি কলেজে। মেয়ে পুরুষ নাকি একসঙ্গে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসতো সে কলেজে। শুনে তো আমাদের চোখ কপালে উঠলো।

কর্তার সঙ্গে সে একবারই গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি কি, ইয়া এক কুকুর নিয়ে বাগানে পায়চারি করছে একটি মেয়ে। আর যা তার পোশাক, তাকাতে লজ্জা হয়।

প্রথমটা তাই চিনতেও পারি নি।

বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে কাগজ পড়ছিলেন ব্যারিস্টার বেয়াই। আমাদের দেখেই বসতে বলে ডাকলেন, লিলি ডার্লিং!

লিলির মানেও জানতাম না, ডার্লিং কার নাম তাও না।

দেখি কি, সেই ধুমসো কুকুরটাকে টানতে টানতে একমুখ হাসি নিয়ে এগিয়ে এলো মেয়েটি।

চিনতে পারলাম। আমাদের বৌরানী।

শ্বশুরকে প্রণাম করা তো দূরের কথা। সামনের চেয়ারটিতে বসে পড়লেন বৌরানী। ভাবলাম, বিয়ের পর থেকেই কেন এত মন কষাকষি বোঝা গেছে। মা-মণিকে জানাতে হবে, কর্তার মতিচ্ছন্ন হয়েছে, তাই এমন বাড়িতে বিয়ে দিয়েছেন ছেলের। আর কি আশ্চর্য! এমন মেয়েকে বৌভাতের দিন মনে হয়েছে লক্ষ্মীঠাকরুন!

টেবিলে বসে খানা-পিনা! মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে। আমার সামনে বসলেন বৌরানী, কর্তার পাশে ছোটবাবুর শাশুড়ি।

কর্তা মারা যাওয়ার আগে অবধি তাই বৌরানী আর এ বাড়ির চৌকাঠ মাড়াতে পান নি।

কর্তার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ছোটবাবুর শ্বশুর অবশ্য এসেছিলেন। বিলিতি দর্জির তৈরি দামি কোট প্যান্ট পরে। গল্প করতে করতে পকেট থেকে সিগারেট

কেস বের করে ছোটবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন।

ফরসা ধবধবে রঙ ছিল ছোটবাবুর। স্পষ্ট দেখতে পেলাম ছোটবাবুর কান লাল হয়ে উঠল। রাগে নয়, লজ্জায়। রাগ ছোটবাবুর শরীরে আদপেই ছিল কিনা সন্দেহ।

দিন কয়েক পরেই বৌরানীও এলেন। কোথায় সাহেবিয়ানা? একেবারে কনেবৌ, আধ হাত ঘোমটা। পায়ে আলতা।

সবাই খুশি হলাম। অখুশী হলাম ছোটবাবুর ওপর। তার চেয়েও বেশী চটলাম ঐ অমিয়বাবুর হাবভাব দেখে।

গরদ নয় তো আদ্দির পাঞ্জাবি। জরি-পাড় ফিনফিনে ফরাসডাঙ্গা ধুতি আর পায়ে চকচকে পামশু। এই ছিলো ছোটবাবুর পোশাক। হাতে হীরের আংটি ঝলমল করতো। ল্যাণ্ডো ছাড়া এক পা নড়তেন না। আস্তাবলের নামে পেশোয়ারি দানার হিসেব বসাতাম হাজার টাকা বছরে, ঘোড়া দুটোও তেজী আর জোয়ান। চকচক করত কুচকুচে কালো গা, চুমকি বসানো মখমল দিয়ে ঢাকা থাকতো তাদের পিঠ। আর রাস্তায় যখন এ-বাড়ির গাড়ি বের হতো, দু-পাশের লোক চেয়ে থাকতো সেদিক পানে।

অথচ অমিয়বাবু এসে ছোটবাবুর কানে মন্ত্র পড়তেন অন্য।. মোটব গাড়ির নামের তো ছড়াছড়ি, সে সব কি জানি ছাই আমি! তবু বুঝতে পারতাম দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় বসে বসে কি গল্প হচ্ছে দুজনের। বৌরানীও মাঝে মাঝে এসে যোগ দিতেন হাতে বই নিয়ে বসতেন ওদের সামনে।

মজিলপুর তৌজির গন্ডগোল মেটাবার চিঠিটা আসতেই ছোটবাবুর কাছে খবর পাঠালাম। মোক্ষদা ফিরে এসে বলল, বৌরানী ওখানে নিয়ে যেতে বললেন চিঠিটা।

গেলাম দোতলার বারান্দায়, আর গিয়ে দেখলাম খিলখিল শব্দ করে হাসছেন, যে-হাসি এতদিন শুধু দেখাই যেতো, শোনা যেতো না। তাই মনটা মুষড়ে গেলো এক মুহূর্তে। কিন্তু তারপর যে-কথাটা শুনলাম, সে-কথা কোনদিন শুনতে হবে ভাবি নি।

বৌরানী হাসতে হাসতে ছোটবাবুকে বললেন, তোমার ঐ ছ্যাকরা গাড়িটা বিদেয় কর। একটা মার্সেডিজ কেনো ওর বদলে।

কথাটা নতুন শুনলেও বুঝতে বাকি রইলো না ওটা মোটর গাড়ির নাম। মন বিষিয়ে উঠলো তাই।

বললাম বৌরানী, এ বাড়ি হলো রাজবাড়ি। রাজা খেতাবটাই নেই, সম্পত্তির দিক থেকে বনেদীয়ানায় কতো রাজা-মহারাজাও চুল বিকিয়ে বসে আছে ছোটবাবুর কাছে। ল্যান্ডো ছেড়ে কি দুদিনের টাকা হওয়া ঠিকেদারদের মতো মোটর চড়তে পারেন ছোটবাবু, ইজ্জতে বাধবে যে।

ইজ্জত! হাসলেন না ধমক দিলেন অমিয়বাবু, ঠাহর হলো না। বললেন, ঐ ছ্যাকরা গাড়ির জন্যেই ইজ্জত থাকছে না এ-বাড়ির; লোকে কৃপণ ভাবছে।

কৃপণ? একখানা ল্যান্ডোর পিছনে যা খরচ তাতে যে দু-তিনখানা মোটর রাখা যায়! ভাবলাম মনে মনে, বলতে সাহস হলো না। কারণ তার আগেই ছোটোবাবু বলে বসলেন, শ পাঁচেক টাকা দেবেন তো নায়েব মশাই , অমিয়দার সঙ্গে যাব আজ স্যুটের অর্ডার দিতে।

স্যুট? অর্থাৎ কোট প্যান্ট? তবে আর বলে লাভ কি, ছোটবাবুর মনই যখন ভিজেছে?

দিন কয়েক পরেই শুনলাম ছোটবাবু এটর্নির পড়া পড়বেন, তারপর হাইকোর্টে বেরুবেন পাশ করে।

বললাম, তা হলে জমিজমা বিষয় সম্পত্তি কে দেখবে? আর হাইকোর্টে গিয়ে ডুমুর কুড়োনোর দরকারটাই বা কি ছোটবাবুর?

উত্তর দিলেন বৌরানী। বললেন, টাকাটাই সব নয় নায়েব মশাই। শিক্ষাদীক্ষাটারও দরকার, আর পাঁচজনের সঙ্গে মেশবার জন্যে একটা পরিচয়ও থাকা চাই।

চুপ করে রইলাম। বৌরানীর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করার জন্যে পরিচয়? কর্তার সঙ্গে যে এই বাড়িতেই বসে রাত কাবার করেছে কত জজ ম্যাজিস্ট্রেট। এই বাড়ির মামলা তদারক করেই

তো অর্ধেক উকিল মোক্তার গ্রাসাচ্ছাদন চালিয়েছে, দোতলা তুলেছে হারু এটর্নি।

কিন্তু কে শোনে সে-কথা! বৌরানী যখন পণ করেছেন ছোটবাবুকে ঢেলে সাজবেন, রুখবে কে?

মাঝেমাঝে সেরেস্তায় এসে বসতেন ছোটেবাবু। দু-চারটে গল্পগুজব করতে করতে হঠাৎ হয়ত কোনোদিন বলতেন, আপনাদের বৌরানীর মতো শিক্ষিত মেয়ে কিন্তু খুব কমই আছে নায়েবমশাই।

বলতাম, তাতো বটেই। কেমন বাড়ির মেয়ে দেখতে হবে।

ছোটবাবু খুশী হয়ে হাসতেন। — সত্যি শ্বশুর মশায়ের আদবকায়দা হাবভাব একেবারে সাহেবদের মতো। গর্ভনরের সঙ্গেও বন্ধুত্ব। আর বৌরানী সেদিন ইংরেজীতে কথা বললো হাটন সাহেবের সঙ্গে। আমি তো আশ্চর্য। আবার ফরাসি শিখেছিলো নাকি কলেজে পড়বার সময়।

ছোটবাবু গুণগান করতো ও বাড়ির, আর আমি মনে মনে ছোট হয়ে যেতাম। এতোদিনের বনেদী বংশ, এমন প্রতিপত্তি-সে সব কিছুই নয়? শোবার ঘরে গায়ে একটা মখমলের আলখাল্লা চাপানোই সব?

বুঝলাম এর মূলে শুধু বৌরানী আর অমিয়বাবু।

ছেলে-বৌয়ের হাবভাব দেখে কোণের ঘরে বসে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন মা-মণি, আর নাম জপ করতেন।

এক একদিন সখেদে বলতেন, এ-বাড়ি যে উচ্ছন্নে গেল নায়েব মশাই, চোখে দেখতে পান না? চোখ ছলছল করতো মা-মণির; আর আমি তাকে বলতে পারতাম না যে, চোখে দেখতে পেলেও কিছু করবার নেই আমার। মেজদিদিমণি একবার এসেছিলেন পুজোর সময়, যাবার সময় শুধু ছি-ছি করে গেলেন।

এ-বাড়ির হালচাল তখন বদলে গেছে, রেওয়াজ শুরু হয়েছে টেবিলে খাওয়ার। বড়ো ঘরের দেওয়াল থেকে রাজা-রানীর বড়ো অয়েল পেন্টিং দু-খানা সরে গেছে, তার জায়গায় এসেছে দু-খানা বিলিতী ছবি-যার দিকে চোখ তুলে তাকানো যায় না, যে-ছবি শুধু কর্তার বাগানবাড়িতেই মানাতো।

মজা এই, বৌরানীর পোশাক পরিচ্ছদও বদলে যাচ্ছিলো, হাবভাব কথাবার্তাও।

ফিরিঙ্গিয়ানার মধ্যে মানুষ হলেও এ-বাড়িতে এসেছিলেন তিনি বৌরানী হয়ে। গরদের শাড়ি পরলে মানাতো তাঁকে, আরো সুন্দর দেখাতো হীরের দুল পরলে।

কিন্তু ছোটবাবুর মনে তখন নেশা ঢুকেছে। রীতিমতো হাইকোর্টে যাতায়াত শুরু করেছেন। কোটপ্যাণ্ট পরে, মোটর গাড়ি হাঁকিয়ে। ল্যাণ্ডোর চাকায় জং ধরে গেল কিনা খোঁজ নিতেন না একদিনও।

বৌরানী তো ছোটবাবুকে ঢেলে সাজালেন, তারপর শুরু হলো মনোমালিন্য।

দিনে দিনে একদিকে যেমন ছোটবাবু বনেদি ঘরের সব চালচলন আচার বিচার ত্যাগ করে ফিরিঙ্গিয়ানার পিছনে ছুটেছিলেন, তেমনি বৌরানী আবার ক্রমশ হয়ে উঠছিলেন পুরোদস্তুর হিন্দু ঘরের বৌ। ঘোমটা টানতে টানতে নাক অবধি নামিয়ে ফেলেছেন তখন, আর মা-মণির হাসি হাসি মুখের উপদেশ শুনে শুনে বৌরানীও রীতিমতো শনি-মঙ্গলবার করতে শুরু করেছেন। আজ ব্রত, কাল উপবাস, তারপর দিন মা ষষ্ঠীর পুজো দেওয়া।

অর্থাৎ বাইরে যতোই আদবকায়দার চাকচিক্য থাক্ না কেন, বৌরানী এটুকু ভুলবেন কি করে যে তিনি শুধু বৌ হয়েছেন মা হন নি।

তাই ছোটবাবুর মন যত বাইরে ছুটতে শুরু করলো, বৌরানীও ততোই অন্দরমহলে ঢুকতে চাইলেন। মা-মণির পুজোর ঘরেই কাটাতে লাগলেন সারাটা দিন। আজ মাদুলী, কাল তাবিজ, তারকেশ্বরের ধরনা দেওয়া লেগেই রইলো। আর তাই নিয়ে খুঁটিনাটি বাধত ছোটবাবুর সঙ্গে।

ছোটবাবু বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কোথাও ব্যবস্থা করে ফিরলেন, আর বৌরানী বেঁকে বসে বললেন, তুমি যাচ্ছো যাও না, আমি ঘরের বৌ কোথায় যাবো হৈ হৈ করতে।

ছোটবাবুর শখ হলো সিনেমা দেখতে যাবার, বৌরানী বাদ সাধলেন। বললেন, সিনেমা আমার ভালো লাগে না। মা-মণি বলছিলেন, 'অহল্যার অভিশাপ'

থিয়েটারটা নাকি খুব ভালো, যদি হয় কোনদিন জানিও।

শুনে সারা শরীর জ্বলে যেতো ছোটবাবুর বেশ বুঝতে পারতাম। একদিন বৌরানীই ঠাট্টা করতেন ছোটবাবুর থিয়েটার দেখার রোগ নিয়ে, আর আজ বলছে কিনা।

এমনি ধারাই চলছিলো বছরের পর বছর। ছোটবাবুকেই বা দোষ দেব কি, তাঁরও তো মানুষের শরীর। তাই ফরাসী শেখাবার জন্যে যে কচি বয়সের মেমসাহেবটি আসতো তাঁর কাছে, ক্রমশ কেমন সন্দেহ হতে শুরু হলো তার সঙ্গে যেন বড়ো বেশী মাখামাখি শুরু করেছেন ছোটবাবু। তা করুক, বনেদী ঘরের জমিদার, যার যা রক্তে সয়। তা বলে দিনে হাজার টাকা চাই বলে হুকুম দিলেই তো হাজার টাকা আসে না। জমিদারি টিকবে কেন তা হলে।

বললাম সে কথা। শুনে কড়া গলায় ধমক দিলেন ছোটবাবু। কোলে পিঠে করে যাকে মানুষ করেছি সেই কিনা ধমক দেয়। লজ্জায় রাগে মুখ তুলতে পারলাম না।

এদিকে বাইরে সারেঙ্গিখানায় নতুন আসবাবপত্র এলো, এলো সেই ফরাসি মেমের জিনিসপত্তর। তারপর শুনলাম বিদ্যেধরী সেখানেই থাকবেন।

ছোটবাবুকে আগে তবু কোর্ট থেকে ফিরে অন্দরমহলে একবার ঢুকতে দেখতাম, বিদ্যেধরীর আগমনের পর থেকে গাড়ি থেকে নেমেই ছোটবাবু সটান চলে যেতেন সারেঙ্গিখানায়। বেয়ারা, বাবুর্চি সে-ঘরের পৃথক, খানাপিনার ব্যবস্থাও। রাত্ত এগারোটার ঘণ্টা বাজতো দেউড়িতে, সেরেস্তার খাতাপত্র গুটিয়ে যখন ঘরের আলো নেবাতো শশী চাকরটা, তখনও টুং-টুং পিয়ানোর শব্দ আসতো মেমসাহেবের ঘর থেকে।

ভাবতাম বৌরানী কি এসব দেখেও দেখেন না?

দেখতেন সবই। যেটুকু দেখতে পেতেন না, অমিযবাবু সেটুকুও পূরণ করে যেতেন।

আর এই অমিয়বাবুই এসে বললেন, একদিন, আপনার চোখের সামনে এসব কি ঘটছে দেখতে পান না?

বৌরানীও শেষ অবধি ডেকে পাঠালেন আমাকে।

আড়াল থেকে বললেন, আপনি শক্ত না হলে যে সব ধসে পড়বে নায়েব মশাই।

আর মা-মণি দাঁড়িয়ে শুধু আঁচলে চোখ মুছলেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। কে শোনে কার কথা।

এমনি সময় শুনলাম বৌরানী অন্তঃসত্ত্বা। এতো-এতো মাদুলি, তাবিজ, ধরনা দেওয়ার ফল ফলেছে। আর তাই শুনে বৌরানীর বাপ আর অমিয়বাবু এসে জোর করে নিয়ে গেলেন, বৌরানীকে।

এদিকে সারেঙ্গিখানায় মদের বোতল যা জমেছিলো তাতে সারা বাড়িটায় রেলিং দেওয়া চলে।

এমনিভাবেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে চলছিলো। ধরেই নিয়েছিলাম, বৌরানী আর এ-বাড়িতে ফিরবেন না।

এমন সময় হঠাৎ ডাক পড়লো মা-মণির।

একখানা চিঠি এগিয়ে দিয়ে মা-মণি বললেন, পড়ে দেখুন।

পড়ে দেখতে হলো না, মা-মণির হাসি হাসি মুখ দেখেই বুঝলাম, সুখবর।

বললেন, বেয়াই মশাই চিঠি পাঠিয়েছেন মেয়ে হয়েছে।

খুশি হয়ে বললাম, সত্যি? এইবার ছোটবাবুর ঘরের দিকে মন পড়বে, না মা-মণি?

মা-মণি হাসলেন। বললেন, গাড়ি বের করতে বলুন। যাবো না নাতনিকে দেখতে?

ছোটবাবুকে বললাম, গাড়ি জুড়ছে ছোটবাবু, তুমি না গেলে কি চলে?

ছোটবাবু বিরক্তির স্বরে বললেন, আপনাদের বৌরানীর মেয়ে হয়েছে? তা তার মেয়ের মেয়ের মুখ দেখবার জন্যে তো অমিয়বাবু আছেন।

কথাটা শুনে চমকে উঠলাম। তা হলে সবকিছুর মূলে এই সন্দেহ? এতো অসন্তোষ, এতো মনোমালিন্য অমিয়বাবুকে ঘিরে?

ইচ্ছে ছিলো আভাসে ইঙ্গিতে ব্যাপারটা বৌরানীর কানে তুলবো, কিন্তু

পারলাম না।

মেয়েকে নিয়ে সে যে কি স্ফূর্তি। কি আনন্দ বৌরানীর, বলে বোঝাতে পারবো না। সেই হাসি হাসি মুখের উপর কি ব্যাথার ছাপ লাগাতে ইচ্ছে হয়!

এসে ছোটবাবুকে বললাম, মেয়ে একেবারে তোমার মতো ছোটবাবু, ছোটবেলায় ঠিক যেমনটি ছিলে। যাও গিয়ে বৌরানীকে নিয়ে এসো, ঘরে লক্ষ্মীশ্রী ফিরে আসুক।

না, ছোটবাবু নয়, অমিয়বাবুই দিয়ে গেলেন বৌরানীকে, দিন কয়েক পরেই। বৌরানীর মুখে হাসি ফিরে এলো, ফাঁকা বাড়িতে যেন নতুন প্রাণ এলো।

কিন্তু সুখ শান্তি দেখবার জন্যে কি আর এ-বাড়িতে নায়েব করে পাঠিয়েছেন ভগবান। সারেঙ্গিখানা থেকে ছোটবাবুর কাশির শব্দ ভেসে আসতো মাঝরাতে, শরীরও দেখতাম ভেঙে পড়ছে। তবু সন্দেহ হয়নি কোনদিন।

হঠাৎ ভোরবেলায় সেদিন বাবুর্চিটা খবর দিলে, মেমসাহেব পালিয়েছে।

সে তো সুখবর। কিন্তু কেন?

কেন? কাল কাশতে কাশতে মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত উঠেছিলো ছোটবাবুর। আর তাই দেখে রাতারাতি প্যাঁটরা নিয়ে সরে পড়েছে মেমসাহেব।

জীবনে অনেক বড়ো বড়ো মামলা মকদ্দমা চালিয়েছি, আদায়ে বাগড়া দিচ্ছে শুনে মহল তদারকে গিয়েছি নিজেই, জজ ম্যাজিস্ট্রেট দেখে ভড়কাই নি কোনোদিন। কিন্তু ছোটবাবুর অসুখ শুনে নিজেকে অসহায় মনে হলো।

খবরটা চাপা রইলো না, কি করে বৌরানীরও কানে গেলো।

আর তাঁর কাছ থেকে শুনলেন অমিয়বাবু।

এতোদিন এই অমিয়বাবুকে কেন যে বিষ-নজরে দেখতাম। মানুষ সত্যিই বোধ হয় সহজ নয়। এতোটুকু ভয়ডর নেই, কি অক্লান্ত সেবা। দিন নেই রাত নেই সব সময় কাছে-কাছে। ডাক্তার ডাকা, ওষুধ খাওয়ানো। সারাদিনের খাটাখাটুনির পর হয়তো অমিয়বাবু ক্লান্ত হয়ে বসে আছেন আরাম কেদারায় আর বৌরানী এসেছেন ছোটবাবুর কাছে সেবাযত্ন করবার জন্যে, অমনি লাফ

দিয়ে উঠেছেন অমিয়বাবু। স্বামীর সঙ্গে দু-একটা কথা বলার পরই সরিয়ে দিয়েছেন বৌরানীকে।

আমার তখন প্রধান সহায় অমিয়বাবু।

মা-মণিও বলতেন, অমিয়র মতো ছেলে হয় না।

ডাক্তার সেই সময় বললে, ছোটবাবুকে হাওয়া বদলের জন্যে কোথাও পাহাড়ী জায়গায় নিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু কে নিয়ে যাবে সঙ্গে করে। ছোট দিদিমণি, মেজ দিদিমণিকে লিখলাম চিঠি। তাঁরা এসে দিন কয়েকের জন্যে দেখাও করে গেলেন, যাবার আগে কাঁদলেন প্রচুর, কিন্তু ছোটবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কোন লোক পাওয়া গেলো না।

শেষ অবধি ঠিক হলো বাজার-সরকার অক্ষয়বাবু আর বৌবানী যাবেন। তবু মন কেমন সায় দিচ্ছিলো না। অক্ষয়বাবু কি আর ডাক্তার ডাকা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, পারবে ঠিকমতো।

অমিয়বাবু বললেন, ঠিক আছে আমিও যাবো।

তারপর আমি আর মা-মণি স্টেশনে গিয়ে তুলে দিয়ে এলাম ওদের। ছোটবাবুর সঙ্গে গেলেন অমিয়বাবু , অক্ষয়, বৌরানী আর এ-বাড়ির দুটো ঝি।

বেশ কয়েক মাস পরে ফিরলেন বৌরানী।

বৌরানী একা ফিরলেন না।

সঙ্গে এলো দাসদাসী, বাজার-সরকার অক্ষয়বাবু, কোলে এক বছরের বাচ্চা মেয়ে বেবি।

তবু কেন জানি না মনে হলো বৌরানী বুঝিবা একাই ফিরলেন। বিধবার বেশ, নিঃশঙ্গ একা।

শুনলাম অমিয়বাবুও ফিরেছেন। ফিরে একেবারে বাসায় চলে গেছেন।

বৌরানী ফিরে আসার পর সমস্ত বাড়িটার কেমন যেন ছমছমে ভাব। কারো মুখে হাসি নেই, ডুকরে-ডুকরে পুজোর ঘরে অবিরতই কাঁদছেন মা-

মণি।

এদিকে অমিয়বাবুও আসেন না, যে আগের মতো হাসিগল্প করে বৌরানীর মনের ভার হালকা করে দেবেন।

ছোটবাবুর শেষ দিনগুলোর খবরও ঠিক পেলাম না। সবই ভাসা-ভাসা ঝি চাকর, অক্ষয়বাবু বোঝেন কতোটুকু যে বলবেন। বৌরানী বলতে পারতেন, কিন্তু তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করাও যায় না।

তাই ভাবছিলাম অমিয়বাবুকে খবর দিই একদিন।

অথচ শ্রাদ্ধের তোড়জোড় করতে গিয়ে মনেও থাকে না ঠিক সময়।

হঠাৎ দেখি অমিয়বাবু নিজেই এলেন। এসে অন্দরমহলে যেমন সটান ঢুকে যেতেন তেমনি ঢুকে গেলেন।

আর বিস্মিত হলাম কিছুক্ষণ পরেই অমিয়বাবুকে ফটক পার হয়ে চলে যেতে দেখে।

বেশ মনে হলো অমিয়বাবুর চোখে মুখে অপমানের ছায়া।

জ্ঞানদা ঝিকে ডেকে বললাম, কি ব্যাপার বলতো?

জ্ঞানদা ফিক্ করে হেসে ফেলেই আঁচলে মুখ ঢাকলো।

— হাসছিস কেন, কি ব্যাপার বল না?

জ্ঞানদা গম্ভীর হয়ে বললে, বড়োবাড়ির কীর্তি, ও আর শুনে কি হবে।

ধমক দিলাম ওকে। কি যা তা বলছিস্?

— যা-তা নয় গো, যা-তা নয়। বৌরানী অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে অমিয়বাবুকে।

তাও কি সম্ভব? ভাবলাম মনে মনে। যে অমিয়বাবু ছোটবাবুর জন্যে এত করলো তাকেই অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে?

জ্ঞানদা বললে, বৌরানীকে বাপের বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছিলো অমিয়বাবু, বৌরানী খেদিয়ে দিয়েছে।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, কেন?

জ্ঞানদা আবার ফিক্ করে হাসলো।

বললে, বিধবা হয়ে সতী হয়েছেন গো।

খেলতে খেলতে,- একদিন

কবিতা সিংহ

সদর দরজা ঠেলেই বাড়ির ভিতর ঢুকেই অণিমা ঝি-এর কোলে তার দেওরের ছেলে দিপুকে দেখলো। অভ্যাসবশত দু'হাত বাড়িয়ে দিতেই, একটু সিঁটিয়ে গিয়ে দিপু বলল,

— তবে যে সকালে বলে গেলে বাড়ি ফিরবে না, গাড়ি চাপা পড়ে মরবে? — সামনের ঘর থেকে তখনই অণিমার দেওর বীরেন আর তার বউ কণা সাজ গোজ করে এলো। অণিমার দিকে একপলক তাকিয়ে, ভুরু উঁচু করে অদ্ভুত হেসে কণা তার স্বামীকে শুধু বলল,

বুড়ো বয়সে যত্ত সব ঢং।

তারপর ঝিকে দিপুর রাতের খাওয়ার ব্যাপারটা পই পই করে বুঝিয়ে দিয়ে স্বামীকে বগলদাবা করে সিনেমা দেখতে চলে গেলো। বাতাসে আটকে থাকা সেন্ট আর পাউডারের উগ্র গন্ধের ঝলকের মধ্যে দাঁড়িয়ে অণিমা শুধু ভাবলো, কলকাতার এই নগণ্য গলিতে, পাঁশুটে রঙের এই রকম একটা বুক খালি করা বিকেলে এইভাবে এইসব অনাত্মীয় কুটুমের মুখনাড়া সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যেই যেন পঁয়ত্রিশ বছর আগে তার জন্ম হয়েছিলো।

আপনমনে, একটু হেসে, অণিমা দিপুর পাশ দিয়ে উঠে তার নিজের ঘরে গেলো।

কণার মতো তাদের ঘরে কথায় কথায় চাবি কুলুপ পরে না। দরজাটা সারা দিন রাতই হাট করে খোলা থাকে ।

আজ বোধহয় তার স্বামী সুরেন কাজে বেরোয়নি। ঘরে ছিলো। বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা হয়েছে। ঘরে কেমন গাঁজ ওঠা জ্যাম আর পোড়া সিগারেটের গন্ধ।

অন্যদিন, এই নরকই খানিকটা গোছাবার চেষ্টা করে অণিমা। আজ সোজা বিছানায় গিয়ে চিত হলো। চিত হতেই বুঝলো বিছানাটা মানুষের মাংসের গন্ধ

মাখানো।

পথের পাগল কিংবা বেহেড মাতালের যেমন জ্ঞানশূন্য অবস্থায় মাঝে মাঝে বমি, মল, প্রস্রাব কিম্বা নর্দমার পাঁক মেখে পড়ে থাকতে ইচ্ছে যায়, অণিমারও আজ সজ্ঞানে ঠিক তেমনি ইচ্ছে গেলো। এমনিতে সে যা যা ঘেন্না করে, যেমন ধুলো মাখা পা, আঁটো শাড়ি-সায়ার বাঁধন, ঘামে ভেজা ব্লাউজ-ব্রেসিয়ারের পুতিগন্ধ, মুখে ঘাড়ে সারাদিনের কালি, সারা গায়ে লেগে থাকা বিছানার কোঁচকানো চাদরের মতো ভাঁজ, দেশি মদের গন্ধ, চাপা অন্ধকার, ফ্যান-বন্ধ-করা গুমোট , এই সবকিছু আগুনের মতো মেখে জড়িয়ে ঠায় পড়ে রইলো চুপচাপ।

পড়ে পড়ে ভাবতে লাগলো, অথচ এখনো পৃথিবীটা কী বেহদ্দ ফূর্তির কারখানা। ডে-শিফ্‌টে নাইট শিফটে, বিরামহীন রগড় পয়দা করে চলেছে। অণিমা এককালে (সে যে কতকাল হয়ে গেলো) স্বামী সুরেনের গায়ে গা লাগিয়ে দু চারখানা রঙচঙে সস্তা বিদেশী ফিল্ম দেখেছে। তার মধ্যে একটা ছবির নাম ছিলো,'ওয়ালর্ড বাই নাইট'। নানা রুচির পুরুষদের জন্য, রাতের বেলেল্লাপনার বিশ্বজোড়া সোনাগাছি।

অন্ধকারে সেই সব দৃশ্যের রঙিন রঙিন চাকতি অণিমার মাথার ভিতর তোলপাড় হতে লাগলো।

অণিমাও তো পারতো। সে নিজে যেমন ঠিক তেমন মাপের আমোদ প্রমোদে গা ভাসাতে। যাকে বলে বরাদ্দ ফূর্তি।

অন্ধকারে ঘরটা চৌকো কি গোল বোঝা যায় না, কফিন কি কুয়ো মালুম হয় না, সে নিজে মৃতদেহ কি কূপমণ্ডূক — অণিমা নিজেই বুঝতে পারে না। না পারুক, তবু সেই আবহাওয়ার মধ্যেই খাবি খেতে খেতে সে নিজেই আমোদের একটা তালিকাও বানিয়ে ফেলতে থাকে। যেমন আজ অফিসের একটা অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্নয় বনস্পতিতে ভাজা লুচি, মিষ্টি, হইহই —। অণিমা চাঁদাও দিয়েছে বইকি। কিংবা সন্ধ্যের শো-তে একটা বাংলা বায়োস্কোপ. কিংবা ময়দানের স্টপে নেমে একা গাছপালা, জলের — এবং বিকেলের গা ঘেঁষে একা একা

হেঁটে যাওয়া, খুব একটা ঝুঁকি নিতে চাইলে-শ্যামবাজারে। সেই কবে ভুলে-যাওয়া বিনয়ের বাড়িটাও ছিলো।

গেলেই যাওয়া। কেউ আটকাবে না। খোঁজও নেবে না। কিন্তু উঁচু উঁচু রেলিঙ্ অণিমা নিজেই তুলেছে। ঘর আর অফিস, বাঁধা লাইন, এ ছাড়া আর কোনো কিছুই তার নিজের থেকেই ভালো লাগে না।

বাড়ি আর অফিসের মানুষগুলোর সঙ্গেও তার যে খুব একটা যোগসাজস আছে, তাও কিন্তু নয়। আদান-প্রদানের ভাষাও দুর্বোধ্য। তবু এরা ছাড়া... হঠাৎ ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলো অণিমা। একটা কথা মনে পড়ে গেছে তার।

আজ সকালে তুমুল ঝগড়ার সময় তাকে লক্ষ করে কণা যে সব কথা বলেছিলো, তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় কণা তাকে বাঁজা বলে ধরে নিয়েছে।

কণাকে তো আর বলা যায় না যে অণিমারা স্বামী-স্ত্রীতে ষড়যন্ত্র করে বেশ ঠান্ডা মাথায় তাদের বিয়ের প্রথম দু তিন বছরের মধ্যেকার দু-দুটো ঘটনাকে শেষ করে দিয়েছিলো। টাকা পয়সার সুবিধে হলে পরে দেখা যাবে এরকম একটা বোঝাপড়াও তাদের মধ্যে হয়।

আরো পরে, তাদের মধ্যে শুধু ও ব্যাপারে কেন, আর কোনো ব্যাপারেই কোনো রকম বোঝাপড়া হয়নি।

নাঃ, কণাকে ঠিক দোষ দেওয়া যায় না — অণিমা ফের শুয়ে পড়তে পড়তে ভাবলো।

যে স্ত্রীলোক দশমাস দশদিন গর্ভধারণ করে, ছেলে পয়দা করে দেখিয়ে দিতে পারেনি, সে বাঁজা নয় তো আবার কী?

হঠাৎ সেই মুহূর্তে একটা ধোপভাঙা নিষ্কলঙ্ক সেমিজের জন্যে অণিমার সারা মন প্রাণ ডুকরে কেঁদে উঠলো।

যদি একটা সাদা সেমিজ পেতো অণিমা হয়তো আবার উঠে বসতো, আলো জ্বালতো, ঘর গুছোতো, স্বামীকে অসংখ্যবারের সঙ্গে আরো একবার ক্ষমাও করে দিতে পারতো।

ছোটোবেলা খেলা ফেরত বাড়ি ফিরলে মা যখন ধোয়া ফ্রক, মুচমুচে

গামছা এগিয়ে দিতো, তখনই তো অণিমা বুঝতো স্নান কত জরুরি। পরিচ্ছন্নতা কতদূর নির্মলতা দিতে পারে!

কণার কী দোষ। দোষ অণিমার। একটা সাদা সেমিজ পেলে রাজ্য জয় করে ফেলতো সে।

ঠিক তখনই, টেবিলের ওপর থেকে অন্ধকারে পায়ের কাছে , সাদামতো কি যেন একটা উড়ে এলো অণিমার। এক পলকের জন্য তার মতিভ্রম হয়েছিলো।

যেন তার প্রার্থনায় বিগলিত হয়ে কল্প-লোক থেকে সিধে বাস্তবের দিকে কেউ ছুঁড়ে দিয়েছে, ধপধপে সাদা একটা সেমিজ।

পরমুহূর্তেই কিন্তু সেই সর্বনেশে সাদা বেড়ালটাকে চিনে ফেললো অণিমা। উন্মাদ ক্রোধে এক লাথিতে বেড়ালটাকে ফেলে দিয়ে, এতক্ষণে অণিমা প্রকৃত দোষীকে খুঁজে বের করলো।

নাঃ, কণা দোষী হবে কেন। সব দোষ ওই অলুক্ষণে বেড়ালটার। অণিমা বেড়াল সইতে পারে না। অথচ সে নিজেও বেড়ালমুখী। ঘোরালো গোল ধরনের মুখ তার। তার স্বামী এককালে বলতো সাক্ষাৎ দুর্গা প্রতিমার মতো। তাই অণিমা বছরকার দিনে দুর্গার মুখও ফিরে দেখে না। আর বেড়াল দেখলে ঘেন্নায় তার গা আরো ঘুলিয়ে আসে। বেড়ালটা অণিমার এতো ঘেন্না হাড়ে হাড়ে জেনেও এ বাড়ি ছাড়বে না। বাড়ির লোকের আদর কাড়বে। গা ঘেঁষে-ঘেঁষে ঘুরবে। আর বাড়ির লোকগুলোও বলিহারি! বেড়ালটাকে বেশ কেমন হিসেবের মধ্যেই ধরে নিয়েছে।

আসলে বেড়ালটা সবার কাছে মিনিয়েচার। শুধু অণিমার সামনেই নিজমূর্তি। একা একা শুধু অণিমাই দেখতে পায়, বেড়ালটা ফুলে ফেঁপে ছাদে মাথা ঠেকিয়ে, চেরা, কটা চোখ থেকে নীল ইলেকট্রিকের মতো আগুন ঢালছে, আর ওর নাক মুখ থেকে ভল্‌ভল্ করে বেরোচ্ছে রোগের বীজ। অণিমা একা একাই, চর্মচক্ষে এইসব দেখতে পায়, অথচ বিশ্বাস করবে কে?

কদিন বেড়ালটা সমানে দিপুর ঘাড়ে পড়ছে। বেড়াল ডিপথেরিয়া রোগ আনে। কথাটা অণিমা বহুবার দিপুর বাপমাকে শুনিয়ে বলেছে। কিন্তু তাদের

হুঁশ হয়নি। আজ সকালে ঘর থেকে দিপুর পাশে বসে থাকা বেড়ালটাকে ক্রমশ নিজমূর্তি ধরতে দেখে অনিমার বেড়ালটার গায়ে একটা লাথি কষিয়ে দেয়, বাস্, অমনি তুলকালাম।

সুরেন বীরেন কণা দিপু, মায় বাড়ির দাসী পর্যন্ত অনিমাকে ছেড়ে কথা বলে নি।

— আরে বাবা বাঁজা তো। কী করে ষষ্ঠীর বাহনের মর্যাদা বুঝবে? ঘরের কোণ থেকে কণার দাপাদাপিকে নির্বাক সমর্থন জানিয়েছিল অনিমা।

— কাল্চার, কাল্চার, এসব হোল গে ফ্যামিলি ট্র্যাডিশনের ব্যাপার।

একটা কতোটুকু বাংলাবাক্যে এতগুলো ইংরেজি শব্দের ব্যবহারের পর সুরেনের কাল্চারকে তারিফ না জানিয়ে পারেনি অনিমা। — ও ভেবেছে ওর টাকায় কেনা গোলাম আমরা, যা করবে তাই সইতে হবে আমাকে, বুঝলে কণা —

যে নির্যাতিত স্বামী বীরবিক্রমে এখন তাকে গাল দিচ্ছে, ভোরবেলা এক চোখ বন্ধ করে, তাকেই ব্যাগ থেকে ওভার-টাইমের টাকা নিতে দেখেছে ভেবে অনিমা প্রায় দমফেটে হেসে ওঠে আর কি।

হাসতে না পারার চাপেই শেষ পর্যন্ত কান্নার মুখের রেখাগুলো চুরমার ভেঙে যেতে থাকলো তার। সুরেন ঘরে এসে ঢুকলে হয়তো কেঁদেই বসতো।

এককালে একটু আদরের জন্য স্বামীকে দেখিয়ে দেখিয়ে, ভাঙাচোরা মূর্তির মতো সে থাকতো, স্বামী এসে একটু ছুঁয়ে দিলেই দিব্যি আবার আস্ত-সমস্ত। আজকাল আর স্বামীকে দেখিয়ে দেখিয়ে সে দুঃখের চ্যারিটি-শো করে না। বরং স্বামী যাতে তাকে কোনো সময়েই আলাদা করে দেখতে না পায়, সেই চেষ্টাই করে। আজও সকালে তাই চটাওঠা দেয়ালের সঙ্গে তার আধময়লা মিলের শাড়ি আর শরীরের পাটকিলে রঙ নিয়ে মিলিয়ে রইলো।

সুরেন ঘরের ভিতর থেকে শুধু সিগারেট দেশলাই আনতে এসে তাই নিয়েই বেরিয়ে গেলো।

কিন্তু সুরেন চলে যেতেই আজ যে কী হলো অনিমার। সে সেই দুপাশে

রেলিং বেয়ে উঠতে লাগলো। তার মায়ের কাছে চলে যাবে বলে।

আঃ কোথায় সেই খাঁটি দুধের স্বাদ!

ছোটো বেলায় মা কাঁসার বাটিতে দুধ দিতো। দুধ খেয়ে, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে সেই খাঁটি দুধের স্বাদ মুছে ফেলে, অণিমা মেরুদণ্ড সোজা করে, চিবুক উঁচিয়ে খেলার দিকে, পড়ার দিকে মুখিয়ে দাঁড়াতো।

এখন কোথায় সেই সব? নির্ভেজাল, খাঁটি, আসল?

জ্বাল দেওয়া দুধ, ধোয়া কাপাস তুলোর জামা, রাঙা লেপ, রোদে সেঁকা বালিশ? মা চলে যাবার পর সেই সব মুফতে পাওয়া জিনিস হাজার দাম দিয়ে ব্ল্যাকেও পাওয়া গেলো না।

এইসব ভাবছিলো বলেই, আজ সকাল বেলা অণিমা এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে পাঁচ বছরের খুকির মতো, বেমানান ক্রোধী হয়ে উঠলো। ঠিক করে ফেললো, বাড়িতে খাবে না। দেরি করে ফিরবে। অফিস থেকে অন্য কোথাও চলে যাবে। নটার ভোঁ বাজতেই তাই চটি পায়ে গলিয়ে ব্যাগ হাতে বেরোতেই দিপু জিজ্ঞেস করলো।

— খেলে না?

— না।

— কখন ফিরবে?

— ফিরবোই না, গাড়ি চাপা পড়ে মরবো।

এই সব বলে, সিন ক্রিয়েট করে, যেন বহুদূরে চলে যাচ্ছে , এইভাবে দীপুকে প্রগাঢ় আদর করে , অণিমা চোখের জল চোখের ভিতরে ঠেলে দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলো।

— বুড়ো বয়সে যত্ত সব ঢঙ!

কণাকে দোষ দেবে কী, অণিমা যেন কথাটা নিজেই নিজেকে শোনালো। নিজের সকালবেলার আচরণের কথা ভেবে, সন্ধ্যেবেলা, মরমে মরে গেলো।

অণিমার চর্তুদিকে অশুচি। এই সব নোংরা, অশৌচ অস্থানের লেজুড় ধরে ধরে অতৃপ্ত আত্মারা আসে।

নিজের হাতের তালুতে একটা লিলিপুট নিজেকে দাঁড় করিয়ে, অণিমা প্রশ্ন করলো, দিপুকে কথা দিয়েছিলে মরবে, মরে জুড়োবে. কথাটা রাখতে পারলে না? নাঃ। অণিমার অতৃপ্তিটা ঠিক সেখানেও না। কথা দিলেই যে মরতে হবে, সেরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। মরার কথা তো ভাবে লক্ষ জন. বলে হাজার জন, কিন্তু আসল সময়ে নশো নিরানব্বই জনই পিছিয়ে যায়। সুতরাং মরতে না পারার জন্য অণিমার বিশেষ খেদ নেই। আসল খেদ পুরো ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে সে কী করে বাড়ি ফিরে এলো, এবং হাত বাড়িয়ে দিপুকে আদর করতে গেলো?

ব্যথা লাগারও তো একটা জানা চেহারা আছে। একটা চাপা ফিক্‌ব্যথার মতো, কিংবা আধকপালে মাথা ধরার মতো. ব্যথাটা তো সারাদিন পিনের মতো খচখচ করে জানান দেবে? তা নয়, বেমালুম মিলিয়ে গেলো। ব্যাপারটা ভয়ের। একমাত্র ক্যানসারেই , যখন রোগটা বাড়ে. তখন কোনো সাড় থাকে না। অণিমার সেই জন্যেই ভয় করছিলো।

যেন সেই মৃত্যুভয়েই, কূপমণ্ডূক হওয়া সত্ত্বেও অণিমা একটা অন্তিম লাফ দিলো।

হঠাৎ উঠে হাতড়ে, বইএর তলায় রাখা তিরিশটা লুকানো টাকা ব্যাগে ভরে চটি গলিয়ে বিনা নোটিশেই ছিটকে পড়লো বাইরে।

বাইরে বেরিয়ে পড়ে অণিমার বেশ কিছুক্ষণ-কোনো বোধ ছিল না। সদ্য জন্মাবার পর অনেক শিশু পাছায় চাপড় না খেলে যেমন কাঁদে না। তেমনি। তারপর হঠাৎ বাইরের সারা পৃথিবী তার কানের কাছে ফুলস্পিডে ঝমঝম করে বেজে উঠলো।

ইসস্, এতদিন কী ভুলই করেছে অণিমা। মুখ গুঁজে ঘরের মধ্যে পড়ে থেকেছে। এভাবে বেরিয়ে পড়েনি কেন?

হাওয়ায় এখন শরীরের ঘাম শুকিয়ে গেছে। দেহটা ব্রেসিয়ার ব্লাউজ আর সায়ার খোলে বেশ মাপসই বসে গেছে, ব্যাগ থেকে ছোট চিরুনিটা বের করে চুলে বুলিয়ে, রুমালে মুখটা রগড়ে মুছে নিয়ে অণিমা আবার মুচমুচে

তাজা ভাবলো নিজেকে। পথের দুপাশে ঝলমলে দোকান, সিনেমার আলো, ভিড়, মোড় পোরোবার সময়ে সংগমের হাওয়ায় হঠাৎ উড়ুক্কু আঁচল, রাস্তায় ফুল-ওয়ালার সামনে চিৎপাত শুয়ে সার সার মালা থেকে বেওয়ারিশ গন্ধ! মানুষ মানুষ।

মানুষের কথা, মানুষের গান ট্রাম-বাসের জ্যান্ত আওয়াজ, ফেরিঅলার সুর করে ডাকা সব যেন অর্কেস্ট্রা হয়ে অদ্ভুত বেজে উঠছে।

অণিমা হঠাৎ নম্বর-টম্বর না দেখে ট্রাফিক আলোয় থেমে যাওয়া একটা বাসে উঠে পড়লো। যেমন ইচ্ছে , যতক্ষণ ইচ্ছে যাবে বলে। বাসে উঠেই বুঝতে পেরে গেলো আর কিছুই গম্ভীর, দুঃখময় আর ভারী নেই। সব একটা হাল্কা , জোর কদম খেলা হয়ে গেছে। ডেলা পাকানো জগদ্দল সব দুঃখ ঘুঁটতে ঘুঁটতে এখন হাল্কা-হাল্কা মাখনের দলার মতো খুশি ভেসে উঠবে-ঝরন্ত বৃষ্টি ফুঁড়ে যেভাবে তার বিপরীত দিকে উঠে আসে ভারহীন, জলহীন, ননী-রঙ মেঘ।

এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে অণিমা যেন দিপুকে দেখিয়ে দিতে চায়, খেলা বানাতে সেও দিপুর চেয়ে কিছু এমন কম পটু নয়। আর খেলাই যখন, তখন যেমন উঠেছে তেমনি ইচ্ছে মতন নেমেও পড়া যায়। একথা ভাবতে ভাবতেই টুক করে নেমে পড়লো অণিমা। প্রাইভেট বাসগুলো বেশ। মার্টিন রেলের মতো। কেমন ঘরোয়া ভাবে পাড়াটাড়ার ভেতর দিয়ে চলে যায়।

হাঁটতে হাঁটতে একটা রেডক্রশ সাইন লাগানো পুরোনা ডাক্তারখানা পেয়ে গেলো অণিমা। অমনি তার ইচ্ছে গেলো, সে একটু গোল ট্যাবলেট নিয়ে খেলবে।

আজ সকালে সে দিপুকে কথা দিয়েছিলো, সে শুধু শো-করবার জন্য। শস্তা কথা। সামনে জামা, পেছন ন্যাংটো, বাক্সের পুতুলের মতো। এখন কোন শো নেই। কাউকে দেখাচ্ছে না। অণিমা খেলছে। ঘর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়ার পরই খেলা। আসল খেলার এখনও দেরী আছে। এখন শুধু ঘুঁটি সংগ্রহ করছে। গোল গোল নীল চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা — ঘুঁটি।

খেলার তো একটা বিশেষ নিয়ম আছে। বাহান্নখানা তাস হলে তবেই তো মজা, বত্রিশটা ঘুঁটি হলেই রাজা-মন্ত্রী হত। ষোলটা না হলেই কি করেই বা লুডোর সেই হোম স্যুইট হোম! বাড়িতে মাত্র তিনটে ট্যাবলেট পড়ে আছে। অণিমা একটা বিশেষ রকম 'গোলোক ধাম' খেলবে। তার তো মোটমাট পনেরোটা ঘুঁটি চাই-ই। অণিমা তাই সিধে দোকানের কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়ালো।

কাউন্টারের বুড়ো চশমার ফাঁক দিয়ে অণিমাকে একটু পরখ করবার চেষ্টা করে বললো, — প্রেসকৃপশন নেই?

অণিমা যেন আকাশ থেকে পড়ে গেলো।

— সে কী? প্রেসকৃপশন লাগে নাকি? কই, এর আগে তো ... অনর্গল মিথ্যে কথা অণিমার গলার ভেতর থেকে একেবারে মেশিন থেকে তৈরি হয়ে এসে ঠোঁট দিয়ে ঝরে পড়ছে।

— সেদিন যে গ্লুকোজ হরলিকস, ফসফোমিন আর মাল্টিভিটামিন নিয়ে গেলাম তার সঙ্গে ওই বড়ি, সেদিন তো কেউ প্রেসকৃপশন চাইলেন না। অবশ্য সেদিন আপনি ছিলেন না।

বনেদি খরিদ্দারের খেলা দেখাতেই বুড়ো বিনা বাক্যব্যয়ে একটা ট্যাবলেট দিলে। অণিমা ট্যাবলেটটা ব্যাগে ভরে হেলেদুলে পথে নামলো। এরপরের ডাক্তারখানার ঘটনা আরো চমৎকার। লম্বা চুল বড় জুলপির তিন চারটি ছেলেছোকরা ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান করছিলো। অণিমা মাথায় ঘোমটা দিয়ে পাড়ায় নতুন আসা মাসিমা সেজে যেতেই বিনাবাক্যব্যয়ে দুটো নীল বড়ি তার ব্যাগে চলে এলো।

ব্যাগে তিনটি খেলার ঘুঁটি নিয়ে অণিমা একটা পার্ক, একটা মন্দির আর কিছু কাঠের দোকান পেরিয়ে আর একটা ডিসপেনসারি পেয়ে গেলো। এখানে কাউন্টারে দারুণ ভিড়। একজন খরিদ্দার। হিকসের থার্মোমিটার চাইছে, একটা পাঙাশ মেয়ে জানতে চাইছে কোন্ টনিকে সস্তায় তাড়াতাড়ি শরীরে রক্ত হয়। বড় জার খুলে মুড়িমুড়কির মতো রঙীন ক্যাপসুল ঢালছে কাউন্টারের ব্যস্ত ছেলেটি। তারই মধ্যে মাথা গলিয়ে একটু বালিকা-কণ্ঠে অণিমা তার প্রার্থিত

ট্যাবলেট চেয়ে বসলো।

ছেলেটি ক্যাপসুল ঢালার মধ্যপথে থেমে গিয়ে অণিমাকে দেখলো। তারপর এক সহকর্মীর হাতে নিজের কাজ দিয়ে অণিমার কাছে এসে দাঁড়ালো।

অণিমার কেমন যেন মনে হলো ছেলেটি তার খেলার আন্দাজ পেয়ে গেছে। তবু সে যেন ম্যানেজ করার জন্যে একরাশ কথা বলে যেতে লাগলো, খেলার দুটো নীল ঘুঁটি পাওয়ার জন্য।

— জানি, আপনারা আজকাল প্রেসকৃপশন ছাড়া ... কিন্তু আমি তো এ পাড়ারই মানে —

কথা বলতে বলতে ছেলেটি তাকে বিশ্বাস করছে কিনা একবার চোরা চাউনি দিয়ে দেখেও নিচ্ছিলো অণিমা।

— আপনি, আপনি আমাদের সেই অণিমাদি না?

অণিমা অবাক হয়ে তাকাতেই দেখলো ছেলেটির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

— আমি তো জানি অণিমাদি, আপনি এই পাড়ার কিন্তু এ দোকানে আর পুরোনো কেউ নেই যারা আপনাকে পাড়ার মেয়ে বলে চিনবে। বাবাও পাঁচ-ছ বছর আগে মারা গেছেন। বাবার জায়গায় এরা আমাকে রেখেছে। সেই ছোট দোকানটাও তো নেই। দেখছেন তো তিন ডবল হয়ে গেছে। পার্ক, মন্দির, কাঠের দোকান, ডাক্তারখানা, ছেলেটির মুখ, কেমন যেন পর পর, পর পর বিষয়গুলো দুর্বোধসঙ্কেতের মতো মনে আসতে লাগলো। তাইতো—

— আমাকে চিনতে পারলেন না, আমি সুবল।

অণিমা যন্ত্রচালিতের মতো বললো,

আরো দুটো ট্যাবলেট দিলে ভালো হয়।

চারটে ঘুমের বড়ি প্যাকেটে ভরে দিতে দিতে ছেলেটি বললো,

— কতদিন পরে পরে এ পাড়ায় এলেন অণিমাদি। তা প্রায়, সতেরো আঠারো বছর পরে হবে তাই না? সেই যে মাঠে আপনারা ক্লাব করেছিলেন! আমাদের দিয়ে নাটক করাতেন, ড্রিল করাতেন, সরস্বতী পুজো করাতেন।

— সে মাঠই আর নেই। তিনতলা ম্যানসন উঠে গেছে। মনে আছে সেই খেলার শেষে আমাদের দিয়ে স্তব করাতেন — "হে ভারত, ভুলিয়ো না, তোমার নারী জাতির আদর্শ, সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী ..." অণিমাদি স্তবটা আমার এখনো অনেকখানি মুখস্থ আছে।

অণিমা একবার ভাবলো ছেলেটির মুগ্ধ স্মৃতিচারণের সুযোগ নিয়ে আরো গোটা দুই ট্যাবলেট চেয়ে দেখবে কিনা? ইতিমধ্যে ছেলেটি আবার তোড়ে শুরু করলো-জানেন অণিমাদি, সেই শেষ। আপনি চলে গেলেন, মাঠে তিনতলা বাড়ি উঠলো, তারপর আমাদের নিয়ে আর কেউ কিছু ভাবেনি। আমরা তখন কত ছেলে মানুষ, আপনি তখন স্কুলে উঁচু ক্লাসে পড়তেন। সবচেয়ে উঁচু ক্লাসে। আমাদের চেয়ে কতো লম্বা, কতো উঁচু। আপনাকে তখন ঠাকুরের মতো মনে হতো। ঠিক দুগগা ঠাকুর। জানেন অণিমাদি কতোদিন আপনাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভেবেছি , সকলের অমতে বিয়ে করে, কোথায় চলে গেলেন? অণিমাদি আপনি বলেছিলেন আপনি বিলেত যাবেন। মস্ত বড়ো প্রফেসর হবেন।

— তাই-ই 'তো হয়েছি, ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছি... ..

বেশ বেমালুম বলে দিলো অণিমা। মুখের একটা পেশীও কাঁপলো না। আগমার্কা মিথ্যে কথা বলতে সত্যি এমন একটা অনাবিল আনন্দ হয়! আর তাছাড়া মিথ্যে কথা বানানোটা তো খেলারই একটা দারুণ অঙ্গ এবং অণিমা তো এখন খেলছে। তাই না? রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তার ফুরফুরে খুশি এল। তার হাতে সাতটা গোল গোল ঘুঁটি। বাড়িতে তিনটে। একুনে দশটা। তবে কিনা তার এক্সট্রা স্পেশাল 'গোলোকধাম' খেলায় আরো পাঁচটা ঘুঁটি চাই। কারণ ওই যে খেলার সেই নিয়ম — লুডোয় ষোলটা, দাবায় বত্রিশটা, তাসে বাহান্নটা।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে, মুছে ফেলা অতীতের পুরোনো সময়গুলো ফিরে মনে করতে করতে, ছেলেটিকে এবার পুরোপুরি মনে পড়ে গেলো অণিমার। ছোট নিচু আর হাফপ্যান্ট পরা। একটুখানি বাড়তি আদর পাবার জন্য তার গা ঘেঁষে ঘেঁষে বেড়াতো। ওদের বাড়ির সামনের টিনের মাঠকোঠায় থাকতো।

বেশ করেছে,ওকে মিথ্যে করে বলেছে নিজের কথা। ওতে পাপ নেই। বরং খেলা যখন, তখন কারো স্বপ্নের জগত ভেঙে দেওয়াটাই খুব পাপ। চারপাশে চাইতে চাইতে অণিমা এতক্ষণে মনস্ক হয়ে ঠাহর করতে পারলো, হাজার বদলালেও, এটা তার বাপের বাড়ির পাড়াই বটে। পার্ক, মন্দির, কাঠের দোকান, ছেলেটির মুখ, ডাক্তারখানা, তাই অন্য চিন্তায় মগ্ন থাকা সত্ত্বেও তার মাথার মধ্যে মেষপালের গলার ঘণ্টার মতো অস্পষ্ট বাজছিলো।

ওই তো সেই রাস্তা। ফুটপাথটা চিরে পাড়ার মধ্যে এঁকে বেঁকে ঢুকে রাস্তাটার মুকের কাছে এসে এমনভাবে দাঁড়াল অণিমা, যেন নদীর মোহনায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

পৃথিবীতে মায়ের কাছে যাওয়ার রাস্তার চেয়ে আর কোন ভালো রাস্তা নেই।

সতেরো বছর পর্যন্ত অণিমা সেই রাস্তা দিয়েই গেছে। কাঁধে বই এর ব্যাগ ঝুলিয়ে, ফিরতে ফিরতে যখনই এই সরু রাস্তার মুখে পৌছে যেতো অণিমা তখনই মনটা এতো ঠাণ্ডা এতো পরিপূর্ণ হয়ে যেতো। রাস্তাটার গাছপালা, মাঠ-জমি, বাড়ির সারি, সব মায়ের হাতের ছোঁয়া মাখানো। সবচেয়ে সুন্দর অণিমাদের সেই ছোট্ট বাড়িটা। বাঁদর-লাঠি গাছের পেছনে এলা রঙা, সবুজ জানালা আর মেরুন রেলিং বারান্দা ঝোলানো। আর সব কাজ ফেলে অনুর জন্যে দাঁড়িয়ে থাকা মায়ের একটি উজ্জ্বল ছবি। অণিমা অবশ্য পাড়ায় ঢুকলো না। নদী পেরোনোর মতোন লেনটি পেরিয়ে রাস্তার উল্টোদিকে বাসস্টপে দাঁড়ালো।

অণিমাকে এখন এক খেলা থেকে আর কে খেলায় পেয়েছে। গ্যাস্ বেলুনের মতো ফুলন্ত লাগছে নিজেকে। প্রায় টেনে ধরে রাখার অবস্থা। বিয়ের পরে সতেরো আঠারো বছর অনেক পাড়া বদল করেছে অণিমা। কলকাতার বহু জায়গায় ঘুরেছে। কবে কৈশোরে, খেলাচ্ছলে, কী সব হতে চেয়েছিলো অণিমা, সে নিজে ভুলে গেছে অথচ সুবল নামে ওই ছেলেটা দিব্যি মনে রেখেছে। এমনি করে আরো কি কেউ মনে রেখেছে অণিমাকে? অন্য কোন বয়সে?

ভিন্ন কোন পাড়ায়?

এবারে, ঠিকঠাক নম্বর দেখে উঠে পড়লো একটা নির্দিষ্ট বাসে। সোজা কলকাতার ঝাড়া উত্তরে।

স্টপ চিনে ঠিক নামতেই পারলো না অণিমা। আন্দাজে রাস্তার নাম জিজ্ঞেস করতে করতে, তবে গলির মুখটা পেলো। মুঠোকতক নতুন দোকানে গলির মুখটা এমন বদলে গেছে। তার মধ্যেও অণিমা ঠিকঠাক দেখে নিল, সেই পুরোনো ডিসপেনসারিটা কী অবস্থায় আছে। সদ্য বিয়ের পর এখানেই একটা কুড়ি টাকার ঘরে উঠেছিল তারা। দু সংসার থেকেই আলাদা। শুধু সুরেনের সঙ্গে।

গলিটা তিন চারটে গোত্তা খেয়ে যেখানে আরো দুটো বাইলেনের ফেঁকড়ি বের করেছে, সেখানেই ওই ঝুরঝুরে বাড়িটায় অণিমার প্রথম সংসার। সেই গ্যাসপোস্টটা এখনো তেমনি রয়েছে। শুধু আদৌ জ্বলছে না। বদলে একটা বাড়ির গা থেকে তারে ঝোলানো একটা নেড়া ইলেকট্রিকের বাল্ব। তার ঘোলাটে আলোয় অণিমার ঘরের সেই জানলাটা দেখা যাচ্ছে। পর্দাহীন জানলায় বসে বসে দুটি শিশুর ছায়ামূর্তি বাটি কুড়িয়ে কী সব খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, ভিতরের দেওয়ালের রঙ তামাটে। বিছানা বালিশ তোশক পুরনো বই, মিক্সচারের শিশি এইসব তালগোল পাকানো। টাল করা। অথচ এক সময় ঐ ঘরই কী ছিমছাম সাজানো গোছানো ছিলো। জানলা দিয়ে নীলচে গ্যাসের আলো পড়ে বিছানাটাকে পরীরাজ্য করে দিতো। রাতে ঘুম ভেঙে গেলে হঠাৎ অণিমার মনে হোত, এ কোথায়? কার পাশে শুয়ে আছে সে!

বারোয়ারি সদর পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলো অণিমা। মাঝে সেই পিছল উঠোন, চারপাশে রক, আর সার সার ভাড়াটে কুঠরি। ঘরে ঘরে স্ত্রী-পুরুষ-বাচ্চার কচাকচি। রেডিও। শ্যাওলা পড়া মাছ ধোয়া জলের আঁশটে গন্ধ ওঠা উঠোনে বিগড়ে যাওয়া কল থেকে ছড়ছড় জল পড়ার বিরক্তিকর আওয়াজ। অণিমার ঘরের সামনে একটি বউ তোলা উনুনে রুটি করছিলো। অণিমা ছায়ার মধ্যে কালো মূর্তির মতো দাঁড়াতেই জিজ্ঞেস করলো —

কাকে চাইছেন?

অণিমা প্রাণপণে তার সময়কার পুরানো বাসিন্দাদের নাম মনে করতে চাইল তারপর চট করে বললো,

— আচ্ছা এই ঘরের পাশের ঘরে নার্স সুরোদিদি কি এখনো আছেন? বউটি অবাক হয়ে বললো,

— কে নার্স সুরোদিদি?

— আহা, তুমি জানবে কি করে?

একরাশ ভিজে কাপড় কেচে কেচে বালতি বোঝাই করে প্রায় বেঁকে বেঁকে হাঁটতে হাঁটতে বললো একটি শীর্ণ বিধবা।

— আর এই ঘরে যে একটি বউ ছিলো, নতুন বিয়ে হয়ে আসা বউ।

শীর্ণ বিধবাটি ফোকলা দাঁতে একটু হেসে বললে, — হ্যাঁ, তার গল্প শুনেছি। সুরোদিদির কাছেই। আহা তার বরটা নাকি তাকে খুব মারতো। তবু নাকি সে শাড়ি কেটে পর্দা বানাতো, ঘর সাজাতো, স্বামীকে খুশি করার জন্য কত রকম রান্না করতো।

শুকনো-মুখ, বিধবাটি উঠোনের আবছা অন্ধকারের দিকে চেয়ে যেন কেমন বেগতিক দেখে, একটু ভয় পেয়ে সারি সারি কুঠরির একটিতে অদৃশ্য হয়ে গেলো। অণিমা এতক্ষণে ঠাহর করে দেখলো উঠোনে হাঁটুর কাপড় তুলে কলে পা ধুচ্ছে যে ছায়ারঙের স্ত্রীলোকটি, বুকের অনাবৃত মাংসখণ্ড নিয়ে তার বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ নেই। কথা বলার আনন্দে সে খনখন গলায় ক্রমাগত কথা বলেই যাচ্ছে।

— বউটা কিছু জানতো না। পর্দা টাঙাতো না আরো কিছু। দশবার সর-খুলে পড়ে যেতো। বরটা কচুর শাক নারকেল ঘণ্ট ভালবাসতো। ঘটির মেয়েতো, জানতো না কিছুই। তাই আমার কাছে শিখতে আসতো। আবার কী লম্বা লম্বা কথা। একটা মাটির ভাঁড় কিনে এনে একবার বলে কি, মাস মাস পয়সা জমাবো। এক বছরে না হোক দশ পনেরো কুড়ি বছর পরে আমার বাড়ি হবে-আর বেশি নয় দুটো বাচ্চা! তা স্বামীটা ভাঁড়ে পয়সা পুরো হতেই ভেঙে সব নিয়ে নিলো।

অণিমা অস্ফুটস্বরে বললো,

— তারপর!

— তারপর বউটাও একটা চাকরি পেলো। স্বামীকে নিয়ে ভালোপাড়ায় পালালো।

— তারপর?

রকের ওপর ভিজে কাপড় বুকে জড়িয়ে উঠতে উঠতে স্ত্রীলোকটি পিচ্‌কেটে বিরক্ত গলায় বললো,

— খালি তারপর আর তারপর! ভর সন্ধ্যেবেলা কেমন ধারা কথা শুধোও গো আপনি? কত আসছে, কত যাচ্ছে আমি কি অতো 'তারপর' তারপরের খবর জেনে বসে আছি?

অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিলো অণিমা। অন্ধকারেই ফিরলো।

গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, যেন সিনেমা দেখছে, যেন অন্যের জীবন — এমনি দূর, থেকে দেখতে লাগলো তার স্বামীকে। চাকরির প্রথম মাইনে পেয়ে, দুজনে মুখোমুখি বসে দামি চা খাবে বলে, এক প্যাকেট চা কিনে অবেলায় ফিরে এসে তার স্বামীর বুকের তলায় এক উল্কিকাটা মাঝবয়সী ঝি-ক্লাসের স্ত্রীলোককে দেখেছিলো। উঠোনের ওপাশে যে বিধবা আয়াটি থাকতো, যার কাছ থেকে অণিমা দু'চারখানা বাঙাল দেশের রান্না শিখেছিলো তার কপালের উল্কি আর পুরন্ত বুকের কথা অণিমার খুব মনে পড়ে।

সত্যি সময় কিভাবে বয়ে গেছে তাই না। এখন ওই বুড়ি আয়া বুক নিয়ে লজ্জা পায় না। যে কথা ভাবতেও এককালে অণিমার বুক ভেঙে যেতো, আজ তা সাড়হীন অর্থহীন লাগে।

আসলে সমস্ত ব্যাপারটাই নিছক খেলা। খেলতে খেলতে সাউথ থেকে একেবারে বেধড়ক নর্থ।

সেই খেলার ছলেই অণিমা চিন্তা করলো মোড়ের ডিসপেনসারি থেকে যদি তাকে খেলার ঘুঁটি না দেয়?

এতো আর সুবলের মতো কাঁচা বয়সের গেঁথে যাওয়া স্মৃতি না, যে

দাগ থাকবে। বড় হয়ে যাবার পর কে বা কার দিকে অতো বিনা কারণে মনোযোগ দিয়ে থাকে?

কাউনটারে একজন মাঝবয়সী, যেন মনে হয় দাঁত কিংবা পেটের গণ্ডগোলে তিরিক্ষে, লোক দাঁড়িয়ে ছিলো।

অণিমা মাথায় ঘোমটা টেনে চাপা গলায় বললো,

— আপনার দাদার ব্যথাটা আবার বেড়েছে, ডাক্তার ঘুমোবার দুটো বড়ি কিনে আনতে বললেন। অ্যাদ্দুর এসে দেখি প্রেসকৃপসনটা আনতে ভুলে গেছি।

লোকটি ভ্রূ কুঁচকে বললো, কোন বাড়ি থেকে আসছেন, ভট্টাচায্যিদের?

অণিমা মাথা নাড়লো,

— হ্যাঁ।

— চেনা বলে, তাই বুঝলেন! দেখলাম পাড়ার ভেতর থেকে আসছেন! তাচ্ছিল্যভরে দুটো বড়ি আর খুচরো টাকা পয়সা অণিমার দিকে ছুঁড়ে দিলো লোকটা।

অণিমা হাঁফ ছেড়ে দোকান থেকে নামলো। হাসতে হাসতে, জিততে জিততে এবার একটা ট্যাকসিই ডেকে ফেললো।

বারোটা যখন হয়েছে আর তিনটে হয়ে যাবে ঠিক।

এবার একটু শ্যামবাজারে যাওয়া যাক। সেই মাঝে মাঝে মনে-পড়া বিনয়ের বাড়ি।

ট্যাকসির ব্যাকসিটে গা এলিয়ে দিতেই অণিমা ধরে ফেললো সে কতটা ক্লান্ত। ক্লান্ত তো ক্লান্ত, কাল তো আর অফিস যেতে হচ্ছে না তাকে। ব্যাগে আর উদ্বৃত্ত টাকা রেখে লাভ কী। বরং ট্যাকসিআলাকে একটা উল্টোপাল্টা ঘুরপাকের নিশানা দেওয়া যাক।

ইতিমধ্যে অণিমা একটু খেল্‌টাকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করে নিক। শরীর যতক্ষণ আছে ততক্ষণই তো সাড়ে বত্রিশ মজা। যখন শরীর থাকবে না তখন মনে হবে আহা সেই যে সারাদিন পরে কী অদ্ভুত ক্লান্ত হতুম, বিছানার

জন্য কোষে কোষে এক ফোঁটা করে কান্না, পাকস্থলীর ভিতর খিদের জন্য পরতে পরতে ঘষা খাওয়া, মাথার ভিতরের ধূসর পরমাণুর মধ্যে সারিডনের জন্য তীব্র চীৎকার তৈরি করতুম, জরায়ুর মধ্যে প্রতিমাসে ঋতুরক্ত জমে উঠতো, তলপেট থেকে মূত্র নিঃসরণের সেই নির্ভার হওয়ার শারীরিক সুখ .....

অনেকদিন পরে, আজ চলে যাওয়ার সময়, অণিমা বুঝতে পারছে সব খুঁটি নাটি, দেওয়ালে খাটানো মশাবি টাঙানোর পেরেকের দাগটাও কীভাবে টান দিতে পারে।

নাকি কত বছর হলো? তা বছর দশেক তো হবেই , এতো বছর পরে বিনয়ের কাছে যাচ্ছে বলেই তার হঠাৎ শরীরের কথা মনে হলো?

ট্যাকসিটা অণিমার দেখানো একটা ভুল মোড় নিলো। এমন ভুল পথে ও বহুদূর চলে যাবে। সিধে রাস্তা পড়ে আছে। অণিমা দুপাশে সরে যেতে থাকা বন্ধ দোকান পাট এবং, মাঝে মাঝে 'লোডশেডিং' এর আঁধারে ছয়লাপ কলকাতাকে দেখতে দেখতে, সিঁড়ি বেয়ে ঘুরে ঘুরে যেন বিনয়ের বাড়ির তিনতলায় উঠতে থাকলো।

দোতলায় ওর দাদা বউদিরা থাকে। তিনতলায় ছাদে বিনয়ের ঘর। অণিমার হাতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। দশ বছর আগের সেই দিনটিতে যেমন ছিলো। আশ্চর্য, এমনিতে অণিমার হাঁফ ধরে, অথচ আজ বিনয়ের বাড়ির তিনটে তলা ভাঙতে তার বুক ধুকপুক করলো না। রগে ঘাম বিনবিন করে উঠলো না। কেবল বুকের কাছে ধরে থাকা রজনীগন্ধাগুলো উৎকণ্ঠায় খুলতে খুলতে থাকলো। যেন কুঁড়ি হচ্ছে, ফুল হচ্ছে, কুঁড়ি ...

বিনয়। দশ বছর পরে বিনয় তাকে কীভাবে যে নেবে? দাঁড়াতেই , অণিমা, সেই দশ বছর আগের পুরোনো, অবিকল, তারা কিচ্‌কিচে আকাশটা দেখতে পেলো। আর সেই ছাদে একা দাঁড়িয়ে থাকা ছাযাময় বিনয়কে।

অণিমার আজ বিনয়ের সঙ্গেও একধরনের লুকোচুরি খেলতে ইচ্ছে হলো। জানতে ইচ্ছে হলো, বিনয় কীভাবে দশ বছর আগের সেই অণিমাকে দেখেছিল। সুবলের অণিমাদি, ভাড়াটে বাড়ির নার্স সুরোদিদির চোখে দেখা সেই ঘরন্তী

বউ, তার পাশে বিনয়ের অণিমা ঠিক কেমন?

— আচ্ছা আপনার কাছে দশ বছর আগে একটি মহিলা প্রায়ই আসতেন না?

— হ্যাঁ, অণিমা, প্রায়ই আসতো, মনে আছে।

— সে কেমন ছিলো?

অণিমা রজনীগন্ধার গা থেকে ধোঁয়ার মতো দৃশ্যমান সুগন্ধ উঠতে দেখলো। মাঝে মাঝে সুরেনের এই বন্ধুটির সঙ্গে সে তার তিনতলার এই ঘরে চলে আসতো। চা খেতো, গল্প করতো, কখনো কখনো বিনয়ের কাছে কাঁদতও। ধৈর্য চাইতো। পরামর্শ চাইতো। বিনয় ধৈর্যভরে শুনতো, বুদ্ধি দিতো, সান্ত্বনা দিতো। আবার সুরেনের জন্যে মন কেমন করে উঠলে ঘরে ফেরার বাসে তুলে দিতো।

— কেমন ছিলো অণিমা?

সেই দীর্ঘ সুগঠিত সুন্দর ছায়াকে আবার অশৈরণ প্রশ্ন করলো অণিমা।

— অণিমা , আসলে অণিমা নষ্ট খারাপ হয়ে যাওয়া একটা স্ত্রীলোক ছিল।

প্রত্যেকটা শব্দ বাজপড়ার মতো শব্দ করে উঠলো অণিমার ভিতরে। হাতের রজনীগন্ধা থেকে যোনির দুর্গন্ধ উঠতে লাগলো।

— জানেন, একদিন সুরেনের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য সে এমনি করে, ছুতো করে কতকগুলো ফুল নিয়ে আমাদের সম্বন্ধকে একেবারে মাংস ক্লেদে নামিয়েছিলো। জাতও গিয়েছিলো। পেটও ভরেনি। আবার ফিরে গিয়েছিলো যাকে ও একমাত্র চায় সেই সুরেনের কাছে।

হঠাৎ ট্যাকসিটা আচমকা লাল আলো দেখে ব্রেক কষতেই অণিমার চটকা ভাঙলো।

— কী করেছেন কি? এদিকে নয় এদিকে নয় গাড়ি ঘোরান ... শ্যামবাজারের মোড়ের দিকে ...

ট্যাক্সিঅলা অবাক হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে বললে, — সে কী, এ যে একেবারে উল্টো দিক, আপনি তো এদিকেই বলেছিলেন?

— স্যরি, আমারই ভুল হয়েছিলো।

অশৈরণ গলায় বললো অণিমা।

— আপনাকে এখন যা বলছি , তাই করুন না। আপনার মিটারে যা উঠবে তার চেয়ে তো আর কম দেবো না আপনাকে, যে চুলোতেই নিয়ে যাই।

ট্যাক্সি ঘুরে গেলো।

গাড়িতে বসে বসে অণিমা বিনয়ের সঙ্গে যে সব কাল্পনিক কথোপকথন বানাচ্ছিল সব মুলতুবি রাখলো। বলা তো যায় না। সত্যি সত্যি কী ঘটবে। দশ বছর বাদে কী ভাবে বিনয় দেখবে অণিমাকে। আসলে কী বলবে?

বিনয়ের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে আসতে অণিমার মনে হলো বিনয় তাকে ঠকিয়ে গেছে। খেলার এই জায়গায়টায় এসে কেমন যেন একটা জট পাকিয়ে গেলো অণিমার। বিনয়ের তিনতলার ঘরে এখন বিনয়ের ছোট ভাই সপরিবারে থাকে। বিনয়ের বড় বউদি খুব দুঃখ করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে, পাঁচ বছর আগে হাঁপানিতে বিনয় কিভাবে মরেছিলো তা বললেন।

মরে ডুবিয়ে দিয়ে গেলো বিনয়। তার তৈরি অণিমা কিংবা অণিমার তৈরি বিনয়ের জন্য সেই বিশেষ মডেলের অণিমা কেমন? তা আর কোনো দিনই জানা হলো না।

যাক, এবার অণিমা ট্যাক্সি ধরে ওর নিজের পাড়ার দিকেই চললো। পথে সেই নার্স মেয়েটির কাছে যাবে একবার। তিনটি ঘুঁটি তার চাই-ই। তা ছাড়া এ মেয়েটির কাছ থেকে তার কিছু উদ্বৃত্ত ঘুমও প্রাপ্য আছে। এক নামকাটা ডাক্তারের জনসংখ্যা কমাবার অ্যাসিটেন্ট হিসেবে, দু-দুবারেই সে খোঁচাখুঁচির সময় অণিমাকে যথেষ্ট অ্যানাস্থেসিয়া দিতে কার্পণ্য করেছিল।

এ মেয়েটির কাছে যাবার সময় অন্তত কোনো রকম ভিক্ষের দরকার হবে না অণিমার। কোনো রকম ভাণের। এ মেয়েটি হাতে টাকা পেলে, একবারও জানতে চাইবে না কে কী জন্যে কোন জিনিস চাইছে। কে সধবা, কে বিধবা কিংবা কে কুমারী? এর দরজায় কড়া নাড়লে কোনো আয়না ভেঙে পড়ার মতো আদর্শ কিংবা সংস্কার ভেঙে পড়ার ঝন্ঝন্ শব্দও হবে না।

সুরেন বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছে। বীরেন আর কণাও দীপাকে নিয়ে কখন শুয়ে পড়েছে। অণিমা আলো জ্বেলে টেবিলে চুপচাপ বসে। সামনে জলভরা গ্লাসে পনেরোটা নীল বড়ির শরীর ক্রমশ দ্রবীভূত হচ্ছে। অণিমা একদৃষ্টে তাই-ই দেখছিলো।

হাতের কাছে কাগজ কলম থাকা সত্ত্বেও অণিমা চিঠিপত্তর লেখার কথা আদৌ ভাবছে না। বিনা অনুষ্ঠানেই চুপচাপ কেটে পড়তে চায় ও।

কোথাও নিশ্চয়ই ফাঁকি ছিলো। জল মেশানো কিংবা ভেজাল।

কুড়ি বছর আগে সুবল নামে ছোট্ট একটি ছেলেকে, একটা লম্বা উঁচু মেয়ে কথা দিয়েছিলো, সে মস্ত স্কলার হবে। অধ্যাপিকা!

পনেরো বছর কবে চলে গেছে , বেলেঘাটা গলির সেই বউটি জমিও কিনতে পারেনি ঘরও তুলতে পারেনি। ছেলের মা তো হতে পাবেইনি।

দশ বছর আগে সে একটা সুন্দর দেহগন্ধহীন সম্পর্ককে গলা টিপে মেরেছে, আজ সকালে দিপুর কাছে মরার কথা দিয়ে কথা রাখতে পারেনি।

তবু অণিমা আজ খুব পরিতৃপ্ত।

কারণ আজ সন্ধেবেলা সে প্রথম শিখলো দুঃখ থেকে এই পৃথিবীতে কীভাবে খেলা বানাতে হয়।

কিন্তু বড়ো দেরিতে শিখলো।

গ্লাসের দিকে এবার হাতটা বাড়িয়ে দিলো অণিমা।

ঠিক তখনই হঠাৎ টেবিলের ওপর লাফিয়ে পড়লো বেড়ালটা। শব্দ করে উল্টে গেলো গ্লাসটা। মুহূর্তের জন্য কলকাতার গলির ঘরে জলপ্রপাতের শব্দ উঠলো। অণিমা উঠে দাঁড়াতেই, মারের ভয়ে বেড়ালটার পিঠটা ধনুকের মতো বেঁকে উঠলো। কিন্তু কীভাবে ঘুরে ঘুরে খেলে খেলে, পনেরোটা ঘুঁটি সংগ্রহ করেছিলো মনে পড়তেই অণিমা দারুণ আমোদে বেড়ালটাকে অবাক করে দিয়ে কেবল খানিকটা হেসে উঠলো।

মেঝের জল মুছে মাটিতে নিজের বিছানা পাততে পাততে অণিমা ভাবলো, খেলতে যখন শিখে গেছে তখন খেলাই চলুক-খেলা চলুক... তারপর এভাবেই খেলতে, খেলতে, খেলতে... একদিন!

দিদিমা

শরৎকুমারী চৌধুরানী

নামাবলীখানি গায়ে দিয়া আমার দিদিশাশুড়ী যখন গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ি ফিরিতেন তখন বেলা ৮ টা। আমি পানের বাক্স লইয়া পান সাজিতাম। তিনি গঙ্গাজলের ঘটিটি ও নামাবলী খানি যথাস্থানে রাখিয়া একটা বড় পিতলের ঢাকা খুলিয়া আমাদের খাবার দিতেন। তাঁহার আদেশে পান সাজা রাখিয়া আমাকেও জলযোগ করিতে হইত। "আহা তাড়াতাড়ি করে আসছি, আহা তোদের কত ক্ষিদে পেয়েছে।" খাবার দিয়া তসর কাপড় ছাড়িয়া তিনি বাজারের হিসাব পত্র লইতেন ও তাড়াতাড়ি "ঝোলের আনাজ" লইয়া রান্না ঘরের উঠোনে যেখানে ঝি মাছ কুটিতেছে সেখানে গিয়া, "ও ঝি ঝোলের মাছটি আগে ধুয়ে দাও তো মা," বলিয়া ঝিকে তাড়া দিতেন।

গয়লা বৌ-এর কাছে দুধ মাপিয়া লইয়া তাহার ঘরের কুশল সংবাদ লওয়া হইলে বলিতেন, বাচ্ছা বাচ্ছার দুধটুকু ভাল দিস্ মা — একটু, সকাল করে আসিস গো" দুধের কড়া চড়াইয়া দিয়া "মাছের ঝোল নামালে গা?" বলিতে না বলিতে স্কুল আফিসের যাত্রীরা "দিদিমা, মা, ভাত," বলিয়া কেহ গামছা লইয়া চৌবাচ্ছায় ঝাঁপাইয়া পড়িতেন কেহ পিঁড়িতে বসিয়া দিদিমার কাছে তেল চাহিয়া লইয়া তেল মাখিতেন ও গল্প করিতেন।দিদিমা "এই যে ভাত হয়েছে" বামন মেয়ে ভাত বাড় মা"— "এই নাও দাদা তেল"— বলিয়া তেলের বাটি দিতেন, পরে খোরায় খোরায় দুধ জুড়াইয়া আহারের স্থলে লইয়া রাখিতেন। বড় বড় পিঁড়ি পাতিয়া একতলার দালানে আহারের ঠাঁই হইয়াছে — একে একে সকলে আহার করিতে অসিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজকের খবর কি দিদিমা?" কেহবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাঁড়ারের কিছু অনাতে হবে কি?" দিদিমা হাসিমাখা মুখে সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। এমন করিয়া স্কুল আপিসের তাড়নার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশান্তভাবে হাসি গল্পের সহিত "বাবুদের" স্নানাহার সমাধা হইলে দিদিমা সকলের হাতে হাতে পান

দিলে সকলে বাহির বাড়ি চলিয়া গেলেন। তখন একটু নিশ্চিন্ত হইয়া দিদিমা অবশিষ্ট দুধ জ্বাল দিতে লাগিলেন। কাহারও ঘন কাহারও বস্কা বাটি বাটি রাখা হইল। দুধ জ্বাল দেওয়া শেষ হইলে নিরামিষ রান্নার বক্‌নোটী চড়াইয়া তরকারি কুটিয়া চাল ধুইয়া নিরামিষের সমস্ত যোগাড় করিতে ব্যস্ত হইলেন। এক একদিন আমি 'তরকারি কুটিব' বলিয়া ধরিয়া বসিলে 'আচ্চা তুমি এই আলু পটলগুলি ছাড়াও' বঁটি ছাড়িয়া দিতেন। ইতিমধ্যে বাহির বাড়ি হইতে ভৃত্যেরা বারম্বার আসিতেছে ও "বড় বাবুর জামাটা ছেঁড়া আর একটা দিন, মেজবাবু ও কাপড় পরবেন না — ধোয়া বার করে দিন, — ছোট বাবুর এ চাপকানের বোতাম নেই সেরে দিতে হবে, — পান কই, — জল দিয়ে যান;" এই প্রকার কত কি বাহানা লইয়া দিদিমাকে ব্যস্ত করিতেছে। দিদিমার বিরক্তি নাই, ধীরভাবে সকল ফারমাস সম্পন্ন করিতেছেন। তখন তিনি রন্ধনে নিযুক্ত এজন্য বাক্স, পেঁটরা ধোয়া কাপড়-চোপড় কিছুই স্পর্শ করবিেন না, চাবি দিয়া আমাদের বাহির করিয়া দিতে অদেশ দিতেন। আমরা তাঁহার উপদেশ মত কাপড় চোপড় বাহির করিয়া দিতাম। ভৃত্যদের সম্মুখে আমরা বাহির হইতাম না, ভৃত্যেরা বাড়ির ভিতর প্রায় অসিত না, যখন আসিত সাড়া পাইলেই ঘরে লুকাইতাম। ঘোমটা দিয়া শ্বশুর ভাশুরের সম্মুখে কখনো কখনো যাইয়া জল কি পান দিয়া আসিতে হইত; কিন্তু ভৃত্যদের কিছু দিতে হইলে দাসী দ্বারা বা ছোট মেয়ের দ্বারা পাঠাইতাম। ভৃত্যেরা একতলার ভিতর বাড়িতে আনাগোনা করিত দেতালায় কদাচিৎ যাইত। আমরা সকালে আসিয়া একতলার ভাঁড়ারে ঢুকিতাম — রান্না ও ভাঁড়ার ঘর পাশাপাশি সুতরাং আমাদের গণ্ডী রান্না ও ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে। তার বাহিরে যাইতে হইলে দাসী হাঁকিত "সরে যাও বৌঠাকরুণ যাচ্ছেন।" সময়ের কি বিচিত্র গতি আজ — আমাদেরই বাড়ি একটিও দাসী নাই ভৃত্যেরাই সকল কার্য্য নির্বাহ করে। যা হোক বাবুরা স্কুল আপিস চলিয়া গেলে আমরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতাম।

বাহির বাড়ীতে ভৃত্যেরা "রাম রাজত্ব" করিত। দাসীরা কাজ সারিয়া তেল মাখিতে বসিত। যেমন যেমন আহার হইয়া যাইত — অমনি বাসন

ধুইয়া ফেলিতে হইত। "এঁটো চণ্ডী" দেবতাটি বড়ই" বিঘ্নকারিণী"। বাড়িতে যে বেলা ২টা পর্যন্ত "শকড়ি" পড়িয়া থাকবে তার যো নাই — তা হলে "এঁটো দেবী" ত্বরিত গতিতে গিয়া স্কুলে আপিসের যাত্রীদের কার্যে বিঘ্ন ঘটাইবে — সুতরাং বাসন কোসন পরিষ্কার না করিলে দাস দাসী কেহই অবসর পাইত না। বাড়ীর মধ্যে প্রচুর স্থান থাকা সত্ত্বেও দাসীরা বাসন মাজিতে ও স্নান করিতে বাহির বাটিতে যাইত। সে সময়টা তাহারা নানা হাস্যালাপে বাড়িটা মুখরিত করিয়া তুলিত।

ওদিকে যেমন ভৃত্যদের সুমুখে আমাদের বাহির হইবার নিয়ম ছিল না দাসীরাও তেমনি বাবুদের সহিত কথাটি পর্যন্ত কহিত না; এক হাত ঘোমটায় মুখ ডাকিয়া কাজ করিত। বাবুদের সন্নিকটে জল কি পানটি পর্যন্ত লইয়া যাওয়ার তাহাদের অধিকার ছিল না তাই দিদিমার অনুপস্থিতিতে আমরা বৌয়েরা বাবুদের সম্মুখে যাইতাম। সেখানে কোন ভৃত্য উপস্থিত থাকিলে সে অমনি সবিয়া যাইত। ভৃত্যের সমুখে আবশ্যক হইলেও কোন বৌ ঘোমটা দিয়াও স্বামীকে জল বা পান কিছুই দিত না। তিনি যে কোন প্রকারে তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতেন। তখন আমাদের বাড়ীর অবিবাহিত মেয়েরা সবে মাত্র বেথুন স্কুলে পড়িতে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা ৮টার সময় — হয়ত দিদিমা গঙ্গাস্নান করিয়া আসার পূর্বেই ডাল, আলু ভাতে, ডিমসিদ্ধ, মাছভাজা, মাখন, কাঁচা দুধ ও মিষ্টি দিয়ে আহার সমাধা করিয়া কাপড় চোপড় পরিয়া সদর দরজায় গাড়ির অপেক্ষায় বই সেলেট হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে — তাহারা ঘরের কোন কাজ করিতে অবসর পায় না।

দশটা সাড়ে দশটা বাজিলেই দিদিমা রান্নাঘরে আমাদের ভাত দেওয়াইতেন। রান্নাঘরটা খুব বড় ছিল; একদিকে আমিষ রান্না ও আর এক দিকে নিরামিষ রান্না হইতে। এ সকল হইয়াও যথেষ্ট স্থান ছিল আমরা সেখানেই প্রায় আহার করিতাম। "আঁশ হেঁসেলে" প্রায় এইরূপ রান্না হইত। মুগ, খাঁড়িমসুর — হয় পেঁজ দিয়া না হয় টক দিয়া ও কখনো হাঁসের ডিম সিদ্ধ বা ভাজা বা ডালনা, লাউ কাঁকড়া বা লাউচিংড়ি, আলু পটল ভাজা মাছভাজা, অম্বল, কখনো কখনো

চিংড়ী মাছ দিয়া পুঁইশাক চচ্চড়ি, কুমড়ো চিংড়ি এই সব দল বদল করিয়া হইত। অড়হর, ছোলা, মটর প্রভৃতি ডাল দিদিমা রাঁধিয়া খনিকটা 'ওবেলার জন্য' রাখিতেন; বাবুদের গরম করিয়া দেওয়া হইত।

দিদিমার রান্না খাবার জন্য বাড়ি সকলে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাই প্রত্যহই দিদিমা কিছু কিছু ব্যঞ্জন পাথরের পাত্রে ঢালিয়া রাখিতেন। দিদিমাকে অনেক রাঁধিতে হইত — বাড়িতে বিধবা ৩/৪ জন ছিলেন — দিদিমাই সকলের রাঁধিতেন — তাঁহারা যোগাড় দিতেও বড় একটা অবসর পাইতেন না। তাঁহাদের আহ্নিক পূজা সারিতে ১১/১২টা বাজিত। তাঁহারা নিজেদের ঘরের কাজকর্ম, পুত্র পৌত্রাদির পরিচর্যা করিয়া স্নান আহ্নিক করিতে যাইতেন। আর সকল সময় তাঁহারা সবই কলিকাতার "বাসায়" থাকিতেনও না। দুজন বা দুমাস আছেন — আবার দেশে গেলেন— সেখানে বা দুমাস রহিলেন অন্যরা আসিলেন এইরূপ চলিত। বধূরা কখনো কখনো দেশে বা পিত্রালয়ে যাইত — কেবল "বাবুরা" পূজার সময় বা স্ত্রী দেশে থাকলে কোন এক শনিবারে দেশে যাইতেন। বাবুদের মা ছয়মাস দেশে থাকেলেও কেহ দেশে যাইতেন না — কিন্তু স্ত্রীটি ছয় দিনের জন্য গেলেও বাবুর অমনি মাছ ধরা বা আম খাওয়ার সখ্ পড়িয়া যাইত। শুনিয়া দিদিমা মুচকি মুচকি হাসিতেন — পাছে কেহ লজ্জা বোধ করেন তাই নিজে উপযাচক হইয়া বাড়ির ছেলেদের দেশে পাঠাইতেন। অনেক সময় বধূরা পিত্রালয়ে থাকিলেও যদি শ্বশুর শাশুড়ি জামাতাকে লইতে লোক না পাঠাইতেন — তবে দিদিমা গঙ্গা স্নানের ফেরত হয়ত কুটুম বাড়ী গিয়া ইঙ্গিতে জামাই লইয়া যাইতে উপদেশ দিয়া আসিতেন। বলিতেন; "আহা এই ওদের অমোদ প্রমোদের সময় — এর পর যখন সংসার ঘাড়ে পড়বে তখন কি আর ধুলো খেলার অবসর পাবে।" কিন্তু শ্বশুর বাড়ি শনিবার গিয়া সোমবার ভোরেই ফিরিতে হইত — অথবা কখনো কখনো রবিবার সকালেই আসিবার আদেশ দেওয়া হইত — বিশেষ আগ্রহ না দেখাইলে — রবিবার থাকিতে দেওয়া হইত না। ছেলেদের পরীক্ষার সময় এ বিষয়ে কর্ত্তা বড় অধিক কড়াক্কড় করিতেন — কিন্তু দিদিমা অত ভাল বাসিতেন না। তিনি বলিতেন "আহা

বৌ এর মুখখানি মধ্যে মধ্যে না দেখলে ওদের পড়া শুনায় উৎসাহ হবে কেন।" দিদিমা যে ব্যবস্থা করিতেন তাহাতে কেহ দ্বিরুক্তি করিতেন না, সকল কার্য তাঁহার অনুমতি ও উপদেশ লইয়াই নিষ্পন্ন হইত। এমন কি প্রত্যেকে প্রত্যহ অপিস স্কুল যাত্রার সময় "দিদিমা আসি — পিসিমা আসি, জেঠাইমা আসি," ইত্যাদি বলিয়া তবে যাইতেন। দিদিমা হাতের কাজ রাখিয়া প্রত্যেকের সমুখে আসিয়া "এস দাদা, এস বাবা" বলিয়া শুভ কামনা করিতেন।

দিদিমা রাঁধিতেন — আমরা ভাত খাইতাম। বাড়ির অনেক বধূ তাহার শাশুড়ির সহিত কথা কহিত না —, কিন্তু দিদিমার সহিত কথা কহিত। দিদিমা বলিতেন আমার সহিত কথা কহিতে অছে। যদি কোন বধূর কাজে বা কথায় কোন ত্রুটি হইত — দিদিমা একটু অল্প হাসিয়া বলিতেন "ছিঃ ও কথা বল্‌তে নাই — অথবা এমন কাজ আর কোর না।" দিদিমার এইটুকু কথায় আমরা যেরূপ শাসিত হইতাম— অন্য গৃহিণীদের সারাদিন বকুনির ঝড় বহিলেও সেরূপ হইত না — বরং বকুনির চোটে কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির করিয়া তুলিতাম।

বেচারা দিদিমা এমন অবস্থায় বড় বিপদে পড়িতেন। গৃহিণীকে বলিতেন "আহা, ছেলে মানুষ বুঝতে পারেনি, আহা আর করবে না।" আর করবে না।" বধূকে বলিতেন, "কাঁদতে নেই — আমরা না শেখালে তোমরা শিখবে কেন দিদি।" আমরা বলিতাম "আমরা বলিতাম "আপনি বারণ করিলেই ত আমরা শুনি — তবে উনি অত বকেছেন কেন।" দিদিমা বুঝাতেন, "আহা ওর শোক তাপের শরীর" কখনো বলিতেন "আহা ও একটু রাগী মানুষ — সকলের কি স্বভাব সমান হয় — তা বলে বৌমানুষকে কাঁদতে নেই সব সইতে হয়।" আমাদের ভাত খাওয়ার সময় দিদিমা নানা প্রকার গল্প করিতেন, যাহার যে ত্রুটি সংশোধন করিতেন। যে বধূ যে নিরামিষ তরকারি ভালবাসে তাড়াতাড়ি তাহাকে সেই তরকারিটি রাঁধিয়া দিতে প্রয়াস পাইতেন। "দিদি বসে খাও — এই ঝালের ঝোল হল' বলে"। প্রত্যেককে দিদিমা সমভাবে যত্ন করিতেন প্রত্যেককেই মিষ্ট কথায় বশীভূত করিয়াছিলেন।

আমাদের আহার শেষ হইলে "বামন মেয়ে" লোকজনদের ভাত দিত

— সে আমাদের স্বজাতি, তাই দিদিমার হাতের ব্যঞ্জনাদি খাইত। কিন্তু সিদ্ধ চাল খাইত বলিয়া সে তাহার ভাত নিজে স্বতন্ত্র রাঁধিত। দিদিমা ও অন্য গৃহিণীরা আতপ চাল খাইতেন — অন্য গৃহিণীরা রাত্রে লুচি ও আলুনি ভাজা খাইতেন, কিন্তু দিদিমা দুগ্ধ ফল ও সন্দেশ ছাড়া অন্য কোন জিনিস খাইতেন না। যদি কোনদিন লুচি খাইতে সাধ হইত তবে দুপুর বেলা ভাতের সহিত খাইতেন। দিদিমার আহারাদি শেষ হইতে বেলা প্রায় ২। ৩টা বাজিয়া যাইত। ইতিমধ্যে আমরা পুতুল খেলিয়াছি — কেহ বা এক ঘুম ঘুমাইয়াছি — এবং যে কেহ একজন নজর রাখিয়াছি দিদিমা কখন আহারে বসেন। দিদিমার আহারের সময় প্রায় আমি চেলির বা গরদের সাড়ী পরিয়া দুধটুকু জলটুকু দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতাম। সে সময়ে আমিই বাড়ির সর্ব্বকনিষ্ঠ বধূ। সুতরাং পাকাচুল তোলার ভার আমার ছিল। আহারান্তে দিদিমা যখন দোতালার দালানে আঁচল পাতিয়া একটু ''গড়াইতেন'' তখন পাকাচুল তুলিতাম। দিদিমা বলিতেন; আহা নাতবৌয়ের হাত যে — মাথায় হাত দিলেই ঘুম পায়। বলিতে না বলিতেই দিদিমা নিদ্রার কোলে গা ঢাকিয়া দিতেন। নাতবৌএর হাতের গুণে যে এত শীঘ্র নিদ্রা কর্ষণ হইত তা ঠিক নয়। রাত্রি ১১/১২টার সময় দিদিমা শয্যাগ্রহণ করিতেন; আর ২/৩টায় তাঁহর নিদ্রাভঙ্গ হইত। এক ঘুমের পর নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি আর শয্যায় থাকিতেন না। তপ জপে নিযুক্ত হইতেন। সুতরাং নিদ্রার দোষ কি! আদেশ ছিল যে নিদ্রাকর্ষণ হইলেই যেন আমি উঠিয়া যাই। দিদিমা বলিতেন — ''আহা ওরা ছেলে মানুষ খেলা করবে, ওরা কি চুপ করে ঘোমটা দিয়ে বসে থকতে পারে।'' এক ঘন্টার মধ্যে দিদিমার নিদ্রাভঙ্গ হইত; দিদিমা একবাটী দুধ গরম করিয়া নিজের হাতে আমাকে খাওয়াইতেন। পরে চুল বাঁধিয়া দিয়া কাপড় ছাড়িতে পাঠাইয়া সকলের জলযোগের ব্যবস্থা করিতেন। এ সকল হইয়া গেলে নিজে কাপড় ছাড়িয়া মালা হাতে করিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে আমার রামায়ণ বা মহাভারতের কোন স্থান হইতে পড়িয়া শুনাইতে হইত। কখনও বা কোন প্রতিবেশীর বা আত্মীয় স্বজনের বাড়ী কথকতা হইতেছে সন্ধান পাইলে তাঁহার দৈনিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিত। সে সময় দিদিমা চুলবাঁধা

প্রভৃতির ভার অপর কোন গৃহিণীর উপর দিয়া মালা হাতে করিয়া তিনটার পূর্ব্বেই "কথা" শুনিতে যাইতেন। সন্ধ্যার সময় দিদিমা সন্ধ্যা বন্দনা সারিয়া লুচি রুটি করিতেন। রাঁধুনি তরকারি রাঁধিতে। গৃহিণীরা নিজেরা ময়দা মাখিতেন। লুচি ভাজা ও রুটি সেঁকার ভার দিদিমাই গ্রহণ করিতেন;— দাস দাসী ব্যতীত রাত্রে প্রায় কেহই ভাত খাইত না।

সকলকে আহারদি করাইয়া প্রাতঃকালের জন্য ভাঁড়ার বাহির করিয়া এবং কিছু কিছু তরকারি কুটিয়া রাখিয়া নিজে যৎ-কিঞ্চিত জলযোগ করিবার পর দিদিমা যখন বিছানায় যাইতেন প্রায় রাত্রি ১২টা বাজিত। আবার ৩টা বাজিলেই প্রায় উঠিয়া বিছানায় বসিয়া জোড়হাত করিয়া ধ্যান করিতেন। ভোর ৪টার সময় হাত মুখ ধুইয়া গো-সেবা করিতেন। ৫টার সময় ঘটি, নামাবলী, তসর কাপড় ও পুষ্প পাত্র হাতে করিয়া "ওমা বামন মেয়ে ও দিদি নাতবৌ ওঠো মা বেলা হয়েছে—আমি তবে এখন আসি," বলিয়া গঙ্গা স্নান করিতে বাহির হইতেন। আমারও ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত — শুনিতাম বৈষ্ণব ভিখারী গাহিতেছে —

হরি কোথা হে — তুমি কোথা হে

ও বিপদের কাণ্ডারি — তুমি কোথা হে —?

দিদিমা আমার শাশুঠাকুরাণীর মাতাও নহেন শাশুড়ীও নহেন — শাশুঠাকুরাণীর মাসী ছিলেন। দিদিমা বাল-বিধবা চিরদিন পিত্রালয়ে বাস করিতেন। তাঁহার অল্প কিছু জমা ছিল — তাহার আয় হইতেই তাঁহার ধর্ম্ম - কর্ম্ম ব্রত-নিয়ম প্রভৃতির খরচ পত্র চলিত-- হাতখরচের জন্য কখোনো দিদিমাকে কাহারও কাছে হাত পাতিতে হইতে না। এমন তীর্থ ছিল না যাহা দিদিমা উদ্‌যাপন করেন নাই। আজিও সকলে একবাক্যে বলেন যে দিদিমার পূণর্জ্জন্ম কখনই হইবে না।

আমি যখন তাঁহাকে দেখিলাম, তখন তিনি ইহলোকের সকল কার্য সমাধা করিয়া পরলোকের দিকে চাহিয়া আছেন — কিন্তু তা বলিয়া তিনি নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতেন না। আমাদের শাশুড়ি ঠাকুরানি অনেক গুলি অপোগণ্ড শিশুসন্তান লইয়া অল্পবয়সে বিধবা হইয়া কায়ক্লেশে যখন সন্তানদের মানুষ

করিয়া তুলিয়াছেন — কন্যা ও পুত্রদের বিবাহ দিয়াছেন — মনে করিতেছেন এইবার আমি একটু নিশ্চিন্ত হইয়া বসিব — এমন সময় অকস্মাৎ তাঁহার ডাক পড়িল তিনি চলিয়া গেলেন। পুত্রেরা একমাত্র মাতাকেই পিতা মাতা উভয়ই জানিতেন— বধূরা নিতান্ত বালিকা — অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনায় নাবিকহীন তরীর মত সকলে অকুল সমুদ্রে ভাসিতেছেন — শুনিয়া করুণাময়ী দিদিমা আসিয়া তাঁহাদিগকে স্নেহবক্ষে তুলিয়া লইলেন। আমাদের শাশুড়ি ছিলেন না কিন্তু জাঠশাশুড়ি খুড়শাশুড়ি ছিলেন এবং যথেষ্ট যত্ন আদর করিতেন — কিন্তু তবুও অভিভাবক হইলেন দিদিমা; — তাঁহাকে নহিলে চাতিন না — দিদিমাও আনন্দর সহিত আত্মদান করিলেন। তাঁহার পিত্রালয়ে তিনিই গৃহিণী ছিলেন — এখানেও তিনি গৃহিণী। ঘরে গাড়ি ছিল কিন্তু দিদিমা কোন দিন গাড়ি করিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেন না। অমাবস্যা পূর্ণিমা একাদশী প্রভৃতি বিশেষ পর্বে অন্য গৃহিণীরা গঙ্গাস্নানে বা কালীঘাটে গাড়িতে যাইতেন — কিন্তু দিদিমার সেই নিয়মিত ব্যবস্থা। প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় কালীদর্শন করিতেই প্রত্যুষে উঠিয়া পদব্রজে কালীঘাটে যাইয়া আদি-গঙ্গায় স্নান করিয়া কালীদর্শন, সন্ধ্যাবন্দনা-সমাপন করিয়া বেলা ১১টায় গাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেন। বলিতেন "বর্ষা বা শীতের দিনে আমি অনায়াসে পায়ে হেঁটে কালীঘাট থেকে আসতে পারি — কিন্তু অনেক বেলা হয়ে যাবে — অনেক খাবার করার আছে — ওরা কখন করবে, আহা পেরে উঠবে না — তাই তাড়াতাড়ি করে আসছি।" অমাবস্যা পূর্ণিমায় বিধবারা কেহইত ভাত খান না, কার্যেই ঐদিন বিস্তর রুটি লুচি তৈয়ারি হইত।

গৃহিণীরা কালীঘাটে গঙ্গাস্নানে সর্বদা যাইতেন — আর কাঠের পুতুল, পুথিঁর মালা পিতলের খেলনা, কাঠের খেলনা — সংসারের কার্যের উপযোগী হাতা বেড়ি খুন্তি বেলন নোড়া বোক্‌নো হাঁড়ি চাটু কড়াই কত কি কিনিয়া আনিতেন — দেখিয়া দেখিয়া আমাদের কালীঘাটে ও গঙ্গাস্নানে যাওয়ার জন্য প্রবল ইচ্ছা হইত কিন্তু কিছুতেই বাবুদের মত হইত না। বাবারা তখন সবে এম এ, বি এ পাশ করিয়াছেন। আমাদের বাহির হইবার হুকুম ছিল না। আবার সাবেক নিয়মে তখন কাশীপুর বরানগর যাইতেও পাল্কিতে অথবা নৌকায় যাইতে

হইত — গাড়ি চড়িতে পাইতাম না। ভাড়াটে গাড়ি ত নয়ই — নিতান্ত কোনদিন পাল্কি-বিভ্রাট ঘটিলে ঘরের গাড়িতে চড়িয়া যাওয়া চলিত। এইরূপ পাল্কি-বিভ্রাট একদিন আমার অদৃষ্টে ঘটায় দিদিমা আমার উপর বিরক্ত হইয়া ছিলেন।

আমার পিতামহাশয় বিদেশে কার্য করিতেন — মাতাও পিতার নিকট বিদেশে, সুতরাং আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার আবশ্যক ছিল না। জ্যেঠা খুড়া যদি লইয়া যাইতেন — একদিন গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দিদিমা বলিলেন — নাতবৌ তোমাকে এতদিন বলি নাই দিদি,— আহা ছেলে মানুষ ভাবনা চিন্তা করবে — তোমার জাঠতুত ভাইটির বড় অসুখ — আহা বাঁচবার কিছু ছিল না — অনেক চিকিৎসায় হরির কৃপায় প্রাণ পেয়েছে, তুমি একদিন যাও তাকে দেখে এস। আমি প্রতিদিন গঙ্গাস্নানের ফেরত তাকে দেখে আসি — এখন প্রাণের আশা হয়েছে তাই তোমায় বলছি। তাঁদের এখনতোমায় নিয়ে যাবার সময় নয় — তুমি আপনি যাও।

আমি নিতান্ত বালিকা এগার বৎসর মাত্র বয়স — দিদিমা আমাকে তাই জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। আমার বেশ মনে পড়ে আমাদের ননদদিগকে কেহ আনিতে না গেলেও তাঁহারা মধ্যে মধ্যে নিজেরাই আমাদের এখানে অর্থাৎ পিত্রালয়ে আসিতেন। আমি ভাবিতাম আমি কবে অমনি ইচ্ছা করিলেই পিত্রালয়ে যাইতে পাইব। তাই আজ দিদিমা যেই বলিনেন "তুমি আপনি যাও"— অমি ভাবিলাম অমি তবে একজন। ২/৪ দিন পরে দিদিমা একদিন বলিলেন যে "আজ তুমি ভাত খেয়ে যাও — অসুখের বাড়ি না খেয়ে গিয়ে ব্যস্ত কোরে কাজ নাই।" আর কোথায় আনন্দ রাখি — অসুখ দেখতে যাওয়ার ত ভারি ভয় ভাবনা — অকস্মাৎ যে গিয়ে পড়ে সকলকে বিস্মিত করে দিব এই আনন্দ! সমবয়স্কা এক ভাশুরঝি ও একটি ছোট ভাগিনেয়ী ধরিল আমরাও যাইব। সে ত আরও ভাল। নিজেরাই ঠিকঠাক হইলাম — দিদিমার অনুমতি নেওয়াও নেই কিছুই না। দিদিমা বলিয়া দিয়াছিলেন পাল্কি ডাকাইয়া লইয়ো। পিত্রালয় হইতে লইতে আসিলে অর্থাৎ পূর্বদিন যদি কেহ আসিয়া বলিয়া যাইত "কাল দিন ভাল আছে অমুককে পাঠাইয়া দিতে হবে"— তবে অনেক সময় দিদিমা

বলিতেন "তোমাদের আর কাকেও আসতে হবে না — আমি এখান থেকেই পাঠাইয়া দিব।" আর ইহাও বলিয়া দিতেন যে "এত দিন রাখিয়ো।" তাই যে বধূ যখন যাইত, প্রস্তুত হইয়া পাল্কি আনাইত, যাবার সময় সকলকে প্রণামদি করিয়া বিদায় লইয়া যাইত। আজ আমি যখন প্রস্তুত হইয়া পাল্কি আনাইতে পাঠাইলাম — তখন গৃহিণীরা সকলে আহারে বসিয়াছেন — আমি আনন্দে এমনি বিহ্বল যে তাঁহাদের আহার শেষ হওয়ার বিলম্ব সহে না; — সহিবেই বা কি করিয়া — ২টা বাজে — কখন যাইব; —সন্ধ্যায় ফিরিতে হবে— কতটুকু সময় আর আছে? কাজেই খুব তাড়া দিয়া ঝিকে পাঠাইয়াছি। এখন ঝি মহাশয়া বাহিরে চাকরদের কিছু না বলিয়া নিজেই গজেন্দ্রগমনে গিয়া এক ভাড়াটে গাড়ি ডাকিয়া আনিয়াছেন। আমরা যাত্রীদল প্রস্তুত একজন পিত্রালয়ের ঝি— একজন শ্বশুরালয়ের; তারপর আমি ও ভাগিনেয়ী ও ভাশুরঝি চলিয়াছি; রান্নাঘরের দরজায় গিয়া "দিদিমা আমরা যাচ্ছি" বলিতেই দিদিমা উন্মুখ হইয়া বলিলেন "পাল্কি এসেছে? আমি "পাল্কি নয় গাড়ি" বলিতে বলতে অন্তঃপুরের দ্বার ছাড়াইয়াছি; — দিদিমা আর কি করিবেন "ও মা ও ঝি সাবধানে নে যাস্ আর রাত করিসনে; বেলাবেলি এস মা"— এইরূপ বলিতে লাগিলেন — আমরা শুনিতে শুনিতে গেলাম। গাড়িতে উঠিয়া বলিলাম "কই চাকর নিলিনে" — ঝিয়েরা বলিল আমরা দুজন আছি আর চাকর কেন। আমি বলিলাম "গাড়ি আনলি কেন? ঝি বলিল "আড়ায় পাল্কি ছিল না, দেরি হয়ে যাচ্ছে তাই গাড়ী আনলুম — দেখ দেখি কেমন মজা — বেশ সবাই গাড়িতে যাচ্ছি — পাল্কি হলে তোমরা ত সুখে যেতে আমাদের ভাত খেয়ে ছুটতে ছুটতে প্রাণ যেত।" তারপর বেশ সুখেই কয়েক ঘন্টা কাটান গেল! কোথায় বা বেলাবেলি আসা — যার নাম রাত নটা। সকলেই প্রফুল্ল মনে — আবার এক ভাড়া গাড়ি চলিয়া আসিয়া হাজির। ঝম্ ঝম্ মলের শব্দে হিহি রবে বাড়ি জাগাইয়া আমরা আসিলাম — আমি বধূ — দিদিমাকে প্রণাম করিতে গেলাম। দিদিমা তখন নাতিদের পরিবেশন করিতেছেন — রাত্রে দোতলার একটা ঘরে খাওয়া হইত — ঘর হইতে দিদিমা বাহিরে আসিলে প্রণাম করিলাম — তখন

দিদিমাকে স্পর্শ করিব না — গাড়ির কাপড় — পদধূলি লইলাম না। দিদিমা কিছু বলিলেন না দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মুখের দিকে চাহিয়া দেখি দিদিমার মুখ অসম্ভব গম্ভীর। ঘর হইতে কর্তা বলিলেন "দিদিমা কার হুকুমে গাড়ি চড়ে যাওয়া হয়েছিল।" কোথায় গেল সে আনন্দস্রোত -- বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল — এদিকে অন্য গৃহিণীরা ঝিয়েদের উপর ঝঙ্কার দিতেছেন — গাড়ি চড়ে নিমন্ত্রণ খেতে গেছলি — কার্য কর্ম্ম সব পড়ে আছে — রঙ্গকরে সব এলেন!"

কর্তা যাই বলিলেন "দিদিমা কার হুকুমে যাওয়া হয়েছিল," অমনি দিদিমা তটস্থ হইয়া বলিলেন "থাক্ থাক্ ছেলে মানুষ বুঝতে পারেনি ও কথা পরে হবে" — দিদিমার সেই বিরক্তির ভাব দূরে গেল, মুখচ্ছবি করুণায় ভরিয়া উঠিল। কর্ত্তা বলিতে লাগিলেন "কনে বৌ না বলা না কওয়া গাড়ি ডাকিয়ে বেড়াতে যায় এ কি রকম।" দিদিমা চুপ করিয়া রহিলেন -- তখন কর্তাতে ও অন্য গৃহিণীগণে ঝিয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঝি বলিল —"আড়াতে পাল্কি ছিল না — তাই গাড়ি এনেছি।" কর্তা বলিলেন, "তবে রাত্রে কেন গাড়িতে আসা হল?" আর উত্তর নাই, "দরওয়ান বা চাকর নেওয়া হয়নি কেন? উত্তর নাই —"এত রাত কেন" উত্তর নাই। "অসুখের বাড়ী তা ত বৌমা জানেন তিনি মেয়েদের কেন নিয়ে গেলেন, কার হুকুমে নিয়ে গেলেন — কাকে বলে নিয়ে গিয়েছেন। উনি যাচ্ছেন ওঁর বাপের বাড়ি এ বাড়ির মেয়েরা কেন গেল।" আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানায় গিয়া শুইলাম — খাওয়ার দরকার ছিল না; পিত্রালয় হইতে খাইয়া আসিয়াছিলাম --- নচেৎ সে রাত্রে আর খাওয়া হইত না। এই একটি দিন মাত্র এক মুহূর্তের জন্য দিদিমার মুখে আমার প্রতি বিরক্তির ভাব প্রকাশিত হইতে দেখিয়া ছিলাম।

দিদিমা সদাপ্রসন্ন, বর্ণ গৌর, পরিপাটি গঠন, দীর্ঘাঙ্গী, মাথার চুলছাঁটা। আধা কাঁচা পাকা ছোট ছোট কোঁকড়া কোঁকড়া চুলে দিদিমাকে অনেকটা পুরুষ মানুষের মত দেখাইত। অত্যন্ত বিরক্ত হইলে দিদিমা টেপা ঠোঁট আরও দৃঢ়ভাবে টিপিয়া থাকিতেন --- পাছে কোন কঠিন কথা বাহির হইয়া পড়ে তাই যেন

অত্যন্ত সাবধান হইতেন।

একদিন রাঁধুনির অসুখ। বাড়িতে পরিবার সে সময় বেশি ছিল না — আমিষ রান্না দিদিমাকে রাঁধিতে হইবে। দিদিমা সকল কার্য করিতেন — কিন্তু আমিষ রান্না রাঁধিতেন না — রাঁধুনির অসুখ হইলে বধূদের মধ্যে কেহ একজন মাছের ঝোল ভাত রাঁধিত। সেদিন আমি ছাড়া আর কোন বধূ ছিল না — আমি ছেলে মানুষ দিদিমাই রাঁধিবেন। দিদিমা গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন — ঠিক ফিরিয়া আসার সময় ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। রান্না ঘরে উনুন জ্বলিয়া যাইতেছে। দাসীরা চাল ধুইয়া বাঁটনা বাটিয়া মাছ কুটিয়া থরে থরে সমস্ত গুছাইয়া ঘর বার করিতেছে কতক্ষণে দিদিমা আসেন — বড় বাবুর আবার সেদিন তাড়াতাড়ি বাহির হইতে হবে।

আমার পান সাজা হইয়া গেল — তথাপি দিদিমা আসিলেন না দেখিয়া বুড়ো ঝি আসিয়া বলিল "বৌমা রান্না ঘরে চল আমি দেখিয়ে দেব এখন তুমি ভাতের হাঁড়িটা বসিয়ে ভাতটা চড়িয়ে দাও, ভাত হতে হতে মাঠাকরুন এসে পড়বেন।" আমি ভাতের হাঁড়ি নামাইতে গিয়া প্রথমেই একখানা সারা ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম্ — ঝি বলিল —"তা যাক্ যে, তুমি হাঁড়িটা বসিয়ে দাও, বড় বাবুর আজ বড় তাড়া।" ঝি অন্য কাজে গেল, আমি ভাতের হাঁড়ি চড়াইয়া হাঁড়ি পুরিয়া জল দিয়া সরা চাপা দিয়া উপরে চলিয়া গেলাম। একটা বিড়ালের সাদা ধবধবে মোটা সোটা একটা বাচ্চা হইয়াছিল — সেটাকে লইয়া খেলিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে চৈতন্য হইল যে হাঁড়িতে ত চাল দেওয়া হয় নাই অতএব এইবার যাওয়া যাক। পুরুষেরা অন্দব মহলে কেহ নাই, গৃহিণীরা দেশে গিয়াছেন একা দিদিমা আছেন — তাঁর অত আঁটা আঁটি ছিল না — আমি ঝমঝম দুড় দুড় করিতে করিতে বেড়ালছানা নাচাইতে নাচাইতে বলিতে বলিতে চলিয়াছি — "চল" তোমাকে ভাতে দিই গে যাই, চল তোমাকে ভাত দিইগে যাই।" সিঁড়ি হইতে দালানে পড়িতেই দেখি ভাশুর মহাশয় ও দিদিমা। অমনি লজ্জালীলা বধূ একহাত ঘোমটা টানিয়া এক দৌড়ে ছুটিয়া রান্না ঘরে প্রবেশ করিলাম। দিদিমা হাসিয়া বলিলেন "মরি মরি কি লজ্জা দেখ।" ভাশুর মহাশয়

বলিলেন "দিদিমা আজ নাকি বৌমা রাঁধছেন"। দিদিমা বলিলেন "হাঁ ঐ যে বেড়ালছানা ভাতে দিতে আসছে।" ভাশুর হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন "বুড়ো ঝি বল্লে — আমার তাড়াতাড়ি তাই সে বৌমাকে দিয়ে ভাত চড়িয়েছে। আমি ভাবিলাম — ছেলে মানুষ কি করেছে দেখে আসি।" দিদিমা বলিলেন — "তা হলেই আজ ভাত খেয়েছিলে আর কি, এক হাঁড়ি জল চড়িয়ে সরা ঢাকা দিয়ে উপরে বসে আছে। আমি এসে শুনি ভাত চড়ান হয়েছে, তা বলি, বেশ হয়েছে আর গুছিয়ে গাছিয়ে আমি — নাত বৌকে খাবার দিয়ে আসি — তা ঝি বল্লে মা ভাত হয় ত হয়ে এসেছে দেখুন দেখি — ওমা সারা খুলে দেখি টগবগ করে জল ফুটছে যেখানকার চাল সেইখানে মজুত আছে। তখন হাঁড়ির জল কতকটা ফেলে চাল দিই — দিয়ে এই উপরে যাচ্ছি। আহা কত খানি বেলা হয়েছে খাবার পায়নি কত ক্ষিদে পেয়েছে। তা যাও দাদা স্নান করে এস' বেড়াল ভাতে ভাত কখনো খাওনি — আজ ভাদ্র বৌ খাওয়াবে।" আমি ত রান্নাঘর থেকে সব শুনিতেছি— ভাশুর মহাশয় বাহিরে গেলে দিদিমাকে বলিলাম "জল না গরম হলে কি করে চাল দিব তাই জল গরম করতে দিয়ে গিয়েছিলাম।" দিদিমা মুচকি হাসিয়া বলিলেন "এক হাঁড়ি জল দিয়েছ চাল ধরত কোথায় — আজ যে পুড়ে খুন হও নাই এই রক্ষে।" তারপর আমাকে খাবার দিয়া অবসর মত আস্তে আস্তে বলিলে "শ্বশুর ভাশুরের কারো সামনে পড়লে ঘোমটা দিয়ে ঘাড়টি হেঁট করে আস্তে আস্তে চলে যেতে হয় — যেন মলের শব্দটি না হয় — অমন করে ছুটে যেতে নাই। তোমার শ্বশুর বাড়ির বড় আঁটআঁটি — তোমার দাদাশ্বশুর গোষ্ঠীপতি ছিলেন — শ্বশুর শাশুড়ি ত চিন্‌লে না দিদি কত বড় ঘরের বৌ তুমি কিছুই জান না! যে বকুনি খেলে তা ঐ ভাড়াটে গাড়ি চড়েছিলে বলে। এ বাড়ির বৌরা কখনো চড়ে নাই, তোমার শ্বশুর এমনি রাসভারী ছিল — আর এমন নিয়ম ছিল যে ৫ বছরের মেয়েটি পর্যন্ত বাহির বাড়িতে যেতে পেত না — এখন এই দেখ ১০/১১ বছরের মেয়েরাও স্কুলে যাচ্ছে। তবু তোমরা বৌ মানুষ তোমাদের সাবধান করে দিই। আর খেলা ধুলা যা করবে ঘরে কোরো — ছাতে উঠোনা জানালা

খুলে রেখ না — পাড়া প্রতিবাসী না দেখতে পায়।" দিদিমা কখনো ভর্ৎসনা করিতেন না। মিষ্ট ভাষায় হাসি মুখে এমন করিয়া বলিতেন যে কষ্ট হইত না, কিন্তু শিক্ষা হইত। দিদিমার দুই চারি দিনের কথা তাই আমার বিশেষ করিয়া মনে আছে আর একদিন দেশ হইতে ধোপা আসিয়াছে যখন, তখন হেঁসেল উঠিয়াছে, রাঁধুনি বেড়াইতে বাহির হইয়াছে — দিদিমা সবে একটু ঘুমাইয়াছেন — বুড়ো ঝি বলিল "বৌমা হাঁড়িতে ভাত তরকারি সব আছে এস ধোপাকে চাবটি বেড়ে দিবে" — কাজ করিতে বলিলে আমার মহা উৎসাহ — অমনি চলিলাম — গিয়াই যেমন সরাখানা ধরিয়া টানা — অমনি খানিকটা ঝোল গায়ে ফেলা। বেশ মনে আছে, সেদিন একখানি নূতন ধোয়া লাল ভোমরাপেড়ে শাদা খড়কে ডুরে পরিয়াছিলাম তাই গায়ে কাপড়ে ঝোলের প্রবাহ বহিয়া যাওয়ায় বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলাম — আধ ঘন্টা মাত্র পরিয়াই কাপড়খানা ধোপাকে ধুইতে দিতে হইবে কম দুঃখ। ধোপাকে ত ভাত দিলাম — এমন সময় দিদিমা আসিয়া আমার মূর্তি দেখিয়া অবাক্। মুচকি হাসিয়া ঝিকে বলিলেন — "আমায় ডাকতে হয় মা — ওকি কিছু পারে, দেখ দেখি গা ধুয়ে এসেছে আবার গা ধুতে চল্লো -- অসুখ না হলে হয়।" বুড়ো ঝি বলিলো, "তা মা বৌঝি এসব না করলে কি হয়।" দিদিমা বলিলেন, "বয়স হইলেই সব শিখবে, নাতবৌ আমার আদরের মেয়ে কিনা তাই একটু চঞ্চল — জল গড়াতে গেলে ঘরময় জল ঢালে, বেগুন কুটতে হাতে ফালা দেয়, — ও সব সেরে যাবে — বয়স হলেই ঘরকন্না ঘাড়ে পড়লেই সব শুধরে, যাবে। নাতবৌ এর সকল কাজে মন আছে, সময়ে সব শিখবে।" আমার মনে আছে এই দিন হইতে আমি শিখিলাম যে আমি সকল কার্যে অপারক কেন, — কেন আমাকে কোন কাজ দিয়া দিদিমা নিশ্চন্ত হইতে পারেন না — আমি ভারী চঞ্চল; — আমি সাবধান হইতে শিক্ষালাভ করিলাম। আমি যেরূপ অভিমানী ছিলাম তাহাতে দিদিমা যদি এই ভাবে আমাকে শিক্ষা না দিয়া তিরস্কার করিতেন; তা হইলে উল্টাফল হইত। আমি বোধ হয় তিরস্কৃত হইয়া প্রতিবাদের পর প্রতিবাদ করিতাম — নিজের দোষ দেখিয়া লজ্জিত হইতাম না।

তখন দিবসে স্বামীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ হওয়া বড় লজ্জার বিষয় ছিল। দিদিমা কিন্তু আমাদের এই নির্লজ্জতায় বিশেষ প্রশ্রয় দিতেন। ছুটির দিনে "নাতিরা" ঘরে থাকিলে, নানা অছিলায়, নাতবৌদের ঘরে পাঠাইতেন। "যাও জল দিয়ে এস" —'পান দিয়ে এস', 'ঘর গুছিয়ে এস'। প্রথম প্রথম আমি এক হাত ঘোমটা দিয়া ঘরে 'প্রবেশ ও প্রস্থান' করিতাম — ক্রমে ক্রমে বেশ অভ্যাস হইয়া গেল — পান জল দিতে গিয়া ঘন্টা খানেক কাটিত ঘর গুছাইতে সারা দুপুর লাগিত। পরে জানিতে পারিয়া ছিলাম অন্য গৃহিণীরা এজন্য দিদিমাকে তিরস্কার করিতেন — আমার সহজ বালিকাভাব দেখে ত তাঁরা "অবাক" হইতেনই। কেননা তাঁহাদের নিকট উহাই "বেহায়পনা"। দিদিমা বলিতেন "আহা ওরা দুটিতে হাসে খেলে আমি দেখে বড় তৃপ্ত হই।" অনেক সময় দিদিমা নিঃশব্দে আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেন ও মুচ্‌কি হাসিতেন — আমি অমনি এক হাত ঘোমটা টানিয়া বাহির হইয়া যাইতাম। দিদিমা ও নাতিতে হাসিতেন ও বলিতেন "ওঃ। কি লজ্জাঃ" অনেক সময় দরজা খোলা আছে — আমার মাথায় কাপড়ও নাঁই স্বামীঘরে আছেন — দিদিমা দুধের বাটি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার দিকে আমার দৃষ্টি পড়িলে ইঙ্গিতে ডাকিবেন; — স্বামী দিদিমাকে দেখিতেছেন ও হাসিতেছেন — আমি বক্তৃতা করিয়াই যাইতেছি, অকস্মাৎ দিদিমার দিকে দৃষ্টি পড়িল — সর্বনাশ একি! দিদিমার মুখ হাসি, মাথা নাড়িয়া ডাকিলেন। একদিন — বলিলাম "দিদিমা এ রকম করিলে হবে না — আপনি কেন সাড়া দিয়ে আসেন না।" দিদিমা বলিলেন "তোমরা হাস কথা কও আমি যে বড় দেখতে ভালবাসি। আহা ছোট নাতি, আমার বোনঝির কোলের ছেলে; মা হারা হয়ে পর্যন্ত বাছা আমার হাসেনি, কথা কয়নি। তোমার সঙ্গে হাসে কথা কয় দেখে প্রাণ ঠান্ডা হয়।" কিন্তু ক্রমে ক্রমে এমন হইল যে আমি ঘরে প্রবেশ করিলেই বাড়ির কেহ না কেহ "আঁড়ি পাতিতেন" — এবং আমার ছেলেমানুষী সরলতার শতধারে আলোচনা করিতেন। একদিন গম্ভীর মুখে দিদিমা বলিলেন, "নাতবৌ যখন ঘরে যাবে দরজা বন্ধ করে দিও" — বলিয়া আমার ঘরের সমস্ত জানালা দরজার ছিদ্রগুলি পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিলেন।

এই দিন দিদিমার মুখ অসম্ভব গম্ভীর দেখিয়াছিলাম। বিরক্ত হইলে দিদিমার মুখের প্রসন্ন ভাবটুকু চলিয়া যাইত। তাহা ব্যতীত কথা বা ব্যবহারে বিরক্তি প্রকাশ পাইত না। দিদিমা কখনো কাহারও ঘরে "আড়ি পাতিতেন" না। নিঃশব্দে আমার ঘরে যে আসিতেন — কেবল এক নজরে দেখিতেন আমরা আনন্দে আছি কিনা অন্য কেহ আড়ি পাতিলে তাঁহার ভাল লাগিত না।

এখন আমি বেশ বুঝিতে পারি যে যদিও দিদিমা সকলকেই সমভাবে দেখিতেন — তবুও যে কারণেই হোক আমার প্রতি যেন ঈষৎ পক্ষপাতী ছিলেন। আমি ছেলেমানুষ বলিয়া বোধ হয় আমাকে বেশি আদর দিতেন।

আমি পিতা মাতার একমাত্র সন্তান ছিলাম — এজন্য সাধারণ ভাবে প্রতিপালিত হই নাই। অনেক বয়স পর্যন্ত প্রচুর দুধের বরাদ্দ ছিল। "শ্বশুর বাড়ী যাইয়া মেয়ে আমার দুধ পাবে না;" মাতা ঠাকুরাণী এই চিন্তায় কাতর হইয়াছেন শুনিয়া দিদিমা বলিয়া পাঠাইলেন; "মাকো বলো যে, সে ভাবনা যেন না করেন।"

দিদিমা নিঃশব্দে নিয়মিত সময়ে ঠিক আমার মাতার মত দুধের বাটিটা আনিয়া আমার মুখে ধরিতেন। এবং সমস্ত নিঃশেষ করাইয়া তবে ছাড়িতেন। তিনি বুঝিয়া লইয়া ছিলেন, তা না হইলে বিড়ালবাচ্ছা অর্ধেক ভাগ পাইবে। জলপানি পয়সা আমার হাতে প্রচুর থাকিত, কোন ফেরিওয়ালা হাঁকিলেই সমবয়স্কা ভাশুরঝি ভাগ্নীরা তাহাকে ডাকিত; আমি পয়সা দিতাম। বাড়ির মহিলারা বিশেষ প্রাচীনারা নিন্দা করিতেন — দিদিমা বলিতেন "আমার নাত বৌ যে "দো-চোখের" ব্রত করিয়াছে, তাই যা দেখে তাই কেনে;" বলিয়া একটু হাসিতেন। এই সকল সরল বালিকা সুলভ ব্যবহারে দিদিমা কখনই বাধা দিতেন না।

মিথ্যা কথা প্রবঞ্চনাকে দিদিমা অতিশয় ঘৃণা করিতেন। সদাসর্বদা সকলের নিকট বলিতেন "নাতবৌ আমার মিথ্যা কথা কাকে বলে জানে না, — নাতবৌ-এর আমার পেটে একখানা মুখে একখানা নেই।" পূর্বেই বলিয়াছি আমার পিতা মাতা বিদেশে থাকিতেন এবং আমি একমাত্র সন্তান। সুতরাং আমি একা একা মানুষ হইয়াছিলাম — সংসারের কোন সংবাদ রাখিতাম না। নিজের পুতুল,

ঘুড়ি, ফুলপাতা লইয়া একা একা খেলা করিতাম। দশ বৎসর বয়সে বিবাহ হইল। এগার বৎসর বয়সে শ্বশুরবাড়ী গিয়া বৎসরেক কাল ভাল রহিলাম — এই নিতান্ত বালিকা বয়সে যদি দিদিমার যত্ন না পাইতাম — অন্য অন্য বালিকা বধূর মত শ্বশুরবাড়ির কঠোরতার মধ্যে পড়িতে হইত. — তবে আমার জীবন বোধ হয় আর এক ধারায় প্রবাহিত হইত। সত্যপ্রিয়তা, সরলতা, চঞ্চলতা, মুখরতা আমার বিলক্ষণ প্রকাশ পড়িত। দিদিমা গুণের প্রশয় ও দোষের সংশোধন করিতেন। কিন্তু কখনই তিরস্কার করিতেন না। তাই দিদিমা কথায় বিশেষ ফল হইত।

এগার বৎসরের বালিকার পক্ষে একাদিক্রমে বৎসরেক কাল শ্বশুরালয়ে কাল যাপন করা কতখানি কষ্টকর তাহা বোধ হয় প্রত্যেক মহিলাই বুঝিতে পারিবেন। বিশেষত আমাদের পশ্চিমাঞ্চলে বাস ছিল বলিয়া বেড়াইবার খুব সুবিধা ছিল। প্রতিদিন সকাল বিকাল মাঠে ও বাগানে বেড়াইতাম, মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, সার্কাস দেখা সদা সর্বদাই ঘটিত। বিবাহের পর একেবারে সে সব বন্ধ। দশ বৎসরের বালিকাকে একেবারে অবগুণ্ঠিতা বধূ হইতে হইল। এই পরিবর্তনে পিত্রালয়েরই বিষম কষ্ট হইত — তারপর সুদীর্ঘ এক বৎসর কাল শ্বশুরালয়ে বাস। একদিন বিকাল বেলা অকস্মাৎ তিন চারজন দাসী সন্দেশ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, কমলালেবু, বাদাম, পেস্তা, আঙুর প্রভৃতি লইয়া আসিয়া সংবাদ দিল, — আমার মা আসিয়াছেন, — কাল প্রাতে পালকি আসিবে আমি পিত্রালয়ে যাইব; — সে কি আনন্দ! ঝিয়েদের ধরিয়া বসিলাম যে, — কেন এখনি নিয়ে যাবিনে — কেন কালকের কথা বল্লি; — মায়ের উপর খুব রাগ করিলাম, — কাঁদিয়া দিদিমাকে বলিলাম আমাকে এখনই পাঠাইয়া দিন। দিদিমা বুকে টানিয়া লইয়া সজল নয়নে বলিলেন, — আহা যাবে বইকি — আজ অবেলাদিন ভাল নয় — পুরুষেরা কেউ বাড়ি নেই একবার তাদের বলি; — কাল ভোরেই পাঠিয়ে দেব — কেঁদো না দিদি চুপ কর। একটা রাত বইত — নয় — আর কি এই ত চল্লে — আবার কতদিনে আসিবে।" আমি শান্ত হইলে মিষ্টি হাসিয়া বলিলেন, "আমার নাতিকে যে ফেলে যাবে

— তোমার মন কেমন করবে না?" আমি হাসিতে লাগিলাম — ভাবটি এই যে, — একথার কোনই মূল্য নাই। পরদিন তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিতে চাহি — দিদিমার নাতি তাহাতে বাধা দিলেন। বিদায় গ্রহণের সময় দেখিলাম তাহার চোখে জল পড়িতেছে — মনে একটা বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িল।

পালকি আসিয়াছে, আমি "জল খাবার" খাইয়া প্রস্তুত হইয়া আছি — দিদিমা গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিলেই পাল্কিতে উঠিব। নিয়মিত যে সময় তিনি আসেন তাহার অপেক্ষা তাড়াতাড়ি আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন — আমার আর বিলম্ব সহে না — বলিতে লাগিলাম "দিদিমা ত এখনও আসিলেন না — তবে আমি যাই। একটা ভাগিনেয়ী যাইয়া বাহির বাটিতে প্রচার করিল — ছোট মামিমা এখনি চলে যেতে চাচ্ছে — ঝি-মা (দিদিমা) এখন কত বেলায় আসবেন কে জানে। শুনিয়া ভাশুর মশায় বাড়ির মধ্যে আসিয়া এক ধমক দিয়া বলিলেন — "ছোট বৌমা কি বলছেন — দিদিমা না এলে যাওয়া হবে না — এ বেলা পাল্কি ফিরিয়া যাক।" সর্বনাশ, আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। — সেই মুহূর্তে মূর্তিময়ী করুণা স্বরূপ দিদিমা বলিতে বলিতে আসিতেছেন, "তাড়িতাড়ি করে আসছি, বেলা হয়ে গেলে নাত-বৌ আমার ব্যস্ত হয়ে পড়বে — তোরা ওকে আজ কি বলে বক্‌লি — আহা কতদিন মাকে দেখেনি ব্যস্ত হবে না — আহা কাঁদছে। দেখ দেখি আজ কিনা কাঁদলি।" ভাশুর মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "কেন বৌমা কাঁদছেন কেন — আমি বেশিত কিছু বলি নাই" — বলিতে বলিতে তিনি সরিয়া পড়িলেন। দিদিমা আমাকে শান্ত করিয়া পাল্কিতে তুলিয়া দিতে দিতে — বলিলেন "আমার নাতি একলা রইল — শীঘ্র করে এস, — এই তোমার ঘর বাড়ি। জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ে জন্ম জন্ম এই ঘর কর।" দিদিমার চোখে জল পড়িতেছিল।

হর্ষবিষাদ পূর্ণ হৃদয়ে চোখে জল ঠোঁটে হাসি লইয়া পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলাম। মাকে প্রণাম করিয়া মুখ তুলিতেই মা বলিলেন 'তুই কেঁদেছিস্ তোর বুঝি আসতে ইচ্ছা ছিল না"। অবরুদ্ধ স্রোতে যেমন বাঁধ ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া বাহির হয় — আমি মায়ের কোলে বসিয়া তেমনি করিয়া খুব কাঁদিলাম, মা কেবল

বলিতেছেন — "আরে একি কাঁদিস কেন?" বলতে পারি না কেন কাঁদিতেছি বা কাহার জন্য কাঁদিতেছি — অশ্রুস্রোত কিছুতেই রোধ করিতে পারিতেছি না যে।

মেয়ে-যজ্ঞি

শরৎকুমারী চৌধুরাণী

মেয়ে যজ্ঞি বলিলেই বুঝিতে হইবে বিশৃঙ্খলার সমষ্টি! প্রাতঃকাল হইতে ভিয়েনের গন্ধে, দাসীর কলরবে, ছেলের কান্নায়, মলের রুনুঝুনুতে, চুড়ির ঝন্ঝন্ শব্দে যজ্ঞিবাড়ি সরগরম। পিচ্ছলে তাড়াতাড়ি চলা যায় না, অথচ হাতে অনেক কাজ, তাড়াতাড়ি করিতেই হইবে - সুতরাং কেহ আছাড় খাইয়া লোক হাসাইতেছে, কাহারও ঢাকাই শাড়িতে কাদা লাগায় মন খুঁত খুঁত করিতেছে , কোনো ছেলে 'সন্দেশ খাব রে' বলিয়া সেই কাদাতেই গড়াগড়ি দিতেছে।

একটি ঘরে' বড় বড় বঁটি পাতিয়া সধবা, বিধবা, যুবতী,প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, কুৎসিতা, সুন্দরী মহিলারা তরকারি কুটিয়া ঝুড়ি-ঝোড়া বোঝাই করিয়া দিতেছেন, হাসি গল্পের বিরাম নাই। বাঙালির মেয়েরা প্রত্যেকেই ইংরাজ মহিলাদের মত সুস্বরের প্রতি মনোযোগিনী নহেন, সুতরাং কেহ বা কোকিল-কণ্ঠে, কেহ বা মোটা গলায় উচ্চস্বরে কথা কহিতেছেন।

শিশুসন্তান আসিয়া মাতাকে বিরক্ত করিতেছে-অনেকক্ষণ মায়ের ভ্রূক্ষেপ নাই-হাতে কাজ, মুখে গল্প, ঠোঁটে হাসি-যখন ছেলে পঞ্চম স্বরে -'মা খাবার দেনা, আ-আ'- বলিয়া ক্ষুদ্র হাতে দু-একটা চড় দিল বা মাথার কাপড়টা খুলিয়া দিল-তখন মা, 'আ মোলো যা হতভাগা ছেলে, তর সয় না' বলিয়া ক্ষুদ্র হাতের মৃদু চড়ের ঋণ সুদসুদ্ধ ফেরত দিয়া আবার গল্পে মনোনিবেশ করিলেন। কেহ বা, 'এই যে বাবা, দিচ্ছি খাবার দিচ্ছি চল, ক্ষিদে পাবেই তো' বলিয়া গল্পের হারানো খেই খুঁজিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে গল্পে প্রবৃত্ত হইলেন। ছেলে কাঁদিয়া 'যজ্ঞি বাড়ি' বলিয়া জানান দিতে লাগিল।

আর একটা ঘরে বালিকারা ও ছোট ছোট বধূরা পান সাজিতেছে। ঘোমটার প্রান্তে হাসিমাখা লাল লাল ঠোঁটের উপর নোলকটি ঝুলিতেছে। হাত দুখানি চুন খয়েরের দাগে রঞ্জিত; মাঝে মাঝে নিজের হাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সকলের বিষম ভাবনা হইতেছে যে, এই হাত লইয়া কেমন করিয়া লোকের সামনে বাহির হইবে-কেহ বা 'কি ক'রে এ দাগ উঠিবে ভাই ' বলিয়া হাসিয়া আকুল হইতেছে। কেহ বা দাগ উঠিবার উপায় বলিয়া দিতেছে। এই ঘরে শিশুর কলরব বড়ো একটা নাই, যদি কোনো শিশু 'দিদি, নে-না' বলিয়া আসিতেছে, অমনি তাহার দিদি যা যা, ঐ ঘরে মা আছে , যা বলিয়া সদ্যই বিদায় করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছে।

এমন সময় ডাক পড়িল — 'ওরে, এই বেলা সবাই ভাত খেয়ে নে— না গো — এখনই যে সব মেয়েরা আসতে আরম্ভ করবে, দুটো বেজে গেছে।'

দালানে সারি সারি কলাপাতায় ভাত ও পাঁচ সাত প্রকার তরকারি একটু একটু দিয়া পাতা সাজানো আছে। ভাত শুখাইয়া চাল হইতেছে, যে আসিতেছে, সে বসিতেছে। কেহ ডাকিতেছে-'ও সেজবৌ, আয় না' —কেহ ডাকে, 'ন-দিদি, শিগ্‌গির নে-না ভাই খেয়ে, না হ'লে যে কারও চুল বাঁধা হবে না।' কাহারও ডাকাডাকিতে সাড়া নাই , পাতা পড়িয়া আছে। যাহাদের অর্ধেক আহার হইয়াছে, তাহারা ডাকিল — 'ও ঠাকুর, আর কি আছে নিয়ে এস না।' ঠাকুর এক পিতলের হাতা লইয়া আসিয়া সকলকে এক এক হাতা দিয়া গেল। 'ও ঠাকুর-এদিকে এদিকে,' 'ও ঠাকুর আর একখানা মাছ ভাজা দাও না,' 'ও ঠাকুর মাছের ঝোলের মুড়োটা লক্ষ্মীর পাতে দাও — কাঁটার মাছ একখানা খুঁজে দাও তো।' ঠাকুর পরিবেশনে আসিলেই বধূরা ঘোমটার মাত্রা বাড়াইয়া হাত গুটাইয়া আহার বন্ধ করিতেছে, মেয়েরা চাহিয়া চাহিয়া খাইতেছে।

ভাত খাওয়ার পালা শেষ হইতে না হইতে একে একে নিমন্ত্রিতেরা আসিতে আরম্ভ করিলেন। একজন তাহাদের দেখিয়া 'ঐ রে- কারা এল, ওঠ, ওঠ,আর দই খায় না।' কেহ ত্রস্তে উঠিয়া পড়িল, কেহ গল্প বন্ধ হওয়ায় এইবার ভাল করিয়া কাজে মনোনিবেশের অবসর পাইয়া, 'দইটা বেশ হয়েছে জ্যাঠাইমা,

আর এক খুরি দাও তো' বলিয়া প্রচুর দই খাইয়া লইল। একটি করিয়া শিশু প্রায় সকলের পাশে আছেই — কারও পাশে বা দু'টি। মা এখন বিশেষ মনঃসংযোগে ছেলেকে আহার করাইতে লাগিল, কেহ উঠিতে বলিলে বলে,'এই যে ছেলেটা খাচ্ছে, খাওয়া হোক, উঠি।' নিজেও যে না খাচ্ছেন, এমন শপথ করা যায় না।

এদিকে ত্বরিতাগত মহিলারা আপাদমস্তক বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া জড়ভরতের ন্যায় উচ্ছিষ্টের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন — কোন দিকে যাই। গৃহিণীরা দই সন্দেশের হাঁড়ি হাতে পরিবেশনে ব্যস্ততার সহিত বলিতেছেন, 'এস এস-চল চল, উপরে চল।' কিন্তু উপরের সিঁড়ির সন্ধান কে দেয়? সুতরাং নিমন্ত্রিতরা দাঁড়াইয়া আহার দেখিতেছেন। ইহাতে দু-একজন শীঘ্র আহার শেষ করিয়া — 'পিসিমা যেন কি, এঁদের নিয়ে বসাও না গা' বলিয়া হাত ধুইতে গেল। তাহারা যখন হাত ধুইয়া আসিল, তখন আরও অনেকে আসিয়া জুটিয়াছেন। তখন একজন 'আসুন আসুন, আপনারা এইদিকে এখন আসুন' বলিয়া উপরে লইয়া একটি ঘরে বসাইলেন। যাহারা পূর্ব্বের পরিচিতা, তাহারা আসিয়া সিঁড়ি, ঘর, মাদুর খুঁজিয়া লইয়া এক রকম বসিবার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। মহিলারা প্রায়ই পরস্পর পরস্পরের অপরিচিত; মুক ও বধিরের ন্যায় চাওয়া-চাওয়ি করিতেছেন। যদি কেহ কাহাকেও পরিচিতা পাইয়া থাকেন, তবে তিনি দুই এক কথা কহিয়া সকলের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছেন।

এমন সময় গৃহিণীদের কাহারও বন্ধু অথবা মেয়েদের শ্বশুরবাড়ির কুটুম্ব বা পিত্রালয়ের কেহ আসায় তাঁহাদের কল্যাণে গৃহিণীদের কেহ একবার আসিয়া সকলকেই সমভাবে আপ্যায়িত করিয়া গেলেন-একজন আসিয়া পান দিয়া গেল। যাঁহারা সকাল সকাল আসিয়াছেন-মনোগত বাসনা যে, সকাল সকাল ফিরিবেন। গতিক দেখিয়া বুঝিলেন যে, সে আশা বৃথা! —

বাড়ির মেয়েদের মধ্যাহ্নের আহার ও বৈকালিক বেশভূষা সমাপ্ত হইতে পাঁচটা বাজিল। তখন একটি গলা-খোলা লাল বডি বা হাতকাটা কালো জ্যাকেটের সঙ্গে কেহ নীলাম্বরী, কেহ ঢাকাই, কেহ শান্তিপুরের ডুরে পরিধান করিয়া দু-

চারখানি অলঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া এ-ঘর ও-ঘর হইতে নিমন্ত্রিতাদের সংগ্রহ করিয়া উঠানে লইয়া গিয়া বসাইতে লাগিলেন; সেখানে সতরঞ্জির উপর পরিষ্কার চাদর পাতা। এক পাশে কারচোপের কাজের বিছানা, তাহাতে আইবুড়ো ভাতের বা বৌভাতের বা 'সাধের' কনে উজ্জ্বল বস্ত্রালঙ্কার ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইয়া বসিয়া আছে , সম্মুখে দুইটি বৃহৎ বৃহৎ পুষ্পাধারে বড় বড় দুটি গোলাপ ফুলের তোড়া। এক পাশে নাচের বাজনা বাজিতেছে , কতকগুলি কালো কালো মোটাসোটা প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ঢোলক, মন্দিরা ও বেহালা বাজাইতেছে। তিন চারজন নাচওয়ালী আবাহু, আকণ্ঠ, আপাদমস্তক অলঙ্কার পরিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছে, কেহ বা সিগারেট খাইতেছে, কেহ পান খাইতেছে। নিমন্ত্রিতাদের আসিতে দেখিয়া দুইজন তাড়াতাড়ি উঠিয়া নানা অঙ্গভঙ্গি সহকারে নাচ গান জুড়িয়া দিল ও নাচিতে নাচিতে প্রত্যেকের অতি নিকটে আসিয়া পেলার জন্য ব্যস্ত করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে উঠান ভরিয়া গেল। আতর, গোলাপ ফুলের মালা ও তোড়া বিতরণে নিমন্ত্রিতাদের অভ্যর্থনা করা হইল। এখন যাঁরা আসিতেছেন, তাঁহাদের কোনো চিন্তা নাই যে, কোথায় বসিব। প্রবেশপথে ও ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বাড়ির মেয়েরা নিমন্ত্রিতাদের অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত। যে কেহ গাড়ি বা পালকি হইতে নামিতেছেন , অমনিই তাহার হাত ধরিয়া লইয়া উঠানে বসানো হইতেছে। আসর জমজমাট, হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া পাল ভেদ করিয়া ছড়ছড় করিয়া জল পড়িতে লাগিল। হৈ হৈ করিয়া সকলে উঠিয়া পড়িল এবং 'নরেন কোথা গেলি', 'খুকি ঝিয়ের কোলে যা', 'হরে. রুমালখানা মাথায় দে', 'রোগা ছেলে ভিজে গেল', 'ওমা কি হবে, আজ সবে দুটি ভাত দিচ্ছি' বলিতে বলিতে মহিলারা ঘরের ও বারান্দার দিকে ছুটিতে লাগিলেন। বেনারসী, ক্রেপ, বোম্বাই প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্র ভিজিল। হুড়াহুড়ি, কলরব, কাদার পিচ্ছিল দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। কে কাকে দেখে! তারই মাঝে নাচওয়ালীরা ভাঙা গলায় চেঁচাইতেছে — 'ওগো, মেয়েদের দালানে বসাও না!' তাহাদের বড় আশায় ছাই পড়িয়াছে, হীরা, মুক্তা ও প্রচুর সোনায় ভূষিতা মহিলাদের দেখিয়া তাহারা আশা করিয়াছিল যে, প্রচুর

পেলা পাইবে — কিন্তু হায় রে বৃষ্টি!

বারান্দায়, দালানে ও ঘরে ঘরে খাদ্যের পাতা সাজানো হইয়াছে. তিলমাত্র স্থান নাই যে মহিলারা আশ্রয় লয়েন, তা আবার গানের মজলিস বসিবে!

বৃষ্টির প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া বাড়ির মেয়েরা অভ্যাগতদিগের হাত ধরিয়া সযত্নে আহারে বসাইলেন এবং বৃষ্টিতে সকলের বড়ই ক্ষতি হইল বলিয়া দুঃখ-আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। গোলযোগে পরিবেশনে অনেক ত্রুটি হইতে লাগিল — কেহ লুচি পাইল, কচুরি পাইল না, সন্দেশ পাইল তো রসগোল্লা পাইল না।

রান্না হইয়াছে — পোলাও, কালিয়া, চিংড়ির মালাইকারি, মাছ দিয়া ছোলার ডাল, রোহিতের মুড়া দিয়া মুগের ডাল, আলুর দম, ছোকা, মাছের চপ, চিংড়ির কাটলেট, ইলিশ ভাজা, বেগুন ভাজা, শাক ভাজা, পটল ভাজা, দইমাছ, চাটনি, তারপর লুচি, কচুরি, পাঁপড় ভাজা; একখানি সরাতে খাজা, গজা, নিমকি, রাধাবল্লভি, সিঙাড়া, দরবেশ মেঠাই, একখানা খুরিতে আম, কামরাঙ্গা, তালশাঁস ও বরফি সন্দেশ; আর একখানায় ক্ষীরের লাড্ডু, গুঁজিয়া, গোলাপজাম ও পেরাকি। ইহার উপর ক্ষীর, দধি, রাবড়ি ও ছানার পায়েস। বাবুদের জন্য মাংসের কোর্মা ছিল, কিন্তু মেয়েরা অনেকেই মাংস খান না, এজন্য তাহা মেয়েদের মধ্যে পরিবেশন করা হইল না। আহার্য প্রচুর ও অনেক প্রকারের, সুতরাং পরিবেশনে বিশৃঙ্খলা ঘটিলেও প্রত্যেকেরই ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল।

এইবার বাড়ি যাওয়ার পালা। 'গাড়ি কই', 'খোকা কোথা', 'খুকির গলার হার কে নিলে?' কিছুই খুঁজিয়া মিলিতেছে না। বৌমার হীরার ধুকধুকি নাই, টেপির মাথার টুপির ল্যাজ ছেঁড়া, গিন্নির নাকের নথের নোলক পর্যন্ত পড়িয়া গিয়াছে। অমিয় জুতা হারাইয়া শুধু মোজা পায়েই আমার জুতো ও-ও-ও ও' করিতে করিতে বাড়ি ফিরিয়া গেল।

গিন্নির বকুনি, কর্তার ক্রোধ শান্ত হইতে রাত বারোটা বাজিল। জুতার শোক ভুলিয়া অমিয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে , এক ঘুমে রাত্রি প্রভাত। একজন বৈষ্ণব খঞ্জনি বাজাইয়া গান গাহিতেছে — জয় যদুনন্দন জগত — জীবন —।

সেকালের শ্বশুরবাড়ি

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

একবার আমাদের গুরুঠাকুর এসেছিলেন। তাঁকে বাবামশায় জিজ্ঞেস করেছিলেন — কিরকম কন্যাদানে বেশি পুণ্য হয়। তিনি বললেন-সাত বছর বয়সে বিয়ে দিলে, অর্থাৎ গৌরীদানে। ঠিক সেই বয়সেই আমার বিয়ে হয়। কলকাতার ঠাকুরবাড়ি থেকে তখন যশোরে মেয়ে খুঁজতে পাঠাত, কারণ যশোরের মেয়েরা নাকি সুন্দরী হত। যে সব দাসীরা মনিবের পছন্দ ঠিক বুঝতে পারে, তাদের খেলনা দিয়ে তাঁরা মেয়ে দেখতে পাঠাতেন। আমাদের ওখানেও এইরকম দাসী গিয়েছিল।

আমার শাশুড়ির (মহর্ষির স্ত্রী) রং খুব সাফ ছিল। তাঁর এক কাকা কলকাতায় শুনেছিলেন যে, আমার শ্বশুরমশায়ের জন্য সুন্দরী মেয়ে খোঁজা হচ্ছে। তিনি দেশে আমার শাশুড়িকে (তিনি তখন ছয় বৎসরের মেয়ে) কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখন তাঁর মা বাড়ি ছিলেন না — গঙ্গা নাইতে গিয়েছিলেন। বাড়ী এসে, মেয়েকে তাঁর দেওর না বলে-কয়ে নিয়ে গেছেন শুনে তিনি উঠোনের এক গাছতলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর সেখানে পড়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে মারা গেলেন। আমার দিদিশাশুড়িও খুব সুন্দরী ছিলেন শুনেছি। তাঁকেও নাকি মনুবুড়ি বলে এক পুরনো দাসী পছন্দ করে এনেছিল।

আমাকে বোধ হয় দাসী পছন্দ করে' গিয়েছিল। যখন আমার বিয়ের দিন সব ঠিক হয়ে গেল, তখন তাঁরা আমাকে আনতে সরকার চাকর দাসী ইত্যাদি পাঠালেন।

বিয়ের পর বাসী বিয়েতে আমাকে মেয়েপুরুষ মিলে ঘেরাটোপ দেওয়া পালকিতে নিতে এসেছিল। শ্বশুরবাড়ির অন্দরমহলে যখন পালকি নামাল তখন বোধ হয় আমার শাশুড়ি আমাকে কোলে করে' তুলে নিয়ে গেলেন। তাঁর ভারী মোটা শরীর ছিল, কিন্তু-আমি খুব রোগা ও ছোট ছিলুম বলে' কোলে

করতে পেরেছিলেন। আমাকে নিয়ে পুতুলের মতো এক কোণে বসিয়ে রাখলেন। মাথায় এক গলা ঘোমটা, আর পায়ে গুজরী পঞ্চম ইত্যাদি কত কি গয়না বিঁধছে। আমার পাশে একজন গুরুসম্পর্কীয়া বসে যৌতুকের টাকা কুড়োতে লাগলেন। আমি তো সমস্তক্ষণ কাঁদছিলুম। আমার শ্বশুর যখন যৌতুক করতে এলেন তখন একটু জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলুম। তিনি জিগ্যেস করলেন — কেন কাঁদছে? লোকে বললে — বাপের বাড়ি যাবার জন্যে। তাতে তিনি বললেন — বল পাঠিয়ে দেব। সকলে বলতে লাগলেন — দেখেছ কী সেয়ানা বউ! ঠিক তাকমাফিক চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছে, যখন শ্বশুর যৌতুক করতে এসেছে। কিছুদিন পর্যন্ত লোকে আমাকে রোজই দেখতে আসত ও নানারকম ফরমাস করত-উপর বাগে চাও তো মা ইত্যাদি। মেয়েরা কাপড় পর্যন্ত খুলে দেখত। আমি খুব লাজুক ছিলাম। সমবয়সীদের সঙ্গে ভালভাবে কথা কইতুম না। ক্রমে ক্রমে সে ভাবটা কেটে গেল।

সেকালে আমাদের অন্দরমহলে এক ছেলে-মানুষ করা পুরনো লোক ছাড়া কেউ আসতে পারত না। বিবাহিত লোকেরা ছাড়া কেউ রাতে বাড়ির ভিতর আসতেন না, কিন্তু কখন কখন দিনে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে আসতেন। আমার পাঁচজন নন্দাইদের একজন ছাড়া সকলেই ঘরজামাই ছিলেন। নন্দাইরা প্রায় সকলেই কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে, হয়ত কলকাতায় পড়তে এসেছেন, সুন্দর চেহারা দেখে এঁরা ধরে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। আমাদের পিরালি ঘরে বিয়ে করবার পরে তাঁদের নিজেদের বাড়ির সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকত না। একজনের বাপ গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে তাঁর ছেলেকে শাপ দিয়েছিলেন শুনেছি।

আমার বড় ননদ সৌদামিনী দেবী আমাদের খুব যত্ন করতেন। বাপের বাড়ীর জন্য যখন কাঁদতুম তখন সান্ত্বনা দিতেন, চুল বেঁধে দিতেন — সে সব তখন কিছুই জানতাম না। ক্রমে ক্রমে যখন ওঁদের সঙ্গে মিশে গেলুম তখন অন্দরমহলে বেশ সুখেই ছিলুম। দাসীরা গঙ্গা নাইতে গেলে বলতুম ছোট ছোট নুড়ি কুড়িয়ে আনতে, তাই দিয়ে আমাদের ঘুঁটি খেলা হত। তাস খেলাও বোধহয় শিখেছিলুম, তাতেও খুব আনন্দ পেতুম।

অনেকদিন বাদে বাদে বাবামশায় (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর) আসতেন। আগেই বলেছি. তাঁকে ভয় করতুম, তাই বেশি কথা বলতুম না।

আমরা বউয়েরা প্রায় সকলেই শ্যামবর্ণ ছিলুম। শাশুড়ি ননদ সকলেই গৌরবর্ণ ছিলেন। প্রথম বিয়ের পর শাশুড়ি আমাদের রূপটান ইত্যাদি মাখিয়ে রং সাফ করবার চেষ্টা করতেন। তিনি সামনে বসে থাকতেন তক্তপোশের উপর, আর দাসীরা আমাদের ঐসব মাখাত। দিন কতক পরে যতদূর হবার হলে ছেড়ে দিতেন। আমরা মেয়েরা বউয়েরা সকলেই ঠিক তাঁর কথামত চলতুম। আমি বড্ড রোগা ছিলুম। একদিন কাদের বাড়ির বউরা বেড়াতে এসেছে সেজেগুজে, তাদের বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখে মা বল্লেন, "এরা কেমন হৃষ্টপুষ্ট দেখ দেখি, আর তোরা যেন সব বৃষকাষ্ঠ!" তারপর আমাকে কিছুদিন নিজে খাইয়ে দিতে লাগলেন। আমার একমাথা ঘোমটার ভিতর দিয়ে তাঁর সেই সুন্দর চাঁপার কলির মতন হাত দিয়ে ভাত খাওয়াতেন। আমার কেবল মনে হত মা কতক্ষণে উঠে যাবেন আর আমি দালানে গিয়ে বমি করব।

বিয়ের দুতিন বৎসর পরে বাবামশায় মাকে শুদ্ধ নিয়ে এসে কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে রইলেন। মা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্য পালকি পাঠালেন। কিন্তু শাশুড়ি ঠাকরুণ বল্লেন ভাড়া বাড়িতে বউ পাঠাবেন না। আমি তাঁর উপর তো কখন কিছু বলিনি, এই কথা শুনে লুকিয়ে ছাতের এক কোণে বসে কাঁদতে লাগলুম। দাসীদের ভয় করতুম, কেননা তারা মায়ের কাছে লাগিয়ে দিয়ে বকুনি খাওয়াত। এমন সময় উনি মায়ের কাছে কি একটা কথা বলতে এলেন। বড়ঠাকুরঝিকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন — সে কোথা? বড় ঠাকুরঝি বল্লেন — তার মা তাকে আনতে পালকি পাঠিয়েছেন কিন্তু ভাড়া বাড়িতে মা পাঠাবেন না বলেছেন, তাই সে ছাতে বসে কাঁদছে। উনি এই কথা শুনে তখনি বাবামশায়ের কাছে চলে গেলেন। তিনি বাপের কাছে যত স্পষ্ট কথা বলতেন, এমন আর কোন ছেলে সাহস করত না। বাবামশায় যখন শুনলেন মা এই কারণে আমাকে যেতে দিচ্ছেন না তখন নিজেই বাড়ির ভিতর চলে এলেন। এসে মাকে বল্লেন — সত্যেন্দ্রর বউয়ের মা তাঁকে নিতে পালকি

পাঠিয়েছেন, তুমি নাকি ভাড়া বাড়ি বলে' তাকে যেতে দাওনি? ভাড়া বাড়ি কেন, মা গাছতলায় থাকলেও মায়ের কাছে যাবে, এখনি পাঠিয়ে দাও। — একথা শুনে আমার খুব আহ্লাদ হল। মায়ের কাছে শুধু তাঁকে মা বলে ডাকতে এত আনন্দ হচ্ছিল যে একটা আলাদা ঘরে গিয়ে মা মা বলতে লাগলুম। সামনে বারবার বলতে লজ্জা করছিল।

আমাদের অসুখ বিসুখ করলে দাসীরা গিয়ে মাকে খবর দিলে তিনি বলতেন, যা দপ্তরখানায় খবর দে গে যা। সেখানকার কর্তা ছিলেন আমার মামাশ্বশুর। তিনি ডাক্তারকে খবর পাঠাতেন।

তখনকার ভাল ডাক্তারদের মধ্যে একজন ইংরেজ ও একজন বাঙালি ডাক্তার আমাদের পরিবারে বাঁধা ছিলেন। একবার মনে আছে একটা অসুখ হয়ে কোণে পড়ে আছি। ডাক্তার এসে আমাকে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দিলেন। মামা নিয়মিত খাইয়ে গেলেন। তারপর পড়েই আছি। আর কোন খোঁজ খবর নেই। আমার বড় ননদ তখন আঁতুড়ে, তা বাঁচিয়ে যতদূর সম্ভব আঁতুড় ঘরের কাছে গিয়েই বসলুম। তখন ভয়ানক খিদে পেয়েছে, মাথা ঝিমঝিম করছে। বড় ঠাকুরঝির খাবার জন্যে একজন ঘিয়ে ভাজা চিঁড়ে দিয়ে গেল, তাতে বুঝি নাড়ী শুকোয়। তিনি তখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন — খাবে? আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালুম। তখন এত শরীর অবসন্ন বোধ হচ্ছিল যে, লজ্জা করবার অবস্থা ছিল না। সেই চিঁড়ে খেয়ে যেন ধড়ে প্রাণ এল।

আমার শাশুড়ীর একটু স্থূল শরীর ছিল, তাই বেশি নড়াচড়া করতে পারতেন না। সংসারের ভাঁড়ারাদির কাজ বোধ হয় দপ্তরখানা থেকেই করা হত। দৈনিক বাজারে আমাদের কিছু করতে হত না। কেবল পৌষপার্বণে রাশীকৃত পিঠে গড়তে হত বলে লোক কম পড়লে মেয়েদের বউদের ডাক পড়ত। ঝাল কাসুন্দি বড় বড় তোলোহাঁড়িতে করা হত। কাঠি দিয়ে জল মাপা হত, তার আবার অনেক বিচার, একটুকুতেই অশুচি হত। ক্রিয়া-কর্মে আনন্দনাড়ু করবারও ধূম পড়ে যেত। আমার মনে পড়ে বাবামশায় যখন বাড়ি থাকতেন আমার শাশুড়িকে একটু রাত করে ডেকে পাঠাতেন, ছেলেরা সব শুতে গেলে।

আর মা একখানি ধোয়া সুতি শাড়ি পরতেন, তারপর একটু আতর মাখতেন; এই ছিল তাঁর রাত্রের সাজ।

একবার জমিদারির আয় কমে গিয়েছিল। তখন আমার শ্বশুর বলে পাঠালেন বউদের রাঁধতে শেখাও। রান্নাঘরের রান্না বড় সুবিধের হত না। দপ্তরখানা থেকে ঘি তেল এনে বামুনরা চুরি করত। কেবল বাবামশায় যখন বাড়ি থাকতেন মা রান্নাঘরে নিজে গিয়ে বসতেন। তখন তারা একটু ভয়ে থাকত। কৈলাস মুখুজ্জে বলে একজন খুব আমুদে সরকার ছিল। ছেলে বাবুদের সঙ্গে রঙ্গ রস করত। সে বামনদের চুরি ধরবার মতলবে এক-একদিন রান্নাঘরে খেত। তারা ফন্দি করে কাঁচাকাঠ উনুনে দিয়ে খুব ধোঁয়া বার করলে, যাতে মুখুজ্জে দেখতে না পায়। কিন্তু চোরাই মাল রাখবে কোথায়? তাই একজন বামুন নিজের পেটে চালাবার যেই উপক্রম করেছে অমনি, কৈলাস চোখমুখ পুঁছে তাকে কঁ্যাক করে চেপে ধরেছে। আমরা রান্নাঘরের রান্না অল্পই খেতুম। তবে দুএক টাকা করে মাসহারা পেতুম, তাই দিয়ে কখন কখন সখ করে কিছু খাবার আনিয়ে আমোদ করে খেতুম। একাদশীর দিন দাসীরা পয়সা চাইত, দু এক পয়সা পেলেই খুশি হয়ে যেত। তাদের দিয়ে কখন কাঁচা আম কি জারক লেবু আনাতুম। মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে লেবু খেতে খেতে ছাতে পায়চারি করতুম। ছেলে বাবুদের মাসোহারা বেশি ছিল।

মা বোধ হয় কৃপণতা করে বাজারের টাকা থেকে কিছু বাঁচাতেন কারণ কর্তামশায় প্রায় পাহাড়ে ভগবানের ধ্যান করে বেড়াতেন বলে কবে বাড়ি আসবেন তাই গুণে বলে দেবার জন্যে দৈবজ্ঞদের পয়সা দিতেন। এক আচার্যানী ও তার ছেলে আসত-তারা তাঁর কল্যাণের জন্য স্বস্তি স্বস্ত্যয়ন করতে বলত,সেজন্য মা মুক্তহস্তে ব্যয় করতেন। মা তাঁর জন্য শুয়ে শুয়ে কেবল ভাবতেন, তাই সংসারের কাজে বড় একটা মন দিতে পারতেন না। এতে অযথা অনেক ব্যয় হত বলে ছেলেরা দারোয়ানকে বলে আচার্যানীর আসা-যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু মা সে কথা টের পেয়ে কান্নাকাটি বকাবকি করাতে সে আবার এল।

এই সময়ে মায়ের খুড়ী, কাকার দ্বিতীয় পক্ষের বিধবা স্ত্রী মায়ের কাছে

থাকতে এলেন। তিনি এসে মায়ের ও আমাদের খাওয়া-দাওয়া দেখাশুনো আর অসুখে সেবাশুশ্রূষা করতে লাগলেন; তিনি এসে সবদিকে সকলের সুবিধা হল। তাঁকে আমরা দিদিমা বলতুম। তাঁর ছেলেপিলে ছিল না, তাই ক্রমে আমাদের ওখানেই রয়ে গেলেন। তিনি প্রায় মায়েরই সমবয়সী ছিলেন ও তাঁর বেশ সঙ্গিনী হলেন।

আমরা তখন শুধু একখানা শাড়িই পরতুম — তার উপর শীতকালে সন্ধ্যাবেলা হয়ত একটা দোলাই গায়ে দিতুম। বিয়ের আগে ছেলেরা বাইরেই থাকত, বিয়ে হলে সকলেরই একখানা আলাদা ঘর হত, সেখানে রাত্রে শুতে আসত। ওঁর এক বন্ধু ছিলেন মনোমোহন ঘোষ। ওঁর ইচ্ছে যে তিনি আমাকে দেখেন-কিন্তু আমার'ত বাইরে যাবার জো নেই, অন্য পুরুষেরও বাড়ির ভিতরে আসবার নিয়ম নেই। তাই ওরা দুজনে পরামর্শ করে একদিন বেশি রাত্রে সমান তালে পা ফেলে বাড়ির ভিতরে এলেন। তার পরে উনি মনোমোহনকে মশারির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে শুয়ে পড়লেন আমরা দুজনেই মশারির মধ্যে জড়সড় হয়ে বসে রইলুম; আমি ঘোমটা দিয়ে বিছানার এক পাশে আর তিনি ভোম্বলদাসের মত আর এক পাশে। লজ্জায় কারো মুখে কথা নেই —। আবার কিছুক্ষণ পরে তেমনি সমান তালে পা ফেলে উনি তাঁকে বাইরে পার করে দিয়ে এলেন।

মনোমোহনের সঙ্গে ওর খুব ভাব ছিল। তিনিই ওঁকে প্রথমে পরামর্শ দিলেন যে — ভিক্টোরিয়া ত আমাদের দেশের লোককে সিবিল সার্বিসে ঢোকবার অনুমতি দিয়ে গেছেন, কিন্তু কেউ এ পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে যায়নি। চলনা দেখি আমাদের সিবিল সার্বিসে নেয় কিনা। তিনি ক্রমাগত এইভাবে লইয়ে লইয়ে ওঁর বিলেত যাবার মত করালেন। বাবামশায়ের ইচ্ছে ছিল যে সব ছেলেরাই বড় হয়ে জমিদারি দেখে। কিন্তু উনি অনেক বলা-কওয়ায় বিলেত যাবার অনুমতি দিলেন।

আমি প্রথম প্রথম লজ্জায় ওঁর সঙ্গে কথা বলতুম না। লজ্জা আমার অসাধারণ রকমের ছিল। তখন উনি একবার বলেছিলেন যে, তুমি যদি কথা বলো ত যা চাও তাই দেব। তাতে আমি একটা ঘড়ি চেয়েছিলুম, উনিও

দিয়েছিলেন। ওঁর বিলেত যাবার সময় অবশ্য সে অবস্থা কাটিয়ে উঠেছিলুম। আমার নাম জ্ঞানদা বলে উনি আমাকে 'জ্ঞেনি' বলে ডাকতেন।

একদিন ওঁর যাবার সময় সময় দিদিমার কাছে বসে আমার একটা গান লেখবার সখ হল। এই পর্যন্ত লেখা হয়েছিল —

"কেমনে বিদায় দেব থাকিতে জীবন
তুমি তো যাবে আনন্দে, সঙ্গীগণ লয়ে সঙ্গে" —

তারপরে আর এগোয় নি।

সেই কাগজটা আমি ঘরে ফেলে গিয়েছিলুম, দিদিমা আবার ওঁকে সেটা দেখালেন। তারপর উনি এই গানটা রচনা করে ফেল্লেন —

কেমনে বিদায় দিব থাকিতে জীবন —
কোন প্রাণে যাব চলি বিজন গহন।
কেমনে ছাড়িব তারে সদা প্রাণ চাহে যারে
কেমনে সহিব বল বিচ্ছেদ দহন।
শরীর যদিও যাবে- মন সদা হেথা রবে
যার ধন তারই কাছে রবে অনুক্ষণ।
দিবস ফুরায় যত, ছায়া যায় দূরে তত
কভু না ছাড়ায় তবু পাদপবন্ধন।

তাঁর গান লেখার খুব অভ্যাস ছিল, ব্রহ্মসঙ্গীত অনেক রচনা করেছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের দিকে ওর খুব ঝোঁক ছিল, এবং বোধ হয় সেইটেই জীবনের ব্রত করবার ইচ্ছে করেছিলেন। মনে আছে একবার বলেছিলেন-আমি যখন প্রচার করতে বেরব তখন ত রাত জাগতে হবে। অবশ্য বিলেত যাওয়াতে সে সাধ পূর্ণ হল না। কিন্তু সেখান থেকেও ব্রহ্মসংগীত রচনা করে পাঠাতেন; এক একটা নতুন গান পেয়ে মহর্ষি খুব সন্তুষ্ট হতেন।

আমাদের বাড়িতে তখন রোজ উপাসনা হত, রোজ সকালে আমাদের তৈরি হবার জন্য আধঘণ্টা আগে ঘণ্টা পড়ত। তার আগে আমরা কিছু খেতুম না। দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়লে দালানে নেবে যেতুম। মহর্ষি থাকলে তিনিই উপাসনা

করতেন, তখন মাও গিয়ে বসতেন। মেয়েরা একদিকে বসতুম পুরুষেরা আর একদিকে। উপাসনার পর খেতুম লুচি তরকারি দুধ ইত্যাদি। চায়ের রেওয়াজ তখন বড একটা ছিল না। তারপর নাইতে যেতুম। একতলায় একটা ঘরে বড় একটা চৌবাচ্চা ছিল, সেখানে আমরা সবাই একসঙ্গে আমোদ করে নাইতুম। এ ওর গায়ে জল দিচ্ছে, কেউ সর ময়দা মাখছে, কেউ মাখাচ্ছে। আমার সেজননদ নানারকম মাখতেন বলে ওঁর স্নান সব শেষে সারা হত। তিনি ওই চৌবাচ্চাতেই সাঁতার দিতে শিখেছিলেন। মোটা ছিলেন বলে সহজেই ভাসতে পারতেন। আমার আর শেষ পর্য্যন্ত সাঁতার শেখা হল না।

স্নানের পর সবাই মিলে গল্প করতে করতে একসঙ্গে খেতুম। রান্নাঘরের রান্না বড় ভাল লাগত না, তাই চচ্চড়ি বা ঝোলের মাছ নিয়ে টক কি কিছু দিয়ে খেয়ে নিতুম। পাতে যা থাকত তা দাসীরা খেত, তাছাড়া আলাদা চাল পেত। তখনকার কালে দাসীদের ১। চাকরদের ২, ২।।০ টাকা এই রকম মাইনে ছিল। পরে ক্রমশ বেড়ে গেল। নতুন দাসী এলে তাদের ঘরের কথা জানতে আমাদের খুব আমোদ বোধ হত। তার স্বামী আছে কিনা, তাকে ভালবাসে কিনা ইত্যাদি। দাসীদের নিচে আলাদা ঘর ছিল, সেখানে খাবার নিয়ে গিয়ে খেত, কাপড় রাখত।

উনি বিলেত যাবার পর ওঁর মাসহারা আট টাকা আমাকে দেওয়া হল; তাতে নিজেকে খুব বড়লোক মনে করলুম, তার থেকে মাসে মাসে কোন খাবার আনাতুম, দাসীদেরও খাওয়াতে ভালবাসতুম।

বিয়ের পরে আমার সেজ দেওর হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইচ্ছে করে আমাদের পড়াতেন। তাঁর শেখাবার দিকে খুব ঝোঁক ছিল। নিজের মেয়েদেরও সব লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। আমরা মাথায় কাপড় দিয়ে তাঁর কাছে বসতুম আর এক একবার ধমকে দিলে চমকে উঠতুম। আমি বিয়ের আগেই লিখতে পড়তে পারতুম আর আমার হাতের অক্ষরের খুব প্রশংসা ছিল। আমার বাবামশায় একটা পাঠশালা খুলেছিলেন। সেখানে মুসলমান পর্যন্ত বড় বড় ছেলেরা যেত; কেবল আমি একলা ছোট মেয়ে ছিলুম। আমার যা কিছু বাংলা বিদ্যা তা সেজঠাকুরপোর

কাছে পড়ে। মাইকেল প্রভৃতি শক্ত বাংলা বই পড়াতেন, আমার খুব ভাল লাগত। এখনো লাগে। উনি বিলেত থেকে ঠাকুরপোকে লিখে পাঠিয়েছিলেন আমাকে ইংরেজি শেখাতে, কিন্তু সেটা অক্ষরপরিচয়ের বড় বেশি এগোয় নি। সেজন্য বোম্বাই গিয়ে ওঁর কাছে খুব বকুনি খেয়েছিলুম, বেশ মনে আছে।

তখন বাড়ির ছেলেদের জন্যে একজন কুস্তিগির পালোয়ান মাইনে করা থাকত। ছেলেরা সকলেই কুস্তি শিখত। কুস্তির জন্য গোলাবাড়িতে একটা আলাদা চালাঘর ছিল। তাতে অনেকটা ঢিলে নরম মাটি কিরকম তেল দিয়ে মাখা থাকত, যাতে পড়লে না লাগে। বম্বে গিয়েও প্রথম প্রথম উনি ঐরকম মাটির আখড়া তৈরি করাতেন। সেজঠাকুরপোই বেশি কুস্তি করতেন। বোধ হয় ছেড়ে দেবার পর যে বাতে ধরল তাতেই অপেক্ষাকৃত কম বয়সে মারা গেলেন। উনিও দাঁও প্যাঁচ খুব জানতেন। আর শীতকালে ভোরবেলা ইডেন গার্ডেনে হেঁটে যাবার একটা নিয়ম ছিল। সেখানে দরজা বন্ধ থাকত ও কেউ গেলে শান্ত্রী বলত "হুকুম সর্দার" অর্থাৎ who comes there?

উনি বিলেত যাবার সময় আমাকে দিদিমার হাতে সঁপে দিয়ে গেলেন। আমার মনে আছে একদিন রাত্রে বেশ জ্যোৎস্না হয়েছে, আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, মাঝখানে দিদিমা, একপাশে উনি আর একপাশে আমি। আমি লজ্জায় কিছু বলছিনে, কিন্তু চোখে চোখে একটু একটু জল আসছে। উনি দিদিমার হাতে আমাকে দিয়ে বল্লেন — একে তোমার মেয়ের মত দেখ। ওঁর কথা দিদিমা যথার্থই রেখেছিলেন। আমাকে তিনি খুবই যত্ন করতেন। যখন পূর্ণিমার দিন খুব জ্যোৎস্না হত, আমি কিছুতেই ঘরে থাকতে পারতুম না, ছাতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম। শীতকাল হলে দিদিমাকে আমি একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে দিতুম, বেচারা বুড়ো মানুষ বসে থাকতেন। এই জ্যোৎস্না ভালবাসবার কথা ওঁর বম্বের চিঠিতেও পরে উল্লেখ করেছেন।

বিলেত থেকে উনি আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন। আমি লিখতুম কিনা মনে নেই। ফিরে এসে বম্বে থেকে যখন কলকাতায় আসতুম, তখন আমাদের নিয়মিত চিঠি লেখালিখি চলত। ওঁর সে সময়কার খানকতক চিঠি

এখনো আমার কাছে আছে। আমার মেয়ে সেগুলো নকল করে দিয়েছে, নইলে পুরনো কাগজ সব খসে খসে পড়ছিল।

মনোমোহন ঘোষ ওঁর সঙ্গেই বিলেত গিয়েছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে ওদের যাওয়া হল, কিন্তু তিনি সিবিল সার্বিস পাশ করতে পারলেন না, — উনি করলেন। তবে সেজন্য তাঁর কোনো ক্ষতি হয়নি, কারণ পরে তিনি খুব বড় ব্যারিস্টার হয়েছিলেন। তিনি স্ত্রীর সম্বন্ধে বেশ ভাল ব্যবস্থা করেছিলেন। সমাজে বের করবার আগে তাঁকে কন্‌ভেণ্টে দিয়ে ইংরিজি লেখাপড়া শিখিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু আমার সে সুযোগ হয়নি। তবে সে সময়ে আমাদের খালি এক শাড়ি পরা ছিল, তা পরে' তো বাইরে যাওয়া যায় না। তাই উনি কোনো ফরাসী দোকানে ফরমাশ দিয়ে একটা কি পোশাক আমার জন্যে করালেন, — বোধহয় তাদের মতে oriental যাকে বলে। সেটা পরা এত হাঙ্গামা ছিল যে ওঁকে পরিয়ে দিতে হত, আমি পারতুম না। দুচারখানা শাড়িও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম।

কর্তামশায় আমাকে বম্বে নিয়ে যাবার অনুমতি দিলে, আমাকে ঐ পোশাক পরিয়ে ঘেরাটোপ দেওয়া পালকি করে জাহাজে তুলে দেওয়া হল। জাহাজে অপরিচিত বিদেশী খাবার খেতে আমি অভ্যস্ত ছিলুম না। উনিই আমাকে সব করে কর্মে দিতেন। মতি বলে একজন চালাক মুসলমান চাকর সঙ্গে নিয়েছিলেন। উনি সংসারের বিশেষ কিছু বুঝতেন না, তারই হাতে সব ছেড়ে দিয়েছিলেন। পরে তার বদলী যখন অন্য চাকর এল, তখন বুঝলুম সে আমাদের কত ঠকিয়েছিল। ওঁর যেমন যেমন মাইনে বাড়ত সবই নিয়ে নিত। ক্রমে আমিও সংসারের কাজ একটু একটু শিখলুম।